তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৪৪ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্র[illegible] দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৯। খৃঃ ১৯২২। সম্বৎ ১৯৭৯। কলিগতাব্দ ৫০২৩।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিংশ কল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৪৪ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

বিষয়।	লেখক		পৃষ্ঠা।
অজ্ঞেয়বাদ ও অধ্যাত্মজ্ঞান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৮
অদ্ভুত স্বপন	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	...	৩১৬
অভিজ্ঞানশকুন্তল (পঞ্চম অঙ্ক —সমালোচনা)	শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন	...	১৪৩ ; ২৪০
অশ্রু-জীবন (কবিতা)	৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৫৯
আর্ট ও তাহার অন্তরায়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬৮
আর্ট ও দুর্নীতি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৬৭
আর্ট ও প্রকৃতি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৩৮
আর্ট ও মঙ্গল	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩২
আর্ট ও মনীষীমত	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৯৪
আর্ট ও সত্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮
আর্ট ও সাহিত্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৫
আর্ট ও সৌন্দর্য্য	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫৫
আর্টের খাতিরে আর্ট	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১১
আর্য্য ও ম্লেচ্ছ	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	৩৫
আহ্বান	কথক শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ	...	১১৮
ঈশ্বর ও মানব	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৮৩
উৎসবে আশা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	২৯২
উৎসবের উদ্বোধন	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী	...	২০৮
উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন		...	১৮৫
এই যে তিনি (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	...	২৬০
এ ভবের পান্থশালায় (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	...	১৩
কবি সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে—	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	১২২
করুণা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	৬৯
কামরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	...	১৩১
৺কিশোরীচাঁদ মিত্র	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ		১৮০, ২০২, ২৯৪
কুড়ানো গান—	মহেন্দ্র ক্ষেপা		
ওপারে ৩১			
আজব কারখানা (মহেন্দ্র ক্ষেপা) ১৮			
দিন ফুরালো সময়ে চল ; কবে যেতে হবে এ সব ফেলে ; আমার মন করে কেন মিছে ভাবনা ২০০			
কেবা কার পর, কে আপন— ৩১১			
কোন্ পথে	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...	১১৮
গার্হস্থ্য-সংবাদ—			
উপনয়ন—শ্রীমান্ যধানাথ ও শ্রীমান্ মৌলিনাথ শাস্ত্রী ; শ্রীযুক্ত আনন্দময় মুখোপাধ্যায় ; শ্রীমান জয়ন্তনাথ ও শ্রীমান হেমাঙ্গনাথ চৌধুরী		...	১৫৮
বিবাহ—শ্রীমতী সরসীনলিনী দেবী ৫৪ ; শ্রীমতী গার্গী দেবী, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ১৫৮			
গৃহপ্রবেশ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়		...	৫৪
শ্রাদ্ধ—স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।			৩০৮
উপনয়ন—শ্রীমান ভাস্কর নাথ ও ভার্গবনাথ মুখোপাধ্যায়।			৩০৮
গ্রন্থ-পরিচয়—			
জ্ঞানাঙ্কুর ; পুরাণ-তত্ত্ব ; চরিত্র ; নিবৃত্তির পথে ; কৃষিজীবী পোদদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিভিন্ন জাতিবিজ্ঞান ৮৩ ;			
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ৫৩ ; চন্দ্রহাস ; স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-কথা ২৫১ ;			
পুষ্পাধার ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দুয়ানী ; আচারতত্ত্ব , প্রথম পাঠ্য-পুস্তক ; কমার্শিয়াল এড্ভার্টাইজার ১৫৩			
পরকালতত্ত্ব ; প্রাচীন শিল্প পরিচয় ৩৩৯			
জলবিচার	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	৩৩৩
জাগো ওগো জাগো (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৮৭
তাই ভালো (গান)	৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৪৪
তোমার নামে (গান)	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এল	...	৩৩৩

বিষয়।	লেখক	পৃষ্ঠা।
দামোদর দেব, গোপাল দেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ...	৩২৬
৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	১৮৫
ধর্মসমাজের আদর্শ	৺ডব্লিউ টি, ষ্টীড ...	২৫১
ধর্মসংস্কারের প্রকৃত পদ্ধতি—ডাঃ ভাণ্ডারকরের ব্যাখ্যান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত ...	৮৯
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন রায় ...	১
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন রায় ...	২১০
নিবেদন (কবিতা)	৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	২৩৮
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত—		
আজ আলোকের এই	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮
আমারে দিই তোমার হাতে	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮
নবীন বর্ষে নবীন হর্ষে	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	৮
প্রচারবিবরণ	শ্রীকেদারনাথ দাস-গুপ্ত	১৫৫ ; ২১৫
৺প্রতিভা দেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ	...	২৭৮
প্রত্যাবর্ত্তন (কবিতা)	কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ	৫৭
প্রভাতী উপাসনা (গান)	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন ...	৩৫
প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব—		
(একাচুরা পূজা ; বরকুমার ; বনদুর্গা ; খলকুমারী)	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ...	১৪
বর্ষশেষ	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ...	১১
বঙ্গীয় পল্লীসমাজের জীবন-মরণ সমস্যা	শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস	২২৮, ২৯৮, ৩১৭
বিশ্বপ্রীতি (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল ...	১০১
বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ	৺সুখবিন্দু সেন বি-এ ...	৫৯
বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব	৺সুখবিন্দু সেন বি এ ...	২৬৪
বেদ-পুরাণ (ডাক্তার ভাণ্ডারকর)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩৫
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—		
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব (রাজা রামমোহন রায়)	শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৩
আকাশ যে ঐ ডাকে	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	১২৮
গগনের এই নীল পাথারে	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	২৫
চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন (রাজা রামমোহন রায়)	শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১৯
দুখের দিনেও গেয়ে যা রে মন	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	৪৩
বচন অতীত যাহা কে কি বুঝান যায় (রাজা রামমোহন রায়)	শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২০০
বাহির হওরে এবার কাজের স্রোতে (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৮৬
বিবাহমঙ্গল (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১০৭
বিস্তার করিলে রাজা (রাজা রামমোহন রায়)	শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৪
বীণা তব শুনি (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৮৪
বন্ধ যাওরে এবার অন্তঃপুরে (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৪৪
মায়ের হয়েই আছি	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	১২৯
হে মন কর আত্মানুসন্ধান (রাজা রামমোহন রায়)	শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১০৮
হে সত্য। গহন গম্ভীর তুমি.	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	৩৩৫
ব্রহ্মোৎসবে আহ্বান	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৮১
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২৫০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১
ব্রাহ্ম সম্বৎ সম্বন্ধে পত্র	শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	১৩৪
ব্রাহ্মসমাজে নববিধ পুরাণের আবির্ভাব	...	৩১২
ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ	শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫০
ভাস্কর রায়	শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ	৪৫ ; ৮০ ; ১৫১
মনসাতত্ত্ব	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ...	১১৩
মায়ার কল (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
মনুসংহিতা ও মাতৃভাব	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫১
মূলের সন্ধান	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	৬৪
মানব জনম পেলেই যদি (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল ...	২৪০

বিষয়।	লেখক।		পৃষ্ঠা।
রমণীর মাতৃত্ব	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭
রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৬
৺রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকল্পে	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৫৯
রামপ্রসাদের মৃত্যু	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৪৮
বাউলপিণ্ডির পথে	শ্রীসুষমা দেবী	...	২০৫
লুসাই-পাহাড়-জেলার বিবরণ	আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	...	৩৯
শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম	আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	...	১৬৪
শঙ্করদেব সম্বন্ধে প্রতিবাদ-পত্র	শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	...	২৪৩
শাশ্বতধর্ম্ম অথবা শুদ্ধ আচরণের আবশ্যকতা (সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৮৯
শান্তি (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	১৯৭
শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৮
শাস্ত্রে যৌবনবিবাহ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২২
শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২৪
শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষার বিরোধ খণ্ডন	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬০
শিবরাত্রি	শ্রীহরিপদ ত্রিবেদী	...	৩২৩
শিলং-এর জলপ্রপাত	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৯৬
শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবিকা-সমস্যা	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...	৩০১
শূকরবলি	শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	...	১৯৭
শেষ গান (কবিতা)	কথক শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ	...	২৮৯
শেষ ডাকে (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ	...	২৫৮
শ্রদ্ধা জ্ঞানের ভিত্তি ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যান	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত	...	৩১
শ্রীনগরের পথে	শ্রীসুষমা দেবী	...	৩৩৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (টিলক কৃত)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ		...	১৮, ৬৯
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ		...	১০১, ১৩৭
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ		...	১৭০
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ		...	২১১
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ			২৪৭, ২৭২, ৩০৭, ৩২৭
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ		...	৩২৭
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ভগ্নাংশ	আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	...	২৩২
শ্রেয় প্রেয় (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	...	৯৩
শোক-সংবাদ—			
৺কালীচন্দ্র ঘোষাল ৫৪ ; সঙ্গীতাচার্য্য ৺শ্যামসুন্দর মিশ্র, রায়বাহাদুর ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ৮৪ ; কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫৮ ; ৺ইন্দিরা দেবী ১৮৬ ; ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২০ ; ৺বঙ্গচন্দ্র রায় ২৫২ ;			
সত্যধর্ম্ম ও তাহার প্রসার (ডাক্তার ভাণ্ডারকর)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২১
৺সত্যেন্দ্রনাথে উপাসনার প্রভাব	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩০৯
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকে		...	২৭৯
৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীদ্বারকানাথ গোবিন্দ বৈদ্য	...	২৮৬
সংবাদ—			
পুরোহিত-নিয়োগ ; ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ		...	৬০
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব		...	১১০
শারদাশ্রম সংস্কৃত কন্যাবিদ্যালয় ; দেশবন্ধু প্রভৃতির কারামুক্তি		...	১৫৭
সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে স্কুল বন্ধ		...	৩৪০
সবরমতি আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ		...	২৬৩
সর্ব্বজ্ঞবচন-সংগ্রহ	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	...	১৮৫
সামাজিক উপাসনা	শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক	...	৮৫
সারস্বত সমাজ			১২৬
সান্ত্বনা (কবিতা)	৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	২৩২
সঙ্গীত-সঙ্ঘের পারিতোষিক বিতরণ		...	২৯
স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২১৭
সোমেশ্বরশতক (কন্নাড় সাহিত্য)	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	...	৫৮
Brahmo Dharma—Chap IV	শ্রীইন্দিরা দেবী	...	৮
Chap V		...	৭৯
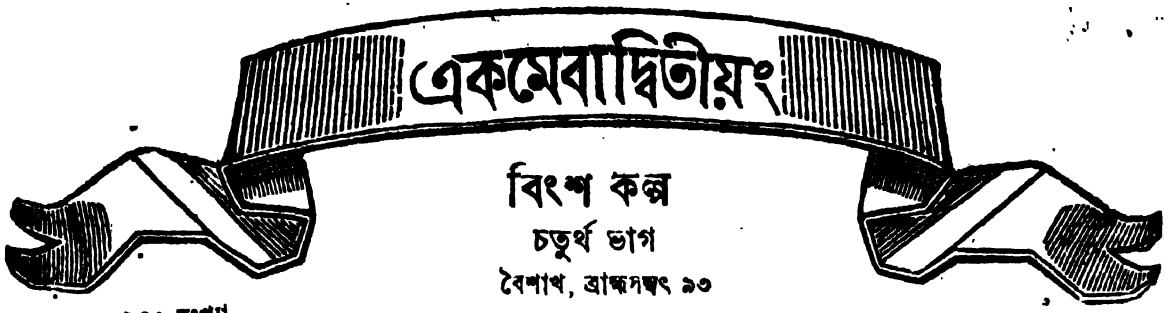
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষ।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

মহাকাল-অবচ্ছেদ নবীন বৎসর,
চির পুরাতন তবু নিয়ত নূতন,
শুভাগত ধরাবক্ষে ভেদিয়া অম্বর ;—
উড়ায়ে অনন্ত অঙ্কে চঞ্চল কেতন।
চিরস্থির মহাকাল নীরব গম্ভীর,
অন্তহীন মহোদধি অজ্ঞেয় মহান্।
ঊর্ম্মিমাত্র বর্ষ তা'র ক্ষণিক অস্থির।
মহা বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ সোপান।
ভ্রান্ত বিশ্বজনগণে করিতে চেতন,
এইরূপে ব্যাপি' কত যুগ-যুগান্তর,
শতাব্দী বৎসর মাস দণ্ড দিন ক্ষণ,
নবভাবে পূর্ণ করে অনাদি অম্বর।
নবোদিত মহাকাশে নবীন তপন,
নবাগত ঋতুভারে নবীন বরষ,
আভাসিত চরাচরে নব জাগরণ,
নিত্য নবভাবে ধরা নিয়ত সরস।
অলীক মোহের বশে মোহান্ধ মানব—
বিশ্বমানবের এই নব আবাহন,
না পারে বুঝিতে, তাই জীবন-আহব—
পরাস্ত নিহত তারে করে অনুক্ষণ।
অনন্তের পরিণতি নিয়ত নূতন ;
অভিব্যক্ত জীবসঙ্ঘ প্রতিদিন হয়,
কেন তবু সঙ্কীর্ণতা মানবের মন—
নিয়ত আশ্রয় করি' বিরাজিত রয়।
তাই নবভাবে আজি মানবমণ্ডল !
জগতের নবীনতা কর আস্বাদন,
মোহমন্ত্র অন্তরেতে পাবে নব বল ;
লভিবে আনন্দময় নবীন জীবন।
অব্যক্ত আনন্দময় বিশ্ব-অধিরাজ।
নূতনের উৎস তিনি, পুরুষ প্রাচীন ;
জানিবে যে দিন তাঁরে মানবসমাজ,
পূর্ণ অভিব্যক্ত সৃষ্টি হবে সেই দিন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে আমি ঋষিবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সবল উদার মুক্তিপ্রদ আশাবাণী তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তোমরা ইহা গ্রহণ করিয়া মুক্তিপথের পথিক হও—"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন ; এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই

জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে আমাদিগকে চলিতেই হইবে। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। সংসারে কোন-না-কোন সময়ে পরাধীনতার প্রবল আঘাত আসিয়া আমাদের প্রত্যেককেই বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে; দুঃখদারিদ্র্য পাপতাপ প্রভৃতির পাষাণভার কোন-না-কোন সময়ে আমাদের মনপ্রাণকে নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার উৎস ভগবান আমাদের অন্তরে স্বাধীনতা লাভ করিবার, সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই আকাঙ্ক্ষা থাকাতেই আমরা শত দুঃখ-দারিদ্র্য, শত পাপতাপ, শত বিপদ-আপদের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়াও স্বাধীনতালাভের জন্য মুক্তিপথের পথিক হইবার জন্য বাহির হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। ভগবৎবিধান এমনই আশ্চর্য্য যে, পরাধীনতা আমাদিগকে যতই ঘিরিতে চাহে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবল বেগে আমাদিগকে মুক্তির পথে ঠেলিয়া পাঠায়।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চলিবে না। ঋষি সত্যই বলিয়াছেন যে, সেই মুক্তির মূল তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ভগবানকে না জানিলে, তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি না করিলে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে দেবতা এই অসীম আকাশে ওতপ্রোত থাকিয়া এই বিশ্বসংসারকে ধারণ করিতেছেন, সমস্ত প্রকৃতির খেলা যিনি আশ্চর্য্যরূপে নিয়মিত করিতেছেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে অবিচলিত নিয়মে এই প্রকৃতিতে সঞ্চরণ করিতেছে, তাঁহাকে না জানিলে, তাঁহার শরণাগত না হইলে প্রকৃতই মুক্তিলাভের আশা কোথায়? মৃত্যুর মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিশ্চয়ই আমরা অমৃতলাভের অধিকারী হইতে পারি না। অমৃতধামের যাত্রী হইতে গেলে মৃত্যুর অতীত সেই অমৃত পুরুষকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে হইবে; জীবনের প্রতি নিমেষে সুখে দুঃখে প্রতি-ঘটনায় তাঁহার সত্তা তাঁহার প্রেমময় মঙ্গলদৃষ্টি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে। এই সত্যবাণী এক সময়ে ঋষিরা ঘোষণা করিয়া ভারতভূমিকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ মহিমান্বিত শিখরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; আজ আবার ব্রাহ্মধর্ম্মও সবল আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই মুক্তিপ্রদ আশ্বাসবাণীই এই দরিদ্র দেশের গৃহে গৃহে প্রচার করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

এই দরিদ্র দেশের অধিবাসী আমরা নানা কারণে শত শত বৎসরের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস করিতে করিতে শরীরে মনে এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা আজ পর্য্যন্ত এই সত্য আশ্বাসবাণীর মুক্তভাব উপলব্ধি করিতেই পারিতেছি না। শয়নে জাগরণে আহারে বিহারে ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধনই যে ভারতের আদর্শ, সেই ভারতের অধিবাসী আমরা আজ তাহাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেছি; সেই যোগসাধনই যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার একমাত্র মূল, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতেই চাহি না। এইরূপ উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ফলেই আজ আমরা লাঞ্ছনা অত্যাচার ও অবজ্ঞার শতবিধ কঠোর আঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি। আজ আমরা স্বাধীনতার বিনিময়ে সোয়াস্তিকে এবং জীবনের বিনিময়ে মরণের মূল আলস্য ও নিশ্চেষ্টতাকে প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া লইয়াছি। যে কেহ এই সোয়াস্তির মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার পথ দেখাইতে যান, যে কেহ আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার কঠিন নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জীবনগ্রহণের উপদেশ দিতে উদ্যত হন, আজ আমরা তাঁহাকেই আমাদের সুখের হন্তারক ভাবিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট নিগ্রহ করিতেও দ্বিধা বোধ করি না—পরাধীনতায়, মরণের অন্ধকূপে থাকা আমাদের এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জগতের ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে, কোন ব্যক্তিই, কোন জাতিই আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার মোহমদিরা পান করিয়া, সোয়াস্তির প্রাণশোষক আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন লাভ করে নাই, স্বাধীনতার পথে যাত্রা করিবার অধিকার লাভ করে নাই, মুক্তির অমৃত সুখ অনুভব করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, শত নিগ্রহের ভয়, শত অত্যাচারের সম্ভাবনা

সত্ত্বেও সে সকলের অতীত হইয়া আমাদিগকে ভগবানের সহিত সেই প্রত্যক্ষ যোগের কথা, সেই স্বাধীনতার আশ্বাসবাণী, সেই মুক্তির অমৃতবার্ত্তা প্রচার করিতেই হইবে। দেশকে উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করিতে চাহিলে, দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে, মুক্তির পথে দাঁড় করাইতে চাহিলে এই প্রচারকার্য্য হইতে আমাদের নিরস্ত হইলে চলিবে না।

স্বাধীনতার এই সত্য আশ্বাসবাণী প্রচার করিবার এক মহান্ অবসর আসিয়াছে। একদিকে বিজ্ঞান দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া সেই মহাশক্তির শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়া মানবকে চমকিত করিয়া তুলিতেছে, মানবের সম্মুখে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তির আশ্বাসবাণী ধরিয়া মানবকে আশান্বিত করিয়া তুলিতেছে; অপরদিকে দেশবিদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মমতসকল গভীরভাবে আলোচিত হইয়া ভগবানের সহিত মানবাত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং মানবাত্মার স্বাধীনতার কথা জনসাধারণের কর্ণে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে। একদিকে জ্ঞানের প্রসার খুবই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, অপরদিকে আমাদের জীবনের ও ধর্ম্মের আদর্শও খুবই সমুন্নত হইয়া উঠিতেছে। ইহারই অপরিহার্য্য পরিণামে জনসমাজের প্রাণে ধর্ম্মবিষয়ক এবং তাহারই অনুষঙ্গে অন্যান্য নানাবিষয়ক এক মহাজাগরণ উপস্থিত হইয়াছে। এই জাগরণের ফলে নানা সংশয় নানা প্রশ্ন উঠিয়া জনসমাজে গভীর অশান্তি আনয়ন করিতেছে। লোকেরা এখন আর পূর্ব্বপুরুষদের আচরিত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করে না। প্রাচীন বল, আর নবীন বল, কোন পন্থারই শুষ্ক মতামত ও শুষ্ক অনুষ্ঠানের বাঁধনে বর্ত্তমান যুগের মানুষ আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে না; অন্ধ কুসংস্কারের দাস হইতে চাহে না, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে চাহে না; অন্তরের সমুন্নত ভাবগুলিকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহে না। তাই আমরা বলিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ সত্য আশ্বাসবাণী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর আসিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মও স্বীয় আবির্ভাব অবধি শত নিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচীন পন্থাকে নির্ম্মূল করিতে চাহেন না। প্রাচীন পন্থাকে সুসংস্কৃত করিয়া তাহাতে নবীন যুগের নবীন আলোক নবীন ভাব প্রবেশ করাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির নবতর পন্থা দেখাইতে চাহেন। সকল ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাই পুনঃসংস্থাপন পূর্ব্বক সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম। নবীন ভাবের নবীন আলোক এবং প্রাচীন পন্থার ভস্মাচ্ছাদিত তেজ, উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনপূর্ব্বক অন্ধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে সত্যধর্ম্মকে জনসমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত।

বর্ত্তমান যুগে মানুষ প্রাণের ভিতর একটা সরল ও সবল ধর্ম্মের অভাব অনুভব করিতেছে। সকলেই এমন একটা ধর্ম্ম চাহিতেছে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিতে পারে যে, যে দেবতা এই অসীম আকাশে থাকিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন, যে দেবতা মানবের আত্মাতে থাকিয়া মানবসমাজকে দেবত্বে উন্নীত করিতেছেন, তিনি আমাদের পিতা মাতা, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও মঙ্গলের আকর, তিনি আমাদের স্বাধীনতার মূল। আমরা এমন সরল ও সবল ধর্ম্ম চাহি, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলিতে পারে যে, যে মত, যে শাস্ত্র ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইবে, সেই মত সেই শাস্ত্র অবিলম্বে পরিত্যাজ্য। আমরা এমন ধর্ম্ম চাহি, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বলিবার অধিকার রাখে যে, কেবল কথার বলে, মেধার বলে বা পুঁথিগত বিদ্যার বলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; সত্যপথের পথিকমাত্রেই শুভকার্য্যের দ্বারা পবিত্রতার দ্বারা তাঁহার স্পর্শ লাভ করিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সরল ও সবল ধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্রে একমাত্র ভগবান; যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, তাহাকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন, আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম

ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের সরল ও সবল ধর্ম্মের জন্য এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবে না।

সত্যধর্ম্মের জন্য প্রাণের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষার কারণেই সময়ে সময়ে নানা সংশয় আসিয়া অশান্তির অন্ধকারে আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিতেছেন—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হও, সকল সংশয়, সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবে। ইহা তো জানা কথা যে, স্বাধীনতার পথে মুক্তির পথে যাত্রা করিতে গেলেই সংশয় সন্দেহ আসিবেই—সংশয়-সন্দেহের ভিতর দিয়াই তো স্বাধীনতার পথে চলিতে হয়। পরাধীনতার পাষাণভারে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলে স্বাধীনতারও অবসর থাকে না এবং কাজেই সংশয়-সন্দেহেরও অবসর থাকে না। একদিকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য, অপরদিকে সংশয় সন্দেহ হইতে মুক্তি দিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব।

জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কারণ ও তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না; জীবনের এমন অনেক রহস্য আছে, যাহা ভেদ করিতে না পারিয়া আমরা হাবুডুবু খাইতে থাকি। এই অজ্ঞতার জন্যই অনেক সময়ে আমরা ভগবানের পূর্ণজ্ঞানে, তাঁহার মঙ্গলভাবে সন্দিহান হইয়া উঠি। কিন্তু স্থিরভাবে ধ্যানস্থ হইয়া আলোচনা করিলেই এই প্রকার সংশয়ের অযৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। সকল তত্ত্ব, সকল রহস্য জানিতে পারি না—সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন সকল তত্ত্ব, সকল রহস্য এক সঙ্গে আমাদের উপলব্ধিতে তো আসিবেই না। কিন্তু সে জন্য ভগবানের পূর্ণজ্ঞানে ও মঙ্গলভাবে সংশয় করিব কেন? বরঞ্চ আমাদের জ্ঞানের সীমাই বলিয়া দিতেছে যে, সমস্ত জগতের কেন্দ্রে, সমস্ত প্রকৃতির অন্তর্য্যামীরূপে এবং সকল আত্মার আত্মারূপে এক পূর্ণজ্ঞান পূর্ণমঙ্গল পরম পুরুষ নিত্য বিদ্যমান আছেন। তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় করিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? আর আমরাও তো প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, জগত যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতির নানা রহস্য, আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকল আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্টস্বরূপে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আমরা উপযুক্ত হইলেই ভগবান আমাদের নিকট স্বপ্রকাশ হইবেন—তাঁহার প্রতি সংশয় করিবার অবসরই নাই।

পুরাকালের বৈদিক ঋষিদের সম্মুখে ভগবান যেমন স্বপ্রকাশ হইয়াছিলেন, আমরাও জানি যে তিনি আমাদেরও সম্মুখে তেমনই স্বপ্রকাশ হইবেন। স্বপ্রকাশ হইবেন কেন?—আমাদের আত্মদৃষ্টিকে উপযুক্ত করিলেই প্রত্যক্ষ করিব যে, ভগবান্ যেমন সেই সুদূর অতীতকালে আকাশে মেঘে পুষ্পে পত্রে ভূধরে সাগরে নদীতে বায়ুতে স্বপ্রকাশ হইয়াছিলেন, তেমনই তিনি আজও সেই আকাশে মেঘে, সেই পুষ্পে পত্রে, সেই পর্ব্বতের উন্নত মহিমায়, অসংখ্য গ্রহতারার নীরব গতিতে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিলে আত্মা যে শান্তি লাভ করে সেই শান্তিতে নিত্য স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহার অমৃতবাণী বৈদিক ঋষিদের ন্যায় আমাদেরও অন্তরে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে; তাঁহার মাভৈ-রবের দুন্দুভি আমাদিগকেও তাঁহার পথে চলিবার জন্য নিত্যই উৎসাহিত করিতেছে।

আমরা ভুলিয়া যাই যে, ভগবান কোন এক ব্যক্তিতে, কোন এক জাতিতে অথবা কোন এক দেশে বা কোন এক কালে আবদ্ধ নহেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতি অণুতে পরমাণুতে স্বপ্রকাশ। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি এবং যিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার আত্মারূপে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে তাঁহার নিকট চলিয়া যাও, সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবে। এই সোজা কথা আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়াই সময়ে সময়ে আমরা এ মহাপুরুষকে সে মহাপুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই। মানুষকে ভাল বাস, শ্রদ্ধা কর, কিন্তু কোন মানুষকেই অতিপ্রাকৃত অবতার বলিয়া ভগবানের সিংহাসনে বসাইলে চলিবে না। ইহা সুনিশ্চিত যে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একমাত্র

ভগবান ব্যতীত আর কোন কিছুই অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত হইতে পারে না। যে সকল মহাপুরুষ দুঃখীর দুঃখে পাপীর পাপে আপনাকে যথার্থ কাঁদাইতে পারিয়াছেন, সেই সকল উদারপ্রাণ মহাপুরুষকে আমরা শতবার ধর্ম্মসংস্থাপনের যুদ্ধে, স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতা বলিয়া অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে সেই করুণাময়ী অখিলমাতার সুশীতল ক্রোড়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর; এ কথা, সে কথা, অবতারের কথা, অতিপ্রাকৃতের কথা প্রভৃতি বৃথা তর্কবিতর্ক মতামত লইয়া সময় নষ্ট করিবার আর অবসর নাই—সরল পথে গিয়া সেই পাপহরণ ভক্তবৎসল ভগবানেরই চরণে আছড়াইয়া পড়, নির্ভয় হইবে। জ্ঞানকে প্রসারিত কর, কুসংস্কার সকল দূর কর; ভগবানের সত্য ও মঙ্গলভাবকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর। বিশ্বাস কর,—নিশ্চয় জানিও, ভগবানের রাজ্যে পাপ, ঘৃণা অজ্ঞান চিরকাল রাজত্ব করিতে পারিবে না। এখানে সত্য, ন্যায় ও প্রেমেরই পরিণামে জয় হইবেই। সন্তানের জন্য মাতার আত্মদানই তাহার সাক্ষী। ইহা জানিয়া নিজেরাও নির্ভয় হও এবং এই আশ্বাসবাণী গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া পাপীতাপী দুঃখী দরিদ্র সকলকে আশ্বস্ত কর। তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্ঞান আমাদের প্রেম ও জ্ঞান অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও গভীর এই কথা জান এবং সকলকে জানাও। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশাবাণী শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে স্বাধীনতার পথে যাত্রা করিতে শিখিয়াছি, দেবাধিদেব ভগবানকে সাক্ষাৎ পিতামাতা বলিয়া জানিয়াছি, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র—ভগবানকেই প্রীতি ও তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন—প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া লইয়া আমাদের সকলের মিলিতভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে নবীনভাবে নবীন আলোকে আলোকিত করিয়া তোল। আমাদের এই কার্য্যে ভগবান তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

মায়ার কল।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মালকোষ।

তুমি হে কালের কাল,
ওহে মহাকাল!
আমায় মায়ার কলে
করেছ নাকাল।
যে কলে চলেছে সব
বিশ্ব-চরাচর;
ঘটে ঘটে কলরব
অষ্ট প্রহর;
যে কলে কলহ নিত্য
পর আপনায়;
যে কলে বিকলচিত্ত
করে গো অন্যায়;
যে কলে জাগিছে মেলা
নব নব আশা;
অমিয় মায়ার খেলা
স্নেহ-ভালবাসা;
সে কলে শিকলে বাঁধা
ওরে মোর মন!
ঘুরে ঘুরে কেন সাধা
জনম মরণ?
করিব তা' দিবারাতে—
কি আছে সাধন,
বল দেব কাটে যাতে
মায়ার বাঁধন।
তুমি যদি মায়া হ'তে
মুক্তি নাহি দিবে
উজলিব সত্যপথে
কেমনে ত্রিদিবে?

Brahma Dharma.

CHAP. IV.

27. Srotrasya srotram etc.

It is from the Supreme Being that the eyes, ears, tongue, mind and soul of man have each received their own powers, and it is through His support that they are

able to exercise those powers in their respective functions; hence He is said to be the ear of the ear, the mind of the mind, the speech of speech, the soul of the soul, and the eye of the eye. As he is the eye of the eye, but not Himself the eye; the ear of the ear, but not Himself the ear; so is He the mind of the mind, but not Himself the mind. He is infinite knowledge in itself. He is the cause and container of all things.

28. Na tatra chakshurgacchati etc.

He who is the eye of the eye, yet beyond all sight; the speech of speech, yet beyond all speech; the mind of mind, yet beyond all mind; all that can be taught about Him is, that He is different from all things known and unknown. He is not any of the things well-known to us, neither is He any of the finite created things that we do not know. He is the Creator, Protector and Conductor of all finite things, known and unknown: He exists in all things, yet is He different and distinct from all. All preceding preceptors have also taught thus.

29. Yadvachanabhyuditam etc.

He from whom speech has obtained the power to speak,—He is Brahma. Speech is revealed through His presence, but He is not revealed by speech. He is not any of the finite things which are worshipped by men and pointed out as 'this'. Some worship wind and water, fire and stones, beasts and birds, trees and creepers; some worship sun, moon, stars and planets, some worship gods and goddesses fashioned according to their own imagination, many worship some particular man gifted with extraordinary powers, thinking him to be the incarnation of God; but none of these is Brahma, and the worship of these is not the worship of Brahma.

30. Yanmanasa na manute, etc.

The mind can only think of finite objects; but how can the mind think upon that Brahma, who is infinite knowledge itself? He is not subject-matter for the mind; none can think upon that all-perfect Being, but He thinks upon us all. He is the witness as it were of all our feelings, all our desires, all our actions; before Him darkness cannot hide misdeeds, nor calumny besmirch good actions.

31. Yadi manyase suvedeti etc.

He who thinks he knows Brahma perfectly well, knows very little indeed about Brahma; because this he knows not, that Brahma the Infinite cannot be perfectly well known. Perhaps he is satisfied with the thought that Brahma is like some material object; or else, if he is somewhat more subtle of understanding, perhaps he thinks Him to be something like a disembodied finite spirit. But never has he known this, that He has neither body nor mind. Had He a body, He would have been visible; had He a mind, He could have been grasped by the mind. There are many who have understood that Brahma has no form; but they have not clearly understood that He has no mind. They ascribe the faculties of the finite mind to that One who is pure, free and infinite Knowledge; they think that he possesses the feelings of anger, hatred, tenderness, mercy and partiality. Had He all these qualities of the mind, He would have been perfectly knowable; therefore they who think they know Him perfectly well, attribute to Him these mental qualities, and they who are more crude-minded, attribute to Him physical qualities. The mind is an extremely subtle thing, beyond the reach of sight. He who is subtler still, who has none of the attributes even of mind,—how is it posible for us to know Him perfectly well? He who is the cause of this wonderfully-designed universe

is possessed of knowledge no doubt—but is that knowledge finite like our mental knowledge? Can we grasp that infinite knowledge with our small intelligence? He has created this universe and preserved it hitherto, therefore it is evident that He possesses powers of creation and preservation; but are those powers limited like ours? Can we even imagine that unthinkable power of His? He who has created mercy tenderness and love for the good of creation, is His love like the love of our little minds? Who can ever plumb with his mind the unfathomably deep love of that all-true, all-beautiful, all-beneficent Being.

32. Naham manye suvedeti, etc.

"Not that I do not know Brahma" means that it is not that I know nothing whatever of Brahma's attributes,—knowledge has shown me His perfection without beginning or end, His supreme truth, beauty and goodness. But my intelligence has not been able to grasp him definitely like a finite object. He who has percieived Him with the pure eye of wisdom and known His perfection, will be able to understand thoroughly the inner meaning of these words.

33. Yasyamatam tasya matam etc.

When we realise that it is impossible for us to thoroughly understand the self of Brahma with our small and limited intelligence, then do we know his perfection without beginning or end. The wise man who, with the pure eye of wisdom has seen as it were manifest the perfection of that all-true, all-beautiful and all-beneficent Being,—he knows that His attributes are found to be illimitable.

34. Iha chedavedidatha etc.

Even though our small intelligence cannot grasp the self of Brahma completely like a finite object, yet by means of intuition which is the basis of intelligence, we firmly believe His spirit of Perfect Goodness to be the Cause of all causes, the Prime refuge of all refuges the Source of all good. The soul of man, freed from sin, can see manifest, within himself that Spirit of Infinitude, Wisdom and Goodness as the support of all things. If we can know Him thus, whilst living on this earth, then shall our lives be truly fruitful. For what higher end can we be born than to know Him? That He has given us the privilege to know Him,—this is the greatest mercy of all His mercies. What greater good fortune could befall us than that we, the denizens of this puny earth, enveloped in darkness,—should come to know that all-true, all-beautiful and all-beneficent Being, Who is beyond all things? The marvellous contrivance of this universe demonstrates to us the infinite wisdom of its Contriver; the existence of beneficent laws makes evident to us the benevolent purpose of the Lawgiver; we purify our souls by practising the rules of righteousness established by Him, and immerse ourselves ever deeper in His love, in grateful recognition of His love for us all. What profits us here in this life, if we know Him not, if we love Him not deeply, if we practise not the righteousness inculcated by Him? Can the soul of man be satisfied with collecting a few gold coins, or obtaining great fame and honours, or gratifying the low pleasures of the senses? Can Love be fulfilled by having as its object frail things of clay, or imperfect natures qualified by good and bad? He who, knowing not that Brahma and depriving himself of the eternal bliss derived from His communion, gives himself up to some unclean pleasure of this earth, his condition is most perilous. He wanders far indeed from the realm of virtuous bliss.

Enkindle the knowledge of Brahma and foster your powers of intuition by consideration of the design and purpose of all things movable and immovable. All movable and immovable things have been created by Him, and are the manifestation of His skill; it is His beneficent spirit that they reveal, His glory that they preach, His name that they proclaim. Be it Astronomy or Geology, Medicine or Psychology, Philosophy or Religion—all knowledge teaches His infinite wisdom and benevolent purpose. From all these sciences obtain that pure knowledge of Brahma which is the basis of all, and become possessed of Brahma, and after departing this world, become immortal under the aegis of that Immortal One.

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

* * *

আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে মোর লুকিয়ে-রাখা ধূলায়-ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত-হাওয়া—
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণবীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী আশা-ভৈরবী—তাল তেওরা।

নবীন বর্ষে নবীন হর্ষে
বিহগ গাহে নূতন গান
আমি কি হেথায় তুচ্ছ ব্যথা লয়ে
রহিব ক্ষুব্ধ বিষাদ ম্লান!
শ্যাম বনরাজি সেজেছে সুন্দর
কি নীল অঞ্জনে মেদুর অম্বর
একি ফুল হাসি একি কল-বাঁশী
আমি হেথায় আসি রব কি ম্রিয়মাণ!
আমারে তুমি নবীন করি লহ
জীবন-ব্যথাভার হয়েছে দুঃসহ
আলোক দাও মোরে জীবন দাও হে
এ মোহ-রজনী করহ অবসান!
রাখ মোরে প্রভু তোমারি চরণে
অভয় হয়ে যাই জীবনে মরণে
না গণি সুখ-দুখ নেহারি প্রেমমুখ
তোমাতে ভরি বুক তোমারি গাহি গান॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

* * *

আমারে দিই তোমার হাতে নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনে ফুল যে ফোটে, তেমনি করেই ফুটে ওঠে,
জীবন তোমার আঙিনাতে, নূতন করে নূতন প্রাতে॥
বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে, মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে, হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে, নূতন করে নূতন প্রাতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্ট ও সত্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান আছেন, একথা জড়বাদী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে এবং তাঁহাদেরই এদেশ-ওদেশবাসী শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গকে গত মহাসমরের পরেও তর্কের দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহাই হউক, তাঁহাদিগকে একথা বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিলেও আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সাধারণ ভারতবাসীকে তর্কযুক্তি দ্বারা সে কথা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা যাঁহাদের উত্তরাধিকারী, সেই মহাপ্রাণ ঋষিরা নিজেদের সহজ জ্ঞানে ভগবানের জাগ্রত স্বপ্রকাশ সত্তা অন্তরে বাহিরে আকাশে আত্মাতে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই অসীম আকাশে বর্ত্তমান আছেন,

যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্বজ্ঞ পুরুষ এই আত্মাতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।” তাঁহারা নিজেদের সহজজ্ঞানে ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচারের দ্বারাও জনসাধারণকে ভগবানের অস্তিত্ব বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। মহামতি বেদব্যাস তাঁহার বেদান্ত দর্শনে বলিতে গেলে একটী সূত্রের দ্বারাই ভগবানের অস্তিত্ব দৃঢ়প্রমাণিত করিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ হইতেছে “যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে. তিনি নিশ্চয়ই আছেন”। তাঁহার মনের ভাব এই যে, এই বিশ্বচরাচর, এই প্রকৃতি, এই জীবাত্মা, ইহারা আপনাপনি উদ্ভূত হইতে পারে না, আপনাপনি রক্ষা পাইতে পারে না এবং আপনাপনি বিনষ্ট হইতেও পারে না ;— তাহা যখন পারে না, তখন, এই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের এক শাশ্বত কর্ত্তা আছেনই ; সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তিনি ধ্রুব সনাতন রূপে নিত্য জাগ্রত সত্তারূপে বিদ্যমান। তাই তাঁহারা সংক্ষেপে তাঁহাকে সত্যং—সত্যস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সেই ঋষিদের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় ভগবানের নাম ভারতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে বলিয়া আমরা যে তাঁহাকে বিশেষভাবে ভারতের দেবতা বলিয়া স্বীকার করি, আমাদের পক্ষে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন, তবে ইহাও ধ্রুব সত্য যে তিনি বিশ্বচরাচরের, সমস্ত প্রকৃতির সর্বত্র সমভাবে আছেন। তিনি যদি সর্বত্র ও সর্বকালে সমান ভাবে না থাকিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি হইতে এই পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত চিরকাল কি সমানভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিত ? কে তাহাদিগকে সমানভাবে চালাইয়া লইতে পারিত ? সেই চিরন্তন মহাসত্য আছেন বলিয়াই এই সমস্ত প্রকৃতি সুশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাই তাঁহাকে সমস্ত জগতের দেবতা এবং সমস্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অন্য কথায় আমরা বলিতে পারি যে, সেই দেবাধিদেব ও প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্ধ্যানে আপনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির সূত্রপাত হইল। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানেরই অন্তর্ধ্যানের ফলে এই প্রকৃতির অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়াই আমরা প্রকৃতির সকল বিভাগেই, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শতবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা একত্ব প্রকাশ হইবার চেষ্টা দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই ভাবটী আলোচনা করিয়াই বলিয়াছেন যে, “প্রকৃতির কার্য্যে ভগবানেরই আর্ট বা কলাকৌশল প্রকাশ পায়”। আমরাও যাহাকে আর্ট বলি, তাহাও প্রকৃতির ভিত্তিতে আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্ধ্যানের অভিব্যক্তিরই ফল। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আমি এক পদও চলিতে পারি না—যাহা লইয়া প্রকৃতি বা ভগবানের অন্তর্ধ্যান বহির্বিকাশ বা আকার লাভ করিয়াছে, আমিও যে তাহারই অন্যতর কণা। সুতরাং প্রকৃতির দৃঢ়ভিত্তি বা সত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আমার অন্তর্ধ্যান অভিব্যক্ত হইতেই পারে না।

আমি উষ্ণপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া এখানকার প্রকৃতির ভিত্তিতে শীতচিত্র একভাবে ধ্যান করিয়া অভিব্যক্ত করিব ; আবার ল্যাপল্যাণ্ডবাসী, তাহার নিজের জন্মস্থানের প্রকৃতির ভিত্তিতে শীতচিত্র আর একভাবে ধ্যান করিয়া অভিব্যক্ত করিবে। কিন্তু আমাদের উভয়কেই বলিতে গেলে ভগবানের চিত্রফলকের উপর, প্রকৃতির সত্য-ভূমির উপর নিজ নিজ আর্টকে বা চিত্রের কলাকৌশলকে দাঁড় করাইতে হইবে। প্রত্যেক আর্টিষ্টের বা শিল্পীর প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে আর্টিষ্টের আর্ট এক মুহূর্ত্তেরও জন্য দাঁড়াইতে পারে না। প্রকৃতিতে বর্ত্তমানে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে অতীতের যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যতে যাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই আমি আমার আর্টে কলাইতে পারি। কিন্তু যাহা অসত্য, প্রকৃতিতে

যাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া আমার উপলব্ধি হইবে, তাহা আমি আমার আর্টে কিছুতেই ফলাইতে পারিব না, এবং ফলাইতে গেলেও তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া সাধারণের চক্ষে হেয় ও পরিত্যাজ্য হইবে। আমি স্বপ্নে নিজেকে আকাশে উড়িতে দেখিয়াছি, পক্ষীদিগকে পক্ষসংযোগে সহজেই উড়িতে নিত্যই দেখিতে পাই, এবং অনেক সময়ে আমাদের প্রাণটাও আকাশের দিকে উড়িবার ভাবে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই কারণে, যদি কোন আর্টিষ্ট তাঁহার চিত্রে কোন মানুষকে উড়িবার রূপ দিয়া অঙ্কিত করেন, তবে তাহা অতিমাত্র কল্পনার বিষয় হইলেও নিতান্ত অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃত—প্রকৃতির অতীত হইবে না। কিন্তু যদি কোন আর্টিষ্ট সোনার পাথরবাটী অঙ্কিত করিতে যান, তবে তাহা নিতান্তই অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত—প্রকৃতির অতীত হইয়া পড়িবে; অর্দ্ধেক সোনা ও অর্দ্ধেক পাথর, এই ভাবে একটা কিছু অঙ্কিত করিলেও তাহা সোনা ও পাথরের জগাখিচুড়ী হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সোনার পাথরবাটী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারিবে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আর্টিষ্ট অতিপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক কোন কিছু অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ব্যর্থকাম হইতে হইবে। তাঁহার এতটুকুও সফলতা লাভের ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে প্রকৃতির সত্যভূমির উপর দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেই হইবে।

সত্যস্বরূপ একমাত্র ভগবান যখন প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না, তখন কাজেই স্বীকার করিতেই হয় যে, আর্টের মূল কেন্দ্র হইলেন সত্যস্বরূপ একমাত্র ভগবান এবং তাহার পত্তনভূমি হইল সত্য প্রকৃতি—সংক্ষেপে সত্য। এই যে বিশ্বচরাচরের, এই যে সমস্ত প্রকৃতির শতবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা একত্ব উপলব্ধ হয়, যাহার অভাবে আর্ট বলিয়া কিছুই থাকিতে পারিত না—আর্ট কতকগুলি শব্দের বা বর্ণের বা স্বরের অযথাসমাবেশেই পরিণত হইত—সেই একত্বের ভিতরেই চক্ষুষ্মান আর্টিষ্ট সমস্ত প্রকৃতির কেন্দ্র, সকল বৈচিত্র্যের একমাত্র অনন্ত উৎস ভগবানকে উপলব্ধি করিতে বাধ্য; তিনি ভগবানের সত্তাকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই কেন্দ্রকে অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগধারা তাঁহার নয়নগোচর হইবে এবং তখনই তাঁহার আর্ট শতমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। এই কেন্দ্রে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া স্থির রাখিতে পারিলেই এই কেন্দ্রের পরিধি প্রকৃতিও সহজে আর্টিষ্টের আয়ত্ত হইবে, এবং সকল বিষয়েই তাঁহার আর্ট স্বাভাবিকতার ছাপ লইয়া উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে। আর্টিষ্ট সেই একত্ব ও তাহার মূল ভগবানকে ভুলিয়া কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আত্মদর্পে যতই এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে থাকিবেন, ততই তাঁহার বক্তব্য বিষয়সকল হইতে আর্ট লুকাইয়া পড়িবে।

শীতের সময়ে সকলেই, জীবজন্তুমাত্রেই জড়সড় হইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলে আগুন পোহাইতে ছাড়ে না,—ইহাই হইল সকল দেশের জন্য ভগবানের একই বিধান। কাজেই ইংলণ্ডেরই হউক আর বঙ্গদেশেরই হউক, শীতচিত্র আঁকিতে চাহিলেই আর্টিষ্টকে তাঁহার চিত্রে জড়সড়ভাব ফুটাইয়া তুলিতেই হইবে। ভগবানের কেন্দ্রভূমির উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই একই বিধানের প্রতি ধ্যাননেত্র স্থির রাখিলে এই ভাব পরিস্ফুট করা সহজ হইবে। তাহার পর, আর্টিষ্ট যদি ইংলণ্ডের শীতচিত্র আঁকিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে গির্জ্জা বরফপড়া এবং গৃহাভ্যন্তরে চুল্লীর নিকট বসিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অগ্নিসেবা প্রভৃতি আঁকিয়া চিত্রে স্বাভাবিকতা আনিতে হইবে; আবার তিনি বঙ্গদেশের শীতচিত্র আঁকিতে চাহিলে তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ঘুঁটে, পাতা প্রভৃতি জ্বালাইয়া তাহারই চারিধারে বসিয়া কঙ্কালসার দরিদ্র কুটীরবাসী পরিবারের অগ্নিসেবা প্রভৃতি আঁকিয়া আর একভাবে চিত্রে স্বাভাবিকতা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক চিত্রে যথাযথ স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই সেই চিত্রে আর্ট প্রাণবান মূর্ত্তিতে

স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিবে। তৎপরিবর্ত্তে, বঙ্গদেশের শীতচিত্রে ইংলণ্ডের বরফপড়া প্রভৃতি আঁকিলে, অথবা ইংলণ্ডের শীতচিত্রে বঙ্গদেশের ঘুঁটে পাতা জ্বালাইবার চিত্র আঁকিলে তাহার মধ্যে কিছুতেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইবে না; সে চিত্রে অস্বাভাবিকতা মূর্ত্তিমান হইয়া থাকিবার কারণে আর্টের পরিবর্ত্তে আর্টের বা কলাকৌশলের অভাবই প্রকাশ পাইবে।

এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের যিনি উৎস, সেই ভগবানই আর্টের কেন্দ্র; আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন প্রকৃতির সত্যভূমিই, সংক্ষেপে সত্যই, আর্টের পত্তনভূমি, এবং সেই কারণে স্বাভাবিকতাই—প্রকৃতিসিদ্ধ যাহা, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের স্বভাব বা কল্পনাসূত্রে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে বা সম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহাই আর্টের প্রাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মিথ্যার চোরা-বালির উপর আর্ট দাঁড়াইতে পারে না—অস্বাভাবিকতাই আর্টের মৃত্যুর কারণ।

বর্ষশেষ।

আজিকার এই রাত্রিটী যেন পুরাতন ও নূতনের মাঝে সেতু হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এর এক প্রান্ত উজ্জ্বল করে পুরাতন বৎসরের শেষ সূর্য্য অস্তে চলে গেছে; আর এক প্রান্ত আলো করে নববর্ষের প্রথম সূর্য্যোদয় আসন্ন হয়ে আছে। আমরা ঠিক মাঝখানটীতে দাঁড়িয়ে আছি। পুরাতন আজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে অনন্তের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে! আমরা আজ তাকে বিদায় দেবার জন্য এবং যিনি আমাদের জীবনকে নিয়ত সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছেন, তাঁকেই আর একবার এই বর্ষশেষের শেষ সন্ধ্যাটীতে স্মরণ করে নেবার জন্যই এখানে এসে মিলেছি। যদিও আমরা প্রত্যেকেই একদিন একলাই এই জীবনের পথে যাত্রা সুরু করে দিয়েছিলাম, তবুও যিনি এই মহা জীবনপথচক্র রচনা করেছেন, তিনি কোনও দিনই তো আমাদের কাহাকেও একলাটী পথ চলবার কষ্ট পেতে দেন নি; তাই যখন কাহাকেও বিদায় দেবার সময় আসে তখন আমাদের হৃদয় বেদনায় ভারাতুর হয়েই ওঠে।

আমরা কত দেশের কত অদ্ভুত গোলক-ধাঁধার গল্পই না শুনেছি, কিন্তু এই বিরাট্ জীবনচক্রের মত এমন অদ্ভুত গোলকধাঁধার কল্পনাও কি কোন দিন মানুষের মনে জেগেছে? যদিও এর সব পথগুলি শেষে একই জায়গায় গিয়ে মিলেছে, তবুও কিন্তু তারা সব একই সঙ্গে যেতে যেতেই কোথায় যে কোন্‌টী কোন্ দিকে মোড় ফিরে দাঁড়িয়েছে তা বুঝে ওঠাই ভার। বরাবরই তো দেখে আস্‌ছি, আমাদের এই সংকীর্ণ জীবনপথগুলির দু'পাশ ঘেঁসে কতশত পথের যাত্রী তার নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলেছে; এমনি এক-সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পাশাপাশি যেতে যেতে কত জনের সঙ্গে কত ভাবও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন চেয়ে দেখেছি যে, তাদের জীবনপথের মোড় ফিরে গিয়েছে, তারা আমাদের ছেড়ে ধীরে ধীরে কোথায় চলে গিয়েছে। এই চলে যাবার মুহূর্ত্তে তারাও যেমন বেদনা পেয়েছে, আমরাও তেমনি পেয়েছি। কিন্তু উপায় তো নেই, দাঁড়িয়ে শোকপ্রকাশের অবসর কৈ? আর শোক-প্রকাশ করাও তো মিছে। আমরা তো আর তাদের মুখ চেয়েই এ দুর্গম জটিল জীবনপথে পা বাড়াই নি। যিনি আমাদের এখানে এনেছেন, সকলের অলক্ষিতে আমাদের কাছে কাছে থেকে যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে সম্মুখের দিকে—উন্নতির দিকে—আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এই দুরূহ জীবনপথের যিনি নিত্য সঙ্গী, তাঁকেই যেন কোন দিন এই সব মিথ্যা কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে না ফেলি, এইটুকুই যেন আমাদের চিরদিনের লক্ষ্য থাকে।

আজ যাকে বিদায় দিতে আমরা এখানে এসেছি, যার জীবনপথ আজ আমাদের জীবনপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সে আমাদেরই একজন পুরাণো বন্ধু। জীবনের কতকটা পথ তার সঙ্গে পাশাপাশি চলেছি শুধু নয়, কিন্তু সে তার ছয় ঋতুর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার থেকে আমাদের রিক্ত জীবনপাত্রগুলিকে রসের ধারায় ভরিয়ে দিয়ে

গিয়েছে। অবশ্য সে আমাদের জীবনে শুধু সুখের কুসুমগুলিকেই ফুটিয়ে তোলেনি—দুঃখের আঘাতও যথেষ্ট দিয়েছে; শুধু সত্যের ভাস্বর পথই দেখায় নি—মিথ্যার মোহময় পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে; কিন্তু তবু আজ তার এই বিদায়ের পবিত্র ক্ষণটীকে সারা বছরের সেই সব লাভক্ষতির পাটোয়ারী হিসাব তুলে পঙ্কিল করে দিতে চাই নে। কারণ, আমরা তো একে আমাদেরই একজন বন্ধু বলেই যে মেনে নিয়েছি। যে দিন এ নূতনের মূর্ত্তিতে আমাদের দরজায় এসে আঘাত করেছিল, সে দিন যেমন পরম আদরে একে ঘরে ডেকে নিয়েছিলাম, আজও যেন তেমনি হাসিমুখে একে বিদায় দিতে পারি। যদিও আমাদের পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ নেই—সম্মুখ হতে নিয়তই এগিয়ে যাবার তাগিদ আস্‌ছে—তবুও যেন এই পুরাতন বন্ধুটীকে একেবারে প্রাণহীনভাবেই বিদায় না দিই।

এ জীবনের পথে কাকেও তো একান্ত করে চিরদিনের জন্য পাই নি। এখানে যা কিছু দু-চোখ দিয়ে দেখি, তাই দেখি চঞ্চল গতিশীল। তুচ্ছ ধূলিকণা হতে মহা মহা গ্রহ-উপগ্রহ পর্য্যন্ত কিছুই তো স্থির হয়ে নেই—সবই যে ছুটে চলেছে। বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, অঙ্কুর পল্লবিত হচ্ছে, পল্লব ফুলে ফলে ভরে যাচ্ছে; জল বাষ্প হচ্ছে, বাষ্প মেঘ হচ্ছে, মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়্‌ছে, শিশু কিশোর হচ্ছে, কিশোর যুবা হচ্ছে, যুবা বার্দ্ধক্যের ভারে নুইয়ে পড়ছে। জীবনের যে ভাগটুকু আমাদের চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে, সেখানেই দেখতে পাই এমনি একটানা গতি। তবে এই গতির একটা বিশেষত্ব আছে। মানুষ যখন চলতে থাকে, তখন তার সমগ্র শরীরের উপর গতিবেগের একটা স্পষ্ট মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌লেও সে যেমন গতির সঙ্গে স্থিতির সামঞ্জস্য রেখে পর্য্যায়ক্রমে এক পায়ে চলে আর অন্য পায়ে দাঁড়ায়—এও যেন কতকটা সেইরূপ। তাই, জীবনের পথে যদিও কেবল বিদায় দিতে দিতেই চলেছি, তবুও সে বিদায় কোন দিন একান্ত রিক্ত হয়ে শ্রীহীন হয়ে প্রকাশ পায় নি, কারণ সে তো কোন দিনই একা আসে নাই—চিরদিনই যে স্বাগতের অগ্রদূত হয়েই এসেছে। বসন্তের নবমুকুলে যখন সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে, তখনই তো বৃক্ষ তার শুষ্ক পত্ররাশিকে দক্ষিণা হাওয়ায় ছড়িয়ে দেয়। চিরদিনই ত্যাগ এমনি ভোগের পাশে পাশেই থেকে সুশ্রী হয়ে শোভন হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এই যে আমরা সকলেই পাওয়া ও ছাড়ার মধ্য দিয়ে একই দিকে ছুটে চলেছি—কেন? কে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে? সমুদ্রের অব্যক্ত আহ্বানের সাড়া পেয়ে দূর-দূরান্তের গুহাশায়ী জলবিন্দু যেমন ঝরণাধারায় নেমে আসে, আমরা কি তেমনি কারও আহ্বান শুনেই ছুটে চলেছি? সে যেমন সমস্ত পথ ধরে অনেক-কিছু পেতে পেতে ছাড়তে ছাড়তে এসে শেষে মহাপারাবারের মধ্যেই তার পরম পাওনাটীকে পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমাদেরও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনগুলির সম্মুখে তেমন কি কোন এক মহা জীবনপারাবার নেই, যেখানে গিয়ে আমাদের সমস্ত গতির সমস্ত পরিণতির অবসান হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই আছে; সেখান থেকেই তো আমাদের ডাক এসেছে, তাঁরই আহ্বানে প্রাণের মাঝে আমাদের বাঁশী বেজে উঠেছে বলেই তো আমরা ছুটে চলেছি। তাঁরই আহ্বান যখন প্রাণের মাঝে কান পেতে শুন্‌তে পাই, তখনই তো আমাদের পথ সোজা হয়ে আসে; আর সংসারের কোলাহলে যখন তা ঢাকা পড়ে যায় তখনি শুধু পথ ভুলে মরুভূমির মাঝে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পড়ি।

আজ এই বর্ষশেষের শেষ সন্ধ্যাটীতে আমরা যেন তাঁর ডাকটীকে স্পষ্ট করে শুনে নিতে পারি, তাহলে নববর্ষের প্রথম প্রভাত হতেই আমরা তাঁর দিকে সোজা এগিয়ে যেতে পারব। তাঁকেই কেন্দ্র করে, ধর্ম্মের যে ভাস্বর জ্যোতিচ্ছটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আজ যেন আমরা আমাদের এই জীবনের পাত্র ভরে তাকে সংগ্রহ করতে পারি। মানুষের জীবন যখন এই আলোকের সংস্পর্শ লাভ করবার সুযোগ পায়, তখনই তা ফুলের কুঁড়ির মত স্তরে স্তরে আপনার দলগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে ফুটে ওঠে। ইহা তোমার আমার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, সমগ্রের জাতিগত জীবনেও তেমনি সত্য। যদিও

একদিন ভারতে এই ব্যক্তিগত সাধনা জোরেই চলেছিল, তবুও আজ ভারতের এই দুর্দ্দশার দিনে সমগ্রের মুক্তিই আমাদের প্রার্থনীয়। এবং এই জন্যই তো ঘরের দরজার খিল এঁটে একাকী সাধনার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া অপেক্ষা সমবেত-ভাবে সাধনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই আমরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। আমরা যেন আজ সেই দিনের অপেক্ষায় জীবনের এই কঠোরতম সাধনার পথে বিধৃত হয়ে থাকতে পারি, যে দিন ধর্ম্মের দিব্য ভাস্বর জ্যোতিতে জাতির মহান জীবনপদ্ম রূপ-রস-গন্ধে ভরপুর হয়ে দিগন্ত আলো করে ফুটে উঠবে। আজ এই বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই ব্রত নিয়েই যেন আমরা ঘরে ফিরতে পারি যে, এখন থেকে ধর্ম্মের ভাস্বর জ্যোতির পথে প্রাণকে আমরা সমান্তরালভাবে উন্মুখ করেই তুলে ধরব—তাতে সংসারের দিক্ থেকে আমাদের যতই কেন স্বার্থহানি ঘটুক না। আমাদের এইটাই পরম সৌভাগ্য যে, ধর্ম্মের সেই ভাস্বর জ্যোতির সন্ধান আমরা পেয়েছি। একদিন এই প্রাচীন ভারত যার অপূর্ব্ব স্পর্শ লাভ করে প্রাণের বিপুল আবেগে দুলে দুলে ইহ-পরলোকে সার্থক হয়ে উঠেছিল, আজ আমরাও তারই সন্ধান লাভ করেছি।

কিন্তু ভীরুর মত আজ যেন সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হই যে, এখনও আমরা ধর্ম্মের সেই ভাস্বর জ্যোতিকে সমান্তরাল-ভাবে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি। বুদ্ধি দিয়ে যে পরিপূর্ণ সত্যকে স্পর্শ করেছি, এখনও তা প্রাণের রসে সিক্ত হয়ে অঙ্কুরিত হয়ে জীবনকে নবীনতার স্পর্শে স্নিগ্ধ করে দেয়নি। অবশ্য প্রতি কথাই আমরা সমগ্রের উপর লক্ষ্য রেখেই বলছি, ব্যক্তির জীবন আমাদের বিচার্য্য নয়। সমষ্টিমুক্তিই আজ বর্ত্তমান জগতের বিশেষ বাণী ; এবং ইহা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়েই প্রচারিত হয়েছিল।

কিন্তু শেষে যে একটা আশার বাণী আমার প্রাণের মধ্যে থেকে থেকে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে তা'কে ব্যক্ত না করে পরছি না ; মনে হচ্ছে, বুঝিবা জাতীয় জীবনের নববর্ষের নবীনপ্রভাত অদূরবর্ত্তী। যদিও এখনো আলোকের প্লাবন এসে ধরণীর শস্যশ্যামল অঞ্চলের উপর লুটিয়ে পড়েনি, এখনও শুধু উচ্চ গিরিশীর্ষে এবং কোথাও বা উন্নত বৃক্ষ শীর্ষে ঝিকিমিকি করছে মাত্র, কিন্তু যখন জাতীয় জীবনের এক অংশে তার আলো দেখা দিয়েছে, তখন সমগ্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে আর কতক্ষণ ?

হে দেব তোমাকেই কেন্দ্র করে ধর্ম্মের যে ভাস্বর জ্যোতিচ্ছটা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে, তারই জ্যোতির্ম্ময় স্পর্শে তুমি আমাদের জাতীয় জীবনকে উজ্জ্বল করে তোল। আজ সমগ্রের জন্যই আমাদের প্রার্থনা। সমগ্রকে দূরে ঠেলে ফেলে, শুধু নিজের জন্য মুক্তি চেয়ে নিতে লজ্জায় আজ অধোবদন হচ্ছি। তুমি বিশ্বেশ্বর, অথচ এতদিন বিশ্বকে সমষ্টিকে বাদ দিয়ে তোমাকে শুধু আমারই জীবনে একান্ত করে পেতে চেয়েছিলাম। আজ আমার সে ভ্রম ঘুচেছে প্রভু, তাই আজ চাচ্ছি তোমায়, শুধু আমাতে নয়—শুধু আমার জাতিতে নয়—তুমি বিশ্বমানবে নেমে এস—তা'কে ইহ-পরলোকে সার্থক করে তোল। এইটাই আজ তোমার কাছে আমাদের বর্ষশেষের প্রার্থনা।

গান।

(ভৈরবী)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

এ ভবের পান্থশালায়
দেখা হ'ল যদি রে ভাই
আয় রে সবাই মিলে মিশে
মোরা গান গেয়ে যাই!
কখন যে কা'র যেতে হবে
ঠিকানা তার নাই কো ভবে—
তবু যে কটা দিন সঙ্গে আছি
আয় না মোরা গান গেয়ে যাই!
পরস্পরে ভালবেসে
দুঃখে সুখে কেঁদে হেসে
পরকে মোদের আপন করে
চল্ না সবার মুখ পানে চাই!
নদী যেমন দুকূল ধানে
শোভিয়া ধায় সিন্ধু পানে
তেমনি মোরাও চলে যাব
ফুলে ফুলে পথখানি ছাই॥

প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

একাচুরা—পূজা।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে এবং ত্রিপুরার উত্তরাংশে এই দেবতার অত্যন্ত সমাদর দেখা যায়। ছেলেমেয়ের উৎকট ব্যাধি হইলে, অথবা মৃতবৎসার সন্তানরক্ষার জন্য এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইহাঁর পূজা মানসিক করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পায়ে লোহার বালা অভাবে সুতা পরাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ইহাকে একাচুরার বেড়ী বলা হয়। কাহারও অন্নপ্রাশনের সময়, কাহারও পৈতার সময়, কাহারও কাহারও বা বিবাহের সময়েও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা সম্পন্ন হইলে পায়ের বেড়ী কাটিয়া ফেলা হয়। যাহার ধৃত বেড়ী কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পক্ষে পূজার সময় নূতন বেড়ী পায়ে পরাইতে হয়। এই দেবতার নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

ইনি যে দেশে পূজা পাইয়া থাকেন, সেই দেশের অধিবাসিবর্গের মুখে ত্রয়োদশ স্বর ওকারের এবং "ড়" বর্ণের উচ্চারণ প্রায় ঠিক হয় না। কালী-কিশোর রামকিশোর নামের ব্যক্তিকে কালী-কিশর—রামকিশর—বলিয়া ডাকা হয়; আবার যিনি একটু দুরস্ত মুখে ডাকিতে চান, তিনি বলেন কালীকিশুর—রামকিশুর ইত্যাদি। ঐ দেশে চোরকে বলে "চুর"; প্রসিদ্ধ চোরের নাম "চুরা" আবার চূড়াকেও বলে চুরা। পাঠশালার গুরু-মহাশয় ছেলেকে পড়াইয়া থাকেন—ড-য়েশূন্য-র—ঢ-য়েশূন্য র অন্তস্থ র ইত্যাদি; সুতরাং এক অদ্বিতীয় চোর এই অর্থে—একাচুরা নাম সিদ্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাহার মস্তকে একটি চূড়া তিনি 'একচূড়'-দেশের প্রভাবে "একাচুরা" হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন পদ্ধতিতে ইনি "একচোর ভৈরব" নামে, কোন পুস্তকে একচূড় ভৈরব নামে, আবার কোথাও—"একচূড় শিব" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ইহাঁর ধ্যানের এবং মন্ত্রেরও পার্থক্য দেখা যায়। কেন্দুয়া থানার অধীন আশুজীয়ানিবাসী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত পদ্ধতিতে দুই প্রকার ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচোরং ত্রিলোচনম্।
দ্বিভুজং শক্রহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্॥

(২) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচোরং ত্রিলোচনম্।
গদাখড়্গধরং দেবং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥
বিন্ধ্যস্থং বিন্ধ্যনিলয়ং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্॥

ওঁ একচোর ভৈরব ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্য হুং ক্রোঁ একচোরভৈরবায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ।

কেন্দুয়া থানার অধীন ইটাত্রতলাগ্রামবাসী কামিনীমোহন বিদ্যালঙ্কারের নিকট প্রাপ্ত পদ্ধতির ধ্যান দ্বিতীয় ধ্যানের অনুরূপ। কেবল "এক চোরের" পরিবর্ত্তে "একচূড়" শব্দ আছে। আমতলার পদ্ধতির মন্ত্র—এং ঐং একচূড়াখ্যশিবায় নমঃ। এই পুস্তক সম্পূর্ণ নহে। কেবল ধ্যান মন্ত্রই আছে। দুর্গাদাসের পুস্তক সম্পূর্ণ। এই পূজার অঙ্গ ছাগবলিদান। কোন কোনস্থলে মহিষবলিও হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকে একাচুরার ব্রতও করিয়া থাকে।

প্রদর্শিত প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় ধ্যানেই এই দেবতা নীলমেঘের সমান বর্ণ, এবং ত্রিলোচন-রূপে কথিত হইয়াছেন। প্রথম ধ্যানের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থানুসারে, ইনি দ্বিভুজ শক্রহন্তা এবং নানা-লঙ্কারভূষিত। দ্বিতীয় ধ্যানের অপরাংশের অর্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি গদা-খড়্গধারী, কোটি সূর্য্যের সমানকান্তি; বিন্ধ্য পর্ব্বত ইহাঁর বাসস্থান, ইনি নিজে ভৈরব এবং ভৈরবীর প্রিয়।

বরকুমার।

ইনি একাচুরার নিয়ত সহচর দেবতা। যেখানে একাচুরার পূজা হইয়া থাকে, সেখানে ইনিও অবশ্যই পূজা পান। মঙ্গল ব্যাপারের পূর্ব্বে একাচুরা বরকুমারের পূজা প্রায়শই হইয়া থাকে। ইহাঁর পদ্ধতিও পুরোহিত ঠাকুরদিগের বিদ্যার দৌড়ের ফলে, বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাঁদের এলাকাভুক্ত প্রদেশে ড়কার ও র এর উচ্চারণগত ভেদ নাই, সুতরাং কোন কোন পুরোহিত ঠাকুর মনে করি-য়াছেন, ইনি বড় কুমার। বড় হইলেই বৃহৎ; অতএব কেহ ইহাঁকে বৃহৎ কুমারায় নমঃ, কেহ বা বৃদ্ধ কুমারায় নমঃ, আবার কেহ কেহ বড়কুমারায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ

মনে করেন ইনি বরদাতা কুমার, মধ্যপদলোপে ইহাঁর বরকুমার নাম সিদ্ধ হইয়াছে। বৌং মন্ত্রে ষোড়শোপচারে ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। ইটাত্র-তলা নিবাসী শ্রীমান্ কামিনীমোহন বিদ্যালঙ্কারের নিকট প্রাপ্ত পদ্ধতির ধ্যান এইরূপ :—

"ওঁ বড়কুমারং দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং মদ্যঘটকপালকম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং নানালঙ্কারৈর্ভূষিতম্"।

বরকুমার দ্বিভুজ, শত্রুনাশক, ইহাঁর হাতে মদ্যপূর্ণ ঘট এবং মড়ার মাথার খুলি। ইহাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং গাত্রে নানাপ্রকার অলঙ্কার।

ইহাঁর অঙ্গদেবতারূপে অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হয়। ইহাঁর পূজাতেও ছাগাদি পশু বলি হইয়া থাকে। ইহাঁর অন্যপ্রকার ধ্যান এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

বনদুর্গাপূজা।

এই দেবতা পূর্ব্বময়মনসিংহে অতীব প্রভাব-শালিনী। প্রত্যেক হিন্দুগ্রামের পল্লীতে পল্লীতেই ইহাঁর অধিষ্ঠান শাকোট বৃক্ষ (শেওড়া গাছ) দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে গাছের গুঁড়ির পূজা বলিয়া থাকে। গাছের গোড়াতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং এই পূজার নাম গাছের গুঁড়ির পূজা। মেয়েরা দেবীকেও 'গাছের গুঁড়ি ঠাকুরাইন' বলিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে শেওড়া ভিন্ন উড়ুম প্রভৃতি গাছেও পূজা হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে পূজ্যবৃক্ষের গোড়া বাঁধান হইয়া থাকে। কিশোরগঞ্জের অধীন যশোদল গ্রামে একটি বনদুর্গার অধিষ্ঠান-বৃক্ষের মূল পক্বেষ্টক বদ্ধ। গ্রামবাসীদিগের নিকট জানা যায় যে, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সমষ্টিতে এখানে লক্ষাধিক বলি সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গল ব্যাপারের পূর্ব্বেই বনদুর্গার পূজা এবং তদঙ্গ বলিদান হইয়া থাকে। এই পূজায় খৈ, চিড়া-ভাজা, চাউলের গুঁড়া, বীচে কলা প্রভৃতি নৈবেদ্য-রূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। হংসডিম্বে সিন্দুর মাখা-ইয়া এই পূজায় দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছেলে হওয়ার পর অশৌচান্ত দিনে বনদুর্গার পূর্ব্বোক্ত ভোগরাগ দেওয়া হয়। ইহাতে আর ষোড়শোপ-চারে পূজার ব্যবস্থা নাই। ইহাকে গাছের গুঁড়ির বাড়ান বলিয়া থাকে। কুমিল্লাপ্রদেশে এই পূজা কামিনীগাছের গোড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে কামিনীপূজা বলা হয়। পুরোহিত ঠাকুরগণ স্বস্বরুচি অনুসারে কেহ শাকোটবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ, কেহ বা শাকোট-বাসিন্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন।

ইটাত্রতলানিবাসী শ্রীমান্ কামিনী বিদ্যালঙ্কারের নিকট প্রাপ্ত পদ্ধতির ধ্যানানুসারে বনদুর্গা ত্রিবলীযুক্তা বনমালাবিভূষিতা, শাকোট বৃক্ষ (শেওড়াগাছ) ইহাঁর অধিষ্ঠান।

ওঁ বনদুর্গাং (দুর্গা) বলীপেতাং (তা) বনমালাবিভূষিতাং (তা) শাকোটবাসিনীং (নী) দেবীং (দেবী) সুতরক্ষাং করুষ মে॥

আমার পুত্র রক্ষা কর, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হয়। ধ্যানের পদ্যটি অশুদ্ধ আছে। "ওঁ হ্রীং বনদুর্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। যশোদলনিবাসী শ্রীমান্ দেবেন্দ্র-নারায়ণ বিদ্যাভূষণের নিকট প্রাপ্ত ধ্যানানুসারে এই দেবীর পরিধান পট্টবস্ত্র।

বনদুর্গাং (র্গা) মহাভাগাং (গা)
শাকোটবৃক্ষবাসিনীম্ (নী)।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং (না) সুতরক্ষাং সদা কুরু॥
অস্যাঃ স্তুতিঃ—
উগ্রদং ষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
দিগ্বস্ত্রাম ভয়াং শ্যামাং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্॥
শাকোটবাসিনীং দুর্গাং সর্ব্বত্র শুভকারিণীম্।

ইহাঁর স্তুতির অর্থ হইতে বুঝা যায়, ইহাঁর দাঁত ভীষণাকৃতি, মুখ ভয়ানক, ইনি পীনোন্নত-পয়োধরা, ইহাঁর লোচন তিনটি, পরিধানে বস্ত্র নাই; ইনি শ্যামবর্ণা। আশুজীয়াবাসী শ্রীমান্ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত পদ্ধতিতে বনদুর্গার মন্ত্র এবং মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, যথা—"ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষিকং স্বপিষি ভয়ং তে মে সমুপস্থিতং যদি শক্যমশক্যং তন্মে ভগবতি স্বাহা" অস্য মন্ত্রস্যারণ্যকঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বনদুর্গাদেবতা সর্ব্বদুঃখপ্রমোচনে বিনিয়োগঃ। শিরসি আরণ্যকঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি বনদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, হ্রামিত্যাদিনা অঙ্গন্যাসাদিকং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ধ্যানসংজ্ঞক পদ্যের

অর্থ হইতে জানা যায়, এই দেবী সুবর্ণময় পদ্মমধ্যে অবস্থিতা ; ইঁহার চক্ষু তিনটি, বর্ণ বিদ্যুতের তুল্য, ইনি হস্তে শঙ্খ, চক্র বর ও অভয় ধারণ করিয়াছেন, (সুতরাং ইনি চতুর্ভুজা), ইঁহার ললাটে চন্দ্রকলা বিদ্যমান, গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ হার ও কুণ্ডল ইঁহার অলঙ্কার, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ইঁহাকে স্তব করিতেছেন, শিব ইঁহার পার্শ্বে বিদ্যমান, ইঁহার মুখ চন্দ্রের সদৃশ, ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বত বাসিনী।

সৌবর্ণাম্বুজ-মধ্যগাং ত্রিনয়নাং সৌদামিনীসন্নিভাং
চক্রং শঙ্খবরাভয়ানি দধতী-মিন্দোঃ কলাং বিভ্রতীম্।
গ্রৈবেয়াঙ্গদ-হার কুণ্ডলধরামাখণ্ডলাদ্যৈস্তুতাং *
ধ্যায়ে বিন্ধ্যনিবাসিনীং শশিমুখীং পার্শ্বস্থ-পঞ্চাননাম্।।

* ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের পুস্তকস্থ পাঠ।

এই ধ্যানটি নেপালাধীশ্বর প্রতাপসাহ সিংহের "পুরশ্চর্য্যার্ণব" নামক বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধেও অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ণদুর্গার প্রসার নেপাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এমত বুঝা যায়। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া থানার অধীন পুঁঠিজানা দেবগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বনদুর্গার পূজায় শূকর বলি হইয়া থাকে। পরন্তু এই বলি ব্যাপার অতীব রহস্যপূর্ণ। মুসলমানদিগের জবাই করার রীতি অনুসারে নাপিত ক্ষুরের দ্বারা শূকরের গলা কাটিয়া দেয়। অধিকন্তু এই পূজার অঙ্গরূপে ২১ একুশটী মোরগ উৎসর্গ করা হয়। ইহাদের হত্যা হয় না। একটি খাঁচার ভিতরে মোরগগুলিকে রাখিয়া পূজা স্থানের দূরে ঐ খাঁচা রাখা হয়, পুরোহিত দূর হইতে মোরগের গায় জল ছড়াইয়া দেন। সম্ভবতঃ যে সময়ে ঐ প্রদেশে বন্য কুক্কুট সুলভ ছিল, সেই সময়ে বলিরূপে কুক্কুটগুলি গৃহীত এবং প্রদত্ত হইত। কালক্রমে বন্য কুক্কুট দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অস্পৃশ্য গ্রাম্য কুক্কুটের দ্বারাই কথঞ্চিৎ প্রাচীন রীতি রক্ষিত হইয়া থাকে।

লালসা বিশ্বেশ্বর পূজা।

এই পূজা ময়মনসিংহের এবং ত্রিপুরার অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে টাকরা টাকরীর পূজা বলে। মৃতবৎসার সন্তানরক্ষার্থই এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে, টাকরা-টাকরী দেবতা কচিছেলেকে অপহরণ করিয়া লইয়া, সেই ছেলের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাই ছেলের স্থান অধিকার করে। ভান করিয়া দেবতাই মরিয়া যায়, পরে মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত হইলে, সেখান হইতে দেবতা উঠিয়া যায়। আমরা বাল্যজীবনে এই বিষয়ের অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছি, এবং তাহাদের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসক বিরল হইয়াছে।

লালসাবিশ্বেশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বরের সজাতীয় দেবতা বলিয়া উল্লেখযোগ্য। কারণ ধ্যানানুসারে এই দেবতা স্ত্রীপুরুষ শরীরাত্মক, এবং একত্রই পূজনীয়। ধ্যানের অর্থ—লালসাদেবী মেঘবর্ণা, ইঁহার পরিধান জীর্ণবস্ত্র, হস্তে পদ্ম, হাত দুইখানি, ইনি বৃক্ষে অধিষ্ঠিত ইঁহার ক্রোড়ে বালক, ইনি মুক্তকেশী এবং ভীষণাকৃতি, ইঁহার হাতে দণ্ড, এবং নিজ হস্তেই ইনি কটিদেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইনি বনমাল্যবিভূষিতা— বিশ্বেশ্বরের মস্তকে জটাভার, ইনি ভস্মবর্ণ, ইনি দ্বিভুজ, ইঁহার হস্তে দণ্ড এবং পাশ বিদ্যমান ; ইঁহার চক্ষু এবং কেশ পিঙ্গলবর্ণ, ইনি সর্ব্বদাই কটাক্ষপাত করিতেছেন, দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতেছেন, ইনি বালক দান করেন, ভক্তের দ্বারা (অন্নের দ্বারা) শান্ত হন, এমন দেবী-দেবকে আমি ভজন করি।

(১) মেঘাঙ্গীং জীর্ণবসনাং পদ্মহস্তাং ভুজদ্বয়াম্।
বৃক্ষস্থিতাং বালক্রোড়াং মুক্তকেশীং ভয়ানকাম্॥
দণ্ডহস্তাং ধৃতকটীং বনমালাবিভূষিতাম্।
জটাভার সমাযুক্তাং (ক্তং) ভস্মবর্ণাং (র্ণং) ভুজদ্বয়াং (য়ং)
দণ্ডপাশসমাযুক্তাং (ক্তং) কেশপিঙ্গললোচনাং (নং)
কটাক্ষস্থানং সততং দন্তৌষ্ঠং (দষ্টৌষ্ঠং) কল্পিতং সদা।
বালকদং ভক্তশান্তং দেবী-দেব মহং ভজে॥

ধ্যানটি নিতান্তই অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। এই পূজা কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত বলিয়া পদ্ধতি লিখিত আছে। "ওঁ লালসা বিশ্বেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে। সাটের সোহং এই মন্ত্রে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। এই পূজার সম্পূর্ণ পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অথ লালসা বিশ্বেশ্বর-পূজাবিধি :—

মহারণ্যে গত্বা স্নানং পরিকৃত্য ক্রমমূলে সায়ং সময়ে কুশহস্ত আচম্য, স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুকস্যাভিনবজাতকুমারস্য বা পুত্রপৌত্রাদীনাঞ্চৈতদ্দোষোপশমনপূর্ব্বক শ্রীলালসাবিশ্বেশ্বর-প্রীতিকামঃ গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক লালসা

বিশ্বেশ্বর-পূজা-বলিদানমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য সূক্তং পঠেৎ—সাম্নাং "দেবোব"ইত্যাদি, যজুষাং "যজ্জাগ্রত" ইত্যাদি। ততোঽষ্টদলপদ্মে ঘটং সংস্থাপ্য ভূতবলিং দত্ত্বা গণেশাদীন্ পূজয়িত্বা, "সাটৈরসোহং" ইতি মন্ত্রেণ যথাবিধি ভূতশুদ্ধিং বিধায় অঙ্গন্যাসং করন্যাসঞ্চ কুর্য্যাৎ—ওঁ লাং বিং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিক্রমেণ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা পূজামারভেত। স্বকীয়মাসনং সংপূজ্য দেবীং দেবঞ্চ ধ্যায়েৎ, * * ইতি ধ্যাত্বা শিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বিশেষার্ঘ্যং স্থাপয়িত্বা "ওঁ লালসাবিশ্বেশ্বরায় নমঃ" ইত্যষ্টধা জপ্ত্বা তিলোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য ততঃ পুনর্ধ্যাত্বাবাহয়েৎ—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব বালানাং হিতকারিণী।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাম্ ইহ সন্নিহিতা ভব ॥

ইতি পঠিত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা মনোজ্যোতিরিত্যাদি মন্ত্রং পঠিত্বা মূলেন ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ, মূলেন পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা গন্ধপুষ্পাভ্যাং মাতৃকাদীন্ পূজয়েৎ। ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ ওঁ সুনন্দায়ৈ, ওঁ পূতনায়ৈ, ওঁ মুখমণ্ডলায়ৈ, ওঁ বিজয়ায়ৈ, ওঁ সকুল্যৈ, ওঁ লালসায়ৈ, ওঁ ললজ্জিহ্বায়ৈ, কামাখ্যায়ৈ, ওঁ ডাকিন্যৈ, ওঁ দীর্ঘদন্তায়ৈ, ওঁ ভয়ানকায়ৈ, ওঁ বালক্রোড়ায়ৈ, ইতি নন্দাদীন্ ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ। বিশেষার্ঘ্যং দত্ত্বা বলিং দদ্যাৎ। তন্ত্রোক্তবিধিনা হোমং কৃত্বা দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তলালসাবিশ্বেশ্বর-পূজাবিধিঃ সমাপ্তঃ।

ইটাত্রতলানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুস্তক দৃষ্টে লিখিত।

থলকুমারী পূজা।

এই পূজা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে "ডরাই" পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনসা-পূজার সহিত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সাধারণতঃ মেয়েরা ইহাকে "ডরাই বিষরী পূজা" বলে। দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে এই পূজা মানসিক করা হয়। উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। উহার প্রধান পাণ্ডা "গুরমা" নামে প্রসিদ্ধ। স্ত্রী নপুংসক বা হিজড়া গুরমা নামে প্রসিদ্ধ। নপুংসকের পরিবর্ত্তে পুরুষই মেয়েলি কাপড় পরিয়া কপালে সিন্দুর ও হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়া সারা জীবন অবিবাহিত অবস্থায় যাপন করে। গুরমার গানই থলকুমারী পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুরমার বিরল-প্রচার ও সমাজের রুচিপরিবর্ত্তন, এই উভয় কারণে অনেকস্থলে গুরমা ব্যতীতই পূজা হইতে দেখা যায়। গুরমার গান যেরূপ অশ্লীলতাপূর্ণ, সেরূপ অশ্লীলতা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই ব্যাপার গুরমার "চৈতাল" নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাপারের "চৈতাল" সংজ্ঞার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠেয় কামদেবের পূজাঙ্গ অশ্লীল গানের সহিত সাম্য নিবন্ধন ইহার এই চৈতাল সংজ্ঞা হইয়াছে।

গুরমা মাথার চুল এলোথেলো করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখে অবিশ্রান্ত মাথা নাড়িতে থাকে, এবং তাহার নিকট উপস্থাপিত সাধারণের শুভাশুভসূচক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, ইহার নাম গুরমার "বান করা"। লোকের বিশ্বাস, গুরমার শরীরে দেবীর অধিষ্ঠান হয়। সুতরাং ভানকরার অপভ্রংশ "বান করা" হইতে পারে।

এই দেবীর পূজার অঙ্গরূপে প্রথম দিবস যথারীতি অধিবাস করিতে হয়। পরদিবস পূজা করিতে হয়।

ধ্যানের অর্থ হইতে জানা যায়, বিশ্বপ্রকাশকারিণী এই দেবী গৌরবর্ণা ও চতুর্ভুজা। ইনি বিশ্বের ঈশ্বরী, ভয় হইতে ত্রাণকারিণী, বিশ্বের মাতা, কৃপার আশ্রয়, সর্ব্বদেবময়ী ও ভীষণাকৃতি। গভীর নদমধ্যে ইহাঁর অধিষ্ঠান, ইনি কুম্ভীরোপরি অবস্থিতা। নানা প্রকার মণি ইহাঁর বিভূষণ, ইনি নানালঙ্কারভূষিতা। ইনি নবযৌবন-সম্পন্না, কামরূপিণী অর্থাৎ ইহাঁর শরীরসংস্থান ইচ্ছাধীন। ইহাঁর পরিধেয় বিচিত্র পট্টবস্ত্র, কুঙ্কুমের দ্বারা শরীর রঞ্জিত, সুতরাং মনোহর। ইনি ত্রিনয়না, এবং থলরূপে সম্ভূত।

বিশ্বপ্রকাশিনীং দেবীং গৌরবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
বিশ্বেশ্বরীং ভয়ত্রাতাং বিশ্বমাতাং কৃপালয়াম্ ॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং ঘোররূপাং ভয়ঙ্করীন্।
গভীরনদসংস্থানাং কুম্ভীরোপরিসংস্থিতাম্ ॥
নানামণিবিভূষাঢ্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
নবযৌবন-সম্পন্নাং কুমারীং কামরূপিণাম্ ॥
চিত্রবস্ত্রপরাধানাং কুঙ্কুমাক্তাং মনোহরাম্।
থলরূপেণ সম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং বরদাং ভজে ॥

এই দেবীর অঙ্গদেবতারূপে উগ্রকুমারী, ক্ষেমঙ্করী, জলবাসিনী, হরপুত্রিকা, উগ্ররূপা,

গঙ্গাপুত্রিকা ও নন্দিপুত্রিকা, এই অষ্টকুমারীর পূজা করিতে হয়। অনন্তর যমুনা, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, পদ্মা, ছায়া, মায়া, সুরবাক্য, বাসুদেব, মৎস্যাদি দশাবতার, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, শেষ, অর্কমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল, সোমমণ্ডল, আত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, রজঃ তমঃ ও অন্তরাত্মা, ইহাঁদেরও পূজা করিতে হয়।

খলকুমারী-পূজার অন্তে অঙ্গরূপে সন্ধ্যাকালে জলসমীপে ছায়া ও মায়ার পূজা করিতে হয়।

আশুতীয়াবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের খাড়ীতে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ধ্যানানুসারে ছায়া দেবী তেজোময়ী, গৌরবর্ণা ও দ্বিভুজা; ইহাঁর হস্তে বর ও অভয়, দন্ত ভয়ঙ্কর, চক্ষু তিনটি; ইহাঁর বামক্রোড়ে শনি, দক্ষিণদিকে সূর্য্য এবং যম চতুর্দ্দিকে গতায়াত করেন; ইনি ক্রূররূপা ও ভয়দায়িনী।

ছায়াং তেজোময়ীং দেবীং দ্বিভুজাং গৌরদেহিকাম্।
বরাভয়করাং (দেবীং) ঘোরদংষ্ট্রাং ত্রিলোচনাম্॥
বামক্রোড়স্থিতং সৌরিং দক্ষিণস্থং দিবাকরম্।
যমং চতুর্দ্দিশো ভূত্বা ভয়দাং ক্রূররূপিণীম্॥
... ... মাতরং রুদ্ররূপাঞ্চ বরদাং ভজে।

যশোদল-প্রাপ্ত ছায়া ও মায়ার ধ্যানের অর্থ হইতে জানা যায় যে, ছায়াদেবী কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, কুমারী, রুদ্রের কন্যা ও দিব্যালঙ্কারভূষিতা।

মায়াদেবী ছায়ারই কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি বরাভয়দায়িনী, দ্বিভুজা ও শ্বেতবর্ণা; ইহাঁর পরিধানে পট্টবস্ত্র।

ছায়া-রূপাং কুমারীঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
রুদ্রস্য তনুজাং দেবীং দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্॥
কুমারীমনুজাং দেবীং বরদামভয়প্রদাম্।
দ্বিভুজাং শ্বেতবর্ণাঞ্চ পট্টবস্ত্রাদিভূষিতাম্॥

কুড়ানো গান।

(মহেন্দ্র ক্ষেপা)

রূপ উঠছে আজব কারখানা
দিল দরিয়া মাঝে।
ডুবলে পরে রত্ন পাবি
ভাসলে পরে পাবি না।
দিলের মাঝে জাহাজ আছে
ন-জনা তার গুণ টানিছে।
ছ-জনা তার দাঁড় টানিছে
হাল ধরেছে একজনা॥
দিলের ভিতর বাগান আছে
তাতে নানা জাতির ফুল ফুটেছে।
সৌরভে জগত মেতেছে
আমার গোসাঁই মাতল না॥
দিলের ভিতর কমল আছে
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে।
সেই তিনকে যে এক করেছে
তার বা কিসের ভাবনা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকর অর্জ্জুন॥ ২॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় বলিলেন—(১) এই প্রকার করুণাচ্ছন্ন অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) ইহা বলিলেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটকালে তোমার (মনে) এই মোহ (কশ্মল) কোথা হইতে আসিল? আর্য্য অর্থাৎ সাধুপুরুষেরা (কখনও) এরূপ আচরণ করেন নাই, ইহা অধোগতিতে লইয়া যায়, এবং অপকীর্ত্তিসাধক। (৩) হে পার্থ! এরূপ কাপুরুষ হইও না! ইহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। হে শত্রুগণের তাপদাতা! মনের এই ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য ছাড়িয়া (যুদ্ধের জন্য) দাঁড়াও!

[এই প্রসঙ্গে আমি পরন্তপ শব্দের অর্থ তো করিয়া দিয়াছি; কিন্তু অনেক টীকাকারের এই মত আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না যে, অনেক স্থানের বিশেষণরূপী সম্বোধন বা কৃষ্ণার্জ্জুনের নাম গীতায় হেতুগর্ভিত অথবা বিশেষ অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে।

। আমার মত এই যে, পদ্যরচনায় অনুকূল নামসমূহের । প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ । কোন অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব কয়েক বার । আমি শ্লোকে প্রযুক্ত নামগুলিরই হুবহু অনুবাদ না । করিয়া 'অর্জুন' বা 'শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ সাধারণ অনুবাদ । করিয়া দিয়াছি।]

অর্জুন উবাচ।

§§ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

অর্জুন বলিলেন—(৪) হে মধুসূদন! আমি (পরম) পূজ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে হে, শত্রুনাশন! যুদ্ধে বাণের দ্বারা কি প্রকারে লড়িব? (৫) মহাত্মা গুরুলোকদিগকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়া উদর-পূর্ত্তিও শ্রেয়স্কর! কিন্তু অর্থলোলুপ (হইলেও) গুরুলোকদিগকে মারিলে ইহজগতেই আমাকে উঁহাদিগের রক্তমাখা ভোগ ভোগ করিতে হইবে।

। ['গুরুলোকদিগকে' এই বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা । 'খুব বৃদ্ধ'দিগেরই অর্থ লইতে হইবে। কারণ বিদ্যা- । শিক্ষাদাতা গুরু এক দ্রোণাচার্য্যকে ছাড়িয়া, সৈন্য- । মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্ব্বে । যখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যের ন্যায় গুরুলোকদিগের । পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য । যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়া নম্রভাবে নিকটে । গেলেন, তখন শিষ্টসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য পালনকর্ত্তা । যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করিয়া সকলে বুঝাইলেন যে, । দুর্য্যোধনের পক্ষে তাঁহারা কেন লড়িবেন।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥

। "ইহাই তো সত্য যে, মনুষ্য অর্থের দাস, অর্থ কাহারও । দাস নহে; অতএব হে যুধিষ্ঠির মহারাজ! কৌরবেরা । আমাকে অর্থের দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়াছে" (মভা. । ভী. অ. ৪৩. শ্লো. ৩৫. ৫০. ৭৬)। উপরে যে "অর্থ- । লোলুপ" শব্দ আছে, তাহা এই শ্লোকার্থেরই দ্যোতক।]

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

(৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে (উঁহারা) জয় করেন—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে মারিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই এই কৌরবেরাই (যুদ্ধের জন্য) সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

। ['গরীয়ঃ' শব্দে প্রকাশ পাইতেছে যে, অর্জুনের । মনে 'অধিকাংশ লোকের অধিক সুখের' ন্যায় কর্ম্ম । ও অকর্ম্মের লঘুত্ব গুরুত্ব বুঝিবার কষ্টি ছিল; কিন্তু । ঐ কষ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহা । তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। গীতারহস্য পৃঃ । দেখ।]

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢচেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

(৭) দীনতার কারণে আমার স্বাভাবিক বৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (আমার নিজের) মন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা যথার্থ শ্রেয়স্কর, তাহাই আমাকে বল। আমি তোমার শিষ্য। শরণাগত আমাকে বুঝাও।

(৮) কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য বা দেবতাদিগের (স্বর্গের) ও রাজত্ব পাইলেও আমার দৃষ্টিতে এমন কোন (সাধন) পড়িতেছে না, যাহা ইন্দ্রিয়শোষক আমার এই শোক দূর করিয়া দেয়। সঞ্জয় বলিলেন—(৯) এই প্রকার শত্রুসন্তাপী গুড়াকেশ অর্থাৎ অর্জুন হৃষীকেশ-(শ্রীকৃষ্ণ)কে বলিলেন; এবং "আমি লড়িব না" বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। (১০) (আবার) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! উভয় সেনার মধ্যে বিষণ্ণোপবিষ্ট অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাসিয়া বলিলেন।

। [এক দিকে তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম এবং অপরদিকে । গুরুহত্যা ও কুলক্ষয়জনিত পাপের ভয়—এই টানা- । টানির মধ্যে "মরি কি মারি" এই গোলযোগে পড়িয়া । ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জুনকে এখন । ভগবান এই জগতে উঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যের উপদেশ । করিতেছেন। অর্জুনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় । নিষ্ঠুর কর্ম্মের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই । জন্য, যে সকল উদার পুরুষ পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ । করিয়া নিজের আত্মার পূর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়া-

হেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গীতোক্ত উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন যে, সংসারের চালচলন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের জীবন-নির্ব্বাহের অনাদিকাল হইতে দুই মার্গ চলিয়া আসিতেছে (গী. ৩. ৩০, ও গী. র. প্র. ১১ দেখ)। আত্মজ্ঞান লাভের পর শুকের ন্যায় পুরুষ সংসার ছাড়িয়া আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আত্মজ্ঞানী জ্ঞানলাভের পরেও স্বধর্ম্মানুসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতবিধ ব্যবহারে নিজের সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্যনিষ্ঠা বলে এবং দ্বিতীয়কে কর্ম্মযোগ বা যোগ বলে (শ্লো. ৩৯ দেখ)। যদিও উভয় নিষ্ঠাই প্রচলিত আছে, তথাপি উহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠতর—গীতার এই সিদ্ধান্ত পরে বলা যাইবে (গী. ৫. ২)। এই উভয় নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে অর্জ্জুনের মন সন্ন্যাস-নিষ্ঠার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে প্রথমে অর্জ্জুনের ভুল তাঁহাকে বুঝানো গেল; এবং পরে ৩৯ম শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন করা ভগবান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাংখ্যমার্গী পুরুষ জ্ঞানলাভের পরে কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান এবং কর্ম্মযোগের ব্রহ্মজ্ঞান কিছু বিভিন্ন নহে। তখন সাংখ্য-নিষ্ঠা অনুসারে দেখিলেও আত্মা যদি অবিনাশী ও নিত্য হয়, তবে "আমি অমুককে কি প্রকারে মারিব" এই বকাবকি বৃথা। এইরূপ কিছু উপহাসের সহিত অর্জ্জুনকে ভগবান প্রথমে বলিলেন।]

শ্রীভগবানুবাচ।

§§ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন—(১১) যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি তাহারই জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ! কাহারও প্রাণ (চাই) যাক বা (চাই) থাক, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জন্য শোক করেন না।

[এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার জন্য শোক করেন না। তন্মধ্যে যাইবার জন্য শোক করা তো মামুলী কথা, উহা না করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু টীকাকারগণ, প্রাণ থাকিবার জন্য শোক কিরূপ এবং কেন করিতে হয়, এই সংশয় করিয়া অনেক বিচার করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্খ ও অজ্ঞানী লোকদের প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ। কিন্তু এইটুকু চুলের গিঁট খুলিতে থাকা অপেক্ষা 'শোক করা' শব্দেরই 'ভাল বা মন্দ লাগা' অথবা 'পরোয়া করা' এইরূপ ব্যাপক অর্থ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। এখানে এইটুকুই বক্তব্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে।]

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥

(১২) দেখ না, এরূপ তো হয়ই না যে, আমি (পূর্ব্বে) কখনও ছিলাম না, তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ (পূর্ব্বে) ছিলেন না; এবং এমনও হইতে পারে না যে, আমরা সকলে ইহার পরে হইব না।

[এই শ্লোকের উপর রামানুজভাষ্যে যে টীকা আছে, তাহাতে লিখিত আছে,—এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং "তুমি ও রাজন্যবর্গ" অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যদি পূর্ব্বে (অতীতকালে) ছিল এবং পরে হইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্মা, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও নিত্য। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে, ইহা সাম্প্রদায়িক জেদের। কারণ এই স্থলে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সকলই নিত্য; উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এখানে বলা হয় নাই এবং বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত (৮. ৪; ১৩. ৩১) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্মা আমি অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি।]

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

(১৩) যে প্রকার দেহধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারই (পরে) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। (অতএব) এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হন না।

[অর্জ্জুনের মনে ইহাই তো বড় ভয় বা মোহ আসিয়াছিল যে, "অমুককে আমি কিরূপে মারি"। এই হেতু উহা দূর করিবার জন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে ভগবান প্রথমে মরা কি আর মারা কি, ইহারই তত্ত্ব বুঝাইতেছেন (শ্লোক ১১-৩০)। মনুষ্য কেবল নিছক দেহরূপী বস্তুই নহে, দেহ ও আত্মার সম্মিলন। তন্মধ্যে 'আমি'—অহঙ্কাররূপে ব্যক্ত আত্মা নিত্য ও অমর। উহা আজ আছে, কাল ছিল এবং কালও থাকিবেই। অতএব মরা বা মারা শব্দ উহার জন্য উপযুক্তই ধরা যায় না এবং উহার শোকও করা উচিত নহে। এখন অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা যে অনিত্য ও নশ্বর, তাহা তো সুস্পষ্ট। আজ নহে তো কাল, কাল নহে তো শত বর্ষেই হইল, উহার তো বিনাশ হইবেই—অদ্য বাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ (ভাগ. ১০. ১. ৩৮); এক দেহ ছাড়িয়া গেলেও তো কর্ম্মানুসারে পরে আর এক দেহ না আসিয়া থাকিতে পারে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে। সারকথা, দেহ বা আত্মা, উভয় দৃষ্টিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা পাগলামী। ভাল, পাগলামীই হইল, কিন্তু একথা তো নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে যে, বর্ত্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে ক্লেশ হয়, উহার জন্য শোক কেন না করি? অতএব এক্ষণে ভগবান এই কায়িক সুখদুঃখের স্বরূপ বলিয়া দেখাইতেছেন যে, উহার জন্য শোক করা উচিত নহে।]

§§ মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

(১৪) হে কুন্তিপুত্র! শীতোষ্ণ বা সুখদুঃখপ্রদ মাত্রাসকল অর্থাৎ বাহ্য সৃষ্টির পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের

সহিত) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপত্তি হয় আর ধ্বংস হয় ; (অতএব) উহা অনিত্য অর্থাৎ বিনশ্বর। হে ভারত ! (শোক না করিয়া) উহা তুমি সহ্য কর। (১৫) কারণ হে নরশ্রেষ্ঠ ! সুখ ও দুঃখ যে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সমান, এবং যিনি ইহাতে বাধা প্রাপ্ত হন না, তিনিই অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত ব্রহ্মের অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন।

[যে ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই যে নামরূপাত্মক জগতকে মিথ্যা বলিয়া জানে না, সে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত শীতোষ্ণ প্রভৃতি বা সুখদুঃখ প্রভৃতি বিকার-সকল সত্য জানিয়া, আত্মাতে উহার অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে দুঃখ পীড়া দেয়। কিন্তু যিনি জানিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিকারই প্রকৃতির, আত্মা অকর্তা ও অলিপ্ত, উহার নিকট সুখ ও দুঃখ একই। এখন অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন যে, এই সমবুদ্ধি দ্বারা তুমি উহা সহ্য কর। এবং এই অর্থই পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যে 'মাত্রা' শব্দের অর্থ এই প্রকার করা হইয়াছে— 'মীয়তে এভিরিতি মাত্রাঃ' অর্থাৎ যাহা দ্বারা বাহিরের পদার্থ পরিমাপ করা যায় বা জানা যায়, ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা যায়। কিন্তু মাত্রার ইন্দ্রিয় অর্থ না করিয়া কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপা যায় যে শব্দ-রূপ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ তাহাদিগকে মাত্রা বলে এবং উহাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত যে স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয়, তাহাকে মাত্রাস্পর্শ বলে। এই অর্থই আমার স্বীকৃত। কারণ এই শ্লোকের বিচার গীতায় পরে যেখানে আসিয়াছে (গী. ৫. ২১-২৩) সেখানে 'বাহ্য-স্পর্শ' শব্দ আছে ; এবং 'মাত্রাস্পর্শ' শব্দের সংকৃত অর্থের সদৃশ অর্থ করিলে এই দুই শব্দের অর্থ একই হইয়া যায়। যদিও এই প্রকারে এই দুই শব্দ মিলিয়া জুলিয়া আছে, তথাপি মাত্রাস্পর্শ শব্দ প্রাচীন দেখা যাইতেছে। কারণ মনুস্মৃতিতে (৬. ৫৭) এই অর্থেই মাত্রাসঙ্গ শব্দ আসিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরিলে পর জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার মাত্রাসকলের সহিত অসংসর্গ (মাত্রাঽসংসর্গঃ) হয় অর্থাৎ উহা মুক্ত হইয়া যায়, এবং উহাতে সংজ্ঞা থাকে না (বৃ. মাধ্যং. ৪. ৫. ১৪ ; বেসূ. শাংভা. ১. ৪. ২২)। শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখ পদ উপলক্ষণাত্মক, ইহাতে রাগ-দ্বেষ, সদসৎ ও মৃত্যু অমরত্ব প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ দ্বন্দ্বসমূহের সমাবেশ হয়। এই সকল মায়া-জগতের দ্বন্দ্ব। এইজন্য সুস্পষ্ট যে, অনিত্য মায়াজগতের এই দ্বন্দ্বসকল শান্তভাবে সহ্য করিয়া এই সকল দ্বন্দ্ব হইতে বুদ্ধিকে না পৃথক করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না (গী. ২. ৪৫ ; ৭. ২৮ ও গী. র. প্র. ৯ পৃ ও দেখ)। এখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অর্থই ব্যক্ত করিয়া দেখাইতেছেন।

§§ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

(১৬) যাহা নাই (অসৎ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে (সৎ) তাহার অভাব হয় না ; তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ 'সৎ ও অসৎ' উভয়ের অন্ত দেখিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ অন্ত দেখিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

[এই শ্লোকের 'অন্ত' শব্দের অর্থ এবং 'রাদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্ত' ও 'কৃতান্ত' শব্দসমূহের (গী. ১৮. ১৩) 'অন্ত' শব্দের অর্থ একই। শাশ্বতকোষে (৩৮১) 'অন্ত' শব্দে ঐ অর্থ আছে—"স্বরূপপ্রান্তয়োরন্তমন্তিকেঽপি প্রযুজ্যতে"। এই শ্লোকে সৎ-এর অর্থ নামরূপাত্মক দৃশ্যজগৎ (গী. র. প্র. ৯ পৃ. ও দেখ।) স্মরণ থাকে যে, "যাহা আছে উহার অভাব হয় না" ইত্যাদি তত্ত্ব দেখিতে যদিও সৎকার্য্যবাদের ন্যায় দেখা যায় ; তথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক। যেখানে এক বস্তু হইতে অপর বস্তু নির্ম্মিত হয়—উদা. বীজ হইতে বৃক্ষ—সেখানে সৎকার্য্যবাদের তত্ত্ব উপযোগী হয়। বর্ত্তমান শ্লোকে এই ধরণের প্রশ্ন হয় নাই, বক্তব্য এইটুকু যে, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, উহার অস্তিত্ব (ভাব) ও অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই উহার অভাব, এই দুই নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই বজায় আছে। এই প্রকার ক্রমে দুইয়ের ভাব-অভাবকে নিত্য মানিয়া লইলে পরে আবার স্বতই কহিতে হয় যে, যাহা 'সৎ' উহার নাশ হইয়া উহারই 'অসৎ' হয় না। কিন্তু এই অনুমান এবং সৎকার্য্যবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর কার্য্যকারণরূপ উৎপত্তি, এই দুই এক নহে (গী. র. প্র. ৭ পৃ. দেখ)। মাধ্ব ভাষ্যে এই শ্লোকের 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' এই প্রথম চরণের 'বিদ্যতে ভাবঃ' ইহার 'বিদ্যতে+অভাবঃ' এইরূপ পদচ্ছেদ আছে এবং উহার এই অর্থ করা হইয়াছে যে, অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভাব অর্থাৎ নাশ হয় না। এবং যখন দ্বিতীয় চরণে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, সতেরও নাশ হয় না, তখন নিজের দ্বৈতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, সৎ ও অসৎ উভয় নিত্য। কিন্তু এই অর্থ সরল নহে, ইহাতে টানাবুনা আছে। কারণ স্বাভাবিক রীতিতে দেখা যায় যে, পরস্পরবিরোধী অসৎ ও সৎ শব্দের সমানই অভাব ও ভাব এই দুই বিরোধী শব্দও এইস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' এস্থলে 'নাভাবো'তে যদি অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহা স্পষ্ট যে, প্রথম চরণে

তার শব্দই থাকিতে হয়। ইহার অতিরিক্ত, অসৎ ও সৎ উভয়ই নিত্য, একথা বলিবার জন্য 'অভাব' ও 'বিদ্যতে' এই পদগুলিকে দুইবার প্রয়োগ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের উক্তি অনুসারে যদি এই বিরুক্তিকে আদরার্থক স্বীকার করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ব্যক্ত বা দৃশ্য জগতে আগত মনুষ্যের শরীর নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদ্গীতা অনুসারে দেহকেও নিত্য স্বীকার করা যায় না; স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে যে, একটী নিত্য এবং অপরটী অনিত্য। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কিপ্রকার টানাবুনা করা হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি নমুনাস্বরূপে এখানে এই শ্লোকের মধ্বভাষ্যানুযায়ী অর্থ লিখিয়া দিয়াছি। যাক, যাহা সৎ তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, অতএব সৎস্বরূপ আত্মার জন্য শোক করা উচিত নহে; এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে নামরূপাত্মক দেহ প্রভৃতি অথবা সুখদুঃখ প্রভৃতি বিকার মূলেই নশ্বর, অতএব উহার নাশের জন্য শোক করাও উচিত নহে। ফলত আরম্ভে অর্জ্জুনকে এই যে বলা হইয়াছে যে, 'যাহার বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক করিতেছ' উহা সিদ্ধ হইল। একণে 'সৎ' ও 'অসৎ' এর অর্থই পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে আরও স্পষ্টরূপে বলা হইতেছে—]

(১৭) স্মরণ থাকে যে, এই সম্পূর্ণ (জগৎ) যিনি ব্যক্ত অথবা ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তিনি (মূল আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম) অবিনশ্বর। এই অব্যয় তত্ত্ব বিনষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে।

[পূর্ব্বের শ্লোকে যাহাকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহারই এই ব্যাখ্যা। ইহা বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই 'নিত্য' শ্রেণীতে আসে। এখন বলিতেছেন যে, অনিত্য বা অসৎ কাহাকে বলিতে হইবে—]

(১৮) বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের স্বামী (আত্মা), নিত্য, অবিনাশী ও অচিন্ত্য, যে শরীর উহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর।

[সার কথা, এই প্রকার নিত্য-অনিত্য বিচার করিলে তো এই ভাবই মিথ্যা হয় যে, "আমি অমুকে মারিতেছি", এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য অর্জ্জুন যে কারণ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নির্মূল হইতেছে। এই অর্থই একণে আরও অধিক স্পষ্ট করিতেছেন—]

(১৯) (শরীরের প্রভু বা আত্মা-) কেই যে হন্তা বলেন বা মনে করেন যে উহা মরিতেছে, এই উভয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। (কারণ) এই (আত্মা) না মারেন, আর না নিহতও হন।

[কারণ এই আত্মা নিত্য ও স্বয়ং অকর্ত্তা, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতিরই। কঠোপনিষদে ইহা এবং পরবর্ত্তী শ্লোক আসিয়াছে (কঠ ২. ১৮, ১৯)। ইহা ব্যতীত মহাভারতের অন্য স্থানেও এইরূপ বর্ণন আছে যে, কাল কর্ত্তৃক সমস্ত গ্রস্ত, এই কালের ক্রীড়াই এই "মারা ও মরা"র লৌকিক নামে উক্ত হয় (শাং ২৫. ১৫)। গীতাতেও (১১. ৩৩) পরে ভক্তিমার্গের ভাষার এই তত্ত্বই ভগবান অর্জ্জুনকে আবার বলিয়াছেন যে, ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতিকে কালস্বরূপ আমিই পূর্ব্বে মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত হও।]

(২০) এই (আত্মা) কখনও জন্মায় না, মরেও না; ইহাও নহে যে, ইহা (একবার) হইয়া আর হইবে না; ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং শরীর নিহত হইলেও মারা যায় না। (২১) হে পার্থ! যে জানিয়াছে যে, এই আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যক্তি কাহাকে কি প্রকারে বধ করাইবে এবং কাহাকে কি প্রকারে বধ করিবে? (২২) যে প্রকার (কোন) মনুষ্য পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন গ্রহণ করে, সেই প্রকার দেহী অর্থাৎ শরীরের স্বামী আত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর ধারণ করে।

[বস্ত্রের এই উপমা প্রচলিত। মহাভারতের এক স্থানে এক গৃহ (শালা) ছাড়িয়া অপর গৃহে যাইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (শাং ১৫. ৫৬); এবং এক মার্কিন গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নূতন কাপড় বাঁধিবার দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বের ত্রয়োদশ শ্লোকে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, এই অবস্থার প্রতি যে ন্যায় প্রযুক্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরীরের বিষয়ে করা গেল।]

(২৩) ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে শস্ত্র কাটিতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দাহ করিতে পারে না, সেইরূপই ইহাকে জল ভিজাইতে বা গলাইতে পারে না এবং বায়ু শুষ্কও করিতে পারে না। (২৪) (সর্ব্বতোভাবে) অকাট্য অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য এই (আত্মা) নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন। (২৫) এই আত্মাকেই অব্যক্ত (অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না), অচিন্ত্য (অর্থাৎ যাহা মনের দ্বারাও জানা যায় না), এবং অবিকার্য্য (অর্থাৎ যাহার কোনও বিকারের উপাধি নাই) বলা হয়। এইজন্য এই (আত্মাকে) এই প্রকার বুঝিয়া, উহার জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে।

[এই বর্ণনা উপনিষদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই বর্ণনা নির্গুণ আত্মার, সগুণের নহে। কারণ অবিকার্য্য বা অচিন্ত্য বিশেষণ সগুণের প্রতি লাগিতে পারে না (গী. র. প্র. ৯ দেখ)। আত্মার বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রের যে চরম সিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তিতে শোক না করিবার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। একণে যদি কেহ এই পূর্ব্বপক্ষ করে যে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে করি না, এইজন্য তোমার যুক্তি আমার গ্রাহ্য নহে; তবে এই পূর্ব্বপক্ষের প্রথম উল্লেখ করিয়া ভগবান উহার এই উত্তর দিতেছেন যে,—]

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ললিত—ঢিমাতেতালা।

অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাব না।
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁহতে হয়েছে এই সংসার কল্পনা॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
{ ন্‌া II ঋা মা -া মা। মা মা -া -া। -া মা মা -া। [-জ্ঞা -গা -ঋসা -ন্‌া] }।
অ চি ন্ত্য ০ র চ না ০ ০ ০ বি শ্ব ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। -জ্ঞা -গা -া মা I গা মা দা -া। জ্ঞা -া -মা -া। মা মা -া জ্ঞা।
০ ০ ০ যে ই ক রি ০ ল ০ ০ ০ র চ ০ না

০
। -গা -ঋা -সা ন্‌া II
০ ০ ০ "অ"

১ ২´ ০ ০
জ্ঞা II দা না -র্সা -া। র্সর্সা র্সা -া -া। র্সা র্ঋনা -া -দা। -জ্ঞা -মা -া মা I
কি ভু লে ০ ০ ভুলি য়া ০ ০ ম ন০ ০ ০ ০ ০ ০ বা

১ ২´ ৩ ০
I মগা মা দা -জ্ঞা। মা -া মা মগা। জ্ঞা -মা মা -া। -জ্ঞগা -ঋা -সা ন্‌া II
রে০ ক তাঁ ০ রে ০ ভা ব০ ০ ০ না ০ ০০ ০ ০ "অ"

১ ২´ ৩ ০
জ্ঞা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। র্সা না -র্সা র্সা। -া -া -া জ্ঞা I
জ লে স্থ ০ লে শূ ন্যে ০ ০ যি ০ ০ নি ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা। র্ঋা -না -দা -া। -জ্ঞা -মমা -া জ্ঞা I
ছে ন ০ ব্যা প্ত আ ০ প নি ০ ০ ০ ০ ০০ ০ যাঁ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা -র্সা। র্সা র্সা র্সা -া। না -র্সা না -দা। -জ্ঞা -মমা -া জ্ঞা I
হ তে ০ ০ হ য়ে ছে ০ এ ০ ই ০ ০ ০০ ০ সং

১ ২´ ৩ ০
I দা না -দা -জ্ঞা। মা মা -া -া। গজ্ঞা -মজ্ঞা -গা -মা। -ঋা -সা -া ন্‌া II II
সা র ০ ০ ক ল্প ০ ০ না০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০"অ"

রামকেলী—আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে।
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে।
হৃদে অহংকার ভরা, রিপুহীন হল ধরা,
শরীর দুর্জ্জয় রিপু, তার কি চিন্তিলে॥
প্রবল যে রিপু হয়, তোমারে করিল জয়,
ধিক্ ওরে দম্ভময়, বৃথা অহংকার।
অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন,
আত্মতত্ত্বসমরে দলহ রিপুদলে॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
{ মা ণদা II -া দা পা মা | পা মা -া পগা | -া গা ঋা -া | সা -া -া সা I
বি স্তা০ ০ র ক ০ রি লে ০ ০০ ০ রা ০ ০ জ্য ০ ০ নি

১ ২´ ৩ ০ ॥
I ঋা মা মা গা | মা -দা -া -া | -া দদা পমা গা | মা -গা } -া পা I
জ বা হু ০ ব ০ ০ ০ ০ লে০ ০০ ০ ০ ০ ০ সং

১ ২´ ৩ ০
I পা দা র্সা না | র্সা র্সা -া -া | -া নর্সা ণা দা | পা -া -া পা I
গ্রা মে ০ অ নে ক ০ ০ ০ রি০ পু ০ ০ ০ ০ সং

১ ২´ ৩ ০
I দা ণদা -ণদা -পা | পমা ণদা -া -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা ণদা II
হা র০ ০০ ০ ক০ রি০ ০ ০ ০ লে০ ০০ ০ ০ ০ "বি স্তা০

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা না -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | -া র্সনা -র্সা র্সা | -া -া -া দা I
০ হৃ দে অ ০ হং কা র ০ ০ ০ ভ০ ০ রা ০ ০ ০ রি

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা | র্ঋা র্ঋা -া র্সর্সা | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
পু হী ০ ন হ ল ০ ০০ ০ ধ০ রা ০ ০ ০ ০ শ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা র্সা | র্সনা র্সা -া -া | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা |
রী র ০ দু র্জ্জ০ য় ০ ০ ০ রি০ পু ০ ০ ০ ০ তা

১ ২´ ৩ ০
I দর্সা ণদা -া পা | দা দা -া -া | -া দদা পমা গা | -মা গা মা ণদা II
র০ কি০ ০ ০ চি ন্তি ০ ০ ০ লে০ ০০ ০ ০ ০ "বি স্তা০"

১ ২´ ৩ •
-া সা II সা সা -া ঋা | মা মা -া -া | -া মা -া -া | গা -া -া মা I
• প্র ব ল; • যে রি পু • • • ছ • • • য় • তো

১ ২´ ৩ •
I মা -গা মা পা | পা দপা -পা -দপা | -া দা -পা -া | -দা -মা া পা I
মা • রে ক রি ল• • • • • জ • • • • • য় ধি

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -না | -র্সা ণা দা -া | -পা -া -া পা I
কৃ ও • রে দ ত্ত • • • ম • • • য় • বৃ

১ ২´ ৩ •
I দা ণা দা -পণা | -া -া -া দা | -া -া দদা -পমা | -গা -মা -া পা I
থা অ হ • • • • • ঙ্কা • • র• • • • • • অ

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | র্সা -না -র্সা র্সা | -া -া -া দা I
ত এ • ব মু ক্তি • • ত • • ন • • • ম

১ ২´ ৩ •
I দা না -র্সা র্সা | ঋা ঋা -া -র্সর্সা | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
নে তে • বৈ রা গ্য • • • • আ• ন • • • • আ

১ ২´ ৩ •
I দা -ঋা -র্সা না | -র্সা র্সা -া না | র্সা ণা -দা -া | -পা -া -া পা |
ত্ম • • ত • ত্ত্ব স ম রে • • • • • দ

১ ২´ ৩ •
I দা ণা -পা -ণা | দা দা দা -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা ণদা II II
ল হ • • রি পু দ • • লে• • • • • • • "বি স্বা"

রাগিণী সাহানা মিশ্র—তাল একতালা।

গগনের এই নীল পাথারে কি করুণা নয়ানে চাও
নিমেষে সকল হৃদয়-পরাণ কেমনে হে তুমি ভুলাও।
তব অপরূপ কান্তি হৃদে ঢালে একি শান্তি;
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি—কি মোহন বাঁশরী বাজাও।
একি ফুলে ফুলে তব হাসি একি ইন্দু পৌর্ণমাসী
একি শ্যাম ঘন তৃণরাশি চরণের তলে বিছাও।
একি আলো-ছায়া তব ভুবনে একি সুখ-দুখ মম জীবনে
একি নিত্য জনমে মরণে কি অপরূপ খেলা খেলাও॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
II মা মা -া | রা রা -া | সা -া সা | সা সা সা I পা্ পা্ সা | সা সা রা |
গ গ • নের এই • নী ল্ পা থা রে কি ক ক্ক ণা ন য়া নে

[-া জ্ঞজ্ঞা] ॥

। রা -পা -া । -মজ্ঞা -া -া [মা মা মা । পা পা পা । পণা ধণা -া ।
চা • • • • ও নি মে ষে স ক ল্ হৃ দয় •

। পা পা -া I পা র্রা র্রা । র্সা ণা পা । মা -পা -া । রা -া -া II
প রা ণ্ কে ম নে হে তু মি ভু • • লা • ও

II { মা পা ণা । পা না না । না -র্সা র্সা । -া -া -া [না র্রা র্রা ।
• ত ব অ প রূ প কা ন্ তি • • • হৃ দে ঢা

। র্সা ণা পা । ণা -া পা । -া -া -া } I পর্মা র্মা র্জ্ঞা । -া র্মা র্মা ।
লে এ কি শা ন্ তি • • • কে ড়ে ল য়্ সা রা

। র্রা -া র্সা । -া -া সা [সা সা সা । রা রা রসা । সরা -া -পা । মজ্ঞা -া -া II
প্রা ণ টি • • কি মো হ ন বাঁ শ রী• বা• • • জা• • ও

II সা সা সা । সা সা সা । ণ্ -সা -রা । রা -া ররা [মজ্ঞা -া জ্ঞা ।
ফু লে ফু লে ত ব হা • • সি • একি ইন্ • দু

। জ্ঞা -া মা । জ্ঞা -মা -পা । পা -া পপা I ণা ধা ণা । ধা ণা পা ।
পো • র্ণ মা • • সী • একি শ্যা ম ঘ ন তৃ ণ

। ধা -মা -া । পা -া -া I সা সা ন্সা । রা রা রলা । রা -া -পা ।
রা • • শি • • চ র ণে• বৃ ত লে• বি • •

। মজ্ঞা -া -া I -া -জ্ঞজ্ঞা II
ছা• • ও • একি

II { মা পা ণা । পা না না । না র্সা র্সা । -া -া র্সর্সা I না র্সা র্রা ।
আ লো ছা য়া ত ব ভু ব নে • • একি সু খ দু

। র্রা র্সা ণপা । ণা ণা পা । -া -া পপা } I র্মা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্মা ।
খ ম ম• জী ব নে • • একি মৃ • ত্যু জ ন মে

। র্রা র্রা র্সা । -া -া সা [সা সা সা । -রা রা রসা । রা -া -পা । মজ্ঞা -া -া II II
ম র ণে • • কি অ প রূ প্ খে লা• খে • • লাও • •

—*—

রমণীর মাতৃত্ব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি যে বর্ত্তমানে নারীজাতির কর্ত্তব্য ও অধিকার প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। আজ প্রায় একুশ বৎসর হইতে চলিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সকল বিষয়ের আলোচনাসূত্রে "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান আলোচনাতেও সাহায্য করিবার সম্ভাবনায় আমরা সেই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়োক্ত প্রবন্ধগুলি ক্রমশ প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। তঃ পঃ সং]

মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান নূতন জগতের নূতন আকাশে এক নবতর সঙ্গীত উদার হৃদয়ে ও মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া তথায় এক নূতনতর ভাবের ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছেন ;—

I am the poet of the woman
the same as the man,
And I say it is as great to be
a woman as to be a man,
And I say there is nothing greater
than the mother of men.

আমার ক্ষুদ্র লেখনী এই তিনটী পংক্তির অনুবাদ করিতে অক্ষম ; দরিদ্র বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ করিতে গেলে ইহার তেজঃপূর্ণ সৌন্দর্য্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। একমাত্র দেবভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কোন কবি মাতৃত্বের তেজঃপূর্ণ মহত্ব এমন তেজের ভাষায় সুব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। কিন্তু হুইটম্যানও স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান করিয়া দেখিয়াছেন এবং ব্যতিরেক ভাবে বলিয়াছেন যে, মানবজননী অপেক্ষা অন্য কিছুই মহত্তর নাই। কেবল এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমির পুরাতন ঋষিরাই স্ত্রীজাতির মহত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি বুঝিয়া শুধু ব্যতিরেক ভাবে (negative) কোন কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু অন্বয়ভাবে (positive) বলিলেন যে, সন্তানের জননী বলিয়াই স্ত্রীসকল বহুকল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া ; ইঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন ; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

"প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥"

এমন দীপ্তিমান অথচ কোমলতাময় কথা ভারতের ঋষি ভিন্ন আর কাহার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে? হুইটম্যান স্ত্রীজাতিকে মানবজননী বলিয়া দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই ; আর্য্য ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে দেবীচক্ষে—সংসার-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীচক্ষে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি যে মানবজননীর জাতি ইহা ঋষিরা নিজে বুঝিয়াছিলেন, এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎদর্শনের উপদেশ দিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে সেই আদর্শভাব অনুসরণ করিবার সহজ উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাতে এই ভাব হিন্দুজাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ; দুঃখের বিষয় এই ভাবটী শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্দ্ধানের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। অপর দিকে পাশ্চাত্য জাতিগণ এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—তবে তাহারা এখনও ইহার উচ্চতা পরিমাণ করিতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির অন্তর হইতে সাধুভাবগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা কেবলই বর্ত্তমান কুশিক্ষার ফলে ; পূর্ব্বে হিন্দুজাতি সাধুভাবের ভাণ্ডার যে সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিল, তাহা ঋষিদিগের শিক্ষার সুপ্রণালীর গুণে। এখন একটা ধুয়া (fashion) উঠিয়াছে যে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়াও সকল কার্য্যই চলিতে পারে ; কেবল তাহাই নহে—ইহাও বলা হইয়া থাকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলেই বরঞ্চ ভাল হয়। ইহা অপেক্ষা হীন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে আর্য্যজাতি ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া প্রতি পদক্ষেপ করিতেন এবং যে কারণে এই ভারতভূমি গভীর শান্তির আস্পদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আজ সেই ভারতের কি পরিবর্ত্তন, মন্দের অভিমুখে কি দ্রুতগতি দেখিতেছি ;—সেই ভারতের সেই আর্য্যজাতির বংশোৎপন্ন আমরা ধর্ম্মকে সকল কার্য্য হইতে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না!

ঋষিরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূলে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের উপর যিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, সকল বিদ্যাই তাঁহার হস্তগত ; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা।" তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যিনি নষ্ট করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে নষ্ট করেন এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, সকল কর্ম্মে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার, ভগবানকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা যদি তাঁহাদের সেই মঙ্গল অনুশাসন না মানিয়া, গর্ব্বভরে অবহেলা করিয়া গৃহে, সমাজে অমঙ্গলরাশি আনয়ন করি, আমাদের পিতৃপুরুষ ঋষিগণ তাহার জন্য দায়ী হইতে

পারেন না। ঋষিরা আমাদিগকে এমন এক অমৃত পান করাইয়াছেন যে এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি আমরা শত কঠোর আঘাতেও একবারে মৃত হইতে পারি না, মরিতে মরিতেও এই অমৃতের সঞ্জীবনীগুণে আবার নববল প্রাপ্ত হইয়া জগতে নবভাবের নবযুগ আনয়ন করিবার চেষ্টা করি। তাঁহাদিগের এই অমৃতদানের ফলেই আমরা এখনও শৈশবকাল হইতেই স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিবার উপদেশ পাইয়া থাকি। ঋষিরা ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং জগতে তাঁহারই হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকেরও মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া জগতকে উপদেশ দিলেন যে স্ত্রীলোককে বিশেষতঃ পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; কেবল দেখিলে হইবে না, লোকশিক্ষার্থ এবং আপনারও শিক্ষার নিমিত্ত মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে হইবে।* কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতাভিমানী আমরা ধর্ম্মবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাবের অতীত হইয়া দুর্ব্বিনীত হৃদয়ের উড়নচণ্ডী যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক বলিয়াই দেখিতে পারি এবং চাহি, পিতৃপুরুষদিগের স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবার চসমা হারাইয়া ফেলিয়াছি অথবা থাকিলেও তাহার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক।

পদে পদে ধর্ম্মের কথা, প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের বন্ধন অনেকের ভাল লাগে না—না লাগিবারই কথা। যাঁহারা পদে পদে আত্মসুখ অন্বেষণ করিবেন; যে সকল লঘুচিত্ত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি দৈহিক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে Artistic beauty বলিয়া পাগলপ্রায় হইবেন; রসিকতা (যাহার ইংরাজী নাম flirtation) করিয়া আপনাদের রসনাকণ্ডূতি এবং মানসিক উত্তেজনা বৃথাই বর্দ্ধিত করত যাঁহারা স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না; যে সকল অদূরদর্শী স্বদেশীয় ব্যক্তি এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদ-নৃত্য (Ball dance) প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মের ও সুনীতিরও দুর্ভিক্ষ আনিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের সকল কার্য্য ধর্ম্মানুকূল করিবার কথা যে ভাল লাগিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের বীজমন্ত্র "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অথবা "খাও দাও হেসে খেলে লওরে ভাই।" তাঁহাদের কু-দৃষ্টান্তে দেশের কি পরিণাম হইবে তাহা তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাবিবার অবকাশ থাকে না; তাঁহারা দিবানিশি আমোদের স্বপ্নেই উড়িতে থাকেন।

তবে ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, কথায় কথায় ধর্ম্মের বন্ধন পড়িলে বালকদিগের অকালপক্বতা কপটতা প্রভৃতি নানা গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা এই ভ্রমে পড়িয়া ঋষিদিগের ভাবে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া আপাতরমণীয় পাশ্চাত্য গুরুদিগের অভ্রান্ত বেদবাক্য (!) সকল অনায়াসেই গলগ্রহ করিয়া থাকেন। ঋষিরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, ধীরতা আসিতে পারে, কিন্তু অকালপক্বতা আসিতে পারে না; অধর্ম্ম করিলে গভীর অনুতাপ আসিতে পারে, কিন্তু কপটতা আসিতে পারে না। তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিতে নিষেধ করেন নাই; তাঁহারা শরীর মন নষ্ট করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিলে এবং ধর্ম্মকে প্রধান অবলম্বন করিলে ভালই হইবে, কখনই মন্দ হইতে পারে না। জগতের ইতিহাসেও কি আমরা ইহার পরিচয় পাই না? রোমসম্রাট নিরো তাঁহার বীভৎস আমোদ বিলাসিতা ও নৃশংসতা দ্বারা জগতের ঘোরতর অপকার করিয়াছে কি উপকার করিয়াছে? যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন আহুতি দিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর কাহারা জগতের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন? গ্রীসের সক্রেটিস মানবজাতির জীবনে, চিন্তায় যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, কয়জন আলসিবিয়াডিস (Alcibiades) তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইংলণ্ডে ধর্ম্মান্ধ পিউরিটান সম্প্রদায় দ্বারা অধিকতর উপকার হইয়াছে অথবা ইংলণ্ডরাজ চতুর্থ জর্জের ন্যায় বিলাসী জনগণদ্বারা অধিক উপকার হইয়াছে? কয়জন লোকে পিউরিটান কবি মিল্টনের অমর কাব্য পড়িয়া স্বীয় জীবনকে উন্নত করিতে পারিয়াছিল এবং কয়জনই বা fashionএর নেতা বর্জ্জ ক্রমেলের উপদেশে উন্নত জীবন যাপন করিয়াছিল? যে ফ্রান্সদেশ কথায় কথায় social science এর দোহাই দিয়া কৃতার্থ হন, সেই ফ্রান্সের যে বর্ত্তমানে কি ভীষণ আভ্যন্তরীণ অবস্থা চলিতেছে তাহা বিলাতী মাসিক পত্রাদিতে যথেষ্ট প্রকাশ পায়। তথায় মধ্যবিৎ গৃহস্থের ঘরেও বালকদিগের মধ্যে ব্যভিচার ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।* নেপোলিয়ন যখন

---

* স্ত্রীলোককে কন্যা বা ভগ্নী-দৃষ্টিতেও দেখিতে পারিবে; এই দৃষ্টি কন্যা মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবারই রূপান্তর মাত্র। "অসংস্কৃতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি মাতেতি বা।" বিষ্ণুসং ৩২ম অঃ।

"পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি বা॥"

মনু, ২অ, ১২৯।

* "It would be difficult to point to another country where there is more juvenile depravity than in France."

এই বিষয়ে স্বদেশভক্ত ফরাসিদেশীয় Max O'rell তাঁহার "Frenchman in America" গ্রন্থে আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা অতিরিক্ত শাসনের ফলে ঘটিয়াছে, আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি যে প্রকৃত ধর্ম্মশাসনের অভাবেই ইহা ঘটে।

বিগত মহাসমরের কঠিন আঘাতেও ইহার হ্রাস হওয়া দূরে থাক, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে দেখা যায়।

স্বদেশ ফ্রান্সের উদ্ধারের জন্য কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল, অথবা যখন তিনি আপনার গর্ব্বিত স্বপ্ন সফল করিবার জন্য অকারণে আশ্রিতগণকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহার সমূলে পতন হইল? বিলাস-পরায়ণ চতুর্থ জর্জ্জের প্রভাব ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে উপকার অপেক্ষা কি অপকারের বীজই নিক্ষেপ করে নাই? কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মপরায়ণা মহারাণীর আদর্শ চরিত্র ইংলণ্ডীয় সমাজকে কত না উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের রাজা ইংরাজজাতি যদি ধর্ম্মপরায়ণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এক ধর্ম্মের বলেই মুসলমানদিগের ভিতরে কি একতা বিরাজ করিতেছে! হিন্দু রাজগণ যদি ধর্ম্মের পথে থাকিয়া স্বদেশদ্রোহ এবং গৃহবিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত দেখিতাম। তখন ভারতের মুক্ত গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য নিয়তই সমুদিত দেখিতাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারাও যদি কেহ ধর্ম্মের সুফল অনুভব করিতে না পারেন, তবে যে আর কি প্রকারে বুঝাইব তাহা জানি না। আর যদি ইহা স্থির হয় যে, ধর্ম্মের পথেই মঙ্গল, তাহা হইলে ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিতে অথবা প্রত্যেক কার্য্যকে ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে বলাই কি কর্ত্তব্য নহে? ধর্ম্ম এমনই পদার্থ যে ইহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধারণ করিতে অভ্যাস না করিলে সহজে আয়ত্ত হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেককে মৃত্যু কর্ত্তৃক গৃহীতকেশ-বোধে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সঙ্গীত-সঙ্ঘের পারিতোষিক বিতরণ।

(আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

গত ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সঙ্গীত-সঙ্ঘের শিক্ষার্থিনী ছাত্রীবৃন্দের পারিতোষিকবিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসর সরস্বতী পূজার দিনে এই আনন্দ-ব্যাপার সম্পন্ন হইত, কিন্তু এবৎসর বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ডনীয় বিধানে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ও একনিষ্ঠ সম্পাদিকা প্রতিভা দেবীর অকালে লোকান্তর গমন ঘটায়, এ উৎসব-ব্যাপার কতকটা বিলম্বে সম্পাদিত হইয়াছে। অনেক গণ্যমান্য দেশী, বিদেশী ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলা এবং সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রতিষ্ঠাত্রী প্রতিভা দেবীর অভাবে সভাস্থল যেন একটা বিষাদকালিমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সদানন্দের ছবি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে ও আপ্যায়নে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী প্রীত ও তুষ্ট হইয়াছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভারম্ভে প্রতিভা দেবীর উদ্দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-রচিত একটী স্মৃতি-সঙ্গীত শ্রীমান্ অমিতানন্দ চৌধুরীর পীযূষ কণ্ঠে গীত হইয়াছিল। সভাস্থলে সঙ্ঘের শিক্ষার্থিনীগণ সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদিশিক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। * * * রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থী-গণকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। * * * কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবীর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া বলেন যে, সঙ্ঘের গত রাখী পূর্ণিমার দশম অধিবেশনে তিনি আমন্ত্রিত হইয়া সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতিভা দেবী সঙ্ঘের সেই উৎসবে শেষ যোগদান করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার আমন্ত্রণ স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবীর অন্তর হইতে আসিয়াছে, সে জন্য তিনি ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একবয়সী এবং বাল্যকালে খেলার সাথী ছিলেন, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যেই তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চার প্রতিষ্ঠাত্রীদের মধ্যে প্রতিভা দেবী অন্যতমা। তাঁহার জীবন সঙ্গীতে মধুময় হইয়াছিল, এবং সেই মাধুর্য্য তাঁহার পারিবারিক জীবনের শান্তিতে স্বপ্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্য আত্মাস্থিত এই সভার স্নিগ্ধ সঙ্গীত-ধারা তাঁহার সমস্ত সামাজিক জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। সঙ্গীত-সঙ্ঘ মাতৃভূমির নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ইহা তাঁহার জীবনের চেষ্টা ও চর্চ্চার প্রধান ফল। তিনি ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। সঙ্ঘের শিক্ষার্থীগণ তাঁহার জীবন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, কারণ এই সঙ্গীতই দেশে অমৃতধারা বর্ষণ করিবে। এজন্য তাঁহার বিয়োগজনিত দুঃখের মধ্যেও যেন একটু শান্তি পাওয়া যায়। আমরাও জীবনের শেষ সীমার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আবরা তাঁহার মহা-প্রস্থান উচ্চ আদর্শে গ্রহণ করি। যাহারা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া আজ পুরস্কার পাইবে, আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাহারাই প্রতিভা দেবীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতেছে, এবং তাহারাই এই সঙ্গীতের মাধুরী সমস্ত দেশে বিতরণ করিবে।

কলা-শিল্পের অনুশীলন বিলাসিতা-সূচক, এরূপ ধারণা ভুল। আনন্দচিত্তই শক্তির প্রকৃত আধার। যেমন বসন্তকালে নবরস সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষলতাদিকে নব পত্রপুষ্পে সুশোভিত করে, সেইরূপ কলাশিল্পের অনুশীলনে আনন্দরস উৎপন্ন হইয়া মনও নিজকে নানাভাবে প্রকাশ করে। সৌন্দর্য্য ও মধুরতা আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়তা করে। সৌন্দর্য্যের এই অনুশীলনে আমাদের জাতীয় জীবনেরও উন্নতি হয়।

সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হইয়া কত মনীষী জগতে কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া যে আনন্দ-রস প্রবাহ উৎসারিত হয়, উহাতে শূরবীরেরাও অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। জাপানের মহিলাগণ ফুলের সাজসজ্জা একটা কলাবিদ্যার মধ্যে পরিণত করিয়াছেন। জাপানের কোনও শূরবীর সেনাপতি বলিয়াছেন যে, তিনি উহার মধ্য দিয়া যে আনন্দরসের উৎসের সংস্থান পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বীরত্ব ও শৌর্য্যের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বীরত্ব ও কঠোরতার দিকটাই জগতের সর্ব্বস্ব নহে; যে কলাবিদ্যায় আনন্দরসের উৎস উৎসারিত হয়, তাহার অনুশীলন ও পুষ্টিতে জগতের অনেক কাজই হইয়া থাকে। সঙ্গীত-সঙ্ঘ সেই আনন্দরসের সন্ধান বঙ্গমহিলার নিকট উপস্থিত করিয়াছে, উহাতে অনুপ্রাণিত হইলে বাঙ্গালার মঙ্গল। বাঙ্গালীজাতি তাঁহার নিকট এই সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানটীর জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। কারণ সঙ্গীত মানুষকে চির আনন্দ ও চির রসধারায় স্নান করাইয়া অমৃতের আস্বাদ দিয়া থাকে।

সংবাদ।

পুরোহিত-নিয়োগ। আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব পুরোহিত ৺যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুতে ট্রষ্টিদিগের সম্মতি অনুসারে তাঁহার একমাত্র জামাতা শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কেহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রচারিত একেশ্বরবাদসম্মত হিন্দু অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে গৃহ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে চাহিলে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে পুরোহিত মহাশয়ের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ। ১৩।২নং বাবুরাম শীল লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ পাল, ২৪নং বাবুরাম শীল লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর আঢ্য এবং ৫নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দে—ইঁহারা গত ১৩২৮ সালের ২৯ শে ফাল্গুন সোমবার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান এই যুবকদিগের মতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দৃঢ় রাখুন।
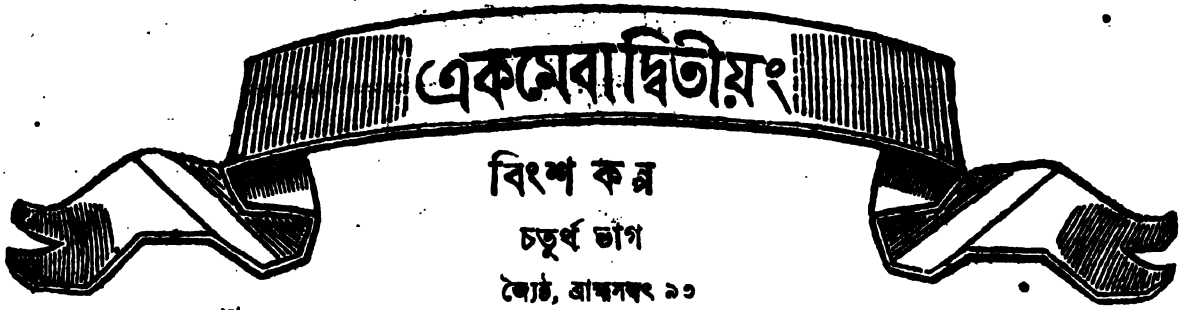
বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩

৯৪৬ ৯সংখ্যা ১৮৪৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওপারে।

(কুড়’নো গান)

পূরবী—আড়াঠেকা।

(আমি) পারের আশায় বসে আছি
পার করগো খেয়ার দাঁড়ী।
(আমার) ওপার হ’তে ডাক্ পড়েছে
আর কি হেথা থাক্‌তে পারি॥
বড় গাছের আড়াল দিয়ে, সোনার রবি ডুবিল রে,
চারি ধারে সাঁজের আঁধার ধরার হিয়া ঘিরিল রে।
এ আঁধারে কেমন করে
(আমি) পারে বসে থাকিব রে,
ও-পার হোতে ঐ যে কারা
আলো জ্বেলে ডাকছে ভারি।
এ-পারেতে তুলিতে ফুল, কত কাঁটা বিঁধিল রে,
তবু, কতক ফুলে কতক পাতায়
ছোট সাজি ভরিল রে,—
আর কেন থাকিব রে কাঁটা বিঁধে মরিব রে,
ও-পারেতে নূতন দেশে নিয়ে চল দিয়ে পাড়ি॥

শ্রদ্ধা জ্ঞানের ভিত্তি।

(ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যান—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ১॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি॥
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ২॥

অর্থ—জ্ঞাতব্য যে বস্তু তদ্‌বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে যে তৎপর, যে ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে সেই ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করে; জ্ঞানলাভ হইলে, অল্প সময়ের মধ্যেই সে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ১॥

যে অজ্ঞ, যে শ্রদ্ধাহীন, যে সংশয়াত্মা সে বিনাশ পায়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, সুখ নাই॥ ২॥

আজকাল লোকের এইরূপ ধারণা যে, পারলৌকিক বিষয়ের জ্ঞানই শুধু শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য বিষয়ের জ্ঞান সেরূপ নহে। উহা প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিদ্ধ। কেহ একজন যদি বলে, আমি আট-পা ও ছয়-মুখবিশিষ্ট মনুষ্য দেখিয়াছি, এবং তাহার সেই কথায় যদি আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করি, তাহা হইলে এইরূপ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসকে ধর্ম্মবিষয়সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বলা হয়। কিন্তু ইহা ভুল। ধর্ম্মবিষয়সম্বন্ধে যেরূপ, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানসম্বন্ধেও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই উভয়পক্ষ উপরি-প্রদর্শিত প্রকারের নহে। আমরা অনেক পদার্থ যাহা নিজের চোখে দেখি, তাহা আমাদের নিকট যেরূপ প্রতীয়মান হয় ঠিক তাহাই—ইহা কোন্ প্রমাণের উপর ভর করিয়া আমরা বলি? চোখের প্রমাণের উপর। কাজেই, ইহা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে। ম্যাজিক লণ্ঠনের দীপের সাহায্যে ছোট জিনিসও খুব বড় দেখায়, সেইরূপ আমাদের চোখে যদি এক আকারের বস্তু অন্য

আকারে প্রতিভাত না হয়—সে কিসের দরুণ? কিন্তু আমরা এস্থলে এরূপ কোন শঙ্কা না করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি; অতএব যাহাকে সত্য জ্ঞান বলা হয়, তাহারও মূল শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব কত কোটি মাইল এবং তাহার পরেও আকাশ আছে এইরূপ মনে হয়। শুনা যায়, আমরা যে সূর্য্য দেখিতে পাই তাহার মত আরও অনেক সূর্য্য আছে। কাল অনন্ত এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি? ইহারও আধার শ্রদ্ধা। আমি কাল যে মনুষ্যের সহিত কথা কহিলাম, সে এই মনুষ্যই—আমরা বলিয়া থাকি; কিন্তু কালিকার ও আজিকার মনুষ্য যে পরস্পর ভিন্ন নহে—সে আমরা কেমন করিয়া বলি? বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট ব্যক্তিকে যে আমরা একত্ব প্রদান করি, তাহার আধার কি? শ্রদ্ধাই তাহার আধার। অতএব, শুধু ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানই শ্রদ্ধামূলক, এ কথা কেন বলিবে? সমস্ত বিশ্বব্যাপার একই রকমে চলিতেছে, সুতরাং তাহার কোন একজন কর্ত্তা আছে, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ জানিতে পারি। আমরা মনুষ্য যতই কেন জ্ঞানী হই না—আমরা পরতন্ত্র, আমরা কোন এক জনকে অবলম্বন করিয়া আছি,—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। গিরি, গুহাগহ্বর দর্শনে যদি আমাদের পূজ্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়—সে পরমেশ্বর-বিষয়িনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ আছেন, আমার আত্মা আছে, সেইরূপ এই বিশ্বেরও এক পরম মহান্ আত্মা আছেন, তিনিই সমস্ত জগতের ব্যাপার চালাইতেছেন—সহজেই এইরূপ আমাদের মনে হয়। জগতের মধ্যে সত্য বলিয়া কিছু আছে, ইহাও আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানে প্রকাশ পায় এবং উহা সত্য বলিয়া আমরা মানিয়া থাকি। কোন ক্ষুদ্র বালককে ক্রোধের আবেশে যখন আমরা প্রহার করি—তাহার পর এইরূপ অনুতাপ হয়—"কেন এই অন্যায় কাজটা করিলাম?" এই অন্যায়বোধ কিসের দরুণ? ইহাও কি বিশ্বাসের কাজ নহে? সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, পরন্তু পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে—এই কথা যখন গ্যালেলিও সত্য বলিয়া মনে করিলেন তখন তাহার প্রতিপাদনার্থ নিজের প্রাণের মায়াও ছাড়িয়া ছিলেন। বহুরূপ উৎপীড়নেও তিনি এই কথা অস্বীকার করেন নাই। কিসের বলে তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন? বিশ্বাসের বলে। লোকের কু-রীতি-নীতির উচ্ছেদ করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে হইবে এইরূপ সঙ্কল্প মনে পোষণ করিলে, মনুষ্য কতই বাধাবিঘ্ন সহ্য করিবার জন্য প্রযত্ন করে। এই সামর্থ্য কিসের? এই সৃষ্টি যদি কতকগুলা পরমাণু একত্র হইয়া আপনা-আপনি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের ঐক্য কোথা হইতে আসিল? যোজনা কোথা হইতে আসিল? শুধু পরমাণুর সংযোগে ইহা হইতে পারে না। যদি কোন চিত্রকর কোন রমণীয় দৃশ্য চিত্র করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই দৃশ্যে পরিদৃষ্ট বিভিন্ন বস্তু কেবল একত্র অঙ্কিত করিলেই সেই চিত্রের মনোহারিতা উৎপন্ন হয় না। সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে আনিয়া ঐ চিত্র আঁকিতে হইবে। এবং তখনই উহা মূল-দৃশ্যের মত রমণীয় হইবে। সেইরূপ, এই সমস্ত জগতের মধ্যে এরূপ কোন শক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াই জগতের এই উন্নতি ও শোভা পরিলক্ষিত হয়। তাৎপর্য্য, বাহ্যজগতের জ্ঞানে যে প্রকার শ্রদ্ধা প্রযুক্ত হয়, পারলৌকিক বিষয়ের জ্ঞানেও সেইরূপ শ্রদ্ধা প্রযুক্ত হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই সমস্ত যোগাযোগ ঠিক হয়। নহিলে সত্য বলিয়া কিছুই বলিবার থাকে না; সমস্তই অসত্য হইয়া পড়ে। এই শ্রদ্ধার যোগেই আমরা মহাশক্তি লাভ করি, উহা পরিত্যাগ করিলে আমরা পশুতুল্য হই এবং আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়।

আর্ট ও মঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান যেমন সত্যস্বরূপ, তেমনি তিনি শিবং—মঙ্গলস্বরূপও বটে। এই সত্যও ঋষিরা আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া সেই মঙ্গলস্বরূপ ভগবানকে বারবার নমস্কার করিয়াছেন—"তুমি যে সুখকর

কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার"। *

তিনি মঙ্গলস্বরূপ, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থে আমরা এই বুঝি যে, ভগবান তাঁহার অন্তর্ধানের অভিব্যক্তিতে যে প্রকৃতির জন্মদান করিয়াছেন, সেই প্রকৃতিতে তিনি তাঁহার মঙ্গলভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত প্রকৃতির সকল অংশের কথা জানিবার অধিকার আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু প্রকৃতির এক অংশ এই পৃথিবী স্বীয় বাষ্পময় কোষ ভেদ করিয়া এই যে শ্যামলশোভন রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের অভিব্যক্তিতে ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ অবধি ভগবদ্ভক্ত মানব পর্য্যন্ত যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, ইহাতেই তো তাঁহার সেই মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের সম্মুখে নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি। ভগবান কেবল দর্শকের মত দাঁড়াইয়া নাই। জগতের প্রতি পরমাণুতে, কালের প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি স্বীয় মঙ্গলভাব নিহিত রাখিয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাঁহার মঙ্গলভাব বিস্তৃত দেখি। এক ধ্রুবতারাকে আকাশে রাখিয়া দিয়া জ্যোতির্বিদ্যা, নৌবিদ্যা প্রভৃতির কতনা উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বঙ্গদেশ—শত শত নদী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সমগ্র দেশকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিতেছে!

জগতের উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়া চলিবার চেষ্টাই হইল মঙ্গলভাবের বহির্বিকাশ। এই বিষয়ে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক মানবের, প্রত্যেক জীবজন্তুর, সমস্ত প্রকৃতির অন্তরের কথা হইতেছে—নিজের নিজের এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জগতের নিরবচ্ছিন্ন সুখের, অপর কথায় মঙ্গলের সুপ্রতিষ্ঠা করা। ভগবান যে মঙ্গলভাব আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে ঐ কল্যাণকর অন্তর্ভাবের বহির্বিকাশেই প্রকৃতির নিম্নতম স্তর অবধি উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরেই উন্নতিসাধনের একটা চেষ্টা দেখা যায়। শত সহস্র উত্থান পতনের ভিতর দিয়াই এই উন্নতির চেষ্টা পরিস্ফুট হইতে দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভগবানের এবং সুতরাং তাঁহা হইতে নিঃসৃত প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জগতে মঙ্গলভাবের প্রসার এবং তাহারই ফলে জগতের উন্নতিসাধন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভগবান যেমন প্রকৃতির কেন্দ্র, তেমনি তিনি আর্টেরও কেন্দ্র, এবং প্রকৃতিই হইল আর্টের পত্তনভূমি। এখন দেখিতেছি যে, ভগবান প্রকৃতিতে তাঁহার মঙ্গলভাব মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জগতের উন্নতিসাধনই সেই মঙ্গলভাবের বহির্বিকাশ। সুতরাং আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, আর্টেরও প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, অন্তত প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জগতে মঙ্গলভাব বিস্তার করা এবং তাহারই পরিণামে জগতের উন্নতিসাধন। আর্ট যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না, এবং জগতের উন্নতিসাধনই যখন প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তখন চিত্রসম্বন্ধীয় বল, সঙ্গীতসম্বন্ধীয় বল, আর সাহিত্যসম্বন্ধীয় বল, সকল বিষয়ক আর্টেরই যে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জগতের উন্নতিসাধন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না।

এই উন্নতিসাধনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে জগতে মঙ্গলভাবের বিস্তার, জগতের অন্তরে স্বাস্থ্যসাধন। তাই প্রকারান্তরে বলিতে পারি যে, জগতের স্বাস্থ্যসাধনই আর্টের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবেই—ব্যায়ামক্ষেত্রে একপ্রকার, সাহিত্যক্ষেত্রে একপ্রকার, বিজ্ঞানক্ষেত্রে একপ্রকার। কিন্তু ব্যায়ামক্ষেত্রে কেবলই ব্যায়াম করিবার ফলে দুই একজন হোঁৎকা মাংসপিণ্ডাকৃতি কুস্তিগীর প্রস্তুত হইলেও তাহাতে প্রকৃত কলাকৌশল প্রয়োগের ফল প্রকাশ পায় বলিয়া ধরিব কিনা সন্দেহ। যে সকল ব্যায়ামের ফলে ব্যায়ামকারীদের শরীরে স্বাস্থ্যবিধান হয়, তাহারই মধ্যে ব্যায়ামের প্রকৃত আর্ট বা কলা-

---

* ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

কৌশল প্রকাশ পায় বলিয়া মনে করি। শরীরের স্বাস্থ্যবিধান বজায় রাখিয়া যে ব্যায়ামে যত technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান প্রকাশ পাইবে, সেই ব্যায়াম তত প্রশংসনীয় হইবে। কোন ব্যায়ামের ফলই যদি শারীরিক স্বাস্থ্যহানি হয়, তবে তাহার technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান যতই কেন ভাল হউক না, তাহা আমাদের নিকট প্রশংসা পাওয়া দূরে থাক, ব্যায়াম বলিয়াই পরিগণিত হয় না। সেইরূপ সঙ্গীত বল, চিত্র বল, সকল বিষয়েই কেবল কসরৎ দেখাইয়া আর্টপ্রকাশের চেষ্টা করিলে ব্যর্থকাম হইতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়ে আর্টপ্রকাশের উপায় বিভিন্ন হইলেও সকলেরই সাধারণ মূল তত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না যে, আর্ট সংসিদ্ধ করিতে চাহিলে তাহা দ্বারা জগতের স্বাস্থ্যসাধন, জগতের কল্যাণ ও উন্নতিসাধন কতটা হইল, তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধনই আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলেও অমঙ্গলজনক কার্য্যে, অন্তত মঙ্গলের অভাবজনক কার্য্যেও যে আর্টের প্রয়োগ হইতে পারে না, আমি তাহা মনে করি না। সুস্থ মনুষ্যের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভদ্রভাবে আহার করাকেও আহার বলা যায়, পেটুকের অকারণে আহার করাকেও আহার বলা যায়, আবার আঁস্তাকুড় হইতে পাগল মানুষ যখন দু'চারিটি পড়া-ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, তাহাকেও আহার বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত আহার অর্থে আমরা প্রথমোক্ত আহারকেই ধরি, শেষোক্ত দুইটাকে প্রকৃত আহার বলিয়া ধরি না। সেইরূপ জগতে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয়বিধ কার্য্যেই আর্টের প্রয়োগ সম্ভব হইলেও প্রকৃত আর্টের অর্থে আমরা সেই আর্টই বুঝি, যাহা মানুষকে মঙ্গলের পথে, উন্নতির মুখে লইয়া চলে, কল্পনাকে অনন্তের পথে, মুক্ত উদারভাবের দিকে লইয়া চলে এবং জগতের উন্নতিকল্পে সহায়তা করে। বাতাস আমাদের জীবনধারণের একটী প্রধান উপকরণ বটে। কিন্তু সে কোন্ বাতাস ?—প্রভাতের সুনির্ম্মল বায়ু, মুক্ত স্থানের জীবনী শক্তিপূর্ণ বায়ুই সেই বাতাস। যে বায়ুতে অক্সিজেন জীবনধারণের উপযুক্ত যথাযথ পরিমাণে থাকিবে, তাহাই প্রকৃত বায়ুনামে অভিহিত হইতে পারিবে। তাই বলিয়া যে বায়ুতে অক্সিজেন খুবই কম ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, তাহাকেও যে বায়ু বলিব না তাহা নহে। কিন্তু এই দুর্গন্ধ বায়ুতে দীর্ঘকাল অবস্থিতির ফল হইল যক্ষ্মারোগ এবং অক্সিজেনে-ভরা মুক্ত বায়ুতে অবস্থিতির ফল হইল দীর্ঘায়ু লাভ। সেইরূপ যে আর্টের ফলে আমাদের আত্মা জীবন লাভ করিতে পারে, তাহাকেই আমরা প্রকৃত আর্ট বলিব। বিদ্রূপাত্মক ভেংচিকাটা আর্ট অথবা শ্লীলতার বা স্বাভাবিকতার মূলচ্ছেদক আর্টকেও যে পারিভাষিকভাবে আর্ট বলিবার অধিকার থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সেই আর্ট মানুষকে নীচের দিকে অধোগতির পথে লইয়া যায় বলিয়া তাহাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।

জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন যদি আর্টের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়—কেবল ইহাই কেন, জগতের কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর বিষয়ে আর্টের প্রয়োগ সম্ভব কি না, ইহা যদি বিচারের বিষয়ও হয়, তাহা হইলেও আর্টকে জগতের সকল বিষয় হইতে অসংযুক্ত বা পৃথকভাবে দেখা চলিতেই পারে না। আর্ট একা একা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে জগতের মঙ্গলামঙ্গল লইয়া তাহার সম্বন্ধের কোন কথাই উঠিতে পারিত না। আর্ট একা-একা দাঁড়াইতে পারে না বলিয়াই কোন বিষয়ে আর্টকে সুপ্রযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে perspective বা পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে সেই বিষয়টীকে ফলাইয়া তুলিতে হয়। পরিপ্রেক্ষণের অর্থ আর কিছুই নহে—পরিবেশের সহিত নির্ব্বাচিত বিষয়টী যে ভাবে দৃষ্ট হয় তাহাই পরিপ্রেক্ষণের ভাবার্থ। কাজেই দেখিতেছি যে, যে দিক দিয়াই হউক, আর্টকে পরিবেশের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না—দেখিলে আর্টের আর্টত্বই থাকে না। আর, যদি আর্টকে পরিবেশের সহিত সংযুক্তভাবে দেখিতেই হয়, তবে আর্টের উপর জগতের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়িত্বের কথাও স্বতই আসিয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোন প্রকৃত আর্টিষ্ট আর্টের দোহাই দিয়া স্বীয় স্কন্ধ হইতে তাঁহার আর্টের সহিত জগতের শুভাশুভের দায়িত্বসম্বন্ধ ঝাঁড়িয়া ফেলিতে পারেন না।

প্রভাতী উপাসনা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

মালকোষ—একতালা।

নয়ন মেলিয়া কি হেরিনু নাথ, প্রথম প্রভাত গগনে
(তব) উজল আলো বিমল হাস্যে রঞ্জিতারুণবরণে
নলিন-নয়ন-পাত-জনিত নবীন নীহারবিন্দু
প্রেম-বিগলিত সুধা তরলিত-সিত-পীযুষ-সিন্ধু
সুরভি-কুসুম-সুবাস-শ্বাস বহিছে মন্দপবনে।
উঠে রোমাঞ্চ ধরণী ভরিয়া বিপুল পরশ-পুলকে
ফুটে চেতনা নব অনুরাগে তরুণ অরুণ আলোকে
গাহে রঙ্গে কত বিহঙ্গ নিখিল পূজার ভবনে
জয়জয় জয় মহিমময় বন্দি তোমার চরণে।

আর্য্য ও ম্লেচ্ছ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বিপুল মানব-সমাজের মোটামুটি দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একশ্রেণীর নাম আর্য্য, অপর শ্রেণীর নাম ম্লেচ্ছ। এই উভয় শ্রেণীর ভাষাগত পার্থক্যই অতি প্রাচীন যুগে ইহাদের বিভাজক অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্য-ধৃত বেদের ব্রাহ্মণাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বিজগণ অপভাষা প্রয়োগ করিলে সেকালে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইতেন, কারণ অপশব্দভাষীর নামই ম্লেচ্ছ।

ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছোহবা এষ যদপশব্দ ইতি। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য মাধবীয় ধাতুবৃত্তি-গ্রন্থেও এই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। "ম্লেচ্ছ" অব্যক্তায়াং বাচি, এবং "ম্লেচ্ছ" অব্যক্তে শব্দে—গণপাঠে ম্লেচ্ছ ধাতুর এই দুইপ্রকার অর্থনির্দ্দেশ দেখা যায়। গণকারপঠিত অর্থের বিশদীকরণাভি-প্রায়ে সায়ণ বলিয়াছেন যে, "ইহ অব্যক্তশব্দোঽস্ফুটশব্দোঽপশব্দশ্চ" অর্থাৎ এইস্থলে অব্যক্ত শব্দের অর্থ অস্ফুটশব্দ এবং অপশব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত শব্দ। সুতরাং প্রাচীন কালে অসংস্কৃত-ভাষী জাতিবিশেষ ম্লেচ্ছনামে অভিহিত হইত। ঋষিপ্রবর বৌধায়নের মতে অবৈধরূপে গোমাংস-ভোজী সংস্কৃতবিরুদ্ধভাষণশীল বেদবিহিত যাবতীয় শৌচাচারবিহীন মানবগণ ম্লেচ্ছনামে অভিহিত হইয়াছে।

গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচার-বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।

এই বচনের পাঠ ভানুজী দীক্ষিত-কৃত এবং রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত অমরকোষের টীকায় কিঞ্চিৎ অন্যথা দেখা যায়—

"গোমাংসখাদকো যস্তু লোকবাহ্যঞ্চ ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনোঽসৌ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে"॥

এই জাতির আকৃতিগত এবং উৎপত্তিগত অনেক প্রকার ভেদের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহের মতে একশ্রেণী চণ্ডালই ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ। তিনি প্রথমতঃ চণ্ডাল, প্লব, মাতঙ্গ, দিবাকীর্ত্তি, জনঙ্গম, নিষাদ, শ্বপচ, অন্তেবাসী, চাণ্ডাল, ও পুক্কস—চণ্ডালের এই দশটি নাম একশ্লোকে নিবন্ধ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে কিরাত, শবর ও পুলিন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ম্লেচ্ছজাতিকে চণ্ডালের অবান্তর ভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার কারিকা এইরূপ—

"চণ্ডালপ্লবমাতঙ্গ-দিবাকীর্ত্তিজনঙ্গমাঃ।
নিষাদশ্বপচাবন্তেবাসিচাণ্ডালপুক্কসাঃ॥
ভেদাঃ কিরাত-শবর-পুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

শূ. ব। ২০।

কিন্তু মহর্ষি দেবল ম্লেচ্ছকে চণ্ডাল হইতে স্বতন্ত্র-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"দাসীকৃতো বলান্-ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ"। ইহার অর্থ দ্বিজাতি ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অথবা চাণ্ডালাদি দস্যু কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত। স্মার্ত্ত-প্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চণ্ডাল এবং ম্লেচ্ছের পার্থক্য স্বীকার করিয়া তুল্যতা বিবেচনা করিয়াছেন, "অতএব চাণ্ডালেন সহ ম্লেচ্ছানাং সাম্য-মাহ দেবলঃ"। যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকার মতেও "অন্ত্য" শব্দের অর্থপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে চণ্ডাল পর্য্যায় শ্বপচ ও ম্লেচ্ছ তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত অথচ ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যথা—"অন্তে ভবা অন্ত্যা ম্লেচ্ছ-যবন-শ্বপচাদয়ঃ। যতোঽধমজাতয়ো ন সন্তি॥" অন্তে অর্থাৎ আর্য্যপল্লীর বাহিরে যাহারা বাস করে, যেমন ম্লেচ্ছ যবন শ্বপচ প্রভৃতি, যাহাদের অপেক্ষা অধম জাতি আর নাই। কোন কোন

পুস্তকে "অন্ত্যা ম্লেচ্ছা" এমত পাঠ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাঠই সমীচীন।

হেমাদ্রি-ধৃত পৈঠীনসী বচনেও চাণ্ডাল এবং ম্লেচ্ছের পার্থক্য বিবেচিত হইয়াছে যথা—

"রথ্যামাক্রম্য কৃতমূত্রপুরীষঃ পঞ্চনখাস্থ্য-স্নেহং স্পৃষ্ট্বাচাপ্তঃ পুনরাচামেৎ। চাণ্ডাল-ম্লেচ্ছ-সম্ভাষণেষু চ॥" অর্থ—রাস্তাতে গমনের অনন্তর, মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগের পর, শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ প্রাণীর স্নেহরহিত অর্থাৎ চরবী রহিত অস্থি স্পর্শ করিয়া কৃতাচমন ব্যক্তিও পুনরায় আচমন করিবে; চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলেও পুনরাচমন করিতে হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে অবান্তর ভেদসত্ত্বেও একধর্ম্মাক্রান্ততা নিবন্ধন অমর সিংহ ম্লেচ্ছদিগকে চণ্ডালবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ম্লেচ্ছ-জাতয়ঃ" এই উক্তি দ্বারা কিরাত শবর ও পুলিন্দ, ম্লেচ্ছের এই তিনটি মাত্র শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎপত্তি-বিবরণ।

মৎস্যপুরাণের মতে মৃত বেণ রাজার দেহ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মথিত হইলে তাহার বাম ভাগ হইতে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। পরন্তু সেই ম্লেচ্ছগণ অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল।

মমন্থুর্ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ।
তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাঃ। ১০ ম অ।

কিন্তু সূতসংহিতা পাঠে জানা যায় যে বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত সন্তান "ক্ষত্তৃ" নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণীতে গুপ্তভাবে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন সন্তানের নাম হইয়াছে "ম্লেচ্ছ"।

ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যতো জাতঃ ক্ষত্তা ভবতি নামতঃ।
অস্যামনেন চৌর্য্যেণ ম্লেচ্ছো বিপ্রাঃ প্রজায়তে॥
(১২অ ২১-২২)

মনুসংহিতায় ক্রিয়ালোপনিবন্ধন এবং ব্রাহ্মণের অদর্শননিবন্ধন পুণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়দিগের বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার পরেই আবার বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের মধ্যে যে সকল মানব ক্রিয়া-লোপাদি দোষে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্যভাব অর্থাৎ ম্লেচ্ছ-ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ম্লেচ্ছভাষাযুক্তই হউক আর আর্য্যভাষাযুক্তই হউক উহাদিগকে দস্যুজাতি বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহূরুপজ্জানা যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥
ম। ১০ অ। ৪৩।৪৪।৪৫।

তবেই দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতেও পুরাকালে অনেকে ম্লেচ্ছদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত হরিবংশের বচনা-বলীপাঠে জানা যায় যে, বশিষ্ঠের আদেশানুসারে সগর রাজা কতকগুলি অত্যাচারী ক্ষত্রিয়ের আর্য্য-জনোচিত বেশের অন্যথা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব-ধর্ম্মবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। এই গণনায় শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলিসর্প, মহিষ, দর্ব্ব, চোল ও কেরল এই দশটি দেশের অধিবাসীদিগের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে শকদেশীয়দিগের অর্দ্ধমস্তক মুণ্ডিত করা হইয়াছিল। যবন এবং কাম্বোজদেশীয়দিগের সমস্ত মাথাই নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পারদদেশীয়দিগকে মুক্তকেশ অর্থাৎ অনাবদ্ধ দীর্ঘকেশযুক্ত এবং পহ্লবদেশীয়কে শ্মশ্রুধারী করা হইয়াছিল। সগরশাসনে ইহাদের স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) এবং বষট্কার অর্থাৎ হোমাধি-কার বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥
শকা যবন-কাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলিসর্পাঃ স-মহিষা দর্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥

বিষ্ণুপুরাণে ইহাদের ম্লেচ্ছত্ব বিঘোষিত হইয়াছে "তে সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ"। অর্থ—

তাহারা সকল ধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রদর্শিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে ম্লেচ্ছদিগের নানাপ্রকার উদ্ভব প্রতিপন্ন হয়। উৎপত্তির বৈচিত্র্যনিবন্ধনই ইহাদের বর্ণগত পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণকায় কাফ্রি, সাঁওতাল প্রভৃতিকে বেণদেহপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইয়ুরোপীয়গণ সম্ভবতঃ সগরবিধ্বস্ত ক্ষত্রিয়ের বংশধর। হেমাদ্রিনিবন্ধধৃত কূর্ম্মপুরাণের বচনপাঠে শুক্লবর্ণ ম্লেচ্ছের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে কেবল শুক্লশব্দই ম্লেচ্ছ অর্থে পঠিত হইয়াছে। যথা—

"ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ।
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গে "শুক্ল"-ভাষণে॥
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তঃ পুনরাচমেৎ॥

পূর্ব্বপ্রদর্শিত পৈঠীনসীবচনে চাণ্ডাল-ম্লেচ্ছ-সম্ভাষণে পুনরাচমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এখানেও শুক্লভাষণে তাহারই প্রতিধ্বনি বুঝিতে হইবে। মহাভারত পাঠে জানা যায়, কলিঙ্গদেশবাসী চিত্রাঙ্গদ রাজার রাজপুর নামক নগরে রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায় বিভিন্নদেশবাসী বহু রাজার সমাগম হইয়াছিল। ইহাতে দক্ষিণদিকবাসী এবং প্রাচ্য ও উদীচ্যদেশবাসী ম্লেচ্ছ এবং আর্য্য বহুরাজার বর্ণনা দেখা যায়। ইহাঁরা সকলেই শুদ্ধ জাম্বুনদপ্রভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ এবং ভাস্বরদেহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ রাজানঃ প্রাচোদীচ্যাস্তথৈব চ॥
কাঞ্চনাঙ্গদিনঃ সর্ব্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভাঃ॥

শান্তি প ৪ অ। ৮।৯।

কিন্তু মহাভারতেই মৃত বেণরাজার দক্ষিণ উরুমন্থনসম্ভূত পুরুষকে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী এবং অন্যান্য পর্ব্বতবনবাসী শত-সহস্র ম্লেচ্ছের আদি-পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই আদি-পুরুষ খর্ব্বকায়, পোড়াখুঁটির মত কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং কৃষ্ণকেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে ঋষিগণ "নিষীদ" এই কথা বলিয়াছিলেন; অতএব ইহার বংশধরগণ নিষাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব।

তং প্রজাসু বিধর্ম্মাণং রাগদ্বেষ-বশানুগম্।
মন্ত্রপূতৈঃ কুশৈর্জঘ্নু ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥
মমন্থুর্দক্ষিণং চোরুমৃষয়স্তস্য মন্ত্রতঃ।
ততোঽস্য বিকৃতো জজ্ঞে হ্রস্বাঙ্গঃ পুরুষো ভুবি॥
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশো রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধজঃ।
নিষীদেত্যেবমূচুস্তমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥
তস্মান্নিষাদাঃ সম্ভূতাঃ ক্রূরাঃ শৈলবনাশ্রয়াঃ।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শত-সহস্রশঃ॥

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৫৯ অ। ৯৪-৯৭।

তাহার একটি নাম "ম্লেচ্ছমুখ"। এই নামটির যৌগিকার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার বর্ণ ম্লেচ্ছের মুখের মত; সুতরাং ইহা হইতে তামাটে বর্ণের ম্লেচ্ছজাতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ব্রহ্মদেশবাসী প্রভৃতিই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব ইহাও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ শুক্ল তাম্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ম্লেচ্ছের সহিতই আর্য্যজাতির পরিচয় ছিল।

ধরাধামে যখন হইতে আর্য্যজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন হইতেই ইহাদেরও অস্তিত্বের প্রমাণ দেখা যায়। এমন কি, মান্ধাতার সময়েই ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা চিন্তা হইয়াছিল। মান্ধাতা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, ও কাম্বোজ প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূত বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি দেশবাসী মানবগণ কি প্রকার ধর্ম্মের আচরণ করিবে? আমার মত নৃপতিগণই বা এই সকল দস্যুজীবীকে কি ভাবে দেশ মধ্যে স্থাপন করিবে?

মান্ধাতোবাচ—
যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্র-মদ্রকাঃ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা-রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ॥
কথং ধর্ম্মান্ চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ॥

শান্তিপর্ব্ব। ৬৫অ। ১৩-১৫

প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলিয়াছেন যে, সমস্ত দস্যুগণই মাতা পিতা গুরু আচার্য্য আশ্রমবাসী এবং ভূপতিদিগের সেবা করিবে। বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ প্রভৃতি) কূপপ্রপাকরণ এবং উপযুক্ত কালে ব্রাহ্মণোদ্দেশে শয্যা প্রভৃতি বিবিধ বস্তুর দানও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অহিংসা, সত্যবচন, অক্রোধ, বৃত্তি (উপযুক্ত জীবিকা), দায়ানুপালন (পৈতৃক ধনাধিকার) পুত্রদার প্রভৃতি পোষ্যবর্গের পালন, শৌচ, অদ্রোহ, এবং সমস্ত যজ্ঞের দক্ষিণা দান, মঙ্গলকামী মানবগণ এই সকল ধর্ম্মের আচরণ করিবে। দস্যুগণ মহাফলপ্রদ পাকযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল কর্ম্ম এবং এই শ্রেণীর যাবতীয় মনুষ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মই দস্যুদিগের সম্বন্ধেও অতিপূর্ব্বকালেই বিহিত হইয়াছে।

ইন্দ্রউবাচ—

"মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
আচার্য্য-গুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনাম্॥
ভূপালানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে॥
পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপা-প্রপাশ্চ শয়নানি চ।
দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা॥
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্।
ভরণং পুত্র-দারাণাং শৌচমদ্রোহ এবচ।
দক্ষিণা সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞা মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্ব্বদস্যুভিঃ॥
এতান্যেবং প্রকারাণি বিহিতানি পুরানঘ!
সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীহ পার্থিব!

৬৫অ। ১৭-২২

মান্ধাতার ও ইন্দ্রের প্রশ্নপ্রতিবচনের অর্থ হইতে তদানীন্তন চীন শক প্রভৃতি দস্যু-ব্যবহার-জীবী ম্লেচ্ছদিগের ধর্ম্মবিষয়ে সমুন্নত অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু "ব্রহ্ম ক্ষত্রপ্রসূত, বৈশ্য শূদ্র" প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে চীন প্রভৃতি দেশবাসী ম্লেচ্ছভাষী দস্যুদিগের মধ্যেও জাতিভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। পরন্তু ইহারা বৃত্তির অপকর্ষ-নিবন্ধন এবং অনেক বিষয়ে সদাচারের ব্যত্যয়-নিবন্ধন আর্য্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ ইহাদেরও "আচার্য্য-গুরুশুশ্রূষা" "বেদধর্ম্মক্রিয়া" ও "শৌচ", এমন কি, পাকযজ্ঞক্রিয়ার পর্য্যন্ত অধিকার দেখা যায়। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মান্ধাতার সময়ের চীন শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ এবং বৌধায়ন-প্রোক্ত সর্ব্বাচারবিহীন অসভ্য বর্ব্বর ম্লেচ্ছ, এক-শ্রেণীর মানব নহে। কারণ, প্রাচ্যোদীচ্য ম্লেচ্ছ-দিগের মধ্যে সভ্যভব্য রাজা ছিল, এবং সেই রাজগণ আর্য্যমহিলার স্বয়ংবরসভায় কন্যার্থী হইয়া অন্যান্য রাজার সহিত উপস্থিত হইত; পূর্ব্বোক্ত চিত্রাঙ্গদ রাজকন্যার স্বয়ংবর বৃত্তান্ত হইতেই এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য নরপতিদিগের অন্যান্য আভ্যুদয়িক কার্য্যেও বিভিন্নদেশীয় ম্লেচ্ছরাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, বাল্মীকির রামায়ণও এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক স্থির হইলে প্রাচ্য উদীচ্য প্রতীচ্য এবং দাক্ষিণাত্য, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য রাজগণ এবং বনপর্ব্বতবাসী রাজগণ উপবিষ্ট হইয়া দশরথের উপাসনা করিয়াছিলেন।

অথ তত্র সমাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্।
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে তং দেবা ইব বাসবম্॥

অযোধ্যাকাণ্ড ৩য় সর্গ ২৪-২৫

মান্ধাতার প্রশ্নবাক্যে যবন চীন শক প্রভৃতি দেশবাসীর ন্যায় গান্ধার এবং মদ্রদেশবাসীও দস্যুজীবী ম্লেচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; অথচ গান্ধার এবং মদ্রবাসীদিগের সহিত কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের যৌনসম্বন্ধেও কোন বাধা ছিল না। মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী পাণ্ডুরাজার ভার্য্যারূপে পরিণত হইয়াছিলেন। কর্ণসারথি মদ্ররাজ শল্যের সহিত কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইলে কর্ণের মুখ হইতে মদ্রদেশের অনেক প্রকার কুৎসিতাচারের কথা বহির্গত হইয়াছে। কর্ণ অনেক বার শল্যকে "কুদেশজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; স্থল-বিশেষে "পাপদেশজ" বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহাও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে মদ্র-দেশের নরনারীগণ অত্যন্ত ব্যভিচাররত (কর্ণ পর্ব্ব ৪অ ২১-২৯)। একথাও বলা হইয়াছে যে মদ্রদেশীয়দিগের অশুভ কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম ও অহঙ্কার প্রসিদ্ধ, ইহাদের সহিত শত্রুতা এবং মিত্রতা কিছুই করিবে না। অশিষ্ট মদ্রদেশ-

বাসিগণ সক্তুমৎস্যভোজী অর্থাৎ শুষ্ক মৎস্যের চূর্ণভোজী, ইহারা গোমাংসের সহিত মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ ও গান করে এবং পরস্পর কামপ্রলাপ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম কি প্রকারে থাকিবে ?

যেষাং গৃহেষশিষ্টানাং সক্তুমৎস্যাশিনাং তথা।
পীত্বা সীধু সগোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ॥
গায়ন্তি বাপ্যবদ্ধানি প্রবর্ত্তন্তে চ কামতঃ
কামপ্রলাপিনোঽন্যোন্যং তেষু ধর্ম্মঃ কথং ভবেৎ॥
মদ্রকেষ্বলিপ্তেষু প্রখ্যাতাশুভকর্ম্মসু।
নাপি বৈরং ন সৌহার্দ্দং মদ্রকেণ সমাচরেৎ॥

কর্ণ পর্ব্ব ৪০ অ।

কর্ণের মর্ম্মবিদারক বাক্যবাণে আহত হইয়াও শল্য স্বকীয় জন্মভূমি মদ্রদেশের বিশুদ্ধিখ্যাপনের প্রয়াসী হইলেন না, কেবল নিজের বংশের বিশুদ্ধি ও সদাচারের উল্লেখপূর্ব্বক স্বকীয় ধর্ম্মপরায়ণতা-নিবন্ধন স্পর্দ্ধা করিয়াছেন, যথা শল্য কর্ণকে বলিতেছেন—সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ যাজ্ঞিক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমি নিজেও ধর্ম্মপরায়ণ; হে বৃষ! তুমি মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তির মত প্রতিভাত হইতেছ; তথাপি সৌহার্দ্দনিবন্ধন তোমাকে আমার চিকিৎসা করা উচিত।

জাতোঽহং যজ্বনাং বংশে সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
রাজ্ঞাং মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণঃ॥
যথৈব মত্তো মদ্যেন ত্বং তথা লক্ষ্যসে বৃষ!
তথাপি ত্বাং প্রমাদ্যন্তং চিকিৎসেয়ং সুহৃত্তয়া॥

কর্ণ পর্ব্ব ৪১ অ।

প্রদর্শিত বৃত্তান্ত হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, মদ্র প্রভৃতি নিন্দিত দেশে ভ্রষ্টাচার লোকের আধিক্য ছিল, এবং সদাচার যাজ্ঞিক প্রভৃতির অল্পতা ছিল। ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানবগণও অন্যান্য বিশুদ্ধ দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিভাবিত হইতেন। পরমার্থতঃ ইহাঁরা গারো কাফ্রি সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর বা সর্ব্বধর্ম্মরহিত ছিলেন না। অধিকসংখ্যক অধিবাসীর আচারগত অনার্য্যতা-নিবন্ধন তত্রত্য বিশুদ্ধাচারগণও মোটামুটি ভ্রষ্টাচার ম্লেচ্ছ বলিয়াই অবজ্ঞাত হইয়াছেন। অন্যান্য নিন্দিত দেশের পক্ষেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ অতি পুরাকালে খৃষ্টধর্ম্ম বা ইসলাম ধর্ম্ম প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং আর্য্য-ম্লেচ্ছ সকলকেই উচ্চাবচভাবে হিন্দুর গণ্ডীর ভিতরেই থাকিতে হইত। মনুর উপদেশানুসারেও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শৌচাচারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন, এই কয়টি দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় মানবদিগকেই স্বস্ব জাত্যুক্ত চরিত্র অর্থাৎ শৌচাচার শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন, যথা—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২।২.

মানুষ যতই অনাচার পাপাসক্ত হউক না কেন, আর্য্য শাস্ত্রানুসারে তাহার কোন না কোন স্তরে থাকিবার স্থান এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার থাকিয়াই যায়।

লুসাই-পাহাড়-জেলার বিবরণ।

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী)

লুসাই সংজ্ঞা—

"লুসাই" সংজ্ঞাটী ইহার শব্দ-ব্যুৎপত্তি হইতেই অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের কোন কোন বিবরণ-পুস্তকে উল্লেখ আছে, "বহু দিন পূর্ব্বে এক জাতীয় লোক লুহা রাজা বা রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইত।" এক্ষণে উভয় দেশীয় ভাষায় (dialects) লুহারাজদ্বারা শাসিত লোকসমূহ (রংকুল প্রভৃতি) লুসাই বা লুহা জাতি আখ্যা দেওয়া হইল। মনে হয়—এই লুহা হইতে লুহাই এবং লুহাই হইতে লুসাই সংজ্ঞার উৎপত্তি হইবে।

ইষ্টার্ণ ও ওয়েষ্টার্ণ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) লুসাই—

সোনাই নদীর পূর্ব্বাংশ হইতে মণিপুরের সীমা পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানের অধিবাসী লুসাইরা ইংরাজ-শাসনাধিকালে "ইষ্টার্ণ লুসাই" নামে অভিহিত। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ইষ্টার্ণ লুসাইরা শেষ বিদ্রোহী হইয়াছিল। ঐ বৎসর জুন মাসের প্রারম্ভে তাহারা শাসিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। যে সকল লুসাই দার্সং এবং মাইকাং পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে সোনাই নদীর পশ্চিমাংশে লাঙ্গাই নদী

পর্য্যন্ত স্থানসমূহে বসবাস করে তাহাদিগকে "ওয়েষ্টার্ণ লুসাই" বলা হয়। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ওয়েষ্টার্ণ লুসাইরা বিদ্রোহী হইয়া শাসিত হইবার পর তাহারা আর কোনরূপ উপদ্রব করে নাই। ওয়েষ্টার্ণ লুসাই সর্দ্দারদিগের সহিত "সাইলস" (Sylus) এবং হউলঙ্গদিগের সহিত কোন কালে সদ্ভাব ছিল না। ইষ্টার্ণ ও ওয়েষ্টার্ণ লুসাইরা পরস্পর বিরোধী ছিল। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে উভয় দলের সর্দ্দারদিগকে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে এবং নিজ নিজ গ্রাম সুরক্ষিত রাখিতে হইত।

বর্ত্তমান সীমা *—

উত্তর সীমা—শ্রীহট্ট, কাছাড় ও মণিপুর; দক্ষিণ সীমা—আরাকাণ ও চীনের পর্ব্বত; পূর্ব্ব সীমা—ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত পর্ব্বতময় ভূখণ্ড; পশ্চিম সীমা—ত্রিপুরা ও চট্টল ভূমি।

প্রাকৃতিক বিবরণ—

গ্রীষ্মকালেও প্রাতঃকাল প্রায় ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত এখানে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন দৃষ্ট হয় এবং সায়ংকাল হইতে সমস্ত রাত্রি ক্রমশঃ শৈত্যবোধ হইতে থাকে। কর্ণফুলি, ধবলেশ্বরী (কালাডন্) সোণাই, টিপকাই ও মণিপুরের কয়েকটী নদী এই জেলার প্রধান নদী। কর্ণকুলি "লুংলে" মহকুমাস্থ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বহুসংখ্যক পর্ব্বত ও গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চট্টলভূমি অতিক্রম করত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে এই নদীটী ১৭০ মাইল। ধবলেশ্বরী লুসাই দেশের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া "পোলিচিরা" নামক স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাছাড় জেলাস্থ শিয়ালটেক নামক স্থানে বরাক নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে আধুনিক প্রসিদ্ধ "চাঙ্গশীল" নামক স্থানটী অবস্থিত। ধবলেশ্বরী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০ মাইল বিস্তৃত। "সোণাই" বরাক নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীতটে পালানঘাট ও সোণাইমুখ নামক দুইটী আধুনিক উন্নতিশীল নগর অবস্থিত। আইবুর নামক স্থানের ঝরণাটী উল্লেখযোগ্য। কালেশীব, দারলঙ্গ, লুংলে, রেঙ্গটী, আরাবোম, মাইফাম, জেভাইলাং প্রভৃতি পাহাড় এই জেলায় অবস্থিত। লুসাই পর্ব্বতমালার মধ্যে অধিকাংশ অত্যুচ্চ, তন্মধ্যে "ব্লু"পাহাড় প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ। এখানকার জঙ্গল সাধারণত নিবিড়। নানা স্থানে স্বভাবজাত অপর্য্যাপ্ত বংশ ও অসংখ্য রকমের ফুলগাছ দৃষ্ট হয়। কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব এখানে বড়ই অধিক। লুসাই পাহাড় জেলার সর্ব্বত্রই "জুম" প্রথায় চাষআবাদ হইয়া থাকে।

কোম্পানীর প্রথম দৃষ্টি—

ভারতের প্রথম রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনকালে কুকি অথবা লুসাইরা শিলহাটের সীমান্তস্থ ত্রিপুরা পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ বঙ্গের কয়েকখানি গ্রাম আক্রমণ করত ১৮৬ জন অধিবাসীর প্রাণসংহার ও ১০০ শত জনকে ধৃত করিয়া লইয়া যাওয়ায় তাহাদের দমনার্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয় (The chronology of India by Burgess.)

জিলা ও শাসন বিভাগ—

১৮৯২ খৃঃ অব্দ হইতে লুসাই পাহাড় জিলায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। লুসাই পাহাড়ের দক্ষিণাংশ প্রথমে Bengal Government দ্বারা এবং উত্তরাংশ আসামের Chief Commissioner দ্বারা শাসিত হইত। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই দুই খণ্ড প্রদেশ আসাম গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আসে। সাধারণভাবে শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য এই জিলা "আইজাল" ও "লুংলে" এই দুই মহকুমায় বিভক্ত হইয়াছে। আইজালের শাসনভার এক্ষণে আসাম গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সুপরিণ্টেডেণ্ট উপাধিধারীর এবং লুংলের শাসনভার জনৈক পুলিস কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত আছে।

আইজাল—

আইজাল পর্ব্বতময়; ইহা সাগরতল হইতে প্রায় ৩৫০০ ফুট উচ্চে কয়েকটী সঙ্কীর্ণ শৈল-

* বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে ইংরাজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকালে Lushai Hill Tracts এর এক অংশ ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য এবং আর এক অংশ "সুকপিলাল" নামক জনৈক লুসাই সর্দ্দারের অধিকারভুক্ত ছিল। ইংরাজাধিকারে লুসাইদের নিরতিশয় উপদ্রব হইলে উহার প্রতিকারার্থ গভর্ণমেণ্ট ত্রিপুরাধিপতিকে জানান। ইহাতে তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলে ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে লুসাইদিগের গ্রামসমূহ অধিকার করিয়া পরবর্ত্তী কালে উহাদের চতুঃসীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক "Lushai Hills" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মালার উপরিভাগে অবস্থিত। লুসাইদিগকে নিরুপদ্রব রাখিবার জন্য ১৮৯০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে আইজালে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয়। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার বাজারটী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীবর্গ লইয়া গঠিত। এখান হইতে কাছাড় জিলার সদর স্থান শিলাচরের দুরত্ব ১২০ মাইল—রাস্তাটী বেশ প্রশস্ত। আইজাল হইতে লুংলে পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথটী দৈর্ঘে ১০৮ মাইল।

কলিকাতা হইতে আইজাল—

কলিকাতা হইতে আইজালে যাইতে হইলে E. B. ও A. W. Rail এ শিলচর; শীলচর হইতে দেশীয় নৌকায় ১২ দিনে 'চাংশীল' (১) নামক স্থানে যাওয়া যায়। চাংশীলে প্রতিষ্ঠিত বাজারটী এক্ষণে উন্নতিশীল। সেখান হইতে হাঁটা-রাস্তায় ১২০ মাইল যাইতে হয়। অথবা শিলচরের গোবিন্দরাম দালচাঁদ কোম্পানীর নৌকায় ৩৭৷৷০ টাকা ভাড়ায় ১২ দিনে "মাইরঙ্গ" নামক স্থানে যাওয়া যায়। সেখান হইতে হাঁটা-রাস্তায় অথবা অশ্বযানে আইজাল ১৩ মাইল পথ।

লুংলে—

এই মহকুমার আয়তন ২৫২৬ বর্গমাইল। এখানে একটী ছোট বাজার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লুংলেতে বিদেশী লোকের থাকিবার স্থানের কোন সুবিধা নাই। ১৯০১ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম এই মহকুমায় আদম সুমারীর (census).কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎকালে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ২৯, less ৪৯৮ জন এবং গ্রামের (২) সংখ্যা হইয়াছিল ১১৪টী।

কলিকাতা হইতে লুংলে—

কলিকাতা হইতে লুংলে যাইতে হইলে আর্মেনিয়ম জাহাজ-ঘাট হইতে ষ্টিমারে অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া ৭১ মাইল দূরে "রাঙ্গামাটী" নামক স্থানে আসিয়া অবতরণ করিতে হয়। কেহ কেহ চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া সেখান হইতে "রাঙ্গামাটী"তে আসিয়া থাকেন। প্রতি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম হইতে রাঙ্গামাটী ও প্রতি শনিবার রাঙ্গামাটী হইতে চট্টগ্রাম "চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটী" নামে অভিহিত গভর্ণমেণ্ট-ষ্টিমার-সার্ভিস পাওয়া যায়। রাঙ্গামাটী হইতে দেশীয় নৌকায় ৪ দিনে 'ডিমাগিরী' (৩) এবং তথা হইতে হাঁটা-রাস্তায় ৪২ মাইল দূরে "লুংলে" যাইতে হয়।

অধিবাসী—

লুসাই, কুকি, রংকুল, হমার (Hmar), পৈ (Poi), বেটী (Bete), জানসেন, টাডৈ (Tadoi). র‍্যালটি, খেড়ো, লেকার প্রভৃতি বন্য দুর্দ্দান্ত জাতিরা এই পার্ব্বত্য জেলায় বসবাস করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে লুসাইদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তন্নিম্নে কুকি ও রংকুল জাতি। ইহারা সাহসী ও বলবীর্য্যসম্পন্ন। চট্টগ্রাম সীমান্তে লুসাই জাতির যতগুলি শাখার বসবাস আছে, তন্মধ্যে থঙ্গোলরা, হৌলঙ্গ ও চাইলুগণই প্রধান। লুসাইরা ভ্রমণশীল-জাতি—কখনই একস্থানে বাস করে না। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশু-শীকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। দুর্গম পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি অথবা গহন কানন ইহাদের রম্যস্থান।

"কুকি" নামে অভিহিত সংজ্ঞা বা শব্দটীর ব্যুৎপত্তি (derivation) যাহাই হউক না কেন, Irans যে এক্ষণে "লুসাই" নামে অভিহিত জাতিদিগের ভাষা ইহা বলা সুকঠিন। কুকিদিগের কোন রাজা অথবা দলপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রেতাত্মার তুষ্টির জন্য নরবলি দেওয়া তাহাদিগের জাতির প্রথা। ইহারা অত্যন্ত পানাসক্ত; প্রধানতঃ ভাত পচাইয়া মদ্য প্রস্তুত করে। হস্তী, শূকর বিশেষতঃ কুকুরের মাংস কুকিদিগের অতি প্রিয়

---

(১) চাংশীল—শীলচর হইতে ঝালানচিরা ৬ দিন, সেখান হইতে ভৈরবীচেরা ১ দিন, তৎপরে গটুরমুর ১ দিন, তথা হইতে ছোটখেরং ১ দিন, তৎপরে কালিচিরা ১ দিন, তৎপরে হারুটানা ১ দিন, তথা হইতে চাংশীল বাজার ১ দিন।

(২) গ্রাম—"A Vilnge is called after the chief and has also a second name, the name of the hill whereon it is built. If a chief dies and the village is moved all means of identifying it on a map are lost, as both the name of the chief and the name of the hill are changed."

(৩) ডিমাগিরী—চট্টগ্রাম হইতে ডিমাগিরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা দৈর্ঘে ৯০ মাইল বিস্তৃত। চট্টগ্রাম হইতে ডিমাগিরী পর্য্যন্ত একটী টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

খাদ্য। কুকি পুরুষ ও রমণিগণকে অধিকাংশ সময় তামাক সেবনে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যাগণ বয়স্থা না হইলে সচরাচর তাহাদের বিবাহ হয় না। কুকিরমণিগণ দেশোৎপন্ন তুলা কাটিয়া কাপড় বয়ন করে। এই জাতির মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

রংকুল, বেটী, জানসেন, ভাডে নামে সাধারণতঃ কথিত জাতিদিগের উৎপত্তি-বিবরণ এখনও তমসাচ্ছন্ন। মিঃ সপিট (Soppit) বলেন, "এই চতুর্ব্বিধ বর্ণ মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ নাই, ইহা সঠিকরূপে বলা যাইতে পারে।" ইহারা "পুরাতন কুকি" ও "নূতন কুকি" নামক আধুনিক আখ্যা ব্যতীত আরও কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত। "পৈ"রা চীনদেশীয় পর্ব্বত হইতে এবং হিমারেরা মণিপুর হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে।

লুসাই পাহাড়ের সর্ব্বোত্তর ভাগে অর্থাৎ মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের মধ্যে "কোইরেয়িং" জাতির বাস। লুসাই পাহাড় জেলার অধিবাসিগণ জুম প্রথায় চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ঢাকা অঞ্চলের লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যার্থ এই জেলায় বসবাস করিতেছে।

জুম-চাষে নিরীখ—

প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যতীত জুম প্রথায় পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফসল উৎপন্ন করা একাবারে দুরূহ। এই প্রথায় চাষ আবাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র পর্ব্বতবাসী প্রজাদিগের উপর নিরীখ ধার্য্যের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলে মহামতি Capt. Lewin ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১লা জুলাই তারিখে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত পত্র (Page 17, Selections from the records of the Govt. of Bengal) লেখেন :—

"We are undoubtedly entitled either to revise or enhance the present capitation tax *Jhum tax* settlements. This has been the conclusion to which all officers have arrived who have reported on this subject; but I strongly dissuade Government from any such proceeding. The *Jhum tax* should not be regarded as a possible source of revenue to us, but on the contrary, should be regarded as an illegitimate and injurious source of revenue which by every means in our power we should endeavour to eliminate from our revenue-roll. Our objects should be to put a stop to *Jhum* culture and induce the people to settle and cultivate by the plough, making land revenue the basis of our district settlement."

উৎপন্ন দ্রব্য—

চাউল, ভূট্টা, রবার ও কচু এই জিলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই জিলার চাউল অতি উৎকৃষ্ট।

ব্যবসায় স্থান—

টিপাইমুখ, চাংশীল, সোনাই বাজার, সাইরাং ও লুসাইছাটাই। বরাকর ও টিপাইমুখ নদীদ্বয়ের সম্মিলন স্থানে টিপাইমুখ বাজার, ধবলেশ্বরী নদীর তীরে চাঙ্গশীল বাজার এবং সোনাই নদীর তীরে সোনাই বাজার অবস্থিত। প্রধানতঃ কাছাড় দেশীয় লোকেরা এই সকল বাজারে লুসাইদিগের সহিত তাহাদের দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। ১৮৭১—৭২ খৃঃ অব্দের লুসাই বিদ্রোহের পরবর্ত্তী কাল হইতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে এই সকল স্থান ক্রমশঃ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার বাজারগুলিতে লুসাইরা বিক্রয়ার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৌচুক (rubber) আনিয়া থাকে।

সৈনিক নিবাস—

আইজাল, লুংলে, সাইরাং (৪) ও চাংশীল এই চারি স্থানে সৈন্যনিবাস (Cantonment) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

থানা—

আইজাল, লুংলে, কুলশী, ডেম্বুল, ডোমাগিরী ও সাইবোং এই কয়টী স্থানে থানা (Police Station) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

———

(৪) সাইরাং—এখান হইতে আইজাল ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সাইরাং এ, একটী ডাক বাঙ্গালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ভীমপলশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা।

১। দুখের দিনেও গেয়ে যা'রে মন!
আঁধার যে দিন নামে
দখিন হাওয়া থামে
নিখিল চলে বামে
সে দিনও তুই গেয়ে যা' মোর মন!

২। যে দিন ঝঞ্ঝা বহে বেগে
ঝিলিক্ মারে মেঘে
তুফান উঠে জেগে
সে দিনও তুই গেয়ে যা' মোর মন!

৩। যদি মরণ আসে দ্বারে
ও তুই ডাকিয়া নে তারে
ওরে কাণ্ডারী তুই পারে
সে কথা কি ভুল্‌বি রে মোর মন!

৪। ও তুই প্রাণের সাথে বল্
"মোদের তিনিই সম্বল
হাসির সনে অশ্রুজল
নিত্য করেন বিশ্বে বিতরণ" ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

আস্থায়ী।

II পমা জ্ঞা -া। রা সা -া I ণ্‌া সা -া। জ্ঞা মা -পা I পা -া -া।
দু খে র্ দি নে ও গে য়ে • যা রে • ম • •

। -া -া -া I পা ণা -া। ণা ণা -া I ণা ণা -া। -া -া -া I পধা র্সা -া।
• • ন্ আঁ ধা র্ যে দিন • না মে • • • • দ খিন •

। র্সা র্সা -া I র্সা ণা -া। -ধা -পা -া I পা দা -া। দা দা -া I
হা ওয়া • থা মে • • • • নি খি ল্ চ লে •

I পা ণদা -া। -পা -মা -া I মা পা -মা। জ্ঞা রা -া I রা জ্ঞা -া।
বা মে• • • • • সে দি ন্ ও তুই • গে য়ে •

। মা মা -পা I পা -া -া। -া -া -া I -া মা মা II
যা' মো র্ ম • • • • ন্ ন্ যে দিন্
য দি
ও তুই

* অন্তরা।

II মা -মা মা। পা ণা -া I ণা -র্সা র্সা। -া -া -া I ণা ণা -া। র্সা -া র্সর্সা I
(১) ঝ ন্ ঝা ব হে • বে • গে • • • ঝি লি ক্ মা • রে
(২) ম র ণ্ আ সে • দ্বা • রে • ও তুই ডা কি • য়া • নে

* অন্তরাদ্ব একের একটু অন্য সুর হওয়ায় আলাদা দেওয়া হইল।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

I ণর্সণা -দা -া | পা -া -া I পা পা -দা | দা দা -া I পা ণদা -া | -পা -মা -া I
(১) মে ০ ০ ০ ঘে ০ ০ তু ফা ন্ উ ঠে ০ জে গে ০ ০ ০ ০ ০
(২) তা ০ ০ রে ও য়ে কা ন্ ডা রী হু ই পা রে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১ ০ ১´ ০

I মা পা -মা | জ্ঞা রা -া I রা জ্ঞা -া | মা মা -পা I পা -া -া | -া -া -া II
(১)সে দি ন্ ও তু ই গে য়ে ০ যা' মো র্ ম ০ ০ ০ ০ ন্
(২)দে ক ০ থা কি ০ ভুল্ বি ০ রে মো র্ ম ০ ০ ০ ০ ন্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

II মা মা -া | পা ণা -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I ণা ণা -দা | ণদা -া -া I
প্রা ণে র্ সা থে ০ ব ০ ০ ল্ মো দের তি নি ই স ০ ০ ম্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

I পা পা -া | -া -া -া I পা দা -া | দা দা -া I পা -া দা | ণদা -া -পমা I
ব ল্ ০ ০ ০ ০ হা সি র্ স নে ০ অ ০ শ্রু জ ০ ০ ০ ল্

১´ ০ ১´ ০ ১´

I মা -পা -মা | জ্ঞা রা -া I রা জ্ঞা -া | মা মা -পা I পা -া -া |
নি ০ ত্য ক রে ন্ বি শ্বে ০ বি ত ০ র ০ ০

০

| -া -া -া II II
০ ০ ণ্

তাই ভালো!

(৺ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

(গান)

দুখের মাঝে এমনি করে
যদি গো তুমি নাথ,
সুখের আলো জ্বালো,
আঁধার-ঘেরা নিশীথ-রাতে
যদি অকস্মাৎ
ফুটে ভোরের আলো,
তাই ভালো গো তাই ভালো!

নয়ন-জলে এমনি করে
যদি তোমার নাথ,
সুধার ধারা ঢালো,
নিদাঘ-দাহ শীতল করি
বাদল অকস্মাৎ
মুছে বিষাদ-কালো,
তাই ভালো গো তাই ভালো!

ভাস্কর রায়।

(শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ)

ভূমিকা।

বর্ত্তমান সময় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনেক বিষয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের পথপ্রদর্শক। এই বিষয়েও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সাধনশাস্ত্র বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, এবং তদনুসারে সাধনমার্গে প্রবৃত্ত হইতেন। এখন সেই অধ্যয়ন অধ্যাপনাও নাই, সাধনও নাই; আছে "ঐতিহাসিক আলোচনা"। তাহাও ছিল না, বর্ত্তমানে আরম্ভ হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের এই "ঐতিহাসিক আলোচনা" ক্রমে লোকের মনে সাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে। অন্ততঃ আমাদের পক্ষে এই কল্পনাও সুখস্বপ্ন। আর কিছু না হইলেও এই "আলোচনার" ফলে হতাদর লুপ্তপ্রায় তন্ত্রগ্রন্থগুলি ক্রমে জীবনীশক্তি লাভ করিয়া লোকলোচন সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, ইহাই পরম আশ্বস্তির কথা।

আজকাল তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। যখন তাহা পূর্ণ প্রতাপে প্রচলিত ছিল, তখন তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। তথাপি তখনও অনেক বিষয় কেবল "গুরুগম্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ইহার উল্লেখ করিয়া তান্ত্রিকগণ বলেন,—গুরুগম্য তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিভাপ্রসূত ব্যাখ্যা অনধিকারচর্চ্চায় পর্য্যবসিত হয়; তাহা যত প্রগল্‌ভতা লাভ করে, শাস্ত্রব্যাখ্যা ততই অধিক উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ—তন্ত্রশাস্ত্র "সাধনশাস্ত্র"—তাহা গুরুগম্য হইতে বাধ্য। তন্ত্রশাস্ত্র "সঙ্কেতবিদ্যা"—"সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা তন্ত্রশাস্ত্রেরই উক্তি। সুতরাং বর্ত্তমান তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে তথ্য সঙ্কলন করিবার আকাঙ্ক্ষা যতই আন্তরিক হউক না কেন, তাহা সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না। এই বিষয়ে সফলতালাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে মূলগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ টীকা-টিপ্পনীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। টীকাকারগণ গভীর জ্ঞান ও কঠোর সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া গুরুমুখশ্রুত গ্রন্থপ্রতিপাদ্য যথার্থতত্ত্ব পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান আলোচনাক্ষেত্রে টীকাকারদিগের কথার মূল্য অনেক অধিক।

তন্ত্রশাস্ত্রের যে সকল টীকাকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাঘবভট্ট এবং ভাস্কর রায় এই দুইজন বিখ্যাত মহাপুরুষ। ইহাঁদের রচিত টীকা বহু উপাদেয় তথ্যে পূর্ণ। শারদাতিলকের টীকাকার রাঘবভট্ট বাঙ্গালীসমাজে বহুপূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত। বঙ্গদেশীয়গণ ইতঃপূর্ব্বে ভাস্কর রায়ের পরিচয় পান নাই, সম্প্রতি নানা স্থান হইতে তাঁহার রচিত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে পরিচয়ের সুযোগ হইলেও সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এখনও তাঁহার নাম খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই আজ আমরা বাঙ্গালী সমাজকে সেই মহাপুরুষের পরিচয় দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভাস্কর রায় ষড়ঙ্গ বেদ, উপনিষৎ, সমস্ত দর্শনশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণ নব্যন্যায় তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে সম্যক্ অধীতী ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থের টীকা ও অনেক নিবন্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠে তদীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও বিচারক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। তিনি স্বরচিত "সেতুবন্ধ" নামক বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকার প্রথমে অধিকারভেদে ভূমিকাভেদের পারম্পর্য্য দেখাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা অতি উপাদেয় ও অন্যত্র দুর্লভ। সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়-চেষ্টা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সাধক ভিন্ন কেহ করিতে পারেন না। তিনি স্বরচিত প্রত্যেক টীকায় সাধনতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুন্দর মীমাংসাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; তাহাও অনন্যসুলভ।

অস্মৎপূর্ব্বপুরুষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস স্বরচিত "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে তান্ত্রিক দার্শনিক মতের কিঞ্চিৎ অবতারণা করি-

য়াছেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালীপ্রণীত কোন তান্ত্রিক নিবন্ধে অথবা টীকাগ্রন্থে দার্শনিক মতের সন্ধান পাওয়া যায় না। আধুনিক "প্রাণতোষণী" তন্ত্রেও দার্শনিক মতের কিঞ্চিৎ অবতারণা আছে। ইহাতে বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিকগণ বহুদিন হইতেই কেবল সাধনতত্ত্বের দিক দিয়াই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। সম্ভবতঃ দার্শনিক মতগুলি গুরুমুখে জানিয়া লইতেন। ইহার ফলে বর্ত্তমান বাঙ্গালী তান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধকগণ তন্ত্রের বিপুল দার্শনিক মতের সহিত একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভাস্কর রায়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তান্ত্রিক দর্শনের পরিচয় পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন।

এবম্ভূত মহাপুরুষ জন্মদ্বারা কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পাদস্পর্শ দ্বারা কোন্ কোন্ দেশ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, কোন্ কোন্ মহাজন তাহার পবিত্র সংসর্গে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন; ইত্যাদি বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া পরে তৎকৃত গ্রন্থসমূহের সার সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব। তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে অপ্রচলিত যে সকল গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উপসংহারে তাহাও প্রদর্শন করিব।

জীবন চরিতের উপাদান।

ভাস্কর রায়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে তিনটি উপাদান আমরা পাইয়াছি। প্রথম—তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে পরিচয়সূচক কবিতাবলী। দ্বিতীয়—তচ্ছিষ্য জগন্নাথকৃত "ভাস্কর-বিলাস" নামক গ্রন্থ। তৃতীয়—রামকৃষ্ণ কৃত "গুরুপরম্পরা-চরিত্র"।

ভাস্কর রায়কৃত "সৌভাগ্য ভাস্কর" নামক ভাষ্যসহ "ললিতা সহস্র নাম" বম্বে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত জগন্নাথকৃত "ভাস্কর-বিলাস"ও মুদ্রিত হইয়াছে। ভাস্করবিলাসে ভাস্কর রায়ের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। জগন্নাথ স্বয়ং ভাস্করের কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই ইহাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য। এই গ্রন্থের সম্পাদক বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"তদন্তেবাসিনা বিশ্বামিত্রগোত্রেণ জগন্নাথমহাশয়েন প্রণীতং ভাস্করবিলাসকাব্যং ভুবনাভোগাখ্যমেব যথোপলব্ধমত্র বিন্যস্যতে।" ইহাঁর "যথোপলব্ধং" এই উক্তি দ্বারা বোধ হয় ভাস্করবিলাসের সমগ্র পুঁথি তিনি পান নাই, যেটুকু পাইয়াছেন তাহাই মুদ্রিত করিয়াছেন। ভাস্করবিলাস পড়িয়া আমাদেরও মনে হয়—এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ নহে, পরন্তু শ্লোকগুলিও যেন ক্রমবিন্যস্ত নহে। জগন্নাথ ভাস্করবিলাসেই নিজেকে ভাস্করের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, গুরুপরম্পরাচরিত্রেও জগন্নাথ ভাস্করশিষ্য বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

গুরুপরম্পরাচরিত্র অতি বিপুল গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা রামকৃষ্ণ। গুরুপরম্পরাচরিত্র পাঠেই জানা যায়,—রামকৃষ্ণের গুরু ময়ূরেশ্বর; ময়ূরেশ্বর নিজ পিতা ও মন্ত্রদাতা গুরু চিন্তামণির নিকট আদিনাথ মহাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নিজগুরু পর্য্যন্ত ২৩০ জন গুরুর চরিত্র অবগত হইয়া নিজশিষ্য রামকৃষ্ণকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। রামকৃষ্ণ গুরুচরিত্র বিষয়ে চিন্তামণি ও ময়ূরেশ্বরের উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপ কথা অবলম্বন করিয়া "গুরুপরম্পরা-চরিত্র" নামক কাব্য রচনা করেন। ভাস্করের শিষ্য উমাপতি, উমাপতির পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য বিনায়ক, বিনায়কের পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য চিন্তামণি, চিন্তামণির পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য ময়ূরেশ্বর, ময়ূরেশ্বরের শিষ্য রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ এই গ্রন্থে ভাস্করচরিত্র অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গুরুপরম্পরা চরিত্র দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ। উত্তরার্দ্ধের ৩৫শ সর্গ হইতে ৪৩শ সর্গ পর্য্যন্ত ৯ সর্গে ভাস্করচরিত্র বর্ণিত হইতেছে। চিন্তামণি ভাস্করচরিত্র-বর্ণনার প্রারম্ভেই ময়ূরেশ্বরকে বলিতেছেন—

কালসামীপ্যতস্তেষাং কিঞ্চিদ্ বিস্তারতোঽধুনা।
কথাঃ শৃণুষ যত্রান্তে ভাস্করঃ কীর্ত্তিভাস্করঃ॥ [৩৫।৩০]

আদিগুরু ও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া ভাস্করের প্রতি ইহাঁদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই ছয়

পুরুষে ভাস্কর সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীও পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কালসামীপ্যবশতঃ সেই কিম্বদন্তীগুলি বিলয় না পাইয়া ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছিল। এই সকল কারণে ভাস্করচরিত্র এত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। গুরুপরম্পরাচরিত্র ঐতিহাসিক কাব্য,—সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। গ্রন্থকার কাব্য লিখিতে বসিয়া সত্যমিথ্যা-বিচারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই, ইহা স্বাভাবিক। হয়ত বা তিনি নিজেও কবিত্বের প্রলোভনে অতিরঞ্জন করিয়া থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় গুরুপরম্পরাচরিত্রের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা হইতে সত্য নিষ্কাষণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। ভাস্করের নিজের উক্তি ও জগন্নাথের উক্তি বিশ্বাস্য, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গুরুপরম্পরাচরিত্রের যে সকল ঘটনা ইহাদের সহিত অবিসংবাদিত, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যে সকল ঘটনায় উভয়ের বিসংবাদ আছে, সেই স্থলে গুরুপরম্পরাচরিত্রের উক্তিই মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। গুরুপরম্পরাচরিত্রের যে সকল উক্তিতে ভাস্কর অথবা জগন্নাথ নির্ব্বাক্, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। ভাস্করবিলাসে ধারাবাহিক জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হয় নাই, মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা লিখিত হইয়াছে, এবং ভাস্কররচিত গ্রন্থগুলির নাম বিবৃত হইয়াছে। গুরুপরম্পরাচরিত্রে ধারাবাহিকরূপে জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। গুরুপরম্পরাচরিত্র লিখিত জীবনচরিত পাঠে বিশেষ আমোদ পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা প্রথমতঃ গুরুপরম্পরাচরিত্রে লিখিত গল্পটি লিপিবদ্ধ করিব, পরে তাহা হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

আবির্ভাব কাল নির্ণয়।

গল্প লিখিবার পূর্ব্বে ভাস্করের আবির্ভাবকাল নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। জগন্নাথ অথবা রামকৃষ্ণ কেহই আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করেন নাই। ভাস্কর স্বয়ং বামকেশ্বরতন্ত্রের "সেতুবন্ধ" নামক টীকার শেষে, ললিতাসহস্রনামের "সৌভাগ্যভাস্কর" নামক ভাষ্যের শেষে এবং দুর্গাসপ্তশতীর [চণ্ডীর] "গুপ্তবতী" নামক টীকার শেষে গ্রন্থরচনাকালসূচক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

শ্রীবিশ্বামিত্রবংশ্যঃ শিবভজনপরো ভারতী সোমপীথী
কাশ্যাং গম্ভীররায়ো বুধমণিরভবদ্ভাস্করস্তস্য সূনুঃ।
মোদচ্ছায়ামিতায়াং শরদি শরদৃতাবাশ্বিনে কালযুক্তে
শুক্রে সৌম্যে নবম্যামতনুত ললিতানামসাহস্রভাষ্যম্॥"

[সৌভাগ্যভাস্কর]

"শ্রীবিশ্বামিত্রবংশ্যঃ শিবভজনপরো ভারতী সোমপীথী
কাশ্যাং গম্ভীররাজো বুধমণিরভবদ্ভাস্করস্তস্য সূনুঃ।
ক্ষেত্রে শ্রীসপ্তকোটীশ্বরপুরি শিবরাত্রৌ শকে শর্ম্মচাপে
নিত্যাষোড়শ্যুদন্বং পরতটগতয়ে সেতুমেতং ন্যবপ্নাৎ॥"

[সেতুবন্ধ]

"সাধুচ্ছায়াপ্রমিতপ্রমোদবর্ষে চিদম্বরে জনিতা।
সাধুচ্ছায়াপ্রমিতপ্রমোদবর্ষং চিদম্বরে তনুতাৎ॥"

(গুপ্তবতী)

এই কবিতাত্রয় দ্বারা জানা যায় যে—"মোদচ্ছায়া" পরিমিত [শরদি] বর্ষে সৌভাগ্যভাস্কর; "শর্ম্মচাপ" পরিমিত "শকে" সেতুবন্ধ; এবং "সাধুচ্ছায়া" পরিমিত প্রমোদ নামক বর্ষে গুপ্তবতী রচিত হইয়াছিল। এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলি সাধারণের অপরিচিত; এইজন্য সৌভাগ্যভাস্করের সম্পাদক বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় ভূমিকায় ভাস্কর রায়ের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া স্বসম্পাদিত গ্রন্থে সময়নির্দ্ধারক প্রমাণসত্বেও ঐতিহ্য এবং অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ভাস্কর রায় এই সকল স্থলে অক্ষর দ্বারা সংখ্যানিরূপণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। আর্য্যভট্টীয় সিদ্ধান্তে অক্ষর দ্বারা সংখ্যানির্ণয়ের এক প্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেই রীতি অবলম্বিত হয় নাই। "শিবতাণ্ডব" নামক তন্ত্রগ্রন্থে এবং "জৈমিনিসূত্র" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে আর এক প্রকার অক্ষরসংখ্যার সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনিসূত্রের টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহাকে কেরলসঙ্কেত বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শারদাতিলকের টীকায় এবং ভাস্কর রায় সেতুবন্ধ ও সৌভাগ্যভাস্করে এই সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁরা ইহাকে "বাররুচ" অর্থাৎ বররুচিকৃত সঙ্কেত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্কেতসূচক শ্লোক যথা—

"ক-ট-প-য বর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্ত্যৈরক্ষরৈরঙ্কাঃ।
নি ঞি চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতে ॥"

এই শ্লোক রাঘবভট্ট কর্ত্তৃক শারদাতিলকের টীকায়, নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃক জৈমিনিসূত্রের টীকায়, এবং ভাস্কর রায় কর্ত্তৃক সৌভাগ্যভাস্করে এবং সেতুবন্ধে [৪৪ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে। আমরা জৈমিনিসূত্র অধ্যয়ন করিবার সময়ে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও শ্লোকোক্ত সঙ্কেতের রহস্য গুরুমুখে অবগত হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যভাস্করে [২ পৃঃ] এই শ্লোক কিছু বিকৃতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; "নি ঞি চ" স্থলে "নেত্রে" পাঠ দেখা যায়, সম্পাদকের অনবধানতায় এইরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেতুবন্ধে (৪৪ পৃঃ) "মে ঞে চ শূন্যং" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এই—কবর্গ, টবর্গ, পবর্গ এবং যবর্গ হইতে সংখ্যা গ্রহণ করিবে, পিণ্ড অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে শেষের বর্ণ হইতে সংখ্যা গ্রহণ করিবে। ন ও ঞ অক্ষরে শূন্য এবং কেবল অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের সহায়ক ভিন্ন শুধু স্বরবর্ণ থাকিলে তাহাতেও শূন্য বুঝিতে হইবে। ব্যঞ্জনের সহায়ক স্বরবর্ণের কোন মূল্য নাই। এই বর্গ সম্বন্ধে আমাদের গুরুর উপদেশ—"কাদি নব, টাদি নব, পাদি পঞ্চ, যাদ্যষ্টৌ" অর্থাৎ ক হইতে ঝ পর্য্যন্ত নয় বর্ণে ক্রমে এক হইতে নয় সংখ্যা বুঝিতে হইবে, ঞ অক্ষর শূন্য। ট হইতে ধ পর্য্যন্ত নয় অক্ষরে ক্রমে এক হইতে নয় সংখ্যা এবং ন অক্ষরে শূন্য। প হইতে ম পর্য্যন্ত পাঁচ অক্ষরে ক্রমে এক হইতে পাঁচ সংখ্যা এবং য হইতে হ পর্য্যন্ত আট অক্ষরে ক্রমে এক হইতে আট পর্য্যন্ত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। অকার হইতে ঔকার পর্য্যন্ত সকল স্বরেই শূন্য বুঝিতে হইবে। ব্যঞ্জনস্থ স্বরের কোন মূল্য নাই। অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে গণ্য। এই নিয়মে প্রত্যেক অক্ষরের মূল্য নিম্নে লিখিত হইল।

ক = ১	ট = ১	প = ১	য = ১
খ = ২	ঠ = ২	ফ = ২	র = ২
গ = ৩	ড = ৩	ব = ৩	ল = ৩
ঘ = ৪	ঢ = ৪	ভ = ৪	ব = ৪
ঙ = ৫	ণ = ৫	ম = ৫	শ = ৫
চ = ৬	ত = ৬		ষ = ৬
ছ = ৭	থ = ৭		স = ৭
জ = ৮	দ = ৮		হ = ৮
ঝ = ৯	ধ = ৯		
ঞ = ০	ন = ০		

এই নিয়মে মো = ৫। দ = ৮। চ্ছা = ৭। যা = ১। "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" অতএব "মোদচ্ছায়া" এই শব্দ দ্বারা ১৭৮৫ এই সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ = ৫। র্ম্ম = ৫। চা = ৬। পে = ১। অতএব "শর্ম্মচাপে" এই শব্দ দ্বারা ১৬৫৫ সংখ্যা আনীত হইল। সা = ৭। ধু = ৯। চ্ছা = ৭। যা = ১। অতএব "সাধুচ্ছায়া" এই শব্দ দ্বারা ১৭৯৭ সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া যায়।

সেতুবন্ধ লিখিত শ্লোকে "শকে" শব্দের উল্লেখ আছে, কাজেই ১৬৫৫ শকাব্দে [১৭৩৩ খৃঃ অঃ] সেতুবন্ধ রচিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যভাস্কর ও গুপ্তবতী লিখিত শ্লোকে বর্ষবাচক "শরদ্" ও "বর্ষ" শব্দের উল্লেখ আছে। এই "শরদ্" ও "বর্ষ" শব্দদ্বারা বিক্রমসংবৎ সূচিত হইয়াছে। গুপ্তবতী শ্লোকে "প্রমোদ" নামক বর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভবাদিষষ্টিবর্ষগণনার প্রক্রিয়ায় গণনা করিলে ১৭৯৭ সংবতে প্রমোদনামক বর্ষই হয়। অতএব ১৭৮৫ সংবতে [১৬৫০ শকাব্দে, ১৭২৮ খৃঃ অঃ] সৌভাগ্যভাস্কর এবং ১৭৯৭ সংবতে [১৬৬২ শকাব্দে, ১৭৪০ খৃঃ অঃ] গুপ্তবতী রচিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভাস্কর রায়ের আবির্ভাব কাল প্রমাণিত হইল।

'রামপ্রসাদের মৃত্যু'—

প্রসঙ্গে

'বঙ্গবাণী'।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

নূতন মাসিক পত্র 'বঙ্গবাণীর' ১ম সংখ্যার ৭৮ পৃষ্ঠায় 'রামপ্রসাদের মৃত্যু' প্রবন্ধে লিখিত আছে 'ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কি ভাবে মরিয়াছেন, তাহা কি আপনারা জানেন ? কালীপূজার পর হালিসহরের গঙ্গায় কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়,—ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাংস্য বাজিয়াছিল,—উদ্দাম ভক্তিতে সেই বিগ্রহের সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদ সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই সংবাদ পড়িয়া আমি 'প্রসাদজীবনীর নূতন অপ্রকাশিত কিছু পাইলাম' এরূপ মনে করি নাই। এই কাহিনী বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতা

সকলেই জানেন। আজ পনেরো বৎসর যাবৎ আমি প্রসাদজীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতেছি। যেখানে প্রসাদের আলোচনা হয় সেখানেই বসি এবং যে কাগজ বা গ্রন্থে প্রসাদ-জীবনীর আলোচনা দেখিতে পাই তাহাই অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করি। এই ভাবে আমি প্রসাদের ভাবধারাকে পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছি। হালিশহরের গঙ্গায় শিবের গলির ঘাটে শ্যামাপূজার দিন প্রসাদ যে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন,—তাই 'বঙ্গবাণীর' প্রতিধ্বনি আমার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয় নাই এবং লেখকও ঐ সংবাদের মূল যে কি তাহা খোলাখুলি ভাবে কিছুই বলেন নাই। কাজেই এই আলোচনার বিষয়টী মামুলি বলিয়া আমি উহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার সুযোগ খুঁজি নাই।

বিগত ২৫ শে ফাল্গুন (১৩২৮ সাল) আমি কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা যাই। সেখানে ৩০ শে ফাল্গুন (মঙ্গলবার) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত হ্যারিসন রোড্ ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে সহসা দেখা হয়। দেখা হইতেই রায় বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অতুল বাবু যে। সব ভাল ত? আপনার রামপ্রসাদ ছাপার কতদূর?' উত্তরে বলিলাম, 'ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিল।' উত্তর শুনিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, 'রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দুই একটী নূতন সংবাদ আপনাকে দিতে পারি। 'বঙ্গবাণী' কাগজে রামপ্রসাদের মৃত্যুর আলোচনা দেখিয়াছেন কি?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, দেখিয়াছি। উহা যে একেবারে মামুলি,—নূতন ত কিছুই নাই।' রায় বাহাদুর বলিলেন, 'এই আলোচনার মূল আমার নিকট আছে,—উহা এক নূতন জিনিষ। প্রসাদের দানপত্রেরও খবর পাইয়াছি।' কথাটা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। প্রসাদের নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব মনে করিয়া অতি আগ্রহের সহিত রায় বাহাদুরের সঙ্গে ট্রামে চড়িয়া তাঁহার কাঁটাপুকুরের বাসায় যাই।

রায় বাহাদুর তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ খুঁজিয়া আমার হাতে 'The good old days of the Hon'ble John company from 1600—1858' বই খানার ৩০৮ পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে বলিলেন। গ্রন্থে আছে, "whilst living in retirement, Ram Prasad became acquainted with the munificent Raja Krish chandra Raya of Nadia, who was so pleased with his life and his songs, that he gave him 14 bighas of Lakhraj lands, and bestowed on him the title of Kaviranjan for having completed a poem, the Vidyasundaram, which is now lost."

"He died in 1762—it is said by jumping into the river Ganges with the image of Kali, which was thrown in after the ceremony of the puja was over. W. H. Carey.

রায় বাহাদুর বলিলেন, 'এ সংবাদ নূতন। পূর্ব্বে কেহ কখনও ইহা প্রকাশ করেন নাই।' আমি ভাবিয়াছিলাম নূতন অপ্রকাশিত কাগজপত্র দেখিতে পাইব। ইহা যে কেরী সাহেবের লেখা। এই গ্রন্থের প্রসাদকাহিনী সকলেইত জানে।

কেরী সাহেব ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে (৬৪ বৎসর পূর্ব্বে) ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ৭১ বৎসর পূর্ব্বে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় ৺হরিমোহন সেন লিখিত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' (১৭৭৩ শক) প্রবন্ধে আছে, "মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।" এই যে "ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ" তন্ত্রোক্ত ব্যাপার, তাহা রায় বাহাদুর বিশ্বাস করেন না;—তিনি বলেন ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া মৃত্যু কিছু নয়, মোট কথা প্রসাদ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া দেহত্যাগ করেন এবং এই কথা শত বৎসরের মধ্যে কেরী সাহেবই সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করেন। রায় বাহাদুরের এই অভিমত ঠিক কি না তাহাই দেখিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া প্রসাদের মৃত্যু হয়, একথা ৺হরিমোহন সেন ৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করেন। গুপ্ত কবি তাঁহার ১২৬০ সালে (৬৯ বৎসর পূর্ব্বে) প্রকাশিত প্রসাদজীবনী প্রবন্ধে সাধকের মৃত্যু যে কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি মৃত্যুর কথা লক্ষ সঙ্গীত রচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া

লিখিয়াছেন, "বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হন নাই।" এই উক্তি হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে, প্রসাদের মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছিল। নাভি গঙ্গায় দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে প্রসাদের মৃত্যু হয়, একথা সর্ব্বজনবিদিত বলিয়াই মনে হয় গুপ্ত কবি ঐ বিষয় আলোচনা করেন নাই।

ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরের সাধক ভুলুয়া সন্ন্যাসী প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হালিশহরে প্রসাদ-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। প্রসাদের পেড়ু (গানের দোহার) অতি বৃদ্ধ ভজন তখনও জীবিত ছিলেন। সন্ন্যাসী আমাকে লিখিযাছেন, "ভজন অতি বৃদ্ধ ছিলেন। আমি ব্যাসপুরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি। ব্যাসপুরের কুঠিতে তখন রাইচরণ সিংহ দেওয়ান ছিলেন। প্রসাদের খেড়ু বলিয়া তিনি ভজনকে শ্রদ্ধা করিতেন, সাহায্য করিতেন। আমি রাইচরণ বাবুর বাসায় ছিলাম।" ভুলুয়া বাবা, ভজন, জজ পণ্ডিতের কন্যা নবকুমারী দেবী, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন লোকদের নিকট প্রসাদের ইতিহাস শ্রবণ করেন। প্রসাদজীবনীর উপকরণ সংগ্রহের সময় তিনি জানিতে পারেন যে, '১১৯৪ সালে কালীমূর্ত্তি মাথায় করিয়া প্রসাদ জাহ্নবীসলিলে প্রবেশ করেন। সেই দেহ আর পাওয়া যায় না। জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়।' হালিশহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের আপামর জনসাধারণ জানেন প্রসাদের মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছিল। প্রসাদের মৃত্যুর পর হইতেই এই অদ্ভুত কাহিনী জনসমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত আছে। কেরী সাহেব ঐ জনশ্রুতি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস লিখিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরাজী গ্রন্থখানার সংবাদ কেবল জন-কোম্পানীর ইতিহাসলেখকেরাই রাখেন। রায় বাহাদুরও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ লিখিবার সময় এই গ্রন্থের খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ পড়িয়াছিলেন কি না সন্দেহ; কারণ তাহা হইলে তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রসাদী প্রসঙ্গে মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। এই ইংরাজী গ্রন্থখানার সহিত জনসাধারণের কোন কালেই পরিচয় ছিল না,—তাঁহারা প্রসাদের দেহত্যাগের বিবরণ লোকমুখেই শুনিয়া আসিতেছেন। ৺ দয়ালচন্দ্র ঘোষ ঐ বিষয়টীকে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছিলেন। তিনিও যে কেরী সাহেবের বই পড়িয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রসাদজীবনীর কথা সর্ব্বপ্রথমে গুপ্ত কবিই একটু বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন; তারপর ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ তিন বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' প্রকাশ করেন। এই সময় হইতেই (১২৯৭ সাল) প্রসাদজীবনীর অনুসন্ধান চলিতে থাকে এবং সময় সময় অনেক অপ্রকাশিত কথা বিভিন্ন গ্রন্থকার ও সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচলিত জনকথা হইতে এইভাবে প্রসাদ-জীবনী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে,—৺ হরিমোহন সেন, কেরী সাহেব, গুপ্ত কবি, ৺ দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই সাধকের জীবনীর উপকরণ লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রামাণিক দলিলাদির মূল বা নকল আজ পর্য্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কাজেই বলিতে হয়, প্রসাদের মৃত্যুর কাহিনী লোকমুখেই ছিল—উহা সেন ও কেরীসাহেব প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। ইহা যে 'অপ্রকাশিত নূতন জিনিষ' তাহা কোন মতেই বলা যায় না। রায় বাহাদুর এবিষয়ে তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কোন উল্লেখ করেন নাই, কেন যে করেন নাই তাহার একটা আভাস পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও একটী কথা আছে, প্রসাদের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কেরী সাহেব বলেন, 'তিনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন',—আর রায় বাহাদুর বলেন, '১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ...... রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।' এই যে গোলযোগ ইহা বোধ হয় রায় বাহাদুর পূর্ব্বে (১৮৯৬ খৃঃ) জানিতে পারিলে কেরী সাহেবের উক্তিই গ্রহণ করিতেন। যে সময়ে কুমিল্লায় বসিয়া রায় বাহাদুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহার বহুপূর্ব্বে কুমিল্লা শহরে ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' ছাপা হইয়াছিল। রায়বাহাদুর ইচ্ছা করিলে এই গ্রন্থ হইতে রামপ্রসাদের মৃত্যুর বিবরণ

গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি সে সময়ে এ সকল কথা অবাস্তব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না,—বর্ত্তমানেও 'ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণের' কথা বিশ্বাস করেন না—শুধু কেরী সাহেবের লিখিত প্রসাদের গঙ্গায় ঝম্প দেওয়ার কাহিনী বিশ্বাস করেন। আমাদের দেশে (কেবল আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই) এরূপ অনেক ঘটনা আছে যাহা আজিও ছাপাখানায় মুদ্রিত হয় নাই, লোকমুখে ঐ সকল কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। ঘটনাবিশেষের বিবরণ লোকমুখে বা মুদ্রিত গ্রন্থে প্রচারিত থাকে। কেরী সাহেবকে ধন্যবাদ এই যে, তিনি ইংরাজ হইয়াও প্রসাদের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি প্রসাদের মৃত্যুর এই অপূর্ব্ব কাহিনী জনকোম্পানীর ইতিহাসে মুদ্রিত না করিলেও পারিতেন। 'বঙ্গবাণীতে' প্রসাদের মৃত্যুর বিবরণ কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে,—প্রবন্ধলেখক যে ভাবে প্রশ্ন তুলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় প্রসাদের মৃত্যুতত্ত্ব বাঙ্গালী পূর্ব্বে জানিতেন কিনা সন্দেহ। প্রসাদজীবনীর এত বড় কথাটা বাঙ্গালী জানেন না এ সন্দেহ তাঁহার মনে যে কি করিয়া উঠিল তাহা ভাল বুঝা গেল না। এ তত্ত্ব বাঙ্গালী জানেন,—কেরী সাহেবের গ্রন্থে না পড়িলেও প্রাচীনদের মুখে এ কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

'রামপ্রসাদের মৃত্যুর' কথা 'বঙ্গবাণীতে' এই ভাবে লিখিলে ঠিক হইত,—'কিন্তু ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন কি ভাবে মরিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কালীপূজার পর হালিসহরের গঙ্গায় কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়,—ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাংস্য বাজিতেছিল,—উদ্দাম ভক্তিতে সেই বিগ্রহের সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদ সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।' 'কবিদের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই' এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য টমাস ওটওয়ে, কাষ্ট, হোয়াইট, কীট্‌স, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বড় বড় প্রাচীন কবিদের ভীষণ মৃত্যুর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক প্রসাদের অপূর্ব্ব মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। রায় বাহাদুর সেদিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমাকে কথাপ্রসঙ্গে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার গ্রন্থাগারে কেরী সাহেবের বইখানা আমার হাতে দিয়া বলিয়াছেন,—'এই গ্রন্থই ঐ আলোচনার মূল। প্রসাদের যে সুখে মৃত্যু হইয়াছিল তাহাই দেখাইবার জন্য প্রাচীন কবিদের ভীষণ মৃত্যুর কাহিনী তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে।'

———

৬

মনুসংহিতা ও মাতৃভাব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শাস্ত্রকার ঋষিরা অধর্ম্মকে মানবের অবনতির এবং ধর্ম্মকে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র কারণ জানিয়া, তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট আমোদ ও বিলাসিতাকে অল্পমাত্রও স্থান দেন নাই; তাঁহারা ধর্ম্মকে মূল অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সেই প্রকারে দেখিতে উপদেশও দিয়াছেন। তাই আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুকে মাতৃত্বের মহান্ বিজয়সঙ্গীত গাহিতে দেখি—

প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

মনু স্ত্রীলোককে "সন্তাননিমিত্ত পূজার্হ" প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়াই যেন কেহ ভাবেন না যে তিনি স্ত্রীলোককে সন্তানপ্রসবকারী পশু (breeding animal) বলিয়া দেখিয়াছেন।* তিনি স্ত্রীলোককে সম্মানের যোগ্য বলিয়াই সম্মান অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কল্যাণকামী আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত হয় সেই গৃহে দেবতারা আনন্দিত হয়েন এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসম্মানিত হইয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করে সে গৃহ শ্মশানসমান হইয়া উঠে।† ভাবিলেও কেমন এক আনন্দ-রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় যে, রমণীর সম্মানরক্ষা বিষয়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা আর কোন জাতিই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মনু বলিয়াছেন বটে যে স্ত্রীলোকেরা বহুকল্যাণপাত্রী এবং সম্মানার্হ; কিন্তু ইহার সঙ্গে যদি তিনি তাঁহার এ প্রকার বলিবার হেতু প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই কঠোর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন আবালবৃদ্ধবনিতা যুক্তিতর্ক অতিক্রম করিয়া একপদও নিক্ষেপ করিতে চাহেন না এমন কঠোর সময়ে সেই বৃদ্ধ মনুর কথা কে না হাসিয়া উড়াইয়া দিত? ভাগ্যবশতঃ মনু আমাদের ন্যায় "শৈশবের দল" অপেক্ষা অনেক দূরদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহার অধিকাংশ উক্তিরই হেতু প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের পরিহাসের পথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে সন্তান প্রসব করা পশুদিগের সহিত মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা যেন স্বীকার করা গেল; কিন্তু তিনিই বা ইহাতে করিবেন কি, আর আমরাই বা করিব কি?—বিধাতার সৃষ্টিই যে এইরূপ। বিধাতা পুরুষদিগকে গর্ভাধানের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তিনিই স্ত্রীলোকদিগকে গর্ভধারণের

* পাশ্চাত্য শিক্ষিত দু একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

† পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩অ,

উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।* বিধাতা পশুদিগেরও মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ করিয়াছেন এবং মানবদিগেরও মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ রাখিয়াছেন। কিন্তু বিধাতার কৃপায় মানবজাতির এই পশুসাধারণ স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকাতেও স্ত্রীলোকের হৃদয়ে যে এক বিশ্বগ্রাহী অথচ কোমলতম মাতৃভাব জাগ্রত রহিয়াছে, তাহাই অনুভব করা এবং জগতের সমক্ষে তাহাই প্রদর্শন করা—ইহাতেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুর মাহাত্ম্য। মনু এই প্রচার করিলেন যে সন্তান-প্রসবরূপ স্ত্রীলোকের পশুসাধারণ ধর্ম্ম থাকিলেও সন্তাননিমিত্তই স্ত্রীলোকেরা কল্যাণপাত্রী ও পূজার্হ এবং ইহার হেতু প্রদর্শন করিলেন যে "অপত্যের উৎপাদন, জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রত্যহ সংসারযাত্রার অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের স্ত্রীরাই প্রত্যক্ষ কারণ।" † এক কথায়, মনুর মতে যে সকল কার্য্য রমণীকে জননী ও মাতা করিয়া তুলে, সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই, অথবা আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ এবং রমণীহৃদয়ে এই মাতৃত্ব আনয়ন করিবার একটী প্রধান সহায় সন্তানলাভ। তাই মনু অপত্যোৎপাদনের কথা বলিয়া স্ত্রীলোককে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া দৈবক্রমে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানলাভ হইল না, তাঁহারা যে পূজার অযোগ্য হইবেন, একথা মনু বলেন না। প্রত্যুত তিনি সন্তানবিহীনা সাধ্বী স্ত্রীদিগকে নিরাশার গভীর অন্ধকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া আশার আলোক দেখাইয়া বলিয়াছেন—"আশৈশব ব্রহ্মচারী ঋষিদিগের ন্যায় ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রীলোকেরা অপুত্রা হইলেও স্বর্গলাভ করেন।" ‡

মনুর এই সকল উক্তি হইতে আমরা সুন্দররূপেই বুঝিতেছি যে তাঁহার মতে সন্তান হউক বা না হউক একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ। মনুসংহিতার যে যে স্থানে নারীজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যাহাতে পরিস্ফুট হয়, মহর্ষি মনু তাহার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা বিশেষরূপেই করিয়াছেন। মনুর মতে স্ত্রীলোকের সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার সহায় হওয়া আবশ্যক, তাই তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিধি প্রদান করিলেন এবং বিবাহকে ধর্ম্মমূলক করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। মানবজাতি যত অসভ্য অবস্থায় থাকে, ততই তাহারা পশুভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; তখন তাহারা উচ্চভাব ধারণ করিতে পারে না। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও আপনাদিগের মধ্যে বিবসন হইয়া থাকা দোষাবহ মনে করে না। তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী যথাসময়ে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে তাহা চরিতার্থ না করা পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করে না। অনেক অসভ্যজাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, এ বৎসর যাহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বসবাস করিল, পর বৎসর তাহাদিগের কোনই বাধ্যবাধকতা রহিল না। এইরূপ অসভ্য জাতিগণের মধ্যে পশুভাবই সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত। ইহাদিগের প্রবৃত্তির উপরে প্রাকৃতিক বাধা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাধাই কার্য্য করিতে চায় না। কিন্তু মানবজাতি যতই সভ্যতার উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে থাকে, ততই তাহারা প্রবৃত্তি দমন, বিশেষতঃ কামপ্রবৃত্তির দমন মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন তাহাদিগের হৃদয় হইতে স্ত্রীলোককে কামভাবে দৃষ্টি করা, স্ত্রীলোকের সহিত কেবল পশুর ন্যায় ব্যবহার করা, এই সকল ভাব অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে থাকে। তাহারা স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব অথবা মাতৃত্ব অল্পে অল্পে বুঝিতে থাকে এবং তাহারা ধীরে ধীরে ইহাও বুঝে যে সুনীতিসঙ্গত বিবাহই এই মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রধান সহায় এবং সুতরাং এই বিবাহকে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপে দেখা যায় যে মানবজাতি যতই সভ্যভব্য হইতে থাকে, ততই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধকে ধর্ম্মমূলক করিবার অথবা মাতৃত্বের সহায় করিবার প্রয়াস পায়। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে "স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারই দেশের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় প্রদান করে।" যে দেশের লোকেরা স্ত্রীলোককে পশুবৎ ব্যবহার করে, সেই দেশ অত্যন্ত অবনত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; যে দেশের লোকেরা romantic love প্রভৃতি কামাভাস-বশীভূত হইয়া স্ত্রীলোককে স্ত্রীমাত্র চক্ষে দৃষ্টি করে, সেই দেশ মধ্যম; এবং যে দেশ কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতে পারে, সেই দেশই উত্তম। স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দিয়াছে এবং সেই এই পবিত্র ভারতের মহর্ষি মনুই এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পথপ্রবর্ত্তক—মনুকেই আমরা এই ভাবের pioneer বলিতে পারি।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, স্ত্রীলোকের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার ও আকর মাতৃত্বই যদি বিকশিত না হইল, তবে তাহার জীবনের সার্থক্য কোথায়? মাতৃস্তনে দুগ্ধ আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতার দেহ-মন দয়া স্নেহ প্রেমে একেবারে ভরিয়া যায়। মাতার সন্তানজনিত সুখের সঙ্গে কি অন্য কোন সুখের তুলনা হইতে পারে? আবার এই সুখের উৎপত্তি কি বিবাহের পবিত্রতা নহে? কোন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন,—

"Wedded love, mysterious law, the true source of human offspring."

আমাদের ঋষিরা ইহা আরও পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া বিধাতার বিধির অনুসরণে কামজ স্ত্রীগ্রহণ এবং অকামজ বিবাহ, এই উভয় প্রকার ঘটনাকেই বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে "ধর্ম্ম ও অকামজ বিবাহই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতেই সুসন্তানের উৎপত্তি হয়।" * এইরূপে দেখি যে, ঋষিরা রমণীর মাতৃভাব যে গভীররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়া নব্যজগতের কবি ওয়াল্ট হুইটমান গাহিলেন যে "মানবজননী অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই।"

---

* প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ। ৯অ, ৯৬.

† উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং। ৯অ, ২৭

‡ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ। ৫অ, ১৬০।

* অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ। মনু ৩অ, ৪২।

নারীপ্রকৃতির এই মাতৃভাবের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ও কিরূপ পবিত্রতা সঞ্চার করে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংলণ্ড নানা বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান * ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও ইংরাজজাতির প্রভূত উন্নতিলাভ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ড জলযুদ্ধ প্রভৃতি নানা কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সেক্সপীয়রের ন্যায় মহাকবির জন্মদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এলিজাবেথ স্বয়ং সমগ্র ইংরাজজাতির অন্তরে আদর্শচরিত্র ও সৌম্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক ভীষণ অশান্তি ও দুর্নীতির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। কে নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে সাহস করিবে যে তাঁহার মন্দ প্রভাব এখনও একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে? তখনকার ইংরাজসমাজের গঠনফলে এলিজাবেথের হৃদয় নানা কারণে মথিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উৎপাদন করিয়াছিল। তদানীন্তন সমাজের দুর্নীতি তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল; তিনি স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার অতীত হইয়া সমাজকে সুগঠিত করিতে পারেন নাই। অপরদিকে বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়েও ইংলণ্ড নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে; কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, বিদ্যার সকল বিভাগেই মহারাণীর এই ষষ্টি বৎসর সুশাসনকালের মধ্যেই ইংলণ্ড কত মহারথীর জন্মদান করিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই বা ইংলণ্ডের এমন অনন্য-সাধারণ গৌরব কি? যাঁহার দিগন্তব্যাপী রাজ্যে সূর্য্যের অস্তাচলগমন দৃষ্ট হয় না, এবং যিনি ইংলণ্ডের ও তদধীন রাজ্যসমূহের অধীশ্বরী দেবী হইয়া স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; যিনি ইচ্ছা করিলে এলিজাবেথের ন্যায় দুর্নীতির পঙ্কিলস্রোত অনায়াসেই আনয়ন করিতে পারিতেন, তাঁহার পবিত্র গার্হস্থ্য জীবন এবং পবিত্র মাতৃভাবই ইংরাজজাতির—কেবল ইংরাজজাতির কেন, তাঁহার প্রজামাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী। ভারতের ঋষিরা স্ত্রীলোকের যে আদর্শচিত্র আমাদের নয়নের সম্মুখে রাখিয়াছেন, ভারতের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াও সেই আদর্শপথে চলিতে সক্ষম হইয়াছেন একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, বিশ্বাস করি। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভারতের সাম্রাজ্ঞী এবং হিন্দুসন্তানের মাতা হইবার উপযুক্ত পাত্রী, তাই ন্যায়দর্শী ভগবানের কৃপায় তাহাই হইয়াছেন। তাঁহার এই পবিত্র মাতৃভাবের প্রভাব যে বিশেষভাবে ইংরাজজাতির এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য জাতিসমূহের কতটা মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? ভারতবাসীদিগকে একটীমাত্র উদাহরণ দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা জানেন যে তাঁহার মাতার উপযুক্ত দয়াস্নেহই কঠোর স্বার্থপর ইংরাজজাতিকে সমদর্শী হইতে শিখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কতকটা বলপূর্ব্বক ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান অধিকারপত্র, আমাদের সকল অধিকারের মূল সেই রাজকীয় ঘোষণাপত্র Royal Proclamation বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংরাজদিগের উপর ইঁহার প্রভাবের কথা অধিক আর কি বলিব? এক সময়ে যুবরাজপত্নীকে বাধ্য হইয়া খঞ্জ ভাবে চলিতে হইয়াছিল, অমনি সমাজনেত্রীবোধে আত্মগর্ব্বিতা স্ত্রীলোকমাত্রেই খঞ্জভাবে চলিতে সুরু করিলেন। এই অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রমণীশ্রেষ্ঠ ভিক্টোরিয়ার মাতার উপযুক্ত পবিত্র চরিত্রের প্রভাব যে সমাজনেত্রীগণের ও উপর, যাঁহাদিগের অধিকাংশ রঙ্গপরিহাস, পরচর্চ্চা প্রভৃতি লইয়াই থাকেন, তাঁহাদিগের উপর বিস্তৃত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? প্রত্যেক অবিকৃতচিত্ত অপর সাধারণ স্ত্রীলোক যে তাঁহার পবিত্রভাবের অনুসরণ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। একবার তাঁহার কোন উচ্চপদস্থ স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী কাহারও সহিত হাস্যপরিহাস (flirtation) করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্ত্রীলোককে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি এই আদর্শ রমণীর মাতৃত্বের প্রভাবের বিষয়ে বলিয়াছেন যে "যুদ্ধের তুমুল নিনাদ যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তাহার বহুকাল পরে এবং যখন রাজনৈতিক সঙ্কটগুলি ঐতিহাসিকদিগের গবেষণার বিষয় হইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতেও ভিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের গাথা গীত হইয়া কত অগণ্য পরিবারকে নির্ভর প্রদান করিবে।" *

* বর্ত্তমানে পরলোকগত।

* "And long after all the thunder peal of noisy war has died away and the fierce agitation of political crises has become but an object of antiquarian interest, the memory of Victoria the Wife, the Mother and the Widow will continue to sustain and inspire innumerable families that are and that are yet to be,—Rev of Rev, May 1897.

গ্রন্থ-পরিচয়।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত। কলিকাতা ৫৭ নং কলেজষ্ট্রীট; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

পথে চলার একটা নেশা আছে। সেই নেশায় যাহাদের পাইয়া বসে, তাহারা সেই নেশার ঝোঁকেই চলিতে থাকে। তখন তাহাদের দৃষ্টি হইতে সুপথ-কুপথের ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়। এমন কি, অনেক সময় হয় তো প্রকৃত কুপথকেই যথার্থ সুপথ ভাবিয়া তাহারা মহা ভুল করিয়া বসে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের দশাও কতকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহারা নিজের আনন্দে নানা ভাব-ভাষা-ভঙ্গিমায় সাহিত্যকে ব্যক্ত করিতে-করিতে নব নব পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, দলে দলে লোক সেই অমৃত রসের আস্বাদনের জন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়েই সাহিত্যের নেশায় সমান বিহ্বল; অথচ পথ যে কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইতে চলিয়াছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। কেবল এক শ্রেণীর লোক—যাঁহারা সাহিত্যের অমৃতরসের

আস্বাদনে নিপুণ হইয়াও কোন দিন নেশায় বিহ্বল হইয়া পথের জ্ঞান হারান না—আজ তাঁহারাই শুধু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এই চাঞ্চল্য কিছু দিন হইতে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, কিন্তু কোন দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই; আজই প্রথম এই গ্রন্থখানিতে তাহা ব্যক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। লেখক ইহাতে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে উহার সুপথ একেবারেই নহে—সম্পূর্ণ কুপথ, ইহা সুস্পষ্টরূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন।

সাহিত্যের অনেকগুলি অবান্তর ভেদ থাকিলেও উপন্যাস বা গল্পসাহিত্যই ইহার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষার এই উপন্যাস বা গল্প-সাহিত্যের মধ্যে আজকাল দিন দিন "পরকীয়া প্রীতির" অত্যন্ত আতিশয্য ঘটিতেছে। আমাদের সমাজ-জীবনে ইহার একান্ত অসদ্ভাব থাকিলেও নবেল লিখিবার খাতিরে বিলাতী উপন্যাস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অপর্য্যাপ্ত আমদানী চলিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা আজ সাহিত্যরথের রথী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই কুসাহিত্যের বেগ নিমেষে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই আজ art for art's sake নীতির দোহাই পাড়িয়া ইহার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রক্ষক যখন ভক্ষক হইয়া দাড়ায়, তখনই অবস্থা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মানুষ মাত্রই ভ্রমশীল—তা সে যতই কেন জ্ঞানী বা গুণী হউক না। সাহিত্যের স্রষ্টা ও ভোক্তা উভয়েই আজ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তাহা যে মন্দের পথ, ইহা যদি নেশার ঝোঁকে সত্যই তাঁহারা আজ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তবে আশা করি এই পুস্তকখানি পড়িলে তাঁহাদের সে ভ্রম কাটিবে। তাঁহারা নিজেদের গতিপথের প্রকৃত মানচিত্র দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে পারিবেন।

আমরা শুধু পুস্তকখানির বিষয়গুরুত্ব এবং বর্ত্তমান কালে তাহার উপযোগিতার কথাই বলিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও পুস্তকখানির আরও অন্য সম্পদ আছে। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন ঝরঝরে ভাষায় লেখা যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। প্রসঙ্গতঃ 'কাব্য' 'আর্ট' প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিচার আলোচনা উঠিয়াছে সে গুলির অল্প কথায় ভারী সুন্দর মীমাংসা দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া তত্ত্ববোধিনীর অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের একটী নাতিদীর্ঘ সুলিখিত ভূমিকায় অলঙ্কৃত এবং সর্ব্বোপরি ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অতি পরিপাটী। আজ-কালকার গল্প-পাগল পাঠকদের এই পুস্তকখানি পড়িবার জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীসু. চ. চ.

গার্হস্থ্য সংবাদ।

উপনয়ন। বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বালিগঞ্জ ষ্টেসন রোড-নিবাসী ৺ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ স্বধানাথ ও শ্রীমান্ মৌলিনাথের শুভ উপনয়ন কার্য্য একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গৃহপ্রবেশ। বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে (৭।১ লভলকপ্লেস) প্রবেশ করিয়াছেন। গৃহপ্রবেশকার্য্য একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ। বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ২২নং লাউডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের ষষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সরসীনলিনীর সহিত কলিকাতানিবাসী পরলোকগত মহেশচন্দ্র দত্তের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ পরেশচন্দ্রের শুভ পরিণয়কার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এবং সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বিভিন্ন সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ভগবান এই নবদম্পতিকে নিত্য প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শোক-সংবাদ।

৺ কাশীচন্দ্র ঘোষাল। বিগত ১৫ জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা ১॥০ ঘটিকার সময় সাধারণ সমাজের পূর্ব্বতন প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁহার বহু আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। বিপুল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যৌবনে ইনি সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন; সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতারাও ইঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। একেশ্বরবাদের উপর অচলা ভক্তিই ইহাঁকে প্রচারকের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইনি জীবনের অধিকাংশ দিনই এই মহৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন; কেবল শেষের কয়টা বৎসর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন প্রচারকদিগের মধ্যে ইনি একজন সুগায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। বিশ্বজননী তাঁহার এই ভক্ত সন্তানটীকে আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
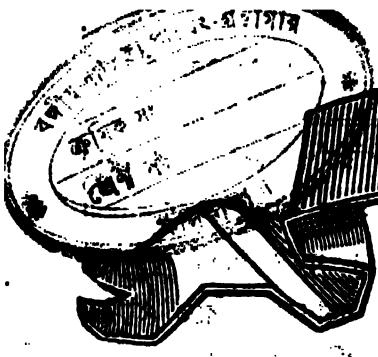
বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩

৯৪৭ সংখ্যা | ১৮৪৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্ট ও সৌন্দর্য্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের সত্যস্বরূপ ও মঙ্গলভাব মাত্রই আর্টের কেন্দ্র নহে; তাঁহার "সত্যং শিবং সুন্দরং" সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্তিই আর্টের কেন্দ্র। এইখানে একটী প্রশ্ন উঠে এই যে, আর্ট কি? আর্ট কি, তাহা সংজ্ঞা দ্বারা, পরিভাষার দ্বারা ঠিক করিয়া বুঝানো বড়ই কঠিন—বোধ হয় অসম্ভব। মিষ্ট আস্বাদ কি, সুগন্ধ কি, এ সমস্তও যেমন সংজ্ঞা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব, তেমনি পরিভাষা দ্বারাও আর্ট বুঝানো যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বলিতে কি, কোন মূল তত্ত্বই, অনুভূতির কোন বিষয়ই সত্য-সত্য পরিভাষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে কি না সন্দেহ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণন করিয়া আলোচ্য তত্ত্বের যথার্থ প্রকৃতিটা কোনরূপে বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি, কারণ তাহা দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে। ভগবদ্গীতাতেও এই প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছে দেখি। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরিভাষা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ না বলিয়া লোকের যে সকল অবস্থা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে, সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আমরাও সেইরূপ আর্টকে কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়াই বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি।

আর্ট বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদের মনের একটী অবস্থা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জার্ম্মান দার্শনিক শেলিং (Schelling) বোধ হয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, আর্টের বস্তুর মধ্যে আমরা সসীমের মধ্যে অসীমকে প্রাপ্ত হই; আমাদের অজ্ঞানতই অসীমকে উপলব্ধি করানো হইল আর্টের প্রকৃতি। আমরাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানই আর্টের কেন্দ্র; তাঁহার অন্তর্ধ্যানের অভিব্যক্তি এই সত্য-প্রকৃতিই তাহার পত্তনভূমি; তাহার মূল প্রাণ স্বাভাবিকতা, এবং তাহার মূল লক্ষ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিবিধান। কাজেই সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করাইতে না পারিলে আর্টের প্রকৃত আর্টত্ব থাকে কি না সন্দেহ।

কিন্তু আর্টের আর একটু বিশেষত্ব আছে। সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করিবার পথে, সত্যমঙ্গল ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথে, এবং জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনের পথে আর্ট আমাদিগকে সৌন্দর্য্য উপভোগের ভিতর দিয়া লইয়া যায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, তাহাদেরও কেন্দ্র সত্যমঙ্গল ভগবান, তাহাদেরও পত্তনভূমি প্রকৃতি, তাহাদেরও প্রাণ স্বাভাবিকতা, এবং তাহাদেরও লক্ষ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধন। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদিগকে

আর্ট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর ভিতর দিয়া সেই পথে লইয়া যায়; দর্শন আবার আমাদিগকে আর এক পথে সেইদিকে লইয়া চলে। কিন্তু সুনীতির কেন্দ্র যেমন সত্যমঙ্গল ভগবানের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি, ধর্ম্মের কেন্দ্র যেমন সত্যমঙ্গল ভগবানের "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" মূর্ত্তি, তেমনি আর্টের কেন্দ্র হইল সেই একই সত্যমঙ্গল ভগবানের সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্তি। তাই আর্টের বহিরঙ্গ হইল সৌন্দর্য্য। তাহার সমস্ত technique বা প্রয়োগবিজ্ঞানই এই সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সৌন্দর্য্যই হইল আর্টের দেহ। যে কোন বিষয় আমরা আর্টের দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইব, সেই বিষয় হইতেই আর্ট সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপুষ্ট করিতে অগ্রসর হয়। এই কারণে অনেক সময়ে আমরা সৌন্দর্য্যমাত্রকেই আর্টভ্রমে গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পতিত হই। প্রকৃত আর্টের মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিবিধানের মন্ত্র এবং তাহার বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য, এই উভয়ের সামঞ্জস্যমত সমাবেশ থাকা চাই।

কেবল অণুবীক্ষণের পরীক্ষার জন্য একটা গাছের পাতা রশ্মিলিখিত (photographed) করিলেই তাহা আর্টের জিনিষ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না সত্য, কিন্তু একটী সুন্দর দৃশ্য রশ্মিলিখিত হইলে তাহাকে আমরা আর্টের বস্তু বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিব না। সেই প্রকার চিত্রে যদি কেবল একরাশ ধুলোকাদা আঁকিয়া তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করাই, জানি না, সকল আর্টসমালোচকের সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত হইতে পারিব কিনা, কিন্তু আমাদের মতে তাহা নিশ্চয়ই আর্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সেই ধুলোকাদারও চিত্রে যতটা সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদের নিজের এবং সেই সঙ্গে অপরেরও বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার উন্নতিবিধানে সক্ষম হইব, এবং কাজেই জগতেরও বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার উন্নতিবিধানে সহায়তা করিতে পারিব, ততই তাহা আর্ট নামের উপযুক্ত হইবে। যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে একেবারে হুবহু ওস্তাদদিগের মুদ্রাদোষ ও মুখভঙ্গীসহ গানের ছাপ তুলিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারি, তবে তাহাকে আর্ট বলিয়া পরিগণিত করা হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই সমস্ত মুদ্রাদোষ বাদ দিয়া ওস্তাদের গানের মধ্যে যতই মাধুরী ফুটাইয়া জগতের স্বাস্থ্যসাধনে সহায়তা করিতে পারিব, ততই তাহাকে যে আর্ট বলিয়া ধরা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া দেখাইবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে তাহাকে perspective বা পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে অর্থাৎ দূর ও নিকটবর্ত্তী পরিপার্শ্বের বা পরিবেশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে অঙ্কিত করা। আর্টের সহিত মঙ্গলের সম্বন্ধ বিচার করিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছি যে, আর্টকে তাহার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনের পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তাহাকে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে দাঁড় করাইতেই হইবে। সেইরূপ আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধও আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, আর্টকে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতেই দাঁড় করাইতে হইবে। সুন্দর বা অসুন্দর, পরস্পরের তুলনাতেই উপলব্ধ হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ অনুভূতিতে আমরা পূর্ণসুন্দরের পূর্ণ-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। কাজেই আমাদিগকে অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরকে উপলব্ধি করিতে হয়। আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহার মধ্যে গুণের সঙ্গে দোষও যাহা থাকে, সে সমস্তই সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে যাহা দেখি, তাহাতে দোষ যাহা থাকে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যতই দূরবর্ত্তী দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করা যায়, ততই তাহা সুন্দর হয়, ততই তাহা সাধারণতঃ আমাদের প্রাণস্পর্শী হয়। তাহার কারণ এই যে, নিকটের ধুলোকাদা অন্তরালে থাকিয়া যায়, এবং সুন্দর দৃশ্যের সৌন্দর্য্যটুকুই আমাদের চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠে। নিকটবর্ত্তী দৃশ্যের চিত্রের মধ্যেও যে আর্ট বা কলামাধুরী প্রকাশ পাইতে পারে না তাহা নহে; কিন্তু তাহাকেও প্রাণস্পর্শী চিত্ররূপে দাঁড় করাইতে চাহিলে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে পরিপার্শ্বের সহিত যোগসম্বন্ধে তাহার মধ্য হইতেও সৌন্দর্য্য বাহির

করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—অসুন্দর বস্তুসকল যথাসম্ভব অন্তরালে সরাইয়া রাখিতে হইবে। আর্টের ভিত্তি যেমন সত্য, আর্টের অন্তরঙ্গ যেমন মঙ্গল, আর্টের বহিরঙ্গ তেমনি সৌন্দর্য্য। যে আর্টে এই তিনটী বিষয়ের একত্র সমাবেশ হইবে, সেই আর্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট বলিয়া আমাদের অন্তরে সহজেই উপলব্ধ হইবে নিঃসন্দেহ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ)

নিতেছ আমারে, ভিন্ন করিয়া
ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর
বজ্র-বেদনে জাগায়ে আমারে
ভাঙ্গায়ে মোহের ঘোর।
বঞ্চিত করি' করিয়া রিক্ত
বিরাগী করিয়া নিলে ;
দগ্ধ করিয়া বিমলিন হেমে
উজল করিয়া দিলে।
জ্বালিলে প্রদীপ দীপ্ত আলোকে
তরুণ সূর্য্য-সম
জলদ-মুক্ত উঠিনু জলিয়া—
বিগত সকল তম
আমার আড়ালে বসিয়া আমারে
রচিলে এমনি করি'—
আমার জীবনে জীবন-দেবতা
তোমার প্রকাশ মরি!
কি শব-সাধনে দিলে হে দীক্ষা
কি কাজে ডাকিলে আজি
কেন এ কম্বু অম্বুদ-নাদে
পরাণে উঠিল বাজি!
রাজ-পথে যবে জন-কোলাহল
চলেছে বিজয় রবে,
আম্রবনের নিভৃত ছায়ায়
আছিনু বসিয়া তবে ;
উদাসীন চোখে হেরেছি জগত
মুগ্ধ শিশুর প্রায়—
দেখি নাই ফিরে; বুঝি নাই কিছু
কা'রা আসে কা'রা যায়।
আনমনে বসে রৌদ্র-ছায়ায়
বাজায়েছি শুধু বাঁশী—
সহজ জীবন যাইত বহিয়া
যেন অকারণ হাসি'।
কোকিলের সাথে গাহিয়াছি গান
বাতাসে করিয়া সাথী
মাঠ হতে মাঠে সন্ধ্যা দু'পুরে
করিয়াছি মাতামাতি।
ভ্রমরের সনে গুঞ্জন করি'
করিয়াছি মধু পান
তটিনীর সাথে সুর মিলাইয়া
তুলিয়াছি কলগান।
ঢেউয়ের মতন আলোর মতন
জীবন যাইত বহি'
রহিয়া বিশ্বে আমি যেন হেথা
বিশ্বের কেহ নহি।
শুধু ক্ষণিকের এক ফোটা সুখ
একটুকু শুধু প্রীতি
একটুকু হাসি একটু আলোক
একটু কালের গীতি।
কোন্ কালে তুমি বাঁধিয়া ফেলেছ
নাড়ীর বাঁধন দিয়ে,
আর তো চলে না হেলা ফেলা আজি
বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে!
নহে ক্ষণিকের এ যে অনন্ত
অসীম জীবনে ভরা
সহসা আজিকে প্রাণের মাঝারে
প্রাণে প্রাণে দিল ধরা।
মধ্য গগনে রক্ত সূর্য্য
করিতেছে উঠি উঠি
হৃদয় কমল দীপ্ত আলোকে
করিতেছে ফুটি ফুটি ;
গন্ধ তাহার অন্ধ আবেগে
আপনা রাখিতে নারে,
ছড়াইতে চাহে নিখিল বিশ্বে
বিলাইয়া আপনারে।
কোন কালে তুমি কি বেশে আসিলে
জীবন-দেবতা মম
ভাঙ্গিল খেলানা ভেঙ্গে গেল খেলা
নিশার স্বপন সম।
দূর মাঠে কোথা ফেলে এনু বাঁশী
ভুলিনু আগের গান
সকল ছাড়িয়া মাথায় করিয়া
লইনু তোমার দান
আগুনের পথ দেখাইয়া দিলে
মরণ-ইসারা করি

রিক্ত ভাণ্ডে লইনু গরল
গরবে পূর্ণ করি
বজ্র-নিনাদে কি কহিলে মোরে
কি সাগরে দিনু ঝাঁপ
নিমেষে টুটিল জীবনের মাঝে
জীবনের অভিশাপ।

সোমেশ্বরশতক।

কন্নাড়-সাহিত্য।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

কর্ণাট প্রদেশে সোমেশ্বরশতক নামক সর্ব্বজনাদৃত কতকগুলি কবিতা আছে। গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পালকুরিক গ্রামনিবাসী পালকুরী সোম বা সোমেশ্বর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কবি ইহার রচয়িতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে সোমেশ্বরশতক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা নিম্নে সোমেশ্বরশতক হইতে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি।

কতক শিখিনু বিদ্যা, আচার্য্য সদন,
কতক শিখিনু করি' শাস্ত্র অধ্যয়ন,
কতক জানিনু করি' বস্তু দরশন,
কতক জানিনু করি' চিত্ত-সংযমন,
কতক বুঝিনু করি' সাধুসমাগম,
এই রূপে জ্ঞান-কোষ, করিনু পুরণ,
জলবিন্দু সমবেত, যথা স্রোতস্বতী,
নানা নদী মিলে পুরে, অপার জলধি।
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ১ ॥

আকাশের শোভা হয়, তরুণ তপন,
রজনীর শোভা হয়, পূর্ণিমা যখন,
সংসারের শোভা হয় বংশধরগণ,
তড়াগের শোভা হয় পদ্ম সুশোভন।
ঘৃতাহুতি দানে হয় শোভন হবন, *
রমণীর শোভা হয় সতীত্ব রতন,
নৃপতির শোভা হয়, সভায় যখন
নানা ছন্দে যশ গায় রাজকবিগণ।
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ২ ॥

প্রতিপদে চন্দ্র বটে হয় ক্ষুদ্রকায়,
সময়েতে পূর্ণ-ভাব পায় পুনরায়;
বটবীজ অণু সম যদিও বা হয়,
তাহা হতে বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ পুন উপজয়;
গাভীশিশু কালক্রমে, বৃষ গণ্য হয়;
কাঁচা ফল শোভে পক্ক পাপন সময়;
সেই মত দেবকৃপা হইলে নিশ্চয়
দরিদ্রও ধনী-শ্রেষ্ঠে পরিণত হয়।
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ৩ ॥

কি ফল মার্জ্জিলে দেহ বল নিশিদিন,
অন্তর যদি বা রহে পঙ্কেতে মলিন;
পাপ কর্ম্মে সদা রত হয়ে দুষ্টজন,
সলিলে ধুইতে পাপ পারে কি কখন?
কাক বা মহিষ করি' অঙ্গ প্রক্ষালন,
পারে কি নাশিতে তার পাশব জীবন?
কিম্বা নিম্বফল অঙ্গে মাখি' ইক্ষুরস,
হয় কি কখন বল সুমিষ্ট সুরস?
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ৪ ॥

কেবা সিঞ্চে বনরাজি বিস্তৃত ভুবন?
কার শক্তি ধরি রাখে, পর্ব্বতপ্রধান?
ক্ষিতি অপ, তেজ আর, মরুত ব্যোমন
কোন্ জন হতে করে শক্তি সঞ্চয়ন?
একমাত্র তুমি হও পালন-কারণ,
নগণ্য মানব করে তোমাতে রমণ।
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ৫ ॥

যুদ্ধ-নীতি জান, হও নায়কপ্রধান,
জগতে দেখাও তুমি, শ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান।
মন্ত্রিত্ব পাইতে যদি, থাকে হে বাসনা,
জান সর্ব্ব নীতি, ত্যজ ক্রোধের সাধনা।
যোগী মধ্যে গণ্য যদি হতে ইচ্ছা হয়,
বৈরাগ্য আশ্রয় কর, কর রিপু জয়।
হর হর হর! শ্রীকল্প সোমেশ্বর ॥ ৬ ॥

ক্ষেত্র যদি খায় বীজ, বজ্র তদুপরে,
বৃত্তি * যদি নাশে শস্য বেষ্টন ভিতরে,
দুষ্ট স্বামী রুষ্ট হয়ে অবলা তাড়য়;
রাজা যদি ত্রাসে প্রজা, যথা ইচ্ছা হয়,
ভক্ষণ করয়ে ফল বৃক্ষেতে যদিবা
মায়ে করে বিষদান সন্তানে বধিবা

---

* হোম।

* বেড়া।

প্রভু হয়ে করে যদি ভৃত্যের বিনাশ,
সেই কালে কেবা রাখে, বিনা কৃত্তিবাস ॥
হর হর হর ! শ্রীকন্ন সোমেশ্বর ॥ ৭ ॥
স্বপনে দেখিলে হ্রদ ফুল্ল-কমলিনী,
নব অঙ্কুরিত বীজ আর তরঙ্গিণী,
সুরম্য উদ্যান পুষ্পে, কিম্বা দেব-দূত,
তোতা, বৃক্ষ, শ্বেত পক্ষী, ভ্রমর, কুমুদ,
দুকূল ছানিছে নদী স্বচ্ছ নীরবাহী,
মঙ্গল লক্ষণ তাহা, কোন ভয় নাহি।
হর হর হর ! শ্রীকন্ন সোমেশ্বর ॥ ৮ ॥
মহিষ, শোণিত, ছায়া, রজত-কাঞ্চন,
যজ্ঞ পশু বধোদ্যত নিকৃষ্ট কৃপাণ,
মৃত দেহ, অঙ্গহীন, নর নব স্নাত,
লোহিত কুসুম, রক্ষ, অস্থি অবসাদ,
তৈলময় কেশ, তরু নব পল্লবিত,
অশুভ স্বপন বলি জানিবে নিশ্চিত।
হর হর হর ! শ্রীকন্ন সোমেশ্বর ॥ ৯।
প্রজার পালন করে, সে হয় নৃপতি ;
উৎকোচ না লয় যেই, সেই মন্ত্রপতি ;
পিতা মাতা সেবা-রত, ধার্ম্মিক প্রকৃত ;
পূজকের শ্রেষ্ঠ হয়, যেবা ভক্তিযুত ;
ভীতি নাই যার, বলি সৈনিক তাহারে ;
দ্বিজপতি সে-ই, যে-ই রহে সদাচারে।
হর হর হর। শ্রীকন্ন সোমেশ্বর ॥ ১০।
ধন্য সেই রাজা যিনি প্রজা হিতকারী ;
প্রজার সুখের প্রতি, সদা দৃষ্টি যাঁরি ;
দরিদ্র যাঁহার রাজ্যে, আশ্রয় কারণ,
আসে নানা দেশ হ'তে মধুমক্ষিসম ;
শস্যক্ষেত্র যার দেশে, দেয় পূর্ণ ধান ;
কৃষির উন্নতি যার, যতন প্রধান ;
সুরক্ষিত আছে প্রধান নগর যার ;
ধন-ধান্যে পূর্ণ সদা, যাহার ভাণ্ডার,
সেই রাজা হয় জেন, চিরকাল সুখী,
ভাগ্যকর্ত্তা বলি' তারে ঘোষে দীনদুঃখী।
হর হর হর ! শ্রীকন্ন সোমেশ্বর ॥ ১১।

অশ্রু-জীবন।

(৺ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

হাসিভরা তোমার ভুবন,—
তরু-লতা-ফুল ফলে, রবি-শশী-তারাদলে,
তোমারি মধুর হাসি ঝরে অতুলন !

উষা-সন্ধ্যা পায় পায়, হাসি যে ছড়ায়ে যায়,
হাসির সাগরে মাতে অটবী নির্ঝর !
অসীম গগনে আর শ্যাম তৃণে অনিবার,
হাসির লহর ভব জাগে মনোহর !
কি হাসি পাখীর গানে যে বুঝে লো সেই জানে,
হাসির চেতনা বুঝি বহে সমীরণ !
শরৎ-মাধবীরাণী হাসির প্রতিমাখানি,
হাসি-মাঝে ডুবে আছে নিখিল ভুবন !
অশ্রুমাখা শুধু এ জীবন ;—
প্রথম নয়ন মেলে, ভেসেছিনু আঁখিজলে,
সে অশ্রু জনমে আর হ'ল না মোচন !
নাহি আশা-তৃপ্তি-সুখ, দুঃখদৈন্যে ভাঙ্গা বুক,
রোগে শোকে জরাজীর্ণ তরুণ যৌবন !
না ফুরাতে মধু-নিশি অমাবৃত দশদিশি,
ফুটন্ত কুসুমে বাজ পড়েছে ভীষণ !
কোথা স্নেহ-দয়া-মায়া, সংসার দানব-ছায়া,
কোমল হৃদয় দলি' করিছে নর্ত্তন !
সুধা ভরা জলে স্থলে, একি হুতাশন জ্বলে,
অশ্রু-পারাবারে শুধু ডুবে এ জীবন !

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক

যৎকিঞ্চিৎ। *

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস গাঢ় তমসায় আবৃত। এই তিমির-জাল ভেদ করিয়া ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। যে সব কারণে সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপর একটা অনিশ্চিতের ছায়া পড়িয়াছে, তদ্ভিন্ন কতকগুলি নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণ কেবলমাত্র বিক্রমপুরের উপর ক্রিয়া করিয়া বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্বসংকলনের পথে অনতিক্রম্য বিঘ্ন আনিয়া ফেলিয়াছে।

বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রণয়নের প্রধান অন্তরায় বাঙ্গলার কোন প্রাচীন প্রামাণিক ইতিহাস নাই। আমাদের দেশে ইতিহাস প্রণয়নের প্রথা ছিলনা ; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যান্য সকল বিষয়ে উন্নত হইলেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

* সাহিত্যপরিষদের ছাত্রসভ্যের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

মুসলমান আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাস প্রণেতাগণ তৎসাময়িক রাজকীয় ঘটনাবলী তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ ইতিহাসানুরাগী ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা সম্রাটবর্গের প্রচুর সহায়তা ও পোষণলাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা প্রধানতঃ শাসনমঞ্চের চতুর্দ্দিকে নিবদ্ধ ছিল; বঙ্গদেশ শাসনকেন্দ্র হইতে দূরে হওয়ায় ইহার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড মুসলমানকরতলগত হওয়ার বহু পরেও বঙ্গদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতে শাসনদণ্ড ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ইতিহাসপ্রণেতাগণ বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আনুপূর্ব্বিক লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, বিক্ষিপ্তভাবে জনশ্রুতিমূলক দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; তাহাও অতিরঞ্জিত ও অসংলগ্ন কাহিনীতে পরিপূর্ণ। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ মুসলমানের করায়ত্ত হওয়ার এক শতাব্দী পরে পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা লোপ হইয়াছিল। পাঠানরাজত্ব সময়ে এবং মোগলরাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ব্ববঙ্গের রাজন্যবর্গ নামমাত্র কর দিয়া শাসনদণ্ড অব্যাহতভাবে পরিচালনা করিতেন। সুতরাং মুসলমানসংস্পর্শমুক্ত বিক্রমপুরসম্বন্ধে অতি অল্প কথাই মুসলমান ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

অদ্যাবধি বঙ্গদেশে যেটুকু ঐতিহাসিকতত্ত্ব সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অল্প সংখ্যক সহৃদয় ইংরেজ ভদ্রমহোদয়ের নিস্বার্থ যত্নে ও মৌলিক গবেষণায় এবং বঙ্গমাতার কয়েকজন কৃতী সন্তানের অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে হইয়াছে। তাঁহাদের এই অযাচিত কৃপায় আমরা দেশের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছি। যাঁহারা আজ বঙ্গদেশের নানারূপ ঐতিহাসিক তথ্য উৎঘাটন করিয়া দেশের এবং জাতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা প্রায় সম্যক্ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের ইতিহাসসঙ্কলনে ব্যয়িত হইতেছে; ফলে পূর্ব্ববঙ্গের এবং তৎসঙ্গে বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বিক্রমপুরে নদীর আবর্ত্তন।

উৎকীর্ণ শিলালিপি, তাম্রফলক, কুলপঞ্জী; পুরাতন ইতিবৃত্তসংশ্লিষ্ট গড় ও ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি ইতিহাসসংকলনের উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রণেতাগণ এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যে বঙ্গদেশের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে একটী নৈসর্গিক কারণ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়নের অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে। নদীবহুল পূর্ব্ববাঙ্গলায় নদীর আবর্ত্তনে বিক্রমপুরের গৌরবের চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নদীর আবর্ত্তন বিক্রমপুরের যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, এরূপ অন্য কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিক্রমপুরে কত নূতন স্থানের সৃষ্টি হইয়াছে, কত প্রাচীন স্থান কীর্ত্তিচিহ্ন সকল বুকে লইয়া অতীতের গহ্বরে বিলীন হইয়াছে। যে সব ভগ্ন অট্টালিকা, মন্দিরাদি পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের ক্ষীণ আলো আভা বিকীরণ করিত, যাহা আজ বর্ত্তমান থাকিলে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের অনেক সাহায্য করিতে পারিত, তাহা খরস্রোতা পদ্মা কিংবা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যে ভীমদর্শনা পদ্মার উদ্বেলিত তরঙ্গরাশির ভৈরবগর্জ্জনে আজ প্রাণের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তাহা পূর্ব্বে ক্ষীণভাবে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। দুই শত বৎসরের মধ্যে কত স্থান, কত প্রাচীন কীর্ত্তি যে পদ্মার করাল কবলে বিলীন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে চাঁদরায়, কেদার রায়ের কীর্ত্তিরাশি সহ শ্রীপুর ও আড়াফুলবাড়িয়া, মহারাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি সহ রাজনগর, নপাড়া-চৌধুরী বংশের বাসস্থান নপাড়া গ্রাম গ্রাস করিয়া পুরাকীর্ত্তিসংহারিণী পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। এই দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ স্থান বিক্রমপুরের বক্ষ হইতে আকর্ষণ করিয়া পদ্মা স্বীয় কুক্ষিগত করিয়াছে। চাঁদরায়ের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া রাজবাড়ীতে যে বিপুলায়তন মঠটী বর্ত্তমান আছে তাহাও নদীর এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে, ইহা শীঘ্রই বুভুক্ষু পদ্মার গর্ভভুত হইয়া ইতিহাস-

প্রসিদ্ধ রাজদ্বয়ের শেষ কীর্ত্তিরেখা বিক্রমপুর হইতে মুছিয়া ফেলিবে। মেঘনা, ধলেশ্বরী (ইছামতী) প্রভৃতি নদীগুলিও অনেক প্রাচীন স্থান কুক্ষিগত করিয়া এই আবর্ত্তনের সাহায্য করিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে ক্ষীণতোয়া পদ্মা বিশালবক্ষা হইয়াছে, অন্যদিকে ভীতিসঙ্কুল মেঘনা ও ইছামতী স্বল্পপরিসর হইয়া পড়িয়াছে। নদীর আবর্ত্তন এইরূপে প্রাচীন স্থানসমূহ কবলিত করিয়া যেরূপ প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়নের অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার ফলে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র অনেক নূতন স্থান গঠিত হইয়া ইহার প্রাচীনত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া দিতেছে। বিক্রমপুরে এইরূপ অনেক স্থান আছে, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিক্রমপুরে পোড়াগঙ্গা বলিয়া ইছামতীর একটী শাখানদীর নাম শুনা যায়; বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। পোড়াগঙ্গা নামক একটী স্বল্পপরিসর গ্রাম্য খাল, "পোড়াগঙ্গার পাড়" নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ইহার অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "সুবচনীর" নিকট ঐ খাল বর্ত্তমান আছে; উহার উত্তর ধারের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বৃক্ষাদিতে দক্ষিণধারের স্থানসমূহ হইতে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপে ঐতিহাসিক উপকরণাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিতে গেলে পদে পদে প্রতারিত হইতে হয়।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ ও যে সব প্রাচীন স্থান এই নদীর আবর্ত্তন হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহাও বিক্রমপুরবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যে স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অনেক মহাপুরুষ, অনেক কৃতী সন্তান বিক্রমপুর অলঙ্কৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ জনপদের ইতিবৃত্তসংকলন বিষয়ে বড়ই উদাসীন।

এই সব অভাব, বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণয়নের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিক্রমপুর বীর্য্য ও বিদ্যার গৌরবে সমস্ত বঙ্গদেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে বিক্রমপুরের বাঙ্গাল রাজা চাঁদ রায়, কেদার রায় অসীম শৌর্য্যবীর্য্যপ্রকাশে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই বিক্রমপুর বিক্রমপুরবাসীর ঔদাসীন্য ও দারুণ উপেক্ষা বক্ষে ধারণ করিয়া মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—অতীত গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি আজ বিক্রমপুরের ভূতগরিমার কঙ্কালরূপে সেই মহাশ্মশানের উপর বিরাজ করিয়া সমাধির অপেক্ষায় বিক্রমপুরবাসীর মুখ চাহিয়া আছে।

বিক্রমপুরের নামপ্রকরণ।

বিক্রমপুর নামটী কত প্রাচীন, ঠিক কোন্ সময় হইতে এই প্রদেশ উক্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু বিক্রমপুর যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের অক্লান্তচেষ্টা আজ বিক্রমপুরের পূর্ব্বগৌরবের জ্যোতিঃ আমাদের সমক্ষে কথঞ্চিৎ প্রতিভাত করিয়া অতীতের প্রতি আমাদিগের একটী আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতেছে, এবং নানারূপ নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে বিক্রমপুরের প্রাচীন সমৃদ্ধি আমাদের নিকট জীবন্ত সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া অতীত সম্বন্ধে নানারূপ ভৌতিক ধারণার মূলোচ্ছেদ করিতেছে। টেলার* সাহেবকৃত ঢাকার ইতিহাসে লিখিত আছে—"খৃষ্টপূর্ব্ব এক শতাব্দীতে ভুবনবিখ্যাত মহারাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া এই প্রদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি

---

* See Tayler's Topography of Dacca, p. 63.

——The celebrated Rajah Vikramaditya who flourished, it is supposed about a century before the Christian era and represented to have visited many distant parts of India and is said to have selected in the course of his travels thsough the country, an island at the confluence of the Ganges and Brahampooter, where he held his court for several years..................Of his history as it relates to this district nothing is known and indeed the only memorial of his visit to it that exists is the name of Bickrampore, which the site of his capital still retains.

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটী দ্বীপে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় কতকদিন রাজকার্য্য পরিচালনা করেন এবং স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রদেশকে 'বিক্রমপুর' নামে অভিহিত করেন।"

বোধ হয় জনশ্রুতিই এই মন্তব্যের মূল ভিত্তি। কিন্তু জনশ্রুতিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না; ইহাতে কিছু সত্য নিহিত আছে কি না তাহা আলোচনার বিষয়। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে অনেক সময় জনশ্রুতিই আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভে * (Iron Pillar) মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার দিগ্বিজয়ের আংশিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বঙ্গীয় রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া বঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা উহাতে লিখিত আছে। সেই সময় "বঙ্গ" বলিলে পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত, সুতরাং এই স্থলে পূর্ব্ববঙ্গজয়ের কথাই উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে অনুমান অসম্ভব নয় যে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে তাহার নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে সমসাময়িক ইতিহাস ইহার সমর্থন করে কি না দেখিতে হইবে। মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত † সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য বলিয়া পরিচিত। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। টেলার সাহেব যে খৃষ্টপূর্ব্ব এক শতাব্দী বলিয়া তাঁহার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক ও অমূলক। সুতরাং বিক্রমপুর যদি সত্যই মহারাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে উহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩০-৬৪৫) ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন; ঐ স্থানকে তিনি সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে বিক্রমপুর বাস্তবিকই প্রসিদ্ধি লাভ করিত তবে হিউয়েন সিয়াঙ্ দুই শতাব্দী পরে তথায় আসিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন। কিন্তু এখানে একটী প্রশ্নের উদয় হয়। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনিই ভারতবর্ষের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ভারতের গৌরব জগতময় রাষ্ট্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত ৪০ বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণা অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ইহা স্থির হইয়াছে যে "বিক্রমাদিত্য" উপনামবিশেষ, কাহারও প্রধান নাম নহে; এবং এই খ্যাতিযুক্ত একাধিক নৃপতি ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী মহারাজা বিক্রমাদিত্য, সেই বিষয়ে পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত হরনেল সাহেব সম্রাট্ যশোবর্দ্ধনকে * উপাখ্যানপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য বলিয়া নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যদি এই যশোবর্দ্ধন গুপ্তই বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার নামানুসারে বিক্রমপুরের নামকরণ হইতে পারে। তাহা হইলে হিউয়েন সিয়াঙ্ যে সপ্তম শতাব্দীতে বিক্রমপুরের নাম উল্লেখ করিয়া যান নাই, তাহা এই জনশ্রুতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইতে পারে না।

---

* See V. A. Smith's Early History of India, p. 254.

——"Our knowledge of his campaign in Bengal is confined to the assertion made in the elegant poetical inscription on the celebrated Pillar of Delhi that "when warring in the Vanga countries, he breasted and destroyed the confederate against him."—

† Good reasons can be adduced for the belief that Chandra Gupta II Vikramaditya who reigned at the close of the fourth century and the beginning of the 5th century and conquered Ujjain should be regarded as the original of the Raja Bikram of Ujjain in popular legend, at whose court the nine gems of sanskrit literature are supposed to have flourished. See V. A. Smith's Eralyi History of India p. 266.

* See J. R. A. S.—1909.

পক্ষান্তরে চন্দ্রগুপ্তের পরে বিক্রমাদিত্য-খ্যাতিযুক্ত অন্য কোন নৃপতি পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়া তাঁহার নামানুসারে বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

"বিক্রমপুর" নামটী বিক্রমাদিত্য হইতে উদ্ভূত হউক আর না হউক ইহা যে অর্থবহ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এই নামটী বিক্রমপুর নামধেয় কোন পরাক্রান্ত নৃপতির নাম হইতে উৎপন্ন হওয়াই খুব সম্ভব। অথবা বর্ত্তমান ইতিহাসে কোন নৃপতির নামের সঙ্গে "পুর" যোগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরীর নামকরণের প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাই। রাজা সীতারাম হইতে "সীতারামপুর", রাজা কেদার রায় হইতে "কেদারপুর" ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এইত গেল জনশ্রুতির কথা। ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী বিপ্রকুলকল্পলতায় বিক্রমপুরের নামকরণ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নিভুজস্য পূর্ব্ববংশান্ নানাগুণসমন্বিতান্।
সদ্বৈদ্যকুলসম্ভূতান্ অবেহি গদতো মম॥
দাক্ষিণাত্যবৈদ্যরাজশ্চৈকস্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনঃ ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।
তস্য পুত্রঃ শুকদেবসেনঃ খ্যাতো গুণোৎকর॥
তৎপুত্র নিভুজসেনঃ শত্রুপক্ষবিমর্দ্দনঃ!
আদিশূরস্য তনয়াং স এব পরিণীতবান্॥"

উপরোদ্ধৃত শ্লোকাবলীতে বলা হইয়াছে, দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত পরমধার্ম্মিক বৈদ্যরাজ বিক্রমসেন তাঁহার নামানুসারে "বিক্রমপুর" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের কোন প্রমাণিকতা আছে কিনা তাহা সুধীবর্গ বিচার করিবেন। তবে ইতিহাসবর্জ্জিত আমাদের দেশে প্রস্তর ও তাম্র-ফলক এবং কুলপঞ্জিকারূপ ক্ষুদ্র জ্যোতিরিঙ্গণের ক্ষীণালোক সাহায্যে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারি; এবং ইহাদের মূল্যবান সাহায্য উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং এই গ্রন্থের উক্তি অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং বিক্রমসেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইহার যদি কিছু সত্যতা থাকে তবে তাঁহার সময় নির্দ্দেশ করা দরকার। উল্লিখিত শ্লোকাবলীতে লিখিত হইয়াছে বিক্রমসেনের পৌত্র শুকদেব সেনের পুত্র পরাক্রমশালী নিভুজ সেন মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। আদিশূরের সময় সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ আছে তাহা সত্বেও আমরা বিক্রমসেনকে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী লোক বলিয়া অনুমান করিতে পারি। কুলপঞ্জিকায় আস্থা স্থাপন করিলে সেই সময় হইতেই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল বলিতে হইবে।

কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে "পুর" শব্দ যোগ করিয়া সাধারণতঃ কোন নগরীর নাম রাখা হইয়া থাকে; ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু "বিক্রমপুর" সম্বন্ধে আমরা এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখিয়া থাকি। বিক্রমপুর একটী সুবৃহৎ জনপদ; ইহার প্রতিষ্ঠাতা যে স্বীয় নামে এই বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ডের নামকরণ করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বিক্রমপুর নামে "নগরী" প্রতিষ্ঠিত হওয়াই খুব সম্ভব। ইতিহাসের ঘটনাবলী দৃষ্টে অনুমিত হয় যে বিজয়ী রাজা প্রথম অধিকৃত নগরীকে স্বীয় নামে অভিহিত করিয়াছিলেন; পরিশেষে তাঁহার বংশধরগণ এই নগরী হইতে যে যে স্থানের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, সে সমস্ত প্রদেশ বিক্রমপুর আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ইহাই খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; "নগরীর" নাম হইতে "প্রদেশের" নাম হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পূর্ব্ববঙ্গে আমরা "ইদিলপুর" নামক গ্রাম হইতে ইদিলপুর পরগণার নাম লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং "বিক্রমপুর" নগরীর নাম হইতে বিক্রমপুর পরগণার নাম হওয়া বিচিত্র নয়। ইউরোপেও এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে "প্রধান নগরীর" নাম হইতে অনেক "সায়রের" নাম উদ্ভূত হইয়াছে; যেমন "ডারহাম" হইতে "ডারহামসায়ার," ওয়ারউইক হইতে "ওয়ার উইক সায়ার" ইত্যাদি। সেইরূপ "রোমের" নাম হইতে রোমনগরী চতুপার্শ্বস্থ যে সব স্থানের উপর প্রভুত্ব পরিচালনা করিত তাহা রোমান রাজ্য নামে অভিহিত হইত। এইসব উদাহরণ আমাদের মন্তব্যের সমর্থক।

মূলের সন্ধান।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বাহিরে মিশ্রিত পদার্থ, অন্তরে মিশ্রিত ভাব লইয়াই আমাদের নড়া-চাড়া। কিন্তু তাই বলিয়া মিশ্রিত পদার্থ এবং মিশ্রিত ভাব ও চিন্তা লইয়া মানুষ স্থির থাকে না। সে তাহার উপাদানগুলি নিরাকরণ করিবার জন্য বিব্রত। জড় জগতে এই মিশ্রিত পদার্থ এবং অন্তরে মিশ্রিত ভাবগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এত বিভিন্ন বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে, যে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। যাহা আমাদের নিকটে জল বলিয়া পরিচিত, পদার্থবিদের নিকটে তাহা নিরবচ্ছিন্ন জল নহে, কিন্তু উহা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমষ্টি; পদার্থবিদ্ তাহা পরীক্ষাগারে দেখাইয়া দেন। আমরা রসায়ন-প্রক্রিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যাই। সাধারণ মনুষ্য বলিতে পারেন যে জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিব, উহার ভিতরে কি কি মূল উপাদান আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ বলিবেন জল পান করিবে, তাহার মূল উপাদান চিনিবে না; এরূপ নিশ্চেষ্টতা, জ্ঞানের অবমাননা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। ক্ষুদ্র শিশুর সম্মুখে একখানি দর্পণ ধর, সে দর্পণের ভিতরের প্রতিবিম্ব, আর একটী ক্ষুদ্র শিশুমূর্ত্তি, দেখিয়া নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবে, প্রতিবিম্বিত শিশুকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিবে; যখন তাহাকে ধরিতে না পারিবে, দর্পণখানি উল্টাইয়া দেখিবে কোথায় সেই শিশু। এই যে অনুসন্ধিৎসা, যাহা বালকের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা যদি বয়োবৃদ্ধকে স্পর্শ না করে, তাহার তত্ত্বনিরূপণের ভাবকে জাগ্রত করিয়া না তোলে, তবে সেই নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-জীবন যে সত্য সত্যই বিফল, তাহা বুঝিতে বড় বিলম্ব থাকে না।

এই অনুসন্ধান চেষ্টাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলে। মানুষ মূল খুঁজিতে চায়। জড়-জগতের ভিতরে মূলের অনুসন্ধান চলিতেছে, মনোরাজ্যে ভাবপরম্পরার ভিতরে মূলের অনুসন্ধান চলিতেছে, ধর্ম্মজগতের বিশ্বাস ও ধারণার ভিতরে মূলের অনুসন্ধান যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। দিবারাত্রি, জ্যোৎস্না-অন্ধকার, গ্রহণ-উল্কাপাতের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া জ্যোতির্বিদ্যা ও খগোলের উৎপত্তি। যে মৃত্তিকার উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি। পরিদৃশ্যমান জড়পদার্থনিচয়ের মূল উপাদান অনুসন্ধান করিতে গিয়া রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তি। চর্ম্মাবৃত দেহের মূলে যে কঙ্কালরাজি শিরা উপশিরা রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া শারীরতত্ত্বের উৎপত্তি। রোগের মূলে যে কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার নিরূপণ ও প্রশমনের চেষ্টায় নিদান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি। মানুষ যে ভাব চিন্তা বিশ্বাস বা ধারণা লইয়া বা ইচ্ছা লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া মনস্তত্ত্বের উৎপত্তি। দয়া-ধর্ম্ম, প্রেম-করুণা, দায়িত্বভাবের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের উৎপত্তি।

কালের প্রবাহ দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। সেই অলক্ষ্য কালের গাত্রেও দাগ পাড়িবার জন্য মানুষের আকুল চেষ্টা। মানুষ কালের মূলকে, অন্য কথায় অতীতকে খুঁজিতে চায়। বিভিন্ন দেশ-কালকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে ইতিহাসের রজ্জু দিয়া বাঁধিতে চায়। কোথায় কোন্ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কোথায় কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, পিতৃপুরুষ কোথায় কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, মানুষ তাহার মূল খুঁজিতে গিয়া অতি-প্রাচীনে গিয়া পৌঁছায়। অনুসন্ধিৎসা তাহাকে পাগল করিয়া তোলে; বর্ত্তমান তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; সে অতীতে ডুব দিতে চায়। কোথায় কোন্ শিলাখণ্ড বা ধাতুফলক অজানিত অক্ষর বক্ষে ধারণ করিয়া পাষাণী অহল্যার মত প্রত্নতত্ত্ববিদের কোমল স্পর্শলাভে উদ্ধার পাইবার জন্য কালের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহাকে মুক্তি দিয়া অতীতের কাহিনী, বহুপ্রাচীনের মূল মর্ম্মকথা, বিবৃত করিবার জন্য মানুষ ক্ষিপ্তপ্রায়। কোথায় কোন্ মুদ্রা কোন্ রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের অন্তরালে থাকিয়া সেই বিস্মৃত রাজবংশের সাক্ষ্য-দান করিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিয়াছে, তাহা

সাধারণ মানুষের নিকট নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু হইলেও উহা প্রত্নবিদের নিকটে অমূল্য কোহিনুর। তাই বলিতেছিলাম যে মূলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

বর্ত্তমানে শিক্ষিতমণ্ডলী যে ভাবপরম্পরা বা সমুচ্চ চিন্তা লইয়া অবস্থান করিতেছেন, বা যে উদারতা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, যে শিক্ষা বা দীক্ষা লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও যৌগিক; উহার ভিতরে মৌলিকতার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। আমরা যদি বিশ্লেষণ করিতে চাই, দেখিতে পাইব, নব্য বঙ্গের প্রতি শিক্ষিত মনুষ্যের ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষার মূলে, প্রাচীন ভাব ও সংস্কার ত আছেই, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ত আছে, তাহার উপরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের, কবি নবীন ও হেমচন্দ্রের, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণের প্রবর্ত্তিত ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত রহিয়াছে। নদীতে প্রবল বন্যা আসিয়া যেমন উভয় কূল প্লাবিত করিয়া পশ্চাতে পলি মাটীর একটী স্তর রাখিয়া যায়, তেমনি যাঁহারা অসীম প্রতিভাসম্পন্ন, তাঁহারা সংসারে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের ভাবের বা কবিত্বের তরঙ্গে চারিদিক প্লাবিত করিয়া তোলেন, এবং শিক্ষিতমণ্ডলীর মনোরাজ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস আনিয়া দিয়া জ্ঞানের ও ভাবের যে স্তর রাখিয়া যান, তাহাতে হৃদয় ও মন উভয়ই বিগঠিত ও বিপুল হইয়া উঠিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বিবিধ সংস্কার শিক্ষা ও ভাবের যৌগিক মিলনই আজকালকার দিনের শিক্ষিত মণ্ডলীর অন্তরের ছবি।

আমাদের অন্তরে ভাবে ও চিন্তায় যাহা যৌগিক মিশ্রণ, তাহার মূল তাঁহাদের ভিতরে, যাঁহাদের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত। মৌলিক সুন্দর উপাদান যাঁহারা আনিয়া দেন, তাঁহারা সত্য সত্যই চক্ষুষ্মান্। একভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা ঋষি, "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ। বৈদিক ও পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্য সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই ঋষি। তাঁহারা যে সত্য দেখিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র নিজের ভোগের জন্য নহে, কিন্তু ভোগ ও পরিবেশন উভয়েরই জন্য। রামমোহন রায় দেশের কল্যাণ ভাবিয়া অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা-প্রভাবে সত্য নিজের দিব্য চক্ষুতে দর্শন করিয়াছিলেন, প্রচারেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশীয় নিজস্ব সাহিত্য ও কাব্যের যে একটি বিশেষ আবশ্যকতা আছে, গত শতাব্দীতে তাহা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এবং জীবিতগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে গাঢ়-রূপে দর্শন করিয়াছেন, এবং আপনাদের সমস্ত আয়াস তাহার কল্পে নিয়োগ করিয়াছেন। তাই একভাবে তাঁহারাও ঋষি।

রসায়নবিদ্যার দুইটি দিক আছে। তাহার এক শাখা পদার্থনিচয় analyse বা বিশ্লেষণ করিতে চায়, আর একটি শাখা মূল উপাদান লইয়া গঠন করিতে চায়। প্রথম শাখাকে analytic বা বিশ্লেষণাত্মক রসায়নশাস্ত্র, এবং দ্বিতীয়টিকে synthetic বা গঠনাত্মক রসায়ন শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। যেমন জল বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহার ভিতরে অম্লজান ও উদজান বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি গঠনের দিক দিয়া অম্লজান ও উদজান লইয়া তাড়িত প্রয়োগে জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই গঠনাত্মক রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে আমাদের দেশে বহু পূর্ব্ব হইতে বিবিধ ধাতু ও বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ভৈষজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জগতে ইহারই প্রভাবে অত্যদ্ভুত মিশ্র পদার্থের আবিষ্কার দিন দিন ঘটিতেছে।

আজকাল অনেকেরই গৃহে পুস্তকের সমাবেশ আছে, কিন্তু আমরা পাঠাগারকে এবং গ্রন্থ-রাজিকে যেরূপ উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করি; উহা যে মূলের অনুসন্ধানের সহায়, তাহা স্থিরচিত্তে আলোচনা করি না। রসায়ন-শাস্ত্রবিদের নিকটে তাঁহার laboratory, অর্থাৎ পরীক্ষাগার বহু আদরের এবং সম্মানের সামগ্রী; সেখানে বিবিধ মূল পদার্থ আবিষ্কৃত ও বিবিধ যৌগিক পদার্থ রচিত হইয়া সংসারের কল্যাণ-সাধন করে; রসায়নবিদের কর্ম্মশালার মত নিজ নিজ ক্ষুদ্র পাঠাগারকে ও সৎগ্রন্থরাজিকে পবিত্রতার প্রস্রবণ, সৎভাবের উৎস, জ্ঞানের নির্ঝর, চরিত্রগঠনের কর্ম্মশালা, রাজভক্তির উন্মেষক্ষেত্র,

ভাবুকের এবং চিন্তাশীলের laboratory, বিবিধ সুভাব এবং সুচিন্তার উন্মেষ মিলন ও মিশ্রণ-ক্ষেত্র বলিয়া যদি চিনিয়া লইতে না পারি, তবে বৃথা পুস্তকসংগ্রহ এবং পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা। জনসমাজ গঠনের মূল মন্ত্র মিলন ও সদ্ভাব। সাধুসঙ্গে সুপণ্ডিতের সহবাসে ভাবের আদান-প্রদানে অন্তর্দেশকে মৌলিক ও সুন্দর গঠিত ও বিপুল করিয়া তুলিতে হইবে, বিবিধ পুস্তক হইতে সত্যরাজি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে, বহুদর্শিতা লাভ করিয়া জীবনের গন্তব্য পথ সুগম করিয়া ফেলিতে হইবে, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় ঊর্দ্ধে উঠিবার সামার্থ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সাধনে জীবনকে ধন্য করিতে হইবে; এবং সৎগ্রন্থ পাঠকে তাহার বিশেষ উপায়ীভূত জানিয়া উহাতে নিযুক্ত হইতে হইবে। কি রাজনৈতিক ব্যাপারে কি জ্ঞানরাজ্যে কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যখনই কোন দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ উপস্থিত হইবে, উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া উহার মূলতত্ত্বের দিকে আপনার দৃষ্টিকে ধীরভাবে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, তবেই ভাস্বর চিরন্তন সত্য অচিরে অন্তরে জাগিয়া উঠিবে এবং উহাকে ধারণ ও বরণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে হইবে। এবং বিশ্লেষণ প্রভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মূল উপাদান গুলি নিরাকরণ করিয়া তাহার যৌগিক প্রভাবে মানবজীবন বিগঠিত করিয়া ধরণীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই রূপেই দেবত্বলাভ করিবার অধিকার সম্ভোগ করিতে হইবে।

রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট মাতৃত্বের অঙ্গে যাহাতে লেশমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ না করে তজ্জন্য মনুপ্রমুখ ঋষিরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। ঋষিদিগের কৃপাতেই ভারতবাসীরা সতীত্বের এতদূর মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনু স্ত্রী-জাতিকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার জন্য এই একটী ব্যবস্থা ছাড়া ঋষিরা আরও অনেকগুলি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। পাছে মাতা, ভগিনী বা কন্যা প্রভৃতির মনেতেও আমাদের মাতৃত্ব বিন্দুমাত্রে কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, অথবা পুরুষের অন্তরে বিন্দুমাত্রও কামভাব জাগরূক হইয়া মাতৃত্ববিষয়ে তাহাদের এতটুকুও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, এই কারণে ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, পরস্ত্রী ত দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত পর্য্যন্ত নির্জ্জনে একত্র অবস্থিতি করিবে না * কারণ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিপথগামী করে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ইন্দ্রিয়দমন বড় সহজ কার্য্য নহে, তখন ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনামাত্র রাখিয়া কাজ কি? ঋষিদিগের এই কথাতে অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন; ঋষিরা মানবপ্রকৃতি ভালরূপ বুঝিয়াছেন কি না, অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি তুরস্কের পূর্ব্বতন কোন প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আলি পাশার অথবা রোমের পূর্ব্বতন পোপবংশ বর্জিয়াদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। ঋষিরা একদিকে যেমন মানবপ্রকৃতির দেবত্ব দেখিয়াছিলেন, তেমনি তাহার পশুত্বও দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের এই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, যাহাতে দেবপ্রকৃতি মানবেরা পশুপ্রকৃতি লাভ না করে এবং পশুপ্রকৃতি মানবেরা যাহাতে দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিদান ব্রহ্মচর্য্যের পথে এতটুকুও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। এই কারণেই যুবক ব্রহ্মচারী গুরুপত্নীকে মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিতে আদিষ্ট হইলেও, গুরুপত্নী যুবতী হইলে ঋষিরা যুবক ব্রহ্মচারীকে তাঁহার তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি দূরে থাকু, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতেও বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন। ঋষিদিগের মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি এবং তাঁহাদিগকে শতবার নমস্কার করিতেছি। বুড়া pessimist অনর্থদর্শী ঋষিরা এ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তোমরা বলিবে—ও কথা অগ্রাহ্য অর্থাৎ যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলে কোন হানি নাই; অনেকে এ কথাও কানাকানি করিতে ছাড়িবেন না যে বুড়া ঋষিদিগের মন দুর্ব্বল ছিল, তাই তাঁহারা আত্মবৎ জগৎ দৃষ্টি করিয়া বিধিনিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ বলিতে সাহস করেন, তাঁহাদের সমুখে ঋষিদিগের কথার সমর্থনরূপে পাশ্চাত্য কোন ব্যক্তির উক্তি Hall mark ধারণ করিতে চাই।

---

* মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ মনু ২অ, ২১৫।

মানবচরিত্রের বিশেষ অভিজ্ঞ সুবিখ্যাত Max O'rellএর * সমর্থনে ঋষিদিগের কথা যখন সত্য বলিয়া বুঝিতেছি বলিব, তখন বোধ হয় এই সকল জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি আর অধিক তর্ক করিবেন না। Max O'rell বেশ একটু রসিকতার সহিত বলিতেছেন—"সহপ্রতিবাদী অধিকাংশ স্থলেই যুবক সহিস, উহা সংবাদপত্রে দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রতিবাদীর সূত্রপাত কণ্টকে। উহা জঙ্ঘাবন্ধ হইতে অধিক দূর নহে; পথও ভারি লোভনীয়—কি বল?" † আরও, স্ত্রীলোক মাত্রের, এমন কি মাতারও সহিত যুবাপুরুষের সর্ব্বদা আদর আবদার চলিতে থাকিলে যে যুবকদিগের নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা আছে, তাহা আমরা স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত Max O'rellএর স্বজাতি সম্বন্ধীয় উক্তিতেই প্রমাণ পাইতেছি। তিনি বলেন, "ফ্রান্সে মাতা আমাদের কোমলতম আদর অধিকার করেন।" কিন্তু এই কারণে ফরাসি জাতি যে কিছু নির্বীর্য্য তাহাও তিনি স্বীকার করেন,—"ফরাসি যুবক অধিকতর নির্বীর্য্য।" আমরা স্বীকার করিতেছি যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে মনু প্রভৃতির উপদেশ অনুসরণ করিলে ভারতের ত্রিসীমানায় পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদনৃত্য প্রবেশ করিতে পারিবে না; আর বিদ্যালয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকেও একত্র অধ্যয়ন অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, এবং ভারতের কি বীর্য্য, কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েই উন্নতির আর সীমা থাকিবে না।

এই নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের মধ্যবিন্দু যে পতিসেবা, তাহা এই ভারতভূমিতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইখানেই তাহা সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই মনুপ্রমুখ ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সাধ্বী স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদিও নাই। ‡ স্বামী যে প্রকারই হউক না কেন, তাঁহাকে স্ত্রীর দেববৎ সেবা করা কর্ত্তব্য, মনুর এই উক্তি শুনিয়া হয়তো অনেকেই মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশার গভীর স্রোতে চিরজন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয় একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর অনুশাসন করিলেন বটে যে অতি নিন্দিত স্বামী তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে দেবতাস্বরূপ, কিন্তু অন্যদিকে অনুশাসন করিলেন যে কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহাও ভাল কিন্তু কদাপি বিদ্যাদিগুণরহিত পুরুষকে কন্যাদান করিবে না। * মনু এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির আবাসভূমিকে গভীর শান্তির আস্পদ হইবার যোগ্য করিয়াছেন।

মনুপ্রমুখ ঋষিরা এই পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপর দাঁড়াইয়া যেমন পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতিকে পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মে মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ পতি প্রবাসে যাইলে স্ত্রীজাতিকে অধিকতর সংযত হইয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিদেশে যাইলে, ক্রীড়া, শরীরসংস্কার (অর্থাৎ শরীরসজ্জাবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান), সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস এবং পরগৃহে গমন, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। † স্বামী বিদেশে গমন করিলে সাধ্বী স্ত্রীর যেরূপ মনের ভাব হইতে পারে বা হওয়া উচিত এবং তদনুসারে তাঁহার যে সকল কার্য্য করা সম্ভব, শাস্ত্রকারেরা তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের হয়তো ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, সাধ্বী স্ত্রীর বহিরঙ্গও সাধন করিতে থাকিলে সকল স্ত্রীলোকেরই অন্ততঃ কতকটাও মানসিক সুপরিবর্ত্তন ঘটিবেই।

স্বামীর প্রবাসকালে সতীর যে সকল কর্ত্তব্য, ঋষিরা তাহার যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ বিধবা হইলেও যে তাঁহাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর্ত্তব্য তাহাও বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীত্ব যাহাতে নির্ব্বিরোধে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য ঋষিরা স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও নিষেধ করিয়াছেন। পাছে স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম দুষ্প্রসঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয়, এই কারণে ঋষিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষক, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। ‡ বর্ত্তমানকালের সভ্য স্ত্রীলোকদিগের এই কথা একটুও ভাল লাগিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। স্বাতন্ত্র্য দিয়া তাহাদিগকে নির্ভরশূন্য করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে কি আর তাহাদিগের সেই কোমলতা, সেই শীলতা রক্ষা পাইতে পারে? তখন তাহারাও যেমন পুরুষদিগকে কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মনুষ্য চক্ষে দেখিবে, তেমনি পুরুষেরাও তাহাদিগকে কেবলমাত্র মনুষ্যচক্ষেই দেখিবে সুতরাং প্রকৃত সম্মান দিতে সঙ্কুচিত হইবে। যদি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়, তাহা হইলে ইহা কি অনেকটা নিশ্চয় নহে যে, এই জীবনসংগ্রামে পড়িয়া হয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ এবং সুতরাং ক্রমশ তাহাদের শারীরিক গঠনও পুরুষোচিত চোয়াড়ে হইয়া উঠিবে অথবা তাহাদের ক্রমশ ধ্বংসসাধন হইবে? আমি

---

* শ্রীমতী মোনাকেয়ার্ডও যাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

† "The co-respondent is not unfreqently a young groom, as one may see by the newspapers. This sample of co-respondent begins at the spur. It is not very far to the garter; the path is very attractive, *que voulez vous ?* John Bull and His Island.

‡ বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। মনু

* কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। মনু

† ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ অ, ৮৮

‡ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। মনু ৯ অ,

জিজ্ঞাসা করি যে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ কি আছেন যিনি এই দুইটীর মধ্যে একটীও প্রার্থনা করেন? আশা করি, নাই। যেমন আমরা ভিড়ের মধ্যে গিয়া যদি দেখি যে তথায় দৈবাৎ এক স্ত্রীলোক রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কত সতর্ক হই যাহাতে তাহার শরীরে ও শ্লীলতায় এতটুকু আঘাত না লাগে এবং তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবার কত না বিশেষ চেষ্টা পাই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার শরীরে ও শ্লীলতায় আঘাত করিতে অতি অল্প পুরুষেই কুণ্ঠিত হইবে। এইরূপে ক্রমে তাহাদের মাতৃত্বে অথবা সতীত্বে আঘাত পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। ঋষিরা যে নারীজাতির জন্য এত অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে রমণীর সতীত্বের পথ যেমন অতি সুফলপ্রসূ, কিন্তু সেইরূপ এই প্রলোভন প্রভৃতির কণ্টকময় সংসারে সেই পথ বড়ই দুর্গম। তাই তাঁহারা সাধ্যমত রমণীদিগকে কণ্টকবিহীন পথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ নিষ্কণ্টক পথে চালাইয়াও তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ইহাতেও যদি পথের দুএকটী কণ্টক তাঁহাদিগের গাত্রে বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহাদের চরিত্রই একমাত্র তাহার রক্ষক; * এ অবস্থায় আপনাকেই আপনার রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল কঠিন কণ্টক সংসারের পথে সতীত্বে বড়ই আঘাত প্রদান করে, মনু তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছয় প্রকার—(১) পানদোষ, (২) দুর্জ্জনসংসর্গ, (৩) পতিবিরহ, (৪) অটন অর্থাৎ shopping ইত্যাদি বৃথা কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ, (৫) অকাল নিদ্রা এবং (৬) পরগৃহে বাস। †

ঋষিদিগের আদেশ ও অনুশাসন মানিয়া চলিলে যে গৃহ কি শান্তিময় ও সুধার আকর হইয়া উঠে, তাহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। মানবের মানবত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই সমানরূপে বিকশিত হইতে দেখা যায়। স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে কিছু বিভিন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশের দস্যু এবং বিলাতের দস্যু প্রায়ই সমান, অল্পই বিভিন্ন; আমাদের দেশের সাধু ও বিলাতের সাধু ভাবে ও চরিত্রে প্রায়ই এক হইবে, হয়তো সামান্যমাত্র বিভিন্নতা থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের ঋষিরা সতীত্ব রক্ষার জন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীর যে প্রকার সম্বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং হিন্দুমাত্রেই যে ব্যবস্থার উপকার বুঝিয়া সাদরে স্বীকার করিয়াছেন, অষ্টদিকপাল-সম্ভূতা মহারাণী ভারতেশ্বরীও ঈশ্বরের কৃপায় স্বীয় প্রতিভাবলে সেই সকল ব্যবস্থা অনুভব করিয়াই যেন তদনুসারে চলিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার গৃহে এক অপরাজিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার জীবনী-লেখক বলেন যে, "মহারাণীর ন্যায় এত গার্হস্থ্য সুখ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই (অবশ্য তাঁহার পাশ্চাত্য প্রজাদিগের) অদৃষ্টে ঘটিয়াছে" এবং তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে মহারাণীর আদর্শে চলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রজার গৃহ সুখশান্তিময় স্বর্গধাম হইয়া উঠুক। * আমরাও সেই প্রার্থনা করি। জীবনীলেখক মহারাণীর অর্থজনিত সুখের কথা এখানে বলেন নাই; বিবাহিত জীবনের প্রকৃত গার্হস্থ্য সুখের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"In that perfect union of two in one (মহারাণী ও তাঁহার স্বামী) :we see the bright consummate flower of the race." ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে যখন আমাদের বিবাহে বলিতে হয় "তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক" এবং "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক"—এই প্রকৃতির মন্ত্রগুলি কি ঐ আদর্শ পরিবার স্থাপন করিবার অথবা এই মর্ত্ত্যধামে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় না, আর বাস্তবিকও কি এই সকল মন্ত্রগুলি হিন্দুজাতিকে অতি উন্নত সামাজিক জাতি করিবার হেতু নহে? আশ্চর্য্য এই যে ভারতের এই অবনতির কালে এমন সুন্দর মন্ত্রগুলিও কতকগুলি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির নিকটে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতে অবরোধপ্রথা ছিল এবং মনুপ্রমুখ ঋষিরা তাহা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহারা যে কি উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীর সহিত পত্নীর অথবা পিতার সহিত কন্যা প্রভৃতির ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে গমন ইত্যাদি বিষয়ে ঋষিদিগের কোনই নিষেধ নাই—বরঞ্চ তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নানা প্রকারে উৎসাহ দিয়াছেন। উৎসাহ দিবারই কথা—এ সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান এবং সমান থাকাই উচিত; বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হয় এবং যদি সেই মাতৃত্ব ধর্ম্মমূলক হয়, তবে ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। যাত্রাস্থানে গমন, নৃত্য গীতাদিতে গমন অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলে মানসিক সংযম থাকে না, প্রবৃত্তি সকল বহির্মুখী হইয়া উঠে, সেই সকল বিষয়ের জন্য ইতস্ততঃ গমন রমণীর অন্তর্মুখী গার্হস্থ্যভাবের প্রতিকূল এবং সেই কারণেই ঋষিরা এই প্রকার অযথাভ্রমণকে স্ত্রীজাতির পক্ষে দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শরমণী ভিক্টোরিয়াতেও আমরা এই কথারই

---

* অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ মনু ৯ অ, ১২

† ভাষ্যে আছে দেবালয় অথবা জ্ঞাতিকুলে বাস; কোন নবীন ভাষ্যকার বলেন হোটেল প্রভৃতি স্থানে অথবা cousinদিগের সহিত বাস।

* "Not to many, only to the rare few, is given to realise such perfect blessedness as the Queen found in her marriage." * * *

"What has been once may be again. The height which one wedded pair attained marks the level which the whole race may yet attain and when that goal is gained mankind will indeed stand near to the portals of paradise"—Rev. of Rev. May 1897.

সম্পূর্ণ সায় পাই। তিনি একে পাশ্চাত্য রমণী, স্বাধীনতার মধ্যে লালিতপালিত; তাহার পরে যখন তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন যে তাঁহাকে সমাজের খাতিরে, আমোদের তাড়নায় কত নৃত্য গীত করিতে হইয়াছিল, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তাঁহার জীবনী-লেখক বলেন যে বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "the Queen had been leading a life of dazzling and continuous excitement." কিন্তু যখন তাঁহার সমস্ত হৃদয় একজন অধিকার করিলেন, যখন তাঁহার প্রবৃত্তিসকল অন্তর্মুখী হইল, তখন তিনি বুঝিলেন যে রাশীকৃত আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত হৃদয়ের স্বাস্থ্যের হানিকারক। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে আমোদের স্রোতে ভাসমান হওয়া "detrimental to all natural feelings and affections."

মহারাণী ভারতেশ্বরীর আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে তিনি কেবলমাত্র ভারতেশ্বরী এবং হিন্দুসন্তানগণের রাজমাতা নহেন, তাঁহাকে আদর্শ হিন্দু-রমণী বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না—তাহা ঐ স্বামীভক্তি। তাঁহার মতে "স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন না হইলে গৃহস্থের প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসিতে পারে না।"* মহারাণী কি গার্হস্থ্য, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়েই তাঁহার স্বামীর সম্মতি লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। আমাদের মহারাণী ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর অনায়াসেই বিবাহশৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি পুণ্যশ্লোক ভারতের পুণ্যবতী অধীশ্বরী, তাই ভারতরমণীর আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন তিনি পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া এই ৩৬ বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বামী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এই ভাবে পুণ্যজীবন যাপন করিতেছেন।†

তাঁহার স্বামী পুণ্যবান্ প্রিন্স এলবার্ট জীবিত থাকিতে যেরূপ ন্যায়পরতা ও দয়ার উপরে রাজ্যশাসন করিতেন, মহারাণীও তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া সেইভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণী লিখিয়াছেন যে "তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ইহলোকের পরপারে মিলনজনিত যে আনন্দ লাভ হইবে, তাহারই আশা করিয়া যাহা কিছু শান্তি পাইতেছেন এবং বর্ত্তমানের শোককে শোক বলিয়া গণনা করিতেছেন না।"* মহারাণী বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার মাতার নিকটে কঠোর সংযম শিক্ষা করাতে শেষ বয়সে এতদূর ধৈর্য্য ও সংযম দেখাইতে পারিয়াছেন।

করুণা।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ভৈরবী—একতালা।

করুণার তাঁর অন্ত যে নাই—
সুখে দুখে যেন গেয়ে যাই গান
তাঁরি প্রেমমুখে চাই!
ওই আকাশে আলোকে কুসুমে পবনে
কি অমিয়ধার সিঞ্চিছে মনে
বিহঙ্গম-গানে নদী-কলতানে
কত রূপে তাঁরে পাই!
তাঁরে যেন আমি মনে বাসি ভাল,
ভালবাসি তাঁর পশু পাখী আলো,
পায় প্রাণ মন করি' নিবেদন
হৃদয় জ্বালা জুড়াই!
দুখ দেন তিনি সেও মম ভালো,
বজ্র পাঠান সেই মম আলো
তাঁরে লয়ে যদি কাটে নিরবধি
আর কিবা আমি চাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

§§ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি। ২৬।
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭।

(২৬) অথবা, যদি তুমি ইহা স্বীকার কর যে, এই

---

* "Without the authority which belongs to the husband," she says, "there cannot be true comfort or happiness in domestic life."

† "First and foremost she has been a true widow, loyal to the memory of her husband. Rejecting with loathing all thought of a second marriage, she has never ceased to regard herself as Prince Albert's wife, because for thirty-six years he awaits her, disembodied, but not unconscious of her presence and her love.—Rev. of Rev. May 1897.

* "The only sort of consolation she experiences is in the constant sense of his unseen presence, and the blessed thought of the eternal union hereafter which will make the anguish of the present appear as naught."—quoted in the Rev of Rev. April 1897.
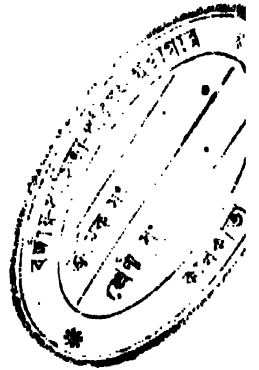
আত্মা (নিত্য নহে, শরীরের সঙ্গেই) সর্ব্বদা জন্মায় বা সর্ব্বদা মরে, তাহা হইলেও হে মহাবাহু! উহার জন্য শোক করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। (২৭) কারণ যে জন্মায়, উহার মৃত্যু নিশ্চিত, এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত; এইজন্য (এই) অপরিহার্য্য বিষয়ে (উপরোক্ত তোমার মতানুসারেও) শোক করা তোমার উচিত নহে।

[মনে রেখো যে, উপরের দুই শ্লোকে ব্যাখ্যাত উপপত্তি সিদ্ধান্তপক্ষের নহে। এই 'অথ চ—অথবা' শব্দের দ্বারা মধ্যস্থলেই উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হইতেছে। আত্মাকে নিত্য বা অনিত্য মান, এইটুকুই দেখাইতে হইবে যে, উভয় পক্ষেই শোক করিবার প্রয়োজন নাই। গীতার এই সত্য সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা সৎ, নিত্য, অজ, অবিকার্য্য ও অচিন্ত্য বা নির্গুণ। হোক; দেহ অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে; ইহারই সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে আর এক উপপত্তি বলা হইতেছে।]

§§ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ২৮।

(২৮) সকল ভূত আরম্ভে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং মরণকালে আবার অব্যক্ত হয়; (ইহাই যদি সকলেরই অবস্থা হয়) তবে হে ভারত! উহাতে কোন্ বিষয়ের জন্য শোক করিবে?

['অব্যক্ত' শব্দেরই অর্থ—'ইন্দ্রিয়ের অ-গোচর'। মূল এক অব্যক্ত দ্রব্য হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অব্যক্তেই লয় হয় (গী. ৮. ১৮); এই সাংখ্য সিদ্ধান্তই এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতেছে। সাংখ্যবাদীর এই সিদ্ধান্ত গীতারহস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে খুলিয়া বলা হইয়াছে। কোনও পদার্থের ব্যক্ত অবস্থা যদি এই প্রকার কখন-না-কখন নষ্ট হয়, তবে যে ব্যক্ত স্বরূপ স্বভাবতই নশ্বর,তাহার জন্য শোক করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই শ্লোক 'অব্যক্ত' শব্দের বদলে 'অভাব' শব্দযুক্ত হইয়া মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বে (মভা স্ত্রী. ২. ৬) আসিয়াছে। পরে "অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা॥" (স্ত্রী. ২. ১৩) এই শ্লোকে 'অদর্শন' অর্থাৎ 'দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়া' এই শব্দেরও মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্র অনুসারে শোক করা যদি ব্যর্থ সিদ্ধ হয়, এবং আত্মাকে অনিত্য মানিলেও যদি এই কথাই সিদ্ধ হয়, তবে আবার লোকে মৃত্যুর বিষয়ে শোক কেন করে? আত্মস্বরূপসম্বন্ধীয় অজ্ঞানই ইহার উত্তর। কারণ—]

§§ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

(২৯) জান, কেহ আশ্চর্য্য (অদ্ভুত বস্তু) মনে করিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি করেন, কেহ আশ্চর্য্য হইয়া ইহার বর্ণন করেন, এবং কেহ বা আশ্চর্য্য হইয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু (এই প্রকার দেখিয়া, বর্ণন করিয়া এবং) শুনিয়াও (ইহাদের মধ্যে) কেহই ইহাকে (তত্ত্বত) জানেন না।

[অপূর্ব্ব বস্তু মনে করিয়া বড় বড় লোক আশ্চর্য্য হইয়া আত্মার বিষয়ে যতই কেন বিচার করুন না উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার লোক খুবই অল্প। এই কারণেই অনেক লোক মৃত্যুর বিষয়ে শোক করে। অতএব তুমি এরূপ না করিয়া পূর্ণ বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপকে ঠিকভাবে জান এবং শোক পরিত্যাগ কর। ইহার ইহাই অর্থ। কঠোপনিষদে (২. ৭) আত্মার বর্ণনা এই প্রকার আছে।]

(৩০) সকলের শরীরে (অবস্থিত) শরীরের স্বামী (আত্মা) সর্ব্বদা অবধ্য অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না; অতএব হে ভারত (অর্জ্জুন)! সমস্ত অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে।

[এখন পর্য্যন্ত ইহা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, সাংখ্য বা সন্ন্যাস মার্গের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে আত্মা অমর এবং দেহ তো স্বভাবতই অনিত্য, অতএব কেহ মরে বা মারে, তাহার জন্য 'শোক' করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কেহ ইহা হইতে এই অনুমান করেন যে, কেহ কাহাকে যদি বধ করে, তবে তাহাতেও 'পাপ' নাই; তাহা গুরুতর ভুল হইবে। মরা বা মারা, এই দুই শব্দের অর্থের পৃথককরণ এই, মরিতে বা মারিতে যে ভয় হয় তাহাকে প্রথমে দূর করিবার জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া হইল। মনুষ্য তো আত্মা ও দেহের সম্মিলন। তন্মধ্যে আত্মা অমর, এইজন্য মরা বা মারা এই দুই শব্দ উহার প্রতি উপযুক্ত হয় না। অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা তো স্বভাবতই অনিত্য, যদি উহার ধ্বংস হয় তবে শোক করিবার যোগ্য কিছুই নাই। কিন্তু যদৃচ্ছা বা কালের গতিতে কেহ মরিলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহা সুখ বা দুঃখ মনে না করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেও এই প্রশ্নের কিনারা হয় না যে, জানিয়া শুনিয়া যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি। কারণ দেহ অনিত্য হইলেও আত্মার খাঁটি মঙ্গল বা মোক্ষ সম্পাদনের জন্য

দেহই তো এক সাধন, অতএব আত্মহত্যা করা অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অপর কাহাকে বধ করা, এই উভয়ই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপই। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ করিবে কেন, তাহার কোন-না-কোন ভাল কারণ দেওয়া আবশ্যক। ইহারই নাম ধর্মাধর্মবিবেক এবং গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা সংখ্যামার্গেরই সম্মত, তদনুসারেও যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মরা-মারার জন্য শোক করিও না; কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ যুদ্ধে মরা বা মারা এই দুই-ই ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে তোমার আবশ্যকই—]।

§§ স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥
অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

(৩১) ইহা ব্যতীত স্বধর্মের দিকে দেখিলেও (এই সময়ে) সাহস হারানো তোমার উচিত নহে। কারণ ধর্মানুগত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

[স্বধর্মের এই উপপত্তি পরেও দুইবার (গী. ৩. ৩৫ এবং ১৮. ৪৭) বলা হইয়াছে। সন্ন্যাস অথবা সাংখ্যমার্গ অনুসারে যদিও কর্মসন্ন্যাসরূপ চতুর্থ আশ্রম শেষ সোপান, তথাপি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ বলেন যে, ইহার পূর্বে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণধর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রম পূর্ণ করা চাই, অতএব এই শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, গৃহস্থাশ্রমী অর্জুনের যুদ্ধ করা আবশ্যক।]

(৩২) এবং হে পার্থ! এই যুদ্ধ স্বত-উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারই; এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়দিগেরই ভাগ্যে ঘটে। (৩৩) অতএব যদি তুমি (নিজের) ধর্মের অনুকূল এই যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারাইয়া পাপ সংগ্রহ করিবে; (৩৪) শুধু ইহাই নহে কিন্তু (সমস্ত) লোক তোমার অক্ষয় দুষ্কীর্তি গাহিতে থাকিবে! এবং সম্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

[শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্বই উদ্যোগপর্বে যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছেন (মভা. উ. ৭২. ২৪)। সে স্থলে এই শ্লোক আছে "কুলীনস্য চ যা নিন্দা বধো বাঽমিত্রকর্শন। মহাগুণো বধো রাজন্ ন তু নিন্দা কুজীবিকা॥" কিন্তু গীতাতে ইহা অপেক্ষা এই অর্থ সংক্ষেপে আছে; এবং গীতা গ্রন্থের প্রচারও অধিক, এই কারণে গীতার "সম্ভাবিতস্য" ইত্যাদি বাক্যের চলিত কথার ন্যায় প্রয়োগ হইতে লাগিল। গীতার আরও অনেক শ্লোক ইহারই ন্যায় সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দুষ্কীর্তির স্বরূপ বলিতেছেন—]

(৩৫) (সকল) মহারথী বুঝিবে যে, তুমি ভয়ে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে, এবং যাঁহাদের নিকট (আজ) তুমি বহুমান্য হইয়া আছ, তাঁহারাই তোমার যোগ্যতা কম ঠাওরাইবেন। (৩৬) এই প্রকারেই তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া, তোমার শত্রু এমন এমন অনেক কথা (তোমার বিষয়ে) বলিবে, যাহা বলা উচিত নহে। ইহার অধিক দুঃখের বিষয় আর আছেই বা কি? (৩৭) মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং জিতিলে তো পৃথিবী (র রাজ্য) ভোগ করিবে! অতএব হে অর্জুন যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ!

[উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্যজ্ঞানের অনুসারে মরিবার-মারিবার জন্য শোক করা উচিত নহে; প্রত্যুত ইহাও সিদ্ধ হইল যে, স্বধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করাই কর্তব্য। তথাপি এক্ষণে এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের 'পাপ' কর্তাকে লাগে কি না। বস্তুত এই উত্তরের যুক্তিগুলি কর্মযোগমার্গের, এইজন্য ঐ মার্গের প্রস্তাবনা এইখানেই হইয়াছে।]

(৩৮) সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া কেবল যুদ্ধে লাগিয়া যাও। এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই) পাপ লাগিবে না।

[সংসারে জীবন যাপনের দুই মার্গ আছে—এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে যে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসমার্গের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারেই আত্মার জন্য বা দেহের জন্য শোক করা উচিত নহে। ভগবান অর্জুনকে সপ্রমাণ দেখাইয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ সমবুদ্ধিতে সহ্য করিতে হইবে এবং স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, এবং সমবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে কোনই পাপ লাগে না। কিন্তু এই মার্গের (সাংখ্য) মত এই যে, কখনও-না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই প্রত্যেক মনুষ্যের ইহ-জগতে পরম কর্তব্য; অতএব ইষ্ট জ্ঞান হইলে এখনই যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস কেন গ্রহণ না করিবে অথবা স্বধর্মের পালনই কেন করিবে ইত্যাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্যজ্ঞান হইতে হয় না; এবং এই কারণেই বলিতে পারি যে, অর্জুনের মূল আপত্তি যেমনটী-তেমনই রহিল। অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন—]

§§ এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

(৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসনিষ্ঠা অনুসারে তোমাকে এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান বা উপপত্তি বলা হইয়াছে। এখন যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে (কর্ম না ছাড়িলেও) হে পার্থ! তুমি কর্মবন্ধন ছাড়িবে, সেইরূপই এই (কর্ম-) যোগের বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বলিতেছি)।

। [ভগবদ্গীতার রহস্য বুঝিবার জন্য এই শ্লোক । অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্য শব্দের দ্বারা কপিলের । সাংখ্য বা নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল । যোগ এস্থলে উদ্দিষ্ট নহে—সাংখ্য অর্থে সন্ন্যাসমার্গ । এবং যোগ অর্থে কর্মমার্গই এস্থলে ধরিতে হইবে। । ইহা গীতার ৩, ৩ শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। । এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র, ইহাদের অনুগামীদিগকেও যথা- । ক্রমে 'সাংখ্য' = সন্ন্যসমার্গী, এবং 'যোগ' = কর্মযোগ- । মার্গী বলা যায় (গী. ৫.৫)। তন্মধ্যে সাংখ্যনিষ্ঠাবান ব্যক্তি । কখন-না-কখন শেষে কর্ম ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া । মানেন, এইজন্য এই মার্গের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে অর্জু- । নের যুদ্ধ কেন করিব এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় । না। অতএব যে কর্মযোগনিষ্ঠার এই মত যে, সন্ন্যাস । না লইয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও নিষ্কামবুদ্ধিতে সর্ব- । দাই কর্ম করিতে থাকাই প্রত্যেকের প্রকৃত পুরুষার্থ, । সেই কর্মযোগেরই (অথবা সংক্ষেপে যোগমার্গের) । জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করা হইল এবং গীতার । শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত, নানা কারণ দেখাইয়া, নানা সন্দে- । হের নিরাকরণ করিয়া, এই মার্গেরই পুষ্টীকরণ করা । হইয়াছে। গীতার বিষয়নিরূপণের, স্বয়ং ভগবানের । কৃত, এই স্পষ্টীকরণ দৃষ্টিতে রাখিলে এই বিষয়ে কোনই । সন্দেহ থাকে না যে, কর্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য। । কর্মযোগের মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রথমে নির্দেশ করা । যাইতেছে—]

§§ নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

(৪০) এখানে অর্থাৎ এই কর্মযোগমার্গে (একবার-আরব্ধ কর্মের নাশ হয় না এবং (পরে) বিঘ্নও হয় না। এই ধর্মের অল্পও (আচরণ) মহান ভয় হইতে রক্ষা করে।

। [এই সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব গীতারহস্যের দশম । প্রকরণে (পৃ.) প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পরে গীতাতেও । বেশী খুলিয়া বলা হইয়াছে (গী. ৬. ৪০-৪৬)। ইহার । অর্থ এই যে, কর্মযোগমার্গে যদি একজন্মে সিদ্ধিলাভ না । হয়, তবে কৃত কর্ম ব্যর্থ না হইয়া পরজন্মে কাজে আসে । এবং প্রত্যেক জন্মে ইহার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং । শেষে কখন-না-কখন প্রকৃত সদ্গতি পাওয়া যায়। । এখন কর্মযোগমার্গের দ্বিতীয় মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । বলিতেছেন—]

§§ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥

(৪১) হে কুরুনন্দন! এই মার্গে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণায়ক (ইন্দ্রিয়রূপী) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয়; কারণ যাঁহার বুদ্ধি (এই প্রকার এক) স্থির না হয়, তাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা-সকল নানা শাখাতে যুক্ত ও অনন্ত (প্রকারের) হয়।

। [সংস্কৃতে বুদ্ধি শব্দের নানা অর্থ। ৩৯ শ্লোকে । এই শব্দ জ্ঞান অর্থে বসিয়াছে এবং পরে ৪৯ শ্লোকে । এই 'বুদ্ধি' শব্দেরই "বুঝা, ইচ্ছা, বাসনা, বা হেতু" । অর্থ হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি শব্দের পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মিকা' । বিশেষণ থাকায় এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে ঐ শব্দেরই । অর্থ ব্যবসায় অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি- । ইন্দ্রিয় (গীতার. প্র. ৬ পৃ-দেখ) হইতেছে। প্রথমে । এই বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিষয়ের ভালমন্দ । বিচার করিয়া লইলে ফের তদনুসারে কর্ম্ম করিবার । ইচ্ছা বা বাসনা মনে আসে; অতএব এই ইচ্ছা বা । বাসনাকেও বুদ্ধিই বলা হয়। কিন্তু সে সময় 'ব্যব- । সায়াত্মিকা' এই বিশেষণ উহার পূর্ব্বে দেওয়া যায় না। । ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক হইলে 'বাসনাত্মক' বুদ্ধি বলা । হয়। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কেবল 'বুদ্ধি' শব্দ । আছে, উহার পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মক' এই বিশেষণ নাই। । এই জন্য বহুবচনান্ত 'বুদ্ধয়ঃ' শব্দের 'বাসনা,কল্পনাতরঙ্গ' । অর্থ হইয়া সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, "যাঁহার । ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়কর্ত্তা বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় স্থির না । হয়,তাঁহার মনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন তরঙ্গসকল বা বাসনা- । সকল উৎপন্ন হয়।" বুদ্ধিশব্দের 'নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়' । এবং 'বাসনা' এই দুই অর্থ মনে না রাখিলে কর্ম্মযোগের । বুদ্ধিবিষয়ক বিচারের মর্ম্ম ভালরূপ বুঝা যাইবে না। । ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি স্থির বা একাগ্র না থাকিলে প্রতিদিন । বিভিন্ন বাসনাসকল মনকে ব্যস্ত করে এবং মনুষ্য । এমনই ঝঞ্ঝাটে পড়ে যে, আজ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যদি । অমুক কর্ম্ম কর, তো কাল স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অমুক । কর্ম্ম করে। বস, এখন ইহারই বর্ণন করিতেছেন—]

§§ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

(৪২) হে পার্থ! (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদসমূহের (ফলশ্রুতিযুক্ত) বাক্যসকলে ভুলিয়া মূর্খ লোকেরা বলে যে ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এবং বাড়াইয়া বলে যে, (৪৩) "অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞাদি) কর্মের দ্বারাই (আবার) জন্মরূপ ফল লাভ হয় এবং (জন্মজন্মান্তরে) ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়"—স্বর্গের পশ্চাতে পতিত ঐ কাম্য বুদ্ধিবিশিষ্ট (লোক), (৪৪) উক্ত উক্তির দিকেই উহাদের মন আকৃষ্ট হইলে, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যেই ডুবিয়া থাকে; এই কারণে উহাদের ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি (কখনও) সমাধিস্থ অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না।

। [উপরের তিন শ্লোক মিলিয়া একটী বাক্য।

উহাতে জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মাসক্ত মীমাংসামার্গীর এই বর্ণনা আছে যে, তাহারা শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে আজ অমুক হেতুর সিদ্ধির জন্য, কাল অন্য কোন কারণে, সর্ব্বদাই স্বার্থের জন্যই, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে নিমগ্ন থাকে। এই বর্ণনা উপনিষদের ভিত্তিতে করা হইয়াছে। উদাহরণার্থ, মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

"ইষ্টাপূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ, অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে—যে মূঢ় লোক ইহা স্বীকার করে, সে স্বর্গে পুণ্য উপভোগ করিলে পর ফের নীচে এই মনুষ্যলোকে আসে" (মুণ্ড. ১. ২. ১০)। জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মের এই প্রকার নিন্দা ঈশাবাস্য এবং কঠোপনিষদেও করা হইয়াছে (কঠ. ২. ৫. ঈশ ৯, ১২)। পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল কর্ম্মেতেই আবদ্ধ এই লোকেরা (গী. ৯. ২১ দেখ) নিজ নিজ কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল তো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহাদের বাসনা আজ এক কর্ম্মে, আবার কাল আর এক কর্ম্মে রত হইয়া চারিদিকে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় ঘুরিতে থাকে; এই কারণে উহাদিগের স্বর্গে যাতায়াত অদৃষ্টে ঘটিলেও মোক্ষলাভ হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির বা একাগ্র রাখিতে হইবে। পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ইহাকে একাগ্র কি প্রকারে করিতে হইবে। এখন তো এইটুকুই বলিতেছেন যে,—]

(৪৫) হে অর্জ্জুন! (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদ (এই রীতিতে) ত্রৈগুণ্যের বিষয়ে পূর্ণ, এই জন্য তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, নিত্যসত্ত্বস্থ ও সুখদুঃখ আদি দ্বন্দ্ব হইতে অলিপ্ত হও এবং যোগ-ক্ষেম প্রভৃতি স্বার্থে না পড়িয়া আত্মনিষ্ঠ হও!

[সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণে মিশ্রিত প্রকৃতির সৃষ্টিকে ত্রৈগুণ্য বলে; এই সৃষ্টি সুখদুঃখ প্রভৃতি অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নশ্বর দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং সত্য ব্রহ্ম ইহার অতীত—এই বিষয় গীতারহস্যে (পৃ. ও) স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই অধ্যায়েরই ৪৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার এই সংসারে সুখপ্রাপ্তির জন্য মীমাংসক-মার্গাবলম্বী লোক শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি করে এবং তাহারা এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়া যায়। কেহ পুত্রলাভের জন্য এক বিশেষ যজ্ঞ করে, কেহ বা বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে। এই সমস্ত কর্ম্ম এই লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের যোগ-ক্ষেমের জন্য কৃত হয়। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, যে মোক্ষলাভ করিবে, সে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের এই ত্রিগুণাত্মক এবং শুধু যোগক্ষেম-সম্পাদক কর্ম্ম ছাড়িয়া নিজের চিত্তকে ইহার অতীত পরব্রহ্মের প্রতি লাগাইবে। এই অর্থেই নির্দ্বন্দ্ব ও নির্যোগক্ষেমবান শব্দ উপরে আসিয়াছে। এখানে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের এই কাম্য কর্ম্মসকল ছাড়িয়া দিলে যোগক্ষেম (নির্ব্বাহ) কি প্রকারে হইবে (গী. র. পৃ. ও দেখ)। কিন্তু ইহার উত্তর এখানে দেওয়া হয় নাই, এই বিষয় পরে আবার নবম অধ্যায়ে আসিয়াছে; সেখানে বলা হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন; এবং এই দুই স্থানেই গীতাতে 'যোগক্ষেম' শব্দ আসিয়াছে (গী. ৯. ২২ এবং উহার উপর আমার টিপ্পনী দেখ)। নিত্যসত্ত্বস্থ পদেরই অর্থ ত্রিগুণাতীত হয়। কারণ পরে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা (গী. ১৪. ১৪ ও ২০, গী. র. পৃ. ও দেখ)। তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসকদিগের যোগক্ষেমকারক ত্রিগুণাত্মক কাম্য কর্ম্ম ছাড়িয়া এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ হইবার বিষয়ে এখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আবার এই বিষয়ের উপরেও দৃষ্টি দিতে হইবে যে, আত্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত কর্ম্ম বস্তুত একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া নহে। উপরের শ্লোকে বৈদিক কাম্য কর্ম্মের যে নিন্দা করা হইয়াছে বা যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা কর্ম্মের নহে, কিন্তু ঐ কর্ম্ম বিষয়ে যে কাম্যবুদ্ধি হয়, তাহারই। যদি এই কাম্যবুদ্ধি মনে না থাকে, তবে শুধু যাগযজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. র. পৃ.)। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন যে, মীমাংসকদিগের এই সকল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত (গী. ১৮. ৬)। গীতার এই দুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের শ্লোকে মীমাংসকদিগের কর্ম্মকাণ্ডের যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা উহার কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে—কর্ম্মের জন্য নহে। এই অভিপ্রায়কেই মনে আনিয়া ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—]

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

"বেদোক্ত কর্ম্মের বেদে যে ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহা রোচনার্থ, অর্থাৎ যাহাতে কর্ত্তার এই কর্ম্ম ভাল লাগে। অতএব এই কর্ম্মসমূহ ঐ ফলপ্রাপ্তির জন্য করিবে না, কিন্তু নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলের আশা ছাড়িয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকার করে, নৈষ্কর্ম্ম্যজনিত সিদ্ধি তাহার প্রাপ্তি হয়" (ভাগ. ১১. ৩, ৪৬)। সারকথা, অমুক অমুক কারণের জন্য যজ্ঞ করিবে, ইহা বেদে উক্ত হইলেও, ইহাতে না ভুলিয়া যজ্ঞ করা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়াই যজ্ঞ করিবে; কাম্যবুদ্ধিকে তো ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু যজ্ঞকে ছাড়িবে না (গী. ১৭, ১১); এবং এইভাবে অন্যান্য কর্ম্মও করিবে—ইহা গীতোক্ত উপদেশের সার এবং এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।]

(৪৬) চারিদিকে জলবৃদ্ধি হইলে কূপের যেটুকু অর্থ বা প্রয়োজন বাকী থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন থাকেনা) সেইটুকু প্রয়োজনই লব্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে সমস্ত (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদে থাকে (অর্থাৎ তাহার পক্ষে কেবল কাম্য কর্ম্মরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না)।

[এই শ্লোকের ফলিতার্থ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু টীকাকারগণ ইহার শব্দগুলাকে লইয়া অন্যান্যরূপে

টানাবুনা করেন। সর্ব্বতঃ 'সংপ্লুতোদকে' এই সপ্তম্যন্ত সামাসিক পদ আছে। কিন্তু ইহাকে কেবল সপ্তমী বা উদপানের বিশেষণও না বুঝিয়া 'সতি সপ্তমী' মানিয়া লইলে "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ (ন স্বল্পমপি প্রয়োজনং বিদ্যতে) তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ"—এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যাহৃত মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া যায় এবং উহার এই সরল অর্থও হইয়া যায় যে, "চারিদিকে জলময় হইলে পর (পানের জন্য কোথাও বিনা চেষ্টায় যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে থাকিলে) যে প্রকার কূপের বিষয় কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শুধু যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন থাকে না।" কারণ, বৈদিক কর্ম্ম কেবল স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই নহে, কিন্তু শেষে মোক্ষ-সাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, এবং এই ব্যক্তির তো জ্ঞানপ্রাপ্তি পূর্ব্বেই হইয়া যায়, এই কারণে বৈদিক কর্ম্ম করিয়া ইঁহার কোন নূতন বস্তু পাওয়া বাকী থাকে না। এই হেতুই পরে তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ১৭) উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি জ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই জগতে কর্ত্তব্য বাকী থাকে না।" খুব বড় পুষ্করিণী বা নদীতে অনায়াসেই, যত চাও তত, জল পান করিবার সুবিধা থাকিলে কূপের দিকে কে খুঁজিবে? সে সময়ে কেহই কূপের অপেক্ষা রাখে না। সনৎসুজাতীয়ের শেষ অধ্যায়ে (মভা. উদ্যো. ৪৫. ২৬) এই শ্লোকই অল্পস্বল্প শব্দের হেরফেরে আসিয়াছে। মাধবাচার্য্য ইহার টীকায়, উপরে আমি যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই করিয়াছেন; এবং শুকানুপ্রশ্নে জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য বিচার করিবার সময় স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—"ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং পিবন্নিব"—অর্থাৎ নদীতে যে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোয়া করে না, সেইরূপ 'তে' অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মের কোন পরোয়া করেন না (মভা. শা. ২৪০, ১০)। এইরূপই পাণ্ডব-গীতার সপ্তদশ শ্লোকে কূপের দৃষ্টান্ত এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—যে বাসুদেবকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে "তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ" ভাগীরথীকূলে পানার্থ জল পাইলেও কূপান্বেষী পিপাসু পুরুষের ন্যায় মূর্খ। এই দৃষ্টান্ত কেবল বৈদিক সংস্কৃত গ্রন্থেই নাই, প্রত্যুত পালিভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থেও ইহার প্রয়োগ আছে। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্মেরও জানা যে, যে পুরুষ নিজের তৃষ্ণা সমূলে নষ্ট করিয়াছে, সে পরে আরও কিছু পাইবার জন্য পড়িয়া থাকে না; এবং এই সিদ্ধান্ত বলিতে গিয়া উদান নামক পালিগ্রন্থের (৭. ৯) এই শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—"কিং কয়িরা উদপানেন আপা চে সব্বদা সিয়ুং"—সর্ব্বদা জল পাইবার ব্যবস্থা হইলে কূপ লইয়া কি করিবে। আজ-কাল বড় বড় সহরে ইহা দেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের কেহ কূপের পরোয়া করে না। ইহা হইতে আরও বিশেষ ভাবে শুকানুপ্রশ্নের আলোচনা হইতে গীতার দৃষ্টান্তের স্বারস্য জানা যাইবে এবং দেখা যাইবে যে, আমি এই এই শ্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই সরল ও ঠিক। কিন্তু এইরূপ অর্থ দ্বারা বেদের কিছু গৌণতা আসে বলিয়াই হউক, অথবা জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের সমাবেশ হইবার কারণে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কারণেই হউক, গীতার টীকাকার এই শ্লোকের পদসমূহের অন্বয় কিছু বিভিন্ন রীতিতে লাগান। তিনি এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'তাবান্' এবং দ্বিতীয় চরণে 'যাবান্' পদগুলিকে অধ্যাহৃত মানিয়া এই প্রকার অর্থ করেন "উদপানে যাবানর্থঃ তাবানেব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে যথা সম্পদ্যতে তথা যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সম্পদ্যতে" অর্থাৎ স্নানপান প্রভৃতি কর্ম্মের জন্য কূপের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকুই বৃহৎ পুষ্করিণীতেও (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) হইতে পারে; এই প্রকারই বেদসমূহের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু এই অন্বয়ে প্রথম শ্লোকপংক্তিতে 'তাবান্' এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'যাবান্' এই দুই পদের অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন বশত আমি ঐ অন্বয় ও অর্থ স্বীকার করি নাই। আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার না করিয়াই লাগিয়া যায় এবং পূর্ব্বের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রতিপাদিত বেদ-সমূহের নিছক (অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত) কর্ম্মকাণ্ডের গৌণত্ব এই স্থলে বিবক্ষিত। এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তি না করিবেন, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন—এই কথা গীতার সম্মত নহে। কারণ, এই সকল কর্ম্মের ফল জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট না হইলেও ফলের জন্য নহে, কিন্তু যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম নিজের শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য বুঝিয়া তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের নিশ্চিত মত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ফলাশা না থাকিলেও অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও জ্ঞানী ব্যক্তির অনাসক্ত বুদ্ধিতে করাই উচিত (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের উপর এবং গী. ৩. ১৯ উপর আমার টিপ্পনী দেখ)। এই নিষ্কাম বিষয়ক অর্থই এখন পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া দেখাইতেছেন—]

§§ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

(৪৭) কর্ম্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার; ফল (পাওয়া বা না পাওয়া) কখনও তোমার অধিকার অর্থাৎ আয়ত্ত নহে; (এইজন্য আমার কর্ম্মের) অমুক ফল মিলিবে, এই হেতু (মনে) রাখিয়া কর্ম্ম করিও না; এবং কর্ম্ম না করিবারও আগ্রহ তুমি করিও না।

[এই শ্লোকের চারি চরণ পরস্পর এক অপরের অর্থের পূরক, এই কারণে অতিব্যাপ্তি না হইয়া কর্ম্ম-যোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধিক কি, ইহা বলিতেও কোন ক্ষতি নাই যে, এই চারি চরণ কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রীই। ইহা প্রথমে বলা হইল যে, "কর্ম্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার" কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ হয় এই যে, কর্ম্মের

। ফল কর্ম্মের দ্বারাই সংযুক্ত হইবার কারণে 'যাহার গাছ, তাহারই ফল' এই ন্যায়ে যে কর্ম্ম করিবার অধিকারী, সে-ই ফলেরও অধিকারী হইবে। অতএব এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট বলা হইল যে, "ফলে তোমার অধিকার নাই"। আবার ইহা হইতে নিষ্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধান্ত বলা হইল যে, "মনে ফলাশা রাখিয়া কর্ম্ম করিও না"। (কর্ম্মফলহেতুঃ কর্ম্মফলে হেতুর্যস্য স কর্ম্মফলহেতুঃ. এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইতেছে)। কিন্তু কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়ে সংলগ্ন হইতেছে. এই কারণে যদি কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকেও ছাড়িয়াই দেওয়া উচিত, তবে ইহাও ঠিক নহে বুঝাইবার জন্য শেষে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে, ফলাশাকে তো ছাড়িয়া দাও. আবার ইহার সঙ্গেই কর্ম্ম না করিবার অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগের আগ্রহ করিও না।" সারকথা 'কর্ম্ম কর' বলিলে কিছু এই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ; এবং 'ফলের আশা ছাড়' বলিলে এই অর্থ হইয়া যায় না যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও। অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ যে, ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু না কর্ম্মে আসক্ত হইবে আর না কর্ম্মই ছাড়িবে—ত্যাগো ন যুক্ত ইহ, কর্ম্মসু নাপি রাগঃ (যোগ. ৫.৫. ৫৪)। এবং ফললাভ নিজের বশে নাই, কিন্তু উহার জন্য আরও অনেক বিষয়ের আনুকূল্য আবশ্যক, ইহা দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অর্থই আরও দৃঢ় করা হইয়াছে (গী. ১৮. ১৪-১৬ এবং রহস্য পৃ. এবং প্র. ১২ দেখ)। এক্ষণে কর্ম্মযোগের স্পষ্ট লক্ষণ বলিতেছেন যে, ইহাকেই যোগ অথবা কর্ম্মযোগ বলে—]

§§ যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

(৪৮) হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মের সিদ্ধি হোক বা অসিদ্ধি হোক, উভয়কে সমানই মনে করিয়া 'যোগস্থ' হইয়া কর্ম্ম কর; (কর্ম্মের সিদ্ধি হইলে বা নিষ্ফল অবস্থায় স্থিত) সমতার (মনো-) বৃত্তিকেই (কর্ম্ম) যোগ বলে। (৪৯) কারণ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধির (সাম্য-) যোগ অপেক্ষা (বাহ্য) কর্ম্ম খুবই কনিষ্ঠ। (অতএব এই সাম্য-) বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলহেতুক অর্থাৎ ফলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে কৃপণ অর্থাৎ দীন বা নিম্ন স্তরের। (৫০) যে (সাম্য-) বুদ্ধিযুক্ত হয়, সে এই লোকে পাপ ও পুণ্য উভয় হইতে নির্লিপ্ত থাকে, অতএব যোগ অবলম্বন কর। (পাপ-পুণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া) কর্ম্ম করিবার চাতুর্য্যকেই (কুশলতা বা যুক্তিকেই) (কর্ম্মযোগ) বলে।

[এই শ্লোকসমূহে কর্ম্মযোগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ; এই সম্বন্ধে গীতারহস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ. —) যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দেখ। কিন্তু ইহাতেও কর্ম্মযোগের যে তত্ত্ব—'কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ'—৪৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বুদ্ধি' শব্দের পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মিকা' বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ 'বাসনা' বা 'বুঝা' হইবে। কেহ কেহ বুদ্ধির 'জ্ঞান' অর্থ করিয়া এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম লঘুশ্রেণীর; কিন্তু ইহা ঠিক অর্থ নহে। কারণ পূর্ব্বে ৪৮ শ্লোকে সমত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ৪৯ ও পরবর্ত্তী শ্লোকেও উহাই বর্ণিত আছে। এই কারণে এখানে বুদ্ধির অর্থ সমত্ববুদ্ধিই করিতে হইবে। কোনও কর্ম্মের ভালমন্দ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না; কর্ম্ম একই হোক না কেন, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার ভাল বা মন্দ বুদ্ধি অনুসারে তাহা শুভ অথবা অশুভ হয়; অতএব কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ; ইত্যাদি নীতিতত্ত্বের বিচার গীতারহস্যের চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ প্রকরণে (পৃ. , — এবং —) করা হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর অধিক চর্চ্চা করিব না। ৪১ শ্লোকে বলাই হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে সম ও শুদ্ধ রাখিবার জন্য কার্য্য-অকার্য্যের নির্ণায়ক ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে প্রথমেই স্থির করিতে হইবে। এইজন্য 'সাম্যবুদ্ধি' এই এক শব্দের দ্বারাই স্থির ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি ও শুদ্ধবাসনা (বাসনাত্মক বুদ্ধি) এই উভয়েরই বোধ হইয়া যাইতেছে। এই সাম্যবুদ্ধিই শুদ্ধ আচরণ অথবা কর্ম্মযোগের মূল. এই জন্য ৩৯ শ্লোকে ভগবান প্রথমে এই যে বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের বাধা দিবে না এমন যুক্তি অথবা যোগ তোমাকে বলিতেছি,তদনুসারেই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "কর্ম্ম করিবার সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই" সেই 'যুক্তি' বা 'কৌশল' এবং এবং ইহাকেই 'যোগ' বলে—এই প্রকার যোগ শব্দের দুইবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৫০ শ্লোকের "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" এই পদের এই প্রকার সরল অর্থ লাগিবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানাবুনা করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "কর্ম্মসু যোগঃ কৌশলং"—কর্ম্মে যে যোগ আছে, তাহাকে কৌশল বলেন। কিন্তু "কৌশল" শব্দের ব্যাখ্যা করিবার এখানে কোনই প্রয়োজনই নাই, 'যোগ' শব্দের লক্ষণ বলাই উদ্দেশ্য, এই জন্য এই অর্থ ঠিক বলিয়া মানা যায় না। ইহা ব্যতীত যখন 'কর্ম্মসু কৌশল' এই প্রকার সরল অন্বয় লাগিতে পারে,তখন "কর্ম্মসু যোগঃ" এইরূপ উল্টা-সোজা অন্বয় করা ঠিকও নহে। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকার সাম্যবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না এবং পূর্ণসিদ্ধি অথবা মোক্ষ না পাইয়া থাকে না—]

§§ কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি। ৫৩ ॥

(৫১) (সমত্ব) বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত (যে) জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তিনি জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া (পরমেশ্বরের) দুঃখবিরহিত পদে গিয়া পৌঁছেন. (৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহের পঙ্কিল আবরণ অতিক্রম করিবে, তখন যে সকল বিষয় শুনিয়াছ এবং

শুনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইবে।

[অর্থাৎ তোমার কিছু বেশী শুনিবার ইচ্ছা হইবে না; কারণ এই বিষয়সমূহ শুনিলে যে ফল হয়, তাহা পূর্ব্বেই তোমার লাভ হইয়া গিয়াছে। 'নির্বেদ' শব্দের উপযোগ প্রায় সংসারপ্রপঞ্চ হইতে পলায়ন বা বৈরাগ্য অর্থে করা হয়। এই শ্লোকে উহার সাধারণ অর্থ "ছাড়িয়া যাওয়া" বা "বাসনা না থাকাই।" পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেষভাবে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত, ত্রৈগুণ্যবিষয়ক শ্রৌতকর্ম্মের সম্বন্ধে।]

(৫৩) (নানা প্রকারের) বেদবাক্যে তোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমাধিবৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে, তখন (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হইবে।

[সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে, যে ব্যক্তি বেদবাক্যের ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া আছে, এবং যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন-না কোন কর্ম্ম করিবার ব্যাপার লাগিয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থির হয় না—আরও বেশী বিভ্রান্ত হইয়া যায়। এই জন্য নানা উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়া দিয়া চিত্তকে নিশ্চল সমাধির অবস্থায় রাখ, এইরূপ করিলে সাম্যবুদ্ধিরূপ কর্ম্মযোগ তোমার লাভ হইবে এবং বেশী উপদেশের প্রয়োজন থাকিবে না; এবং কর্ম্ম করিলেও তাঁহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এই ভাবে যে কর্ম্মযোগীর বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা স্থির হইয়া যায়, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। এখন অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, তাঁহার ব্যবহার কিপ্রকার হয়।]

অর্জ্জুন উবাচ।

§§ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

অর্জ্জুন বলিলেন (৫৪) হে কেশব! (আমাকে বুঝাও যে,) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে? ঐ স্থিতপ্রজ্ঞের বলা, বসা ও চলা কি প্রকার হয়?

[এই শ্লোকে 'ভাষা' শব্দ 'লক্ষণ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমি উহার ভাষান্তর, উহার ভাষ্ ধাতু অনুসারে "কাহাকে বলে" করিয়াছি। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ.   ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহার কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ভিত্তি এবং ইহা হইতে পরবর্ত্তী বর্ণনার গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে।]

শ্রীভগবান বলিলেন—(৫৫) হে পার্থ! যখন (কোন মনুষ্য নিজের) মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করে, এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকে, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। (৫৬) দুঃখে যাঁহার মন খিন্ন হয় না, সুখে যাঁহার আসক্তি নাই এবং প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলে। (৫৭) সকল বিষয়ে যাঁহার মন নিঃসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এবং যথাপ্রাপ্ত শুভাশুভে যাঁহার আনন্দ বা বিষাদও হয় না, (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। (৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের (হস্তপদাদি) অবয়ব সকল-দিক হইতে টানিয়া লয়, সেই প্রকার যখন কোন পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয় হইতে (নিজের) ইন্দ্রিয় সকলকে টানিয়া লয়, তখন (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। (৫৯) নিরাহারী পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও (তাহার) রস অর্থাৎ বাসনা চলিয়া যায় না। কিন্তু পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিলে বাসনাও চলিয়া যায়, অর্থাৎ বিষয় ও তাহার বাসনা উভয়ই চলিয়া যায়।

[অন্নের দ্বারা ইন্দ্রিয়পোষণ হয়। অতএব নিরাহার বা উপবাস করিলে ইন্দ্রিয়সকল অশক্ত হইয়া নিজ নিজ বিষয়সমূহ সেবন করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু এই ভাবে বিষয়োপভোগ দূর হওয়া কেবল জবরদস্তির, অক্ষমতার, বহিঃক্রিয়া হইল। ইহা দ্বারা মনের বিষয়বাসনা (রস) কিছু কম হয় না, এইজন্য এই বাসনা যাহা দ্বারা নষ্ট হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে; এই প্রকার ব্রহ্মানুভূতি হইলে পর মন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়সকলও আপনা-আপনিই আয়ত্ত থাকে; ইন্দ্রিয় সকলকে অধীন রাখিবার

। জন্য উপবাস প্রভৃতি উপায় আবশ্যক নাই,—ইহাই । এই শ্লোকের ভাবার্থ। এবং, এই অর্থই পরে ষষ্ঠ । অধ্যায়ের শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. । ১৬, ১৭ এবং ৩. ৬, ৭ দেখ) যে, যোগীর আহার । নিয়মিত রহিবে, তিনি আহার বিহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ । ছাড়িয়া দিবেন না। সারকথা, গীতার এই সিদ্ধান্ত । মনে রাখিতে হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় । উপবাস প্রভৃতি সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যাজ্য; । নিয়মিত আহার-বিহার এবং ব্রহ্মজ্ঞানই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের । উত্তম সাধন। এই শ্লোকে রস শব্দের 'জিহ্বা দ্বারা । অনুভবযোগ্য মিষ্ট, ঝাল, ইত্যাদি রস' এই প্রকার অর্থ । করিয়া কোন কোন ব্যক্তি এই অর্থ করেন যে, উপ- । বাসের দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় যদি চলিয়াও । যায়, তথাপি জিহ্বার রস অর্থাৎ পানাহারের ইচ্ছা হ্রাস । না হইয়া অনেক দিনের উপবাসের ফলে আরও বেশী । তীব্র হইয়া উঠে। এবং ভাগবতে এই অর্থেরই এক । শ্লোকও আছে (ভাগ. ১১. ৮. ২০)। কিন্তু আমার । মতে গীতার এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক । নহে। কারণ, দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে উহা মিল খায় না। । ইহা ব্যতীত ভাগবতে 'রস' শব্দ নাই 'রসনং' শব্দ । আছে এবং গীতার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণও সেখানে । নাই। অতএব, ভাগবত ও গীতার শ্লোককে একার্থক । মানিয়া লওয়া উচিত নহে। এখন পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে । আরও বেশী স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎ- । কার ব্যতীত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইতে পারে না—]

(৬০) কারণ এই যে, কেবল (ইন্দ্রিয়সকল দমন করিবার জন্য, প্রযত্নকারী বিদ্বানেরও মনকে, হে কুন্তী-পুত্র! এই প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্ব্বক নিজের অভি-প্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৬১) (অতএব) এই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে। এই প্রকার যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নিজের স্বাধীন হইয়া যায়, (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে।

। [এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নিয়মিত আহারের । দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের । জন্য মৎপরায়ণ হইতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে চিত্ত লাগা- । ইতে হইবে; এবং ৫৯ শ্লোকের আমি যে অর্থ করিয়াছি, । উহা হইতে প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মনুও । শুধু ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী পুরুষকে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, । "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" (মনু ২. ২১৫) । এবং উহারই অনুবাদ উপরের ৬০ শ্লোকে করা হইয়াছে। । সারকথা, এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যিনি । স্থিতপ্রজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে নিজের আহার-বিহার । নিয়মিত রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান । হইলেই মন নির্ব্বিষয় হয়, শরীর-ক্লেশের উপায় তো । অতিরিক্ত—প্রকৃত নহে। 'মৎপরায়ণ' পদে এস্থলে । ভক্তিমার্গেরও আরম্ভ হইল (গী. ৯. ৩৪ দেখ)। উপরের । শ্লোকে যে 'যুক্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'যোগের দ্বারা । প্রস্তুত'। গীতা. ৬.১৭ তে 'যুক্ত' শব্দের অর্থ 'নিয়মিত'। । কিন্তু গীতাতে এই শব্দের সর্ব্বদা ব্যবহৃত অর্থ হইতেছে— । সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গীতাতে কথিত হইয়াছে উহার । উপযোগ করিয়া তদনুসারে সমস্ত সুখ-দুঃখ শান্তভাবে । সহ্য করিয়া ব্যবহার কার্য্যে চতুর পুরুষ" (গী. ৫. ২৩ । দেখ)। এই রীতিতে নিষ্ণাত ব্যক্তিকেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' । বলে। তাঁহার অবস্থাকেই সিদ্ধাবস্থা বলে এবং এই । অধ্যায়ের এবং পঞ্চম ও দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে ইহারই । বর্ণনা আছে। ইহা বলা হইয়াছে যে, বিষয়সমূহের বাসনা । ত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার জন্য কি আবশ্যক। । এখন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে এই বর্ণিত হইতেছে যে, । বিষয়সমূহে বাসনা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এই বাসনা । হইতেই পরে কামক্রোধ প্রভৃতি বিকার কি প্রকারে । উৎপন্ন হয় এবং শেষে উহা দ্বারা মনুষ্যের বিনাশ । কিরূপে সাধিত হয়, এবং ইহা হইতে কি প্রকারে । মুক্তিলাভ হইতে পারে—]

(৬২) বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি বাড়িয়া যায়। আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসনা উৎপন্ন হয় যে, আমার কাম (অর্থাৎ ঐ বিষয়) লাভ করিতে হইবে। এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বিঘ্ন হইলে) ঐ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়; (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অবি-বেক আসে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে (পুরুষের) সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। (৬৪) কিন্তু নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহার অধীনে থাকে, সেই (ব্যক্তি) প্রীতি ও দ্বেষ হইতে মুক্ত নিজের স্বাধীন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়-সমূহে বিচরণ করিয়াও (চিত্তে) প্রসন্ন থাকেন। (৬৫) চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ নাশ হয়, কারণ যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন তাঁহার বুদ্ধিও তৎকালে স্থির থাকে।

। [এই দুই শ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, বিষয় বা । কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কেবল উহাতে আসক্তি । ত্যাগ করিয়া বিষয়েই অনাসক্ত বুদ্ধিতে বিচরণ করেন । এবং তিনি যে শান্তি লাভ করেন, তাহা কর্ম্মত্যাগের । ফলে নহে, কিন্তু ফলাশাত্যাগের ফলে প্রাপ্ত হয়েন। । কারণ ইহা ব্যতীত, অন্য বিষয়ে এই স্থিতপ্রজ্ঞ ও । সন্ন্যাসমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞের মধ্যে কোন ভেদ নাই। । ইন্দ্রিয়সংযম, নিরিচ্ছা ও শান্তি, এই গুণ উভয়েরই । আবশ্যক; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই । যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না কিন্তু লোক- । সংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে । থাকেন এবং সন্ন্যাসমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞ করেনই না (গী. ৩. । ২৫ দেখ)। কিন্তু গীতার সন্ন্যাসমার্গী টীকাকার এই । প্রভেদকে গৌণ বুঝিয়া সাম্প্রদায়িক আগ্রহে প্রতিপন্ন । করিয়া থাকেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের উক্ত বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গ । সম্বন্ধীয়ই। এক্ষণে এই প্রকারে যাহার চিত্ত প্রসন্ন । নহে, তাহার বর্ণনা করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ আরও । বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করা হইতেছে—]

(৬৬) যে ব্যক্তি উক্ত প্রণালীতে যুক্ত অর্থাৎ যোগ-যুক্ত হয় নাই, তাহার (স্থির) বুদ্ধি ও ভাবনা অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠাও থাকে না। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই এবং যাহার শান্তি নাই তাহার কোথা হইতে সুখলাভ হইবে? (৬৭) (বিষয়সমূহে) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্দ্রিয়সমূহের পশ্চাতে পশ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়ু যেমন আকর্ষণ করে, পুরুষের বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব

হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়সকল হইতে যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল চারি দিক হইতে সরিয়া আসিয়াছে, (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে।

[সার কথা, মনের নিগ্রহের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ করা সকল সাধনের মূল। বিষয়সমূহে লিপ্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকল এদিকে-ওদিকে যদি দৌড়াইতে থাকে তবে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার (বাসনাত্মক) বুদ্ধিই হইতে পারে না। অর্থ এই যে, বুদ্ধি না হইলে তাহার বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও সুখও লাভ হয় না। গীতারহস্যের চতুর্থপ্রকরণে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে একেবারে চাপিয়া সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু গীতার অভিপ্রায় এই যে, ৬৪ শ্লোকে যে বর্ণনা আছে তদনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত।]

(৬৯) সকল লোকের যাহা রাত্রি, তাহাতে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন এবং যখন সমস্ত প্রাণী জাগিয়া থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রাত্রি মনে হয়।

[এই বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা আলঙ্কারিক। অন্ধকারকে অজ্ঞান এবং প্রকাশকে জ্ঞান বলা হয় (গী. ১৪. ১১)। অর্থ এই যে, অজ্ঞানী লোকের নিকট যে বস্তু অনাবশ্যক মনে হয় (অর্থাৎ উহাদের নিকট যাহা অন্ধকার) তাহাই জ্ঞানী লোকের নিকট আবশ্যক; এবং যাহাতে অজ্ঞানী লোক মগ্ন থাকে—উহাদের নিকট যেখানে উজ্জ্বল মনে হয়—সেইখানেই জ্ঞানীব্যক্তি অন্ধকার দেখেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানীর অভীষ্ট নহে। উদাহরণ যথা, জ্ঞানী ব্যক্তি কাম্য কর্ম্মকে তুচ্ছ মনে করেন, আর সাধারণ লোক উহাতে ডুবিয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যে নিষ্কাম কর্ম্ম চাহেন, অন্যান্য লোক তাহা চাহে না।]

(৭০) চারি দিক হইতে (জল) পূর্ণ হইলেও যাহার মর্য্যাদা অতিক্রান্ত হয় না, সেই সমুদ্রে যেপ্রকার সমস্ত জল চলিয়া যায়, সেইপ্রকার যে ব্যক্তিতে সমস্ত বিষয় (তাঁহার শান্তিভঙ্গ না করিয়াই) প্রবেশ করে, তাঁহারই (প্রকৃত) শান্তিলাভ হয়। বিষয় ইচ্ছা যে করে তাহার (এই শান্তি) (লাভ হয়) না।

[এই শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, শান্তিলাভের জন্য কর্ম্ম করিবে না, প্রত্যুত ভাবার্থ এই যে,সাধারণ লোকের মন ফলাশা ও কাম্যবাসনার কারণে বিমূঢ় হইয়া যায় এবং উহাদের কর্ম্মের দ্বারা উহাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়; কিন্তু যিনি সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন,তাঁহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হয় না, যতই কর্ম্ম করিতে হোক না কেন, তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যায় শান্ত থাকেন এবং সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন; অতএব তাঁহার সুখ-দুঃখের ব্যথা হয় না। (উক্ত. ৬৪ শ্লোক এবং গী·৪, ১৯ দেখ)। এখন এই বিষয়ের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার নাম কি—]

§§ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সাংখ্য-
যোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২॥

(৭১) যে ব্যক্তি সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসক্তি, ছাড়িয়া এবং নিস্পৃহ হইয়া (ব্যবহারে) বিচরণ করেন, এবং যাঁহার মমত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

[সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার এই 'চরতি' (বিচরণ করেন) পদের "ভিক্ষা মাগিয়া ফেরেন" এইরূপ অর্থ করেন; কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্ব্বের ৬৪ ও ৬৭ শ্লোকে 'চরন্' এবং 'চরতাং'এর যে অর্থ, সেই অর্থই এখানেও করিতে হইবে। গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা মাগিবেন। হাঁ, ইহার বিপরীতে ৬৪ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রিয়সকলকে নিজের আয়ত্ত রাখিয়া 'বিষয়ে বিচরণ করিবেন'। অতএব 'চরতি'র 'বিচরণ করেন' অর্থাৎ 'জগতের ব্যবহার করেন' এই অর্থই করিতে হইবে। শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের উত্তরার্দ্ধে এই বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'নিস্পৃহ' চতুর পুরুষ (স্থিতপ্রজ্ঞ) ব্যবহারে কি প্রকার চলেন; এবং উহাই গীতারহস্যের চতুর্দ্দশ প্রকরণের বিষয়।]

(৭২) হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা পাইলে পর কেহই মোহে পতিত হয় না; এবং অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালেও এই স্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হওয়া স্বরূপ মোক্ষ লাভ করে।

[এই ব্রাহ্মী স্থিতি কর্ম্মযোগের চরম ও অত্যুত্তম অবস্থা (গী. র. প্র. ৯. পৃ. ও দেখ); এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় না। এস্থলে এই বিশেষত্ব বলিবার কোন কারণ আছে। তাহা এই যে, যদি কোন দিন দৈবযোগে দু'এক ঘণ্টার জন্য এই ব্রাহ্মী স্থিতি অনুভূত হয়, তবে তাহাতে কিছু চিরন্তন লাভ হয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যদি কোন মনুষ্যের এই স্থিতি না থাকে, তবে মরণকালে যেমন বাসনা রহিবে তদনুসারেই পুনর্জন্ম হইবে (গীতারহস্য পৃ দেখ)। এই কারণেই ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণনা করিতে গিয়া এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 'অন্তকালেঽপি'=অন্তকালেও স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থা স্থির থাকে। অন্তকালে মনকে শুদ্ধ রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতা উপনিষদে (ছা. ৩. ১৪, ১; প্র. ৩. ১০) এবং গীতাতেও (গী. ৮. ৫. ১০) বর্ণিত হইয়াছে। এই বাসনাত্মক কর্ম্ম পরবর্ত্তী অনেক জন্মলাভের কারণ, এইজন্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, অন্ততঃ মৃত্যুসময়ে বাসনাশূন্য হইতে হইবে। আবার ইহাও বলিতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসনাশূন্য হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ বাসনাশূন্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কাহারও উহা প্রাপ্ত হওয়া কেবল কঠিন নহে, অসম্ভবও বটে। মৃত্যুকালে বাসনা শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এই

। তত্ত্ব কেবল বৈদিক ধর্ম্মেই নাই, অন্যান্য ধর্ম্মেও এই
। তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতারহস্য পৃ দেখ।]

এই প্রকারে শ্রীভগবানের গীত অর্থাৎ কথিত উপ-নিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—শাস্ত্র-বিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বাদে সাংখ্য-যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

। [এই অধ্যায়ে, আরম্ভে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গের
। আলোচনা আছে, এই কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম
। দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে
। হইবে না যে সমস্ত অধ্যায়ে ঐ বিষয়ই আছে। একই
। অধ্যায়ে প্রায় অনেক বিষয় বর্ণিত হয়। যে অধ্যায়ে,
। যে বিষয় আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে, কিম্বা যে বিষয়
। উহাতে মুখ্য, তদনুসারেই ঐ অধ্যায়ের নাম রাখিয়া
। দেওয়া হইয়াছে। গীতারহস্য প্রকরণ ১৪. পৃ. দেখ।]

Brahma Dharma.

CHAP. V.

35. Ishavasyamidam etc.

As the birds cover their fledglings with their own wings, and protect them from all kinds of harm, so is the whole of this universe covered and overspread and continually protected by the supreme Lord. He is the king of kings of this universe. He is our father, protector and friend, His rule prevails everywhere, His love is manifest on all sides; leave all sinful thoughts and worldly greed, attain that loveable Being, and enjoy the highest bliss. As disease is an unhealthy state of the body, so is sin an unhealthy state of the mind. As during illness one has no desire for food, so in a state of sin one has no wish to enjoy the bliss of Brahma; therefore having healed and cleansed thy mind by renouncing all sinful thoughts and deeds, thou shalt then enjoy divine bliss. The wicked and erring son can never love his father, nor can he realise his father's love for him; he lives in constant fear of his judgment. Similarly the sinful man who daily transgresses the moral laws laid down by our holy Father, and receives the punishment due to him, is always sad and depressed; how can he have his wayward troubled and unclean mind in those waters of love, by realising within himself His all-peaceful all-pure and all-beneficent nature? Therefore he who desires to obtain Brahma must renounce all worldly desire, he must altogether abandon sinful thoughts, sinful words and sinful deeds,—he must not behave unjustly to others, he must not covet another man's wife, he must not covet his neighbour's goods.

36. Onejadekam etc.

Motion means going from one place to another. The one and only Highest Brahma is present everywhere wholly and equally,—there is no place where He is not; therefore there is no possibility of His going from one place to another. Thus He is motionless,—He moves not. Though motionless, yet is He swifter than the mind; the mind cannot overtake Him, nor can the senses grasp Him. Howsoever hard the swiftly-moving mind and senses may strive to reach Him, He, though motionless, seems to overstrip them. The air regulates the bodily functions of all living beings. Without air the body becomes disrupted within a very short time; but if He from whom the air has received this force did not exist, then from whom else could it have obtained the power to sustain the bodily life of all creatures? therefore has it been said that "through His presence the air regulates the bodily functions of all living beings."

37. Tadejati tannaijati etc.

Men move in order to reach some other place, but since He is ever present in all places, the purpose of movement is already fulfilled; therefore has it been said: "He moves", that is to say the function of motion

is accomplished in Him. But He does not move in the same way as men walk from one place to another; because He is fully omnipresent. He exists even in the furthest star. Not only is He present far from us, but He is also near us, so near that He is within us; and as He is within us all, so also is He outside us. He is not confined to any one particular spot, like a king who, sitting upon his own throne, thence rules over his kingdom. He protects the whole universe by remaining equally in all places.

38. Yastu Sarvani etc.

All things exist in the Supreme Spirit; He is the refuge of all things, and they all depend upon Him. He who knows the Supreme Soul to be the support of all things, and sees Him present in all creatures, does not hold any one in contempt. He sees that we are all children of that Immortal Being; nobody is considered negligible or contemptible by that protector of the universe, who governs all things; therefore he does not despise or hate anyone. He treats every one, high and low, with the consideration due to their respective qualities.

39. Saparyagacchukramakayam etc.

The Supreme Spirit is all-pervading and omnipresent; He is pure and undefiled, He is aloof, no stain or defect can touch Him. He possesses no limbs or features; therefore is He without veins and without blemish or scar. He has no bodily informity or pain. As He is without body, so is He without mind; so that He is not even subject to sin or remorse, which are sufferings of the mind. He is not as we are, prostrated with disease, racked with grief, and troubled with sin; He has no disease, no sorrow and no sin; He is spotless, pure and unwounded by sin. He is an all-seeing poet. Whether it be the perfect order of the solar system, or the enchanting beauty of the honey-shedding full moon, or the wonderful charm of the jewels of wisdom and piety, each and all of these are the creations of His marvellous skill. He is the ruler of the mind. This Supreme Lord has establis hed divers laws in the minds of diver kinds of creatures; but the one indivisible aim of all these laws is the happiness of them all. Especially has He subjected the mind of man to wonderful laws by which His soul may rise ever higher with the progress of His wisdom and piety. The soul of man is to Him a precious treasure, and He cherishes it with the utmost care. He has established religious laws, whereby it may be saved from the depths of ignorance, sorrow and sin, and attain the knowledge and bliss of Brahma. He is highest of all. He is self-revealed. All living things have been created and revealed by Him. He is birthless eternal, uncreated and unrevealed by anyone else. He is everlastingly self-revealed. He ordains all things duly for His chidren at all times. All those insects, worms and ants; fish, tortoises and crocodiles; birds beasts and men; and the infinite millions of invisible tiny creatures with which earth water and sky, holes and dens are filled;— He ordains for them all at all times in due and just manner, all things to eat and drink and enjoy that they may desire; which having received they wander about with glad hearts.

ভাস্কর রায়।

(গুরুপরম্পরাচরিত্রলিখিত জীবনচরিত)

(শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ)

ভাস্করপিতা গম্ভীররায়।

দাক্ষিণাত্যে বীজাপুর নগরে সত্যপরায়ণ প্রজা-বৎসল এক মুসলমান রাজা ছিলেন। গম্ভীর রায়

নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। গম্ভীর রায় বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, আবার মুসলমানশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি মুসলমান রাজার অমাত্য হইলেও অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত আচারানুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। তিনি রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। রাজা তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। সেই মুসলমান রাজার আজ্ঞায় গম্ভীররায় মহাভারতের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ভারতী" উপাধি প্রদান করেন। পরে তিনি বিষ্ণুর সহস্রনামের কারিকা রচনা করেন। তাঁহার পত্নীর নাম কোণমাম্বা। কোণমাম্বার গর্ভে নারায়ণ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নারায়ণ বিদ্যা ও বুদ্ধি দ্বারা পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্য পিতা মাতা নিতান্ত অসুখী ছিলেন।

জন্মবিবরণ ও বাল্যচরিত।

একদা এক সাধু গম্ভীর রায়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন গম্ভীর রায় রাজকার্য্যে স্থানান্তরে ছিলেন। কোণমাম্বা দুঃখিতান্তঃকরণে সাধুর নিকট সুপুত্রলাভকর বর প্রার্থনা করেন। সাধু তাঁহাকে সৎপুত্রলাভকর ভাস্করব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—এই ব্রতের ফলস্বরূপ তোমার যে পুত্র হইবে, সে শঙ্করাচার্য্যের মত ভাষ্যকর্ত্তা, শ্রীহর্ষের ন্যায় বিদ্বান্, সূর্য্যের মত তেজস্বী, কালিদাসের তুল্য কবি এবং বৃহস্পতির সদৃশ আলাপপটু হইবে। কোণমাম্বা সাধুপদিষ্ট ভাস্কর ব্রত অবলম্বন করিয়া গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভাবস্থায় গম্ভীর রায় রাজকার্য্যে ভাগ্যপুর নামক স্থানে গমন করেন, পতিবিরহে অক্ষমা কোণমাম্বাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। সেই ভাগ্যপুরেই বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে কৃত্তিকা নক্ষত্রে ভাস্কর রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মসময়ে সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্র এই পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী ছিল। ভাস্কর-ব্রত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, পিতা মাতা পুত্রের নাম রাখিলেন ভাস্কর। ভাস্কর প্রথমবর্ষ বয়সেই প্রস্ফুট আলাপে সমর্থ হইলেন। দ্বিতীয় বর্ষে লিপিজ্ঞানে পটুতা লাভ করিলেন। তৃতীয় বর্ষে পিতার নিকটেই শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দঃ নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কাশীতে উপনয়ন।

তাঁহার চতুর্থবর্ষ বয়সের সময়ে গম্ভীর রায় রাজকার্য্য হইতে এক বৎসরের অবসর লইয়া স্ত্রীপুত্র দাস দাসী যান বাহন ও উপযুক্ত শরীররক্ষক প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। কাশীতে উপস্থিত হইয়া ভাস্করের জন্ম হইতে গণনায় তিন বৎসর নয়মাস বয়সে অর্থাৎ গর্ভগণনায় পঞ্চমাব্দে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করেন। গম্ভীর রায় উপনয়নে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপনয়ন উপলক্ষে কাশীস্থ সমস্ত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গ আহূত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রখরবুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী বালক ভাস্করকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বমান্য "সভেশ্বর" যতীন্দ্র ভাস্করকে নিকটে আহ্বান করত উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—শীঘ্র তোমার বিবাহ সম্পাদন করিবার জন্যই তোমার পিতা এত শৈশবে তোমার উপনয়ন দিয়াছেন। ইহার উত্তরে ভাস্কর বলিয়াছিলেন—ইহাতেই বা দোষ কি? আপনিও ত সুখে ভিক্ষান্ন লাভ করিবার জন্যই বানপ্রস্থ আশ্রম উল্লঙ্ঘন করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। শিশুর মুখে এইরূপ প্রৌঢ় উত্তর শুনিয়া যতীন্দ্র অতীব সন্তুষ্টচিত্তে গম্ভীর রায়কে বলিলেন—এই বালক নিশ্চয়ই দেবতার অংশ, নতুবা এই বয়সে এইরূপ প্রৌঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইত না। গম্ভীর রায় উপনয়ন কার্য্য শেষ করিয়া পরিজনবর্গ সহ রাজধানী বীজাপুরে উপস্থিত হইলেন।

ভাস্করের বিদ্যাগুরু নৃসিংহযজ্বা।

শৃঙ্গেরীমঠস্বামীর আশ্রিত মন্ত্রবেত্তা অষ্টাদশবিদ্যাপারগ নৃসিংহযজ্বা নামক এক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি যজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্বসূত্রোক্ত ঋষিছন্দোহীন গাথাময় মন্ত্রগুলিকে শ্রুতিপ্রমাণবলে ঋষিচ্ছন্দোযুক্ত করিয়াছিলেন। নানাদেশীয় রাজগণ এই পণ্ডিতবর্য্যকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নৃসিংহযজ্বা শৃঙ্গেরী মঠ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে স্বীকার করেন নাই। পরে মল্লভূপ নামক কোন রাজা অনেক সাধনা করিয়া এবং শৃঙ্গেরীমঠস্বামীর দ্বারা অনুরোধ করাইয়া নৃসিংহযজ্বাকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজদত্ত উত্তম গৃহে সাগ্নিক বাস করিয়া ইনি সুখে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় নিরত হইলেন। রাজাও ইঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। মল্লভূপ রাজা অশেষ অর্থব্যয় করিয়া নৃসিংহযজ্বার দ্বারা ক্রমে সোমযাগ প্রভৃতি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন, ইঁহার অনুগ্রহেই পুত্রলাভে সমর্থ হইয়া ইঁহার প্রতি অধিকতর ভক্তিযুক্ত হইলেন।

রাজার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী অদ্বৈতমতবিরোধী এক লেখকশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী নৃসিংহযজ্বার এবম্বিধ রাজসম্মান প্রাপ্তিতে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া রাজাকে বলিলেন—মহারাজ, এই নৃসিংহযজ্বা নিজ গৃহে গোপনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৌলমত অবলম্বন করিয়া উপাসনাদি করেন, অথচ বাহিরে বৈদিকাচারপরতায় ভান করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব এবম্বিধ ভণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাজা ইহার বাক্যে বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে তিন বৎসর পর্য্যন্ত লেখকের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা একদিন অত্যন্ত ক্রোধের সহিত লেখককে বলিলেন—তুমি যদি গুরুদেবের এইরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম দেখাইতে পার তবে বিশ্বাস করিতে পারি, নতুবা তোমাকে যথোচিত শাস্তি দিব। লেখক ইহাতেই স্বীকৃত হইয়া, একদিন নৃসিংহগুরু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অভেদজ্ঞানে তন্ময় হইয়া ইষ্টদেবতার উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় রাজাকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। রাজা সেই সময়ে নৃসিংহগুরুর অলৌকিক দেহজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নৃসিংহযজ্বা উপাসনান্তে রাজাকে দর্শন করিয়া বলিলেন—তুমি লেখকের বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া কেন অসময়ে আমার নিকট আসিলে, ইহার জন্য তোমাকে কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করিতে হইবে, শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর। রাজা বাড়ী আসিয়া দেখিতে পাইলেন—তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মারা গিয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া বিবেচনা করিলেন,—আমি গুরুদেবের নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার ফলেই আমার এই দুর্দ্দশা, এবং লেখকই ইহার একমাত্র কারণ। এই মনে করিয়া লেখককে বেত্রাঘাতে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এইভাবে হত লেখক পিশাচত্ব লাভ করিয়া রাজাকে নিতান্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

নৃসিংহ যজ্বা রাজার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার আশ্রয় পরিত্যাগ করত স্ত্রী-পুত্রাদি ও অগ্নিসহ প্রস্থান করিলেন। নৃসিংহগুরু ভিন্ন পিশাচভয় দূর করিবার অন্য উপায় নাই মনে করিয়া রাজা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—গুরুদেব নারায়ণপেট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। রাজা তথায় গমন করিয়া প্রথমতঃ গুরুদেবের দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না; পরে বহু চেষ্টায় দর্শন পাইলেও গুরুদেব কিছুতেই তাঁহার সহিত কথা বলিলেন না। রাজা নিরুপায় হইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন এবং এক লৈঙ্গ [শিবোপাসকবিশেষ] দ্বারা পিশাচভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। রাজা পরে ঐ লৈঙ্গের মত গ্রহণ করিয়া লিঙ্গী হইলেন।

গুরুগৃহে গমন ও অধ্যয়ন।

নৃসিংহযজ্বা নারায়ণপেটে অবস্থান করিয়া বহু শিষ্যের অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এইস্থানে স্বামী শাস্ত্রী নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে নৃসিংহ সপুত্রক শৃঙ্গেরী মঠে গমন করিয়া তথা হইতে নারায়ণপেটে আসিবার সময়ে বীজাপুরে গম্ভীররায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি ঋক্‌সংহিতা অধ্যয়ননিরত বালক ভাস্করকে দেখিতে পাইয়া গম্ভীররায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে এই বালক, বয়সে বালক হইলেও প্রৌঢ়ের মত অধ্যয়ন করিতেছে? ইহার অধ্যাপকই বা কে? তদুত্তরে গম্ভীর রায় বলিলেন—এই বালক আমারই পুত্র, আমার নিকটেই অধ্যয়ন করে। রাজকার্য্যবশতঃ অবসরের অভাবহেতু আমি রীতিমত অধ্যাপনা করিতে পারি না, কোন কোন সময়ে মুখে মুখে পাঠ বলিয়া দেই, তাহাই শুনিয়া শুনিয়া অঙ্গের সহিত সমস্ত ঋক্‌সংহিতা অভ্যাস করিয়াছে, এবং ক্রীড়াচ্ছলে পুস্তক ব্যতিরেকেই সেই সকল আবৃত্তি করিয়া থাকে। এখন ইহার সপ্তম বর্ষ বয়স চলিতেছে। রাজকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া এখন আর আমি ইহার অধ্যাপনা চালাইতে পারিতেছি না। ইহা শুনিয়া নৃসিংহ বলিলেন—আমার পুত্র [স্বামী শাস্ত্রী] কে আমি প্রত্যহ অহর্নিশ রীতিমত অধ্যয়ন করাইতেছি, তাহাতে উপনয়নের পর তিন বৎসরে সমগ্র যজুঃসংহিতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। ইহাতেই সকলে তাহাকে সুধী বলে। এখন দেখিতেছি লোকের এই উক্তি বৃথা। আপনার পুত্র তিন বৎসরের মধ্যে কেবল মুখে মুখে শুনিয়া সমগ্র সাঙ্গ ঋক্‌সংহিতা অভ্যাস করিয়াছে, আর আমার বালক রীতিমত অহর্নিশ তীব্র অধ্যয়নে তিন বৎসরে সমগ্র যজুঃসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছে; এই অবস্থায় আমার পুত্র আপনার পুত্রের তুল্য হইতে পারে না। বহু শিষ্যের মধ্যেও আপনার পুত্রের তুল্য সুধী অধ্যেতা দৃষ্ট হয় না। অল্পবুদ্ধি শত শত শিষ্যের অধ্যাপনা অপেক্ষা এইরূপ বুদ্ধিমান্ একটি শিষ্যের অধ্যাপনাও ভাল। আপনার পুত্রের অধ্যাপনার ভার আমিই গ্রহণ করিব। গম্ভীর রায় এই কথা শ্রবণে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বহু ধন ও পরিচারকের সহিত পুত্রকে যানে আরোহণ করাইয়া নৃসিংহ যজ্বার সহিত বিদায় দিলেন। ভাস্কর রায় নৃসিংহ যজ্বার গৃহে উপস্থিত হইয়া গুরুপুত্রের সহিত একত্র অধ্যয়ন করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নৃসিংহ গুরুর

নিকট প্রথম বর্ষে সমগ্র যজুর্ব্বেদ, দ্বিতীয় বর্ষে সমগ্র সামবেদ এবং তৃতীয় বর্ষে সমগ্র অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেন।

গৃহাগমন ও বিবাহ।

এই সময়ে গম্ভীর রায় ভাস্করের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে বাড়ী আনাইলেন। তিনি বাড়ী আসিয়াও রুমন্ নামক পণ্ডিতের নিকট ছন্দঃ-শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে ভাস্করের বিবাহ হইল। বিবাহের পর কিছুকাল গৃহে বাস করত একাদশ বর্ষ বয়সে ছন্দঃশাস্ত্রে "ছন্দোভাস্কর" ও "ছন্দঃকৌস্তুভ" নামক বিদ্বজ্জন-মান্য গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

পুনর্ব্বার গুরুগৃহে গমন ও অধ্যয়ন।

পুনর্ব্বার নারায়ণপেটে নৃসিংহ গুরুর নিকট গমন করিয়া ক্রমে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ [সঙ্গীতশাস্ত্র], স্থাপত্য বিদ্যা [অর্থশাস্ত্র], মীমাংসা [পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা], সমস্ত শিক্ষা প্রভৃতি ছয় অঙ্গ, ন্যায়শাস্ত্র, সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সমগ্র পুরাণ ও উপপুরাণ অধ্যয়ন করিলেন। এইরূপে নৃসিংহ গুরুর নিকট ষোড়শবর্ষ বয়সের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন।

এই সময়ে ভাস্করের যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার দেহের বিশালতা ও উন্নতি, সুদীর্ঘ বাহু, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, পরিপুষ্ট মাংসপেশী-সমূহ, দৈহিক বল ও কান্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে লাগিল। এই স্থলে গ্রন্থকার ভাস্কর সম্বন্ধে যে একটি শ্লোক লিখিয়াছেন, ভাস্করের গ্রন্থ পাঠ করিলে সেই শ্লোকের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্লোকটি এই—

"তর্কে গৌতম এব পাণিনিরসৌ শাব্দে পরো জৈমিনি-
র্মীমাংসাসু সুধর্ম্মশাস্ত্রকথনে সাক্ষান্মনুর্ব্বা গতঃ।
বাগ্মিত্বে বাক্‌পতিরেব কাব্য উশনাঃ পৌরাণিকে ব্যাসবদ্
ভাষ্যে শঙ্করপাদ ইত্থমবনৌ শ্রীভাস্করঃ সর্ব্ববিৎ॥"

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিচয়।

জ্ঞানাঙ্কুর। প্রথম ভাগ। ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সপ্তম সংস্করণ। মূল্য ।৵০ আনা।

গ্রন্থখানির নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। লেখক যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁহার যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি শিশুদিগের পাঠোপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া এই জ্ঞানাঙ্কুর প্রথম ভাগ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি প্রবন্ধ "বিবিধার্থ সংগ্রহে"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনকার বিদ্বজ্জ-সমাজ এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ইহা শিশুদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া আসিতেছে। আজকালের একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে ইহার বিশেষত্ব সহজেই ধরা পড়িবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, তখনকার অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ যেমন বালকদিগের পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক রচনা করিতেন, এখনকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ তাহা করেন না। তাঁহাদিগের এদিকে লক্ষ্যই নাই। আজকালকার শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ইহার আসন অতি উচ্চে।

পুরাণ-তত্ত্ব। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

আমরা এই "পুরাণ-তত্ত্বে"র প্রথম খণ্ড পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম। লেখক ইহাতে যেরূপ স্বাধীন ও বিস্তৃতভাবে পুরাণের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি প্রশংসার্হ। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ নির্ভীক সত্য সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। লেখক অতি নিপুণতার সহিত পুরাণের মধ্য হইতে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রক্ষিপ্তাংশগুলি টানিয়া বাহির করিতেছেন। ইহাতে শুধু যে পুরাণের সত্য রূপটাই পাইয়া আমরা ধন্য হইব তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের মূল তত্ত্বের ঐতিহাসিক দিকটাও পরিষ্কার হইয়া আসিতে পারে। ইহার বিচার্য্য বিষয়টী নীরস হইলেও রচনাভঙ্গির গুণে পড়িতে বেশ ভাল লাগে।

চরিত্র। কলিকাতা শাঁখারি টোলা ৩৮ নং ক্রীক রো হইতে শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক নিবেদনে জানাইয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে লোকে শিক্ষিত হইয়াও নীতিজ্ঞান অভাবে অসৎসংসর্গে বিলাসিতাতে ও প্রবঞ্চনাদিতে চরিত্রবিষয়ে দিন দিন যেরূপ হীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উন্নতির আশা কিছুই দেখিতেছি না। সেইজন্য স্বর্গীয় রামচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের দ্বাদশটী

নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া "চরিত্র" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিলাম।" উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু প্রবন্ধগুলি বহুদিন পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া ইহাতে বর্ত্তমান কালোপযোগী ভাব, ভাষা ও চিন্তাশীলতার একান্ত অভাব এবং আকারেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আজকালকার পাঠক ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন কি না সন্দেহ।

নিবৃত্তির পথে। শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত, ২৭ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে অতি সংক্ষেপে ছয়টী দর্শন ও পৌরাণিক সাধন তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক নিজেও নিবৃত্তিপথেরই পথিক; তাই তিনি শুধু অধ্যয়নের নহে, অভিজ্ঞতারও বাণী কিছু কিছু আমাদিগকে শুনাইতে পারিয়াছেন। ইহাতে সংগৃহীত প্রবন্ধের অনেকগুলিই পূর্ব্বে "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। দার্শনিক আলোচনাগুলি বড় গুরু হইয়াছে; আর একটু হাল্কা হইলে ভাল হইত।

কৃষিজীবী পোদদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিভিন্ন জাতিবিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। ডায়মণ্ডহারবার "নিখিল বঙ্গীয় ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি" হইতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরদার বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

পুস্তকখানি ইংরাজিভাষায় লিখিত। লেখক ইহাতে কৃষিজীবী পোদজাতির মূলান্বেষণ এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, জীবননির্ব্বাহের প্রণালী ও সামাজিক রীতি-নীতির আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত অতি সংক্ষেপে বাঙ্গালার উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও তাহার পরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য। লেখক দেখাইয়াছেন যে, এই পোদ শব্দটী সংস্কৃত পৌণ্ড্র শব্দেরই অপভ্রংশ; এবং তিনি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণও করিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র শব্দ ক্রিয়াহীন ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের বাচক। লেখকের অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; তবে আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান-যুগে শাস্ত্রের নজীর দেখাইয়া নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা কার্য্যত বড় হইবার চেষ্টা করাই ভাল।

শোকসংবাদ।

সঙ্গীতাচার্য্য ৺ শ্যামসুন্দর মিশ্র। বিগত ১৩ই বৈশাখ বুধবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় নিউমোনিয়া রোগে বঙ্গ-সঙ্গীতাকাশের একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্যামসুন্দর মিশ্র মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ মদনমোহন মিশ্র। শ্যামসুন্দর মিশ্র মহাশয়ের আদি নিবাস হিন্দুস্থান; কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতা। সুখলাল জহরীর লেনে ইঁহার নিজের বাড়ী আছে। ইঁহার সন্তান একমাত্র কন্যা। ইনি জামাতাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইনি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতগুরু স্বর্গীয় শিবনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহার সুমিষ্ট-কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ইঁহাকে আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালাগান শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি সঙ্গীতসঙ্ঘে বাঙ্গালা গান এবং কলিকাতা সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র মহিলাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইনি তবলা বাদ্যেও ওস্তাদ ছিলেন। স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবী শ্যামসুন্দর বাবু ও কৌকভ খাঁকে সঙ্ঘের প্রথম অবস্থা হইতেই সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মৃত্যুকাল সন্নিকট বুঝিয়া ইনি জামাতাকে নিকটে বসাইয়া তাহাকে কেবল "সরগম" শুনাইবার আদেশ করেন। "নাদব্রহ্ম" ইহা ভাবিয়াই তিনি বোধ হয় তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি পত্নী, একটী মাত্র কন্যা ও এক জামাতা রাখিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন।

রায় বাহাদুর ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। এডুকেশন গেজেটের পরিচালক, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বিগত ২৫শে বৈশাখ পরলোকগমন করিয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্য-সেবায় ও নানা জনহিতকর ব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর সহিত এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের যোগ ছিল। মুকুন্দ বাবু সেভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত না থাকিলেও তিনি চিরকাল পিতার আদর্শে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যখনই কোন উপাদেয় প্রবন্ধ বাহির হইত তিনি এডুকেশন গেজেটে তাহা অবিলম্বে উদ্ধৃত করিয়া দিতেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর "জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতি" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশের জন্য অন্যান্য পত্রিকার কার্য্যালয়ে পাঠান, কিন্তু কেহই প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু উহা মুকুন্দ বাবুর হস্তগত হইলে তিনি নির্ভীকতার সহিত উহা নিজ পত্রে বাহির করেন। পিতার আদর্শ কেমন করিয়া জীবনে ধারণ করিতে হয়, এবং কেমন করিয়া তাঁহার আদর্শ আজীবন পালন করিতে হয়, মুকুন্দ বাবু তাহার যে জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, তাহা অন্যত্র নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ও অনুরূপা দেবী যে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা হইতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহারই দৃষ্টান্তের ও সুচেষ্টার ফলে। আমরা মুকুন্দ বাবুর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।
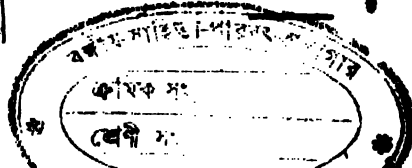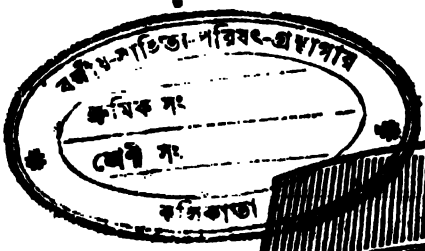
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সামাজিক উপাসনা। *

উপাসনা—দেবতার পূজা অর্চ্চনা, অতি পুরাকাল হ'তে পৃথিবীতে প্রচলিত। সকল দেশে, সকল যুগে, সকল জন-সমাজে, এই পূজা চ'লে আস্‌চে। অবশ্যই এর একটা কারণ আছে। আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিরা এ'কে সহজ ক্রিয়া বলেচেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণও ঐ কথার সাক্ষ্য দান করেচেন। আরিস্টটল (Aristotle) বলেচেন It is not requisite in scientific principles to investigate the why, but each of the principles ought to be credited itself through itself, কেন স্বভাবসিদ্ধ তাহা বিচারসাপেক্ষ নহে। লর্ড হারবার্ট চারবর্গ (Lord Harbert of Charburg) বলেচেন ঈশ্বরের পূজা করা মানুষের প্রকৃতিগত—Implanted in human nature. হিউম এবং রীড (Hume and Reid) বলেচেন This truth is self evident, অর্থাৎ এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ। আধুনিক প্রোফেসার নিউম্যানের (Prof. Newman) "The Gazing Soul" অর্থাৎ মানবাত্মা, পরমাত্মার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, ইহা অতি সত্য। বাস্তবিকই মানবাত্মা চাতক পক্ষীর ন্যায় কেবল 'জল-জল' ডাক্‌ছে। এ কথা অস্বীকার করবার যো নাই।

ত্রিবিধ পূজা।

ব্রহ্মপূজা তিন প্রকার—নির্জ্জন, পারিবারিক ও সামাজিক। এ তিনই অতীব আবশ্যক। কেহ হয়ত বলবেন "বিজনে ব'সে আপনার ইষ্টদেবতার আরাধনা, চিন্তা ও উপাসনা করলেই হলো। তাহাতেই মানবাত্মার সব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হয়।" এ কথা ঠিক নয়। পরে তার আলোচনা করব। নির্জ্জন সাধনা অদ্যকার বিষয় নয়। সব সাধকই তাহার প্রয়োজন স্বীকার করে থাকেন। আজ পারিবারিক উপাসনার বিষয় অল্প একটু বলে, সামাজিক পূজার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা।

পারিবারিক পূজা।

মানুষ একা থাকে না। সে সংসারী। পরিজনবর্গকে নিয়ে একত্র বাস করে—একত্র বসা ওঠা করে—একত্র আহার করে ও নানা সদালাপে নিযুক্ত থাকে। আর, যে কাজটা সব চেয়ে প্রিয় ও মিষ্ট, সেটা তাদের ছেড়ে কি হয়? পরিবারবর্গ সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে ভগবানকে ডাকতে কেমন ভাল লাগে। নির্জ্জন সাধনা বাড়ীর ছেলে মেয়েরা দেখে না। সকলে মিলে মিশে পূজা করলে দেখে শুনে তাদের কত শিক্ষা লাভ হয়। আমরা বাল্যকাল হতে এসব দেখে এসেচি ও

---

* সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিগত ৯ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক কর্ত্তৃক বিবৃত।

শিখেচি। মা, খুড়ি, জেঠাই, খুড়া জেঠা প্রত্যেকে স্নানান্তে শুদ্ধ বসনে একটা করে পুষ্পপাত্র নিয়ে, পুরুষেরা ঠাকুর দালানে ও মেয়েরা নিজ নিজ ঘরে, শিবপূজায় বসে যেতেন। আমরা খেলায় মত্ত থাকলেও তাঁদের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও স্তব্ধ হয়ে যেতাম। আজকালের ছেলেমেয়েরা এসব প্রায়ই দেখতে পায় না। স্কুল পাঠশালাতেও ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা। কাজেই তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েচে। দেখে, শুনে, পড়ে, নীতি ও ধর্ম্ম বালকবালিকাদের মনে মুদ্রিত হয়। যত বড় হয়—জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, ততই তাদের প্রকৃতি সুন্দর ভাবে গঠিত হতে থাকে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আপন ইষ্ট দেবতার পূজা অর্চ্চনা না করে জল গ্রহণ করেন না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সপরিবারে প্রার্থনা করে, তবে শয়ন করেন। আমাদের পুত্রকন্যারা এসব দেখতে পায় না, তাই তাদের এই দুর্দ্দশা। হিন্দুর সাধনা ঠিক পারিবারিক না হলেও, ঐ ভাবের কতকটা বটে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে নারায়ণ শাল-গ্রাম থাকিত। ঐ নারায়ণের দুই সন্ধ্যা সেবাই পারিবারিক পূজা।

সামাজিক পূজা।

মানুষ একাকী বনে বাস করে না। সুতরাং সে সঙ্গী চায়—জন-সমাজ চায়। আমোদ, আহ্লাদ, ভোগ ও পান-আহার শুধু পরিবারবর্গকে নিয়ে ভাল লাগে না; বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের না নিলে মন তৃপ্ত হয় না। একটী সুন্দর জিনিস পেলে, আর দশ জনকে না দেখালে হয় না। কোন সুমিষ্ট ফল বা আহার্য্যসামগ্রী আর পাঁচ জনকে না দিয়ে খেতে আরাম হয় না। ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা সব চেয়ে প্রীতিকর কাজ। সেটা কেবল নির্জ্জনে বা পরিবারদের নিয়ে করলে বিমলানন্দ পূর্ণতা লাভ করে না। এই কারণে, সব দেশের, সব যুগের ধর্ম্মসম্প্রদার মধ্যে সামাজিক পূজা চলে আসচে। হিন্দু গৃহস্থের বাটী নৈমিত্তিক পর্ব্ব উপলক্ষে সমগ্র নিজ গ্রামের ও নিকটস্থ পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা যখন পূজা বা আরতি দেখে, তখন তারা কি অপূর্ব্ব আনন্দই না উপভোগ করে। সকলেরই অন্তরে ভক্তি-প্রেম উথলিয়া উঠে। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরমন্দিরে বা অন্য তীর্থস্থানে, লোকে সমস্বরে বেদ-পুরাণ গান শুনে কতই না শান্তিসুখ আস্বাদন করে! মসজিদে বা প্রশস্ত প্রাঙ্গনে বা মাঠে যৎকালে শত-সহস্র মুসলমান সারি দিয়ে দাঁড়াইয়া, কখনও জানু পাতিয়া কখনও বা দাঁড়াইয়া আল্লার স্তব স্তুতি ও প্রণতি করেন, কি মনোহর, কি অভূতপূর্ব্ব সে দৃশ্য! দেখে কে না মুগ্ধ হয়। গিরজায় যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা দেখেশুনে নিশ্চয় অবাক্ হয়ে যান এবং অপার আধ্যা-ত্মিক আনন্দ উপভোগ করেন। কেন এমন হয়?—কে সকলকে টেনে আনেন? এবং এনে এই সুখ-শান্তি বিলান? কেহ হয়ত বলবেন "ও একটা সামাজিক প্রথা—নিয়ম। তারই বশবর্ত্তী হ'য়ে লোকে একত্র হয়—প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু হয়ে নয়।" সকলের পক্ষে এ কথা খাটে না—দু'চার জন এ ভাবে পরিচালিত হ'তে পারেন। কিন্তু তা হ'লেও এই যে নিয়মিত সময়ে সমবেত হওয়া, এও একটা কম ব্যাপার নয়। অভ্যাসে কি না হয়? কিন্তু আসল কথা অস্বীকার করার যো নাই। অধিকাংশ লোককে তাঁদের প্রাণের দেবতা উপাসনা-মন্দিরে বিশুদ্ধ শান্তি-সুখ দিবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে আনেন—তাঁদের অন্তরে একটা আকুলতা জাগাইয়া দিয়া—সব ভাই বোনে এক সঙ্গে মিলে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সহবাসে থাকার—একভাবে ডাকার, এক কালে প্রার্থনা করার একটা মহৎ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ধরে আনেন। তাই যদি না হবে, দূর দেশান্তর হ'তে অর্থ ও সময় ব্যয় করে, মানুষ আসবে কেন? ভারতের নানা স্থান হ'তে ব্রহ্মবাদীরা মাঘোৎসবে কলিকাতায় আসেন কেন? সব ফাঁকি—সব শুকনা হাঁড়ীতে পাতা বেঁধে এই ব্যাপার কি সম্ভব-পর হ'তে পারে? অনার্য্য অসভ্য জাতিরাও পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীতীরে বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে, বালকবালিকাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের দেবতারও পূজা করে। এক সঙ্গে এই সকল জাতিরা সামা-জিক আরাধনা অতীব মিষ্ট না বুঝলে কি এই দৃশ্য দেখা যেত? কখনই না।

সাধকের প্রভাব।

সামাজিক উপাসনায় অনেক সাধক একত্র তাঁদের দেবতার পূজা করেন। সকলে সমভাবে

প্রস্তুত হয়ে আসেন না। যাঁরা কাতর প্রাণে ব্যাকুল হয়ে ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্মসহবাসসুখ লাভের জন্য পিপাসু হয়ে বাড়ী থেকে আসেন, তাঁদের ভাব এক প্রকার। আর যাঁরা শূন্য হৃদয়ে, আন্‌মনে আসেন, তাঁদের অন্তর অন্য প্রকার। নিষ্ঠাবানেরা আনন্দময়ী মায়ের পাদপ্রান্তে আপন আপন মলিনতা, দুর্ব্বলতা, হীনতা, দীনতা ঢেলে দেন—হৃদয়ের ঢাকা একেবারে খুলে দেন—মায়ের কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। তখন শ্রীহরি ভগবান্ তাঁদের সব দখল করে বসেন—তাঁদের জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করেন। তখন সাধকদের মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে জ্যোতির্ম্ময় হয়—চোখ বেয়ে জলধারা বাহির হতে থাকে। সে ভাব আর সকলকে আকর্ষণ করে—মোহিত করে—মুগ্ধ করে ফেলে। তাঁরাও ক্রমে সেই ভাবাপন্ন হন। ভাব ভাবকে—ভক্তি ভক্তিকে—প্রেম প্রেমকে টেনে নিয়ে, সকল উপাসক উপাসিকাকে এক ডোরে বেঁধে ফেলে। দেখেছি, যখন এক জন কাঁদেন, তখন ক্রন্দনের রোলে দেবমন্দির উথলিয়া উঠে। মন্দির এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে। বাহিরের লোক মন্দিরে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে পড়ে। তারাও আবার সেই জালে পড়ে যায়—ছট্ ফট্ করে। কেন সবাই কাঁদচে—কিসের জন্য এই হাহাকার রব উঠেচে। এঁরা কি পেয়ে এমন করচেন, ভেবে পায় না। চকিতের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে নিজেরাই ধরা পড়ে যায়। কারণ বুঝতে পারে না। অবশেষে তাদেরও শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয়—তারাও ভাবে ও প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠে, যারা তামাসা দেখ্‌তে বা উপহাস করতে এসেছিল, তারাও ঐ মন্দিরের দেবতাকে না ডেকে চলে যেতে পারে না। "He who comes to scoff learns to pray" এই হচ্চে সামাজিক উপাসনায় সাধকের প্রভাব। নির্জ্জন বা পারিবারিক পূজায় ইহা হবার সম্ভাবনা নাই। একটী জাতি কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি। ধর্ম্ম-বন্ধনই ঐ জাতিগঠনের মূলে। স্বজাতির মধ্যে যতই কেন বন্ধন থাকুক না, ধর্ম্ম-বন্ধন, বিশেষতঃ একত্র ইষ্টদেবতার পূজা, আরাধনা, অপর সব বন্ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদের মধ্যে কি একতা! এক জনের জন্য শত সহস্র লোক্ অম্লান বদনে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। কি চমৎকার ভাব! কেন? ধনী, এমন কি নবাব বাদসাহ, সামান্য মুটে মজুরের সঙ্গে নেমাজ পড়েন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবানীপুরে, পোড়া বাজারে কংগ্রেসের সঙ্গে স্বদেশী মেলা হয়। কাবুলের আমীর ঐ মেলা দেখ্‌তে এসেছিলেন। যেই নেমাজের সময় উপস্থিত হল অন্যান্য মুসলমানদিগকে তাঁর সঙ্গে নেমাজ করতে সাদরে আহ্বান করে ছোট বড় সকলকে নিয়ে আল্লার পূজা আরাধনা করলেন। চাকর মনিব বিচার না ক'রে মুসলমান একত্র আহারে বসেন। তাই মুসলমান আজিও পৃথিবীতে টিকে আছেন।

সদ্‌গুরু।

ব্রহ্মের পূজা—জ্ঞানযোগে জ্ঞানময়ের পূজা, নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। এক হিসাবে সোজা বটে। পূজার কামনা স্বতঃসিদ্ধ হলেও, পূজার প্রণালী অনুসারে সিদ্ধির অল্পতা ও আধিক্য হয়। একজন প্রকৃত ভক্তই, অন্যকে পথ দেখাতে পারেন। মুণ্ডক উপনিষৎ বলেছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থ আচার্য্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে উপদেশ দিবেন। সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যই সদ্‌গুরু। তিনি উপাসক-মণ্ডলীকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ ক'রে, ক্রমশঃ আরাধনা ইত্যাদি প্রণালী দিয়ে উপাসককে নিয়ে যান এবং পূজা করান। নির্জ্জন সাধনে বা পারিবারিক পূজায় তাহা হয় না। পূজায় বসা ও সরল প্রার্থনা করা সকলেরই অধিকার সমান। কিন্তু কিরূপে সেই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে হবে, সবাই ত জানেন না। চক্ষু মুদে প্রথম প্রথম সাধক অন্ধকার দেখেন। সেই অন্ধকারের ভিতর জ্যোতির্ম্ময়কে দেখ্‌তে হবে। নিজ আত্মায় তাঁর আসন রচনা ক'রে, তার উপর পরমাত্মাকে বসাতে হবে—দেহ-মন্দিরে, আত্মাসনে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করতে হবে। তার পর বুক খুলে তাঁকে সব দেখাতে হবে। তখন ব্যাকুল প্রার্থনা সাধকের মুখ হ'তে আপনা হতেই বাহির হবে। যাঁর অযাচিত উদার সদাব্রতে আমরা সকলে লালিত পালিত, স্মরণ করলেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি

ও প্রেম উথ্‌লে উঠ্‌বে। এ পথ অল্প সময়ের মধ্যে কেবল আচার্য্যই দেখাতে পারেন। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।" অর্থাৎ পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষের উপদেশ বিশেষ উপকারী। সুতরাং আচার্য্যের সাহায্য চাই না, একথা কি বল্‌বার যো আছে? বল্লে শুনবে কে?—মানবে কে? প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না। সঙ্গীত শুধু যে আচার্য্যকে সাহায্য করে, তা নয়। সঙ্গীত উপাসকউপাসিকাদের পক্ষেও বিশেষ উপকারী।

প্রচার

সামাজিক উপাসনার আর এক উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-প্রচার। বিজনে পূজা ত একা একা। প্যারিবারিক পূজা পাঁচ সাত জন লয়ে। দেবালয়ে সামাজিক সাধনে, বন্ধুবর্গ, উপাসক উপাসিকা থাকেন। তদ্ভিন্ন দর্শক বিস্তর। তাঁদের মধ্যে এমন লোক থাকেন, যাঁরা হয় ত কখনও এরূপ স্থানে আসেন নাই। ধর্ম্মপ্রচার পৃথিবীতে এই প্রকারে বরাবর হ'য়ে আস্‌ছে। আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ দিয়ে উপাসনা করতে, তাঁর উপদেশ ও সুগায়কদিগের গান শুন্‌তে শুন্‌তে, সমগ্র উপাসকমণ্ডলী ব্রহ্ম-প্রেমে—ব্রহ্মানন্দে—যোগানন্দে বিভোর হ'য়ে পড়েন। মনে হয় শেষ হলো কেন? আশা যে মিটিল না—আরও চলুক না। তিন বৎসর হিমালয় ভ্রমণে যোগসিদ্ধ হ'য়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যৎকালে আদি সমাজের বেদী থেকে উপাসনা ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অগ্নিময় ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন এবং হারমোনিয়মের সঙ্গে খ্যাতনামা গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র সুললিত সুরে, সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রাণস্পর্শী নূতন নূতন গান গাইতে লাগ্‌লেন, উপাসক ও দর্শকবৃন্দে দেবালয় পূর্ণ হ'তে লাগ্‌ল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ প্রভৃতি অনেকে সমাজে এসে যোগ দিলেন। কয়েক জন যুবক প্রচার-ব্রত অবলম্বন করলেন। তাঁরা ভারতের নানা স্থানে তাঁদের হৃদয়ের আগুন ছড়াইয়া দিতে লাগ্‌লেন। তার পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শোচনীয় বিচ্ছেদ ঘটিল। সিন্দুরিয়াপটির প্রশস্ত বাড়ীতে কেশবচন্দ্রের দল প্রথম পৃথক মাঘোৎসব করেন। ঐদিন প্রাতের উপাসনার পর প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া বরাবর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ব্রহ্মমন্দি-রের ভিত্তি স্থাপন হয়। কি লোকসমারোহ—কি উৎসাহ! রেভারেণ্ড ড্যাল নিশান হাতে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সর্ব্বাগ্রে চলেছেন। বৈকালের উপাসনা প্রতাপচন্দ্র করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি তিনি ঐ উপাসনায় বিমুগ্ধ ও ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হন এবং ঐ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনে তিনি ও আরও ২১ জন যুবা গ্রাজুয়েট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আমার সমপাঠী নগেন্দ্রনাথ ও আমি যেদিন প্রথমে স্কুল থেকে আদিসমাজে যাই, সেদিনের ভাব জীবনে কখন ভুলিব না। কিন্তু হায়, তিনি কোথায় উঠে গেলেন, আর আমি কোথায় প'ড়ে রয়েচি। আরও কত কথা—কত বল্‌ব। আদিসমাজের, মেছুয়াবাজার মন্দিরের ও সাধারণ সমাজের প্রকাশ্য উপাসনাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। এসব ব্যাপার সামাজিক উপাসনার ফল। তাই এ বিষয়ের উল্লেখ কর্‌লাম।

দূরে থাকা

উপাসক-মণ্ডলী হ'তে দূরে থাকার ফল অতি বিষময়। সাধক যতদিন মণ্ডলীভুক্ত থেকে, তাঁদের সহবাসে কালযাপন করেন এবং সামাজিক উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগ দেন, তাঁর প্রাণ প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় ও কর্ম্মে ততই অনুপ্রাণিত হয়। যেই মণ্ডলীর উপাসনা ও অনুষ্ঠান হ'তে তফাতে অব-স্থিতি করতে আরম্ভ করেন, তাঁর মতিগতি বহি-র্মুখী হ'তে থাকে—ইষ্টপূজা তার ভাল লাগে না—সম-সাধকের সঙ্গ আর তেমন মিষ্ট লাগে না। ক্রমশঃ তাঁর পতনের সূত্রপাত হ'তে থাকে—তাঁর সমস্ত ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়। যাঁকে জ্ঞানে, ধ্যানে ও সাধুকার্য্যে নিয়ত রত দেখা যেত, তিনি আর সে সকলের ত্রিসীমায় যান না। ক্রমে তাঁর প্রাণ এককালে শুকাইয়া যায়। যেন আর সে মানুষ নয়—চেনা ভার হ'য়ে পড়ে। আমার এক সমপাঠী প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হন। তাঁর বিশ্বাস ফেরাবার জন্য আমি বিস্তর চেষ্টা করেছিলাম। এমন দৃঢ়তা—

এমন নিষ্ঠা যে, কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'লাম না। সমাজের বড় বড় প্রচারকদের নিকট তাঁকে লয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরাও তাঁর সঙ্কল্প দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। কলেজেও তাঁর সঙ্গে দেখা শুনা হত। অতি নির্ম্মল চরিত্র। ভক্তি না ক'রে থাকা যেত না। বহুদিন পরে, কর্ম্মস্থানে আবার তাঁহার সহিত মিলিত হই। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। দেখি, আর সে মানুষ নয়—এমনই পরিবর্ত্তন। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম "ভাই তোমার এমন দুর্গতি হলো কি করে?" সরল প্রাণে বল্লেন "গিরজায় না গিয়ে এবং প্রার্থনা না করে এই পতন।" কি আশ্চর্য্য! এসব ঘটনা আমরা দেখছি, শুনছি কিন্তু তবু চৈতন্য হয় না। তাই ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের এবম্প্রকার দুরবস্থা। তাই বলি হে ভাই বোন! সমাজ ও সামাজিক পূজা-অর্চ্চনা ছাড়ার পরিণাম অতি ভয়াবহ। ধর্ম্মবন্ধুদের ও ধর্ম্মসমাজকে ছেড়ে থাকা কোনও মতে উচিত নয়। যেমন অবস্থায় পড়ি না কেন, সামাজিক উপাসনাকে জড়াইয়া পড়ে থাকতে হবে।

হে ভগবন্! হে আমাদের পরম দেবতা! আমাদিগকে রক্ষা কর। অধঃপতন হ'তে রক্ষা কর। সামাজিক পূজা অর্চ্চনার প্রয়োজনীয়তা আমাদের পাষাণ হৃদয়ে মুদ্রিত ক'রে দাও। সমাজের মধ্যে আমাদিগকে টেনে রাখ,—তাহা হ'তে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করো না। সামাজিক পূজা ছাড়লে আমরা আর দাঁড়াতে পারব না—পতন অনিবার্য্য হ'বে। এই মহা সত্য বড় বড় অক্ষরে আমাদের কপালে ও বুকে লিখে দাও। অদ্যকার এই উৎসবক্ষেত্রে আমাদের এই বিনীত, সরল ও কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

ধর্ম্মসংস্কারের প্রকৃত পদ্ধতি।

(ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যান হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

আজ পর্য্যন্ত, যতটা হওয়া উচিত ততটা উন্নতি আমাদের না হইলেও, আমরা যে-ধর্ম্মমার্গে চেষ্টা-উদ্যোগ করিতেছি, তাহাতে করিয়া আমরা একটু

সম্মুখদিকেই পদনিঃক্ষেপ করিয়াছি, একটু অগ্রসর হইয়াছি। তুকারাম বাবার উক্তি-অনুসারে "হা তো নহে কাঁহী নিরাশেচা ঠাব। ভলে পোটী বাব রাখলীয়া" অর্থাৎ "এই কার্য্যে নিরাশ হইবার আমাদের কোন কারণ নাই, এবং আমাদের নিকট আশারই স্থান রাখা উচিত।" কারণ ঐ সাধু পুরুষেরই উক্তি অনুসারে:—"বিশ্বম্ভরেঁ বিশ্ব সমাবিলে পোটী। ভেথেঁচি সেওটী আম্হী অসো"॥ অর্থাৎ—"বিশ্বম্ভর বিশ্বকে উদরে ধারণ করিয়াছেন, এবং পরিণামে তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থান;". এই জন্য, তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার সময়, নৈরাশ্য আসিয়া যেন আমাদের উৎসাহভঙ্গ না করে। যাক্।

আমাদের এই সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমে দেখা যায়, রাজা রামমোহন রায়, বেদ-উপনিষদকেই সম্পূর্ণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তদনন্তর, ইঁহার পরে যিনি এই সমাজের নেতা হইয়াছিলেন সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে অংশ বিচার ও মনোদেবতার কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় টিকিল তাহাই সত্য ও গ্রাহ্য, অবশিষ্ট অংশ দূষণীয় অতএব অগ্রাহ্য ও অসত্য এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া, তাহা হইতে নির্ব্বাচিত শ্লোকাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করিলেন। শ্রীবৃদ্ধি ও প্রগতির দৃষ্টিতে উহা ঠিক্ই হইয়াছিল। আমাদের মিত্র মাধব রাও রানড়ে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহাতে তিনি—তোমরা খৃষ্টধর্ম্মের কোন পন্থাতেই মিশ্রিত না হইয়া স্পষ্টরূপে খৃষ্টকে গুরু স্বীকার কর—এই অভিপ্রায়ে মক্সমূলর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের উত্তর দিয়াছেন। এই পত্র সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় এখনও থাকিয়া-থাকিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, চারিদিকে ধর্ম্মের বিকাশ কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা ভালরূপ জানিয়াও এবং স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ হইয়াও প্রো-মক্সমূলর ঐ পত্র কেমন করিয়া লিখিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এতদ্দেশীয় পুরাতন গ্রন্থাদিকে মহত্ব দিয়াও, তাহার সমস্তই যে সত্য একথা স্বীকার করা

সমীচীন মনে করিলেন না। যতকিছু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহা হইতে সত্যাংশ গ্রহণ করিবে—এইরূপ মত কেশবচন্দ্র সেনের—তবে কিনা, তাঁহার মনের ঝোঁক্ বিশেষভাবে খৃষ্টধর্ম্মের দিকে ছিল। তাই, তাঁহার সাথী ও মিত্র প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে মক্‌সমূলর এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন।

ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে যে কিছু সত্য তত্ত্ব আছে তাহার সহিত মিশ্রিত অসত্য টিকিয়া থাকিলেও, ঐ সকল গ্রন্থের সত্যাংশ সর্ব্বত্রই সমান গৃহীত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেন যে দিক্‌টা আমাদের নেত্রসম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন আমরা তাহাকেই নববিধান বলিয়া মনে করি। কেশবচন্দ্র সেন আপন সম্প্রদায়ের 'নববিধান' এই নাম দিয়াছেন; কিন্তু এই নামাভিধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—এক সময়, মাতৃত্বের কল্পনা আমাদের মনে উদয় হওয়ায়, এই নাম দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মূলেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ভগবদ্‌গীতায় "পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তুকারাম বাবার অভঙ্গে, 'মাউলী', 'আঈ', 'জননী' এই সকল নাম অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। সেইরূপ আবার, আমাদের বোম্বাই প্রদেশে, আরতির পর, "ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব", এই বাক্য আবৃত্তি করিবার প্রথা খুবই পুরাতন। 'নববিধান' এই নাম দিবার আর এক কারণ এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে,—একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতে হইলে, অথবা সেই ব্যক্তি পরিবারবৎসল হইলে, সে একাকী যাত্রা করিবে কি সপরিবার যাত্রা করিবে,—ইত্যাদি ছোটখাটো বিষয় সম্বন্ধেও প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে, কিংকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ হইয়া থাকে—তাই, এই নববিধান। কিন্তু এই কারণটাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এই নামের বিচার-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই, উহা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, মোক্ষমূলর সাহেবের মতানুসারে খৃষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে বসাইতে হইবে,—এই উপদেশ সম্বন্ধে একটু বিচার করা যাক্।

আরবদেশ, তুর্কস্থান, পালেস্তাইন্, ফিনিশিয়া প্রভৃতি যে সকল সেমিটিক্ প্রদেশে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রসার হইয়াছিল এবং অনন্তর-উদ্ভূত যে-মহম্মদীয় ধর্ম্মে পরমেশ্বর অপরম্পার, সর্ব্বশক্তিমান, রাজাধিরাজ—এই কল্পনার উপরেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার আজ্ঞা বা হুকুম অমুক এইরূপ ভক্তদিগের ধারণা হইয়াছিল; অর্থাৎ যতই অন্যায় হউক না, যতই নিষ্ঠুর হউক না, এই হুকুম তামিল করায় কোন পাপ নাই, এইরূপ উহারা বুঝিয়াছিল। উহারা পরমেশ্বরের কারুণ্য ও বাৎসল্য মানিত না এরূপ নহে, তথাপি ঐ সকল গুণকে পশ্চাতে রাখিয়া উহারা ঈশ্বরের অতুল শক্তি ও অধিরাজত্বকেই অতিশয় প্রাধান্য দিয়াছিল। উহারা মনে করিত, যে-সব লোক উহাদের ধারণা অনুসারে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা অমান্য করে, তাহাদের ন্যায় নিন্দনীয় ও মহাপাতকী আর কেহ নাই এবং তাহারা অনন্ত নরকে বাস করিবার যোগ্য। এখন দেখ,—আমাদিগের ও পারসীলোকদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং প্রাচীন গ্রীক, রোমন্ ও জর্ম্মন লোকদিগের, ঈশ্বরের কারুণ্যগুণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তিনি আমাদের মাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের নিকটে আছেন—শুধু ইহাই নহে; তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তঃকরণে বাস করেন—এইরূপ তাঁহারা মনে করিতেন। তাই, "দ্যৌঃ পিতা" এইরূপ বলিতে তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়াছিল; এবং ভগবদ্‌গীতা ও সাধুসন্তদিগের গ্রন্থে ঈশ্বরের মাতৃত্বব্যঞ্জক বচন ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ, পরম কারুণিক, সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় তিনি আমাদের অন্তর্যামীও—এ কথাও ঠিকই; কিন্তু এই একদেশীয় দৃষ্টি বিকৃত হইতেও পারে; এবং ঐরূপ প্রকৃতপক্ষে হইয়াছেও। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়স্থ—এই কল্পনাটিকে বৌদ্ধেরা এইরূপ টানিয়া বুনিয়াছে যে, আমরা নীতির অনুসরণ করিয়া চলিলে এবং আমাদের ইন্দ্রিয় ও আমাদের মনোবিকারদিগকে দমন করিলে, আমরা এত উচ্চ অবস্থায় উপনীত

হইতে পারিব যে, শুধু ঈশ্বর কেন, ঈশ্বর হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে আমরা সমর্থ হইব,—এইরূপ বৌদ্ধদিগের মত; এবং সেই সময়, ঈশ্বর যাঁহারা মানেন সেই সব ইন্দ্রাদি দেবতাকে বৌদ্ধেরা সেবক বানাইয়া তুলিয়াছিলেন। সেইরূপ আবার, বৈদান্তিকেরা 'অহং ব্রহ্ম জগৎমিথ্যা' এই মতটা, ঈশ্বর সন্নিহিত ও তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন এই তত্ত্ব হইতে বাহির করিয়াছেন; এবং জগৎ মায়াময় ও জগতের সমস্ত ব্যবহার অলীক এইরূপ সাংঘাতিক মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ঐশ্বরিক গুণবিষয়েও একদেশদর্শী হওয়ায়, ঈশ্বরের অন্য গুণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, কোন একটি বিশিষ্ট গুণকে প্রাধান্য দেওয়ায় এই প্রকার ধারণা জন্মিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদিগের পরমেশ্বরের অপরিমিত শক্তির প্রতি ও অধিরাজত্বের প্রতি সমধিক লক্ষ্য থাকায়, ঈশ্বরের তথাকথিত আদেশ অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে পালন করাইবার জন্য উভয় পক্ষের শ্রেয়স্কর মনে করিয়া, উহারা নিজ ধর্ম্মকে স্বীকার করাইবার জন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অনার্য্যদিগের উপর জুলুম করিত। এবং পর্ত্তুগীজরা এদেশে আসিয়া যখন কোন ভূভাগকে আপন দখলে আনিত, তখন তাহারা বেজায় জবরদস্তি করিয়া লোকদিগের মুখে পাঁউরুটি গুঁজিয়া দিয়া অথবা কূপের মধ্যে পাঁউরুটি ফেলিয়া জাত মারিয়া অনেক লোককে খৃষ্টান করিয়াছিল; যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণে স্বীকৃত না হইত তাহাদিগের উপর মারধর করিত এবং আমাদের ধর্ম্ম যদি স্বীকার না কর তাহা হইলে প্রাণের মায়া ছাড়ো, তোমাদিগকে আমরা খুন করিয়া ফেলিব—এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। যখন মুসলমানদিগের রাজত্ব হইল, তখন তাহারা তো তলোয়ারের জোরেই লোকদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। কিন্তু কোন লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমাইয়া রাখিয়া বলপূর্ব্বক সেই প্রবৃত্তি অন্যদিকে লইয়া গেলে, পরে এক সময় পূর্ব্ব প্রবৃত্তিটা কোন-না-কোন আকারে আবার আবির্ভূত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোন কোন স্থানে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের পূর্ব্বেকার জাতিভেদ বিশেষতঃ শরীরসম্বন্ধ স্থাপনসম্বন্ধে পুরাতন প্রথা আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এদিকে পাশ্চাত্য বিদ্বান লোকেরা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল এবং পূর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদির পরিশীলন করিবার ফলে, উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থাদির মধ্যে উন্নত চিন্তা ও সত্যাংশ নাই এরূপ নহে—এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস হইল। তখন হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অসহিষ্ণুতার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া উহাদের আচরণে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তথাপি ঐ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে ঈশ্বরের অসীম শক্তি ও অধিরাজকতার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি থাকায় উহা আমাদের ভাবের সহিত মিশ খায় না। এবং উহাতে বড়ই অনুদারতা লক্ষিত হয়।

আমাদের লোকের মধ্যে,—পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে বাস করেন, তিনি হৃদয়স্থ,—এই অত্যুত্তম বিচারের বিশেষ প্রসার আছে। তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতামাতা, আমাদিগকে উত্তরোত্তর উন্নত পদবীর দিকে লইয়া যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়; আমরা মনুষ্য দুর্ব্বল, নিজের শক্তিতে আপনার উন্নতি করা আমাদের সাধ্য নাই, আমাদের উন্নতি তাঁহার কৃপার উপরেই নির্ভর করে, দুর্ব্বলের বল একমাত্র তিনিই। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা, বিকারের বশীভূত না হইয়া নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তি আমাদের সকলেরই আছে এবং আত্মপ্রভাবে উন্নতির চরম সীমায় আমরা পৌঁছিতে পারি—এই তত্ত্ব বাহির করিল। এবং তুকারাম বাবার ন্যায় বড় বড় সাধুসন্তেরা—

> "মাঝে মজ কলোঁ যেতী অবগুণ।
> কায় করূঁ মন অনাবর ॥ ১ ॥
> কাম ক্রোধ আড় পড়লে পর্ব্বত।
> রাহিলা অনন্ত পলীকডে ॥ ২ ॥
> মুলজবে মজ না সাঁপডে বাট।
> দুস্তর হা ঘাট বৈবিরাং চা ॥ ৩ ॥

এই উক্তির মধ্যে মনোনিগ্রহের দুষ্করতা ও মনোবিকারের সম্মুখে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। বৈদান্তিকেরা জগৎ মায়াময় ও জগতের ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া নিবৃত্তিমার্গের দিকে

লোকদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। যে একদেশীয় দৃষ্টির আতিশয্য হইয়া এই দুই প্রকার মতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রতিকার করিয়াছেন নানক, চৈতন্য, তুকারাম-বাবা প্রভৃতি ভক্তিমার্গের সাধুসন্তেরা। কিন্তু তাহার মধ্যেও আস্তে আস্তে কতকগুলা খারাপ জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। এবং দেবতারও সাধারণ মনুষ্যের মতো শয্যা, পানাহার, পানসুপারী প্রভৃতি চাই এইরূপ কল্পনা লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সেই অনুসারে দেবতার সম্মুখে পীকদানী রাখিতে হয় এবং কোনো পাষণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে, তাহা সারিবার জন্য দেবতাকে পাচন দিতে হয়, ঔষধোপচার করা আবশ্যক হয়! এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়,—যদি আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, মোক্ষমূলর সাহেব প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে খৃষ্টকে গুরু করা সম্বন্ধে অথবা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদের কোন কাজে আসিবে না। কারণ, মনুষ্যের স্বভাব এইরূপভাবে গঠিত যে, যে-কল্পনার বীজ বা যে-বিচারের বীজ বহুকাল হইতে উপ্ত হইয়া তাহার মূল গভীরদেশে চলিয়া গিয়াছে তাহা একেবারে উন্মূলিত করিয়া তাহার স্থানে নূতন কিছু লাগাইয়া দিলেও যাহা পুরাতন ও দৃঢ়-বদ্ধমূল ছিল, তাহা কোন-না-কোন আকারে আবার গজাইয়া উঠিবে। ইহার দৃষ্টান্ত; রোমান কাথলিক লোকেরা এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিতে গিয়াছিল,—কিন্তু জাতিভেদের একটা প্রকার এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাছাড়া খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকের অধিকাংশই উন্নত চিন্তাদিতে পূর্ণ হইলেও, উহা ঈশ্বরের প্রণীত অলঙ্ঘনীয় আদেশ বলিয়া খৃষ্টানদিগের এতটা বিশ্বাস যে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য, যতই জুলুম, যতই নির্দ্দয় আচরণ করা হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, এইরূপ উহাদের ধারণা। এই তত্ত্ব, আমাদের লোকদিগের পরম্পরাগত বিচার-রীতির এতটা বিরুদ্ধ, যে উহা কিছুতেই আমাদের গ্রাহ্য হইতে পারে না। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা স্বধর্ম্মপ্রচারের জন্য মার-ধর ও নানাপ্রকার জুলুম করিয়াছিল—এইরূপ ইতিহাসে পড়া যায়; কিন্তু বৌদ্ধেরা কোন অনুচিত কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না। সৌম্যরীতিতে স্বমত প্রতিপাদন করিয়া সৌম্যরীতিতে লোকদিগকে স্বমতে দীক্ষিত করা কর্ত্তব্য, এইরূপ তাহারা মনে করিত।

আমাদের উপদেশাদির মধ্যে:—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

অর্থাৎ:—তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন; এবং কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে আদি, পূর্ণ ও মহান্ পুরুষ বলিয়াছেন।" ঈশ্বরের ইহাই বিশুদ্ধ ও যথার্থ বর্ণনা মনে করিয়া মিছামিছি তাঁহার উপর জঘন্য স্বরূপ ও মনোবৃত্তি আরোপ বর্জ্জন করিতে হইবে। সেইরূপ আবার ভগবদ্গীতাতে "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" এই যে পরমেশ্বরের বর্ণনা, এবং সাধুসন্তেরা—'পিতামাতা,' 'বৎসল' 'জননী' প্রভৃতি তাঁহার অপার-করুণাব্যঞ্জক বিশেষণের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ মনে করিয়া চলিতে হইবে। আরও—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত॥
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ভগবদ্গীতা।

আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল; যে পরমাত্মা আমার অন্তর্যামী, তাঁহারই শক্তিতে সমস্ত সৃষ্টি চলিতেছে এবং তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমরা ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না; তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অনন্যভাবে তাঁহার শরণাগত হইলে, অচল শান্তি ও চিরসুখের ধাম যে ভগবৎ-পদ সেই ভগবৎপদ আমার লাভ করিব, ইহাই নিরন্তর

আমাদের মনে রাখা চাই। তদনুসারে, প্রবৃত্তি ও ও নিবৃত্তি-মার্গের সম্বন্ধে, লোকের মধ্যে আমাদের ব্যবহার, এই বৌদ্ধ-উপদেশ অনুসারে হওয়া চাই, যথা :—

অক্রোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং ॥

অর্থাৎ :—"অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধু ব্যবহারের দ্বারা অসাধু ব্যবহারকে জয় করিবে, অলীকবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করিবে।" এই সকল উচ্চ প্রকারের নীতিতত্ত্ব মনে রাখিয়া আমাদের নিয়ত চলিতে হইবে। সেইরূপ আবার, আত্ম-সংযমন ও ইন্দ্রিয়দমন আমাদের নাই—এরূপ নহে। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা যদি কর্ম্ম করিতে একেবারে বিরত হই, তাহা হইলে বাসনা নির্ম্মূল করা দুঃসাধ্য হওয়ায়, সম্মুখে বিষয় উপস্থিত হইলে, কি কর্ত্তব্য ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

যে-ব্যক্তি হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি মাত্রকে সংযমন করিয়া, বিষয় চিন্তা করে, সেই মূর্খ মনুষ্যকে দাম্ভিক বক-ধার্ম্মিক মনে করিবে। অতএব লোকের মধ্যে, সংসারের মধ্যে থাকিয়া কিরূপ হইতে হইবে?—না—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ যে মনুষ্য কোন জীবের প্রতি দ্বেষ করে না, সর্ব্বতোভাবে মিত্রতা আচরণ করে, দয়ালু, যাহার, আমি ও পর এই ভেদবুদ্ধি নাই, যাহার আমিত্ব নষ্ট হইয়াছে, যার নিকট সুখদুঃখ সমান, অথবা যাহার সুখে অত্যন্ত হর্ষ কিংবা দুঃখে অত্যন্ত উদ্বেগ হয় না, যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, সন্তুষ্ট, যাহার অনন্য ভক্তি আছে, আত্মসংযম আছে, যে ব্যক্তি দৃঢ়-নিশ্চয়ী এবং যে পরমাত্মার পদে নিজের মন ও বুদ্ধি সংলগ্ন করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির ন্যায় ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতির সাধনা করিবার চেষ্টা আমাদের করা কর্ত্তব্য। যেখানে-যেখানে পরমেশ্বরের সত্তা পাওয়া যাইবে, সেখানেই বৃথা-অভিমানকে প্রতিবন্ধক হইতে না দিয়া, প্রাঞ্জল বুদ্ধিতে তাহা শ্রবণ করিলে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব। যাহারা, আমাদের দেশীয় লোকের স্বভাব, পরম্পরাগত বিচার-পদ্ধতি ও কল্পনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকেই প্রাধান্য দেয় এবং তদনুসারে ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়, সাধারণের সম্মতি পাইয়া, সংস্কারকার্য্যে অধিক সফলতা লাভ করা তাহাদের পক্ষেই অধিক সম্ভব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাই করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করাই ইষ্ট ও শ্রেয়স্কর বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রেয় ও প্রেয়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

(১)
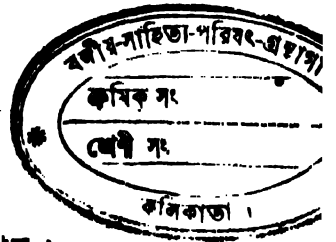
প্রেয়ের আহ্বান শুনি আত্মহারা হই
তুমি যে পরম শ্রেয় মনে থাকে কই?
এ জীবনে যাহা কিছু পেয়েছি হে দান
তোমারি করুণা বলে হে প্রাণের প্রাণ!
তব করুণায় এই রবি শশী তারা
ধরণী-শীতল-করা শ্রাবণের ধারা
এই বায়ু এই আলো এই ফুল ফল
নদী গিরি সিন্ধু বন এই স্থল জল!
এই দেহ এই প্রাণ ধমনী-প্রবাহ
তোমারি করুণাবলে চলে অহরহ!
গোপন হৃদয়ে প্রভু কি যে কৃপা তব
কত আশা প্রীতিফুল মুঞ্জরিছে নব
নিতি নিতি শুভ বুদ্ধি জাগিতেছে বুকে
তব স্নেহাশীষ এ-যে পাই সুখে দুখে॥

(২)

হে জীবনপ্রভু মোর জীবন মধ্যাহ্নে
পূজি তব শ্রীচরণ বল কোন্ পুণ্যে
তুমি যদি দয়া করি নাহি দাও দুখ
অনুতাপ-বহ্নি দিয়ে না দহ এ বুক
তুমি যদি কৃপা করি না ফুরাও আঁখি
সকলি বিফল হবে পাব শুধু ফাঁকি!

এতকাল বেঁচে আছি করুণায় তব
করুণায় তব জানি পুনরাগুন হব!
প্রেমের আহ্বান শুনি' যেন ভুলি না গো—
তুমি মোর প্রিয়তম কহ কানে যাগো!
জীবনে মরণে প্রেম একমাত্র তুমি
তোমা ছাড়া এ ভুবন ধূ-ধূ মরুভূমি!
তোমা ছাড়া হয়ে যেন নাহি থাকি কভু
এই কৃপা কর মোরে হে জীবনপ্রভু॥

আর্ট ও সাহিত্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাহিত্যজগতের সকল বিভাগেই আর্টপ্রকাশের অবসর আছে—বিষয়গুলি ব্যক্ত করিবার প্রণালীর উপরেই, পরিপার্শ্বের সহিত পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে বিষয়গুলি যথাযথরূপে ফলাইবার উপরেই আর্ট ব্যক্ত হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে। এমন কি, যে বিজ্ঞান হাতে-হেতেড়ে পরীক্ষার উপরেই প্রধানত দাঁড়াইয়া আছে, সেই বিজ্ঞানবিভাগেও আর্ট প্রকাশের অবসর আছে দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাস, নাট্য ও কাব্যবিভাগেই আর্ট প্রকাশের অবসর কিছু বেশী ও সহজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নাট্য ও কাব্য বহু পূর্ব্বাবধিই বহুলপ্রচলিত ছিল। উপন্যাস নামক পদার্থের যে নিতান্তই অভাব ছিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু উপন্যাসের আধুনিক আদর্শ ধরিলে সেগুলি উপন্যাস নাম পাইবার অধিকারী হইবে কিনা জানি না। সেকালের উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান আদর্শ কাদম্বরী।

বিজ্ঞান ও দর্শন লিখিতে গেলে যেরূপ প্রমাণ ও নিয়মাবলীর মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হয়, নাট্য ও কাব্যে ততটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয় না। তাই কি এদেশে, কি অন্যদেশে সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অপেক্ষা নাটককার ও কবির সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। একেই তো এদেশে নাট্য ও কাব্যের, বিশেষতঃ কাব্যের, যথেষ্ট প্রচলন ছিল, তাহার উপর আবার এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের নাট্য ও কাব্য লিখিবার নবতর ভাব ও নবতর ভঙ্গী আমদানি হওয়ায় এদেশবাসীর কাব্য ও নাট্যরচনার পরিসর খুবই বাড়িয়া গেল। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আর একটী অঙ্গ এদেশে চিরস্থায়ী আতিথ্য গ্রহণ করিল—সেটী উপন্যাস। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে, আধুনিক উপন্যাসের অনুরূপ কোন কিছু ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। অথচ এদেশের ইংরাজীশিক্ষিতগণ দেখিলেন যে, নাট্য ও কাব্যরচনায় যেটুকু বাঁধা-বাঁধি নিয়মে পড়িতে হয়, উপন্যাস রচনায় সেটুকুও বাঁধাবাঁধিতে পড়িতে হয় না। এই স্বাধীনতা থাকিবার কারণেই যেমন কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সহজেই প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তেমনি এই স্বাধীনতার কারণেই উপন্যাস ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগের রচনায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি হাত "মক্স" করিতে লাগিলেন। কাজেই বর্ত্তমানকালে এদেশে নাট্য, কাব্য ও উপন্যাস, সাহিত্যের এই তিনটী বিভাগ, বিশেষত উপন্যাসবিভাগ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণে বহুল বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক যখন সাহিত্যের এই তিনটী বিভাগেরই দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন বলা বাহুল্য যে এই তিন বিভাগেই তাঁহাদের আর্ট ফলাইবার চেষ্টাও সমধিক দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই তিনটী বিভাগের মধ্যে কবিতায় অল্প পরিসরের মধ্যে অনেকটা ভাব সংহতভাবে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া কাব্যে আর্টের মাধুরী প্রকাশ করিতে বিশেষ একটু ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। তাই অপেক্ষাকৃত অল্প লোকে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন, এবং করিলেও কাব্যে আর্ট ভালরূপ ফলাইতে আরও অল্প লোক সফলকাম হন। কাব্য অপেক্ষা নাট্যরচনায় আবার আরও অল্পসংখ্যক লোককে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। সমাজ বিশেষ একটু সমুন্নত অবস্থায় না পৌঁছিলে নাটকরচনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কাব্য যেমন কল্পনায় আলোচিত হইবার জন্য রচিত হয়, এবং কল্পনাতেই আলোচিতও হয়, নাটক সেরূপ হইতে পারে না। নাটক অভিনয়ের জন্যই

রচিত হয়। কোন নাটক প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দেখিবার অবসর না পাইলেও তাহা পাঠ করিবার কালে আমরা তাহার অভিনয় অন্ততঃ কল্পনাতেও দেখিয়া লইতে বাধ্য হই। এই অভিনয় প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে দেখিবার সময়েই হউক, অথবা মানসপটে কল্পনার চক্ষে দেখিবার সময়েই হউক, কোন নাটকে আর্ট ও তাহার technique বা প্রয়োগবিজ্ঞান কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা বড়ই স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। কতটা সত্য ঘটনার উপর দাঁড়াইয়া এবং কতটা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া কতটা মঙ্গলভাব জগতে বিতরিত হইল, একটা নাটকে সমস্তটা যেন সহসা চক্ষের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে। আর্ট সর্ব্বাঙ্গীন মূর্ত্তিতে নাটকে যেন প্রত্যক্ষভাবে বাহির হইয়া পড়িতে চাহে। ইহা ব্যতীত, কাব্যের ন্যায় নাটকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের মধ্যে কলা-কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহাদুরী লইতে হয়। এই প্রকার প্রত্যক্ষমূলক সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অল্পক্ষেত্রে সুনিপুণভাবে কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহাদুরী লওয়া বড় সহজ কথা নহে বলিয়া খুবই অল্পসংখ্যক লোক নাটক রচনায় অগ্রসর হন।

নাটক ও কাব্য অপেক্ষা উপন্যাসে আর্ট প্রয়োগের অবসরও যেমন অনেক বিস্তৃত, তেমনি স্বাধীনতাও যথেষ্ট। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, আজ পর্য্যন্ত উপন্যাসকে সংযত আকার দিবার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। এই কারণে উপন্যাসলেখকেরা তাঁহাদের উপন্যাসে একটু হাতপা ছড়াইয়া প্রয়োজনমত আর্টের খেলা খেলিবার অবসর পান। স্বাধীনতার সারমাটিতে আর্টরূপ গোলাপকুসুম ফুটাইবার বড়ই সুবিধা হয়। ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত আর্টিষ্ট, তাঁহারা নিজেদের গ্রন্থে এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া সত্য-মঙ্গল-সৌন্দর্য্যমূলক আর্টকে ফুটাইয়া তুলিতে সফলকাম হন। কিন্তু অনেক উপন্যাসলেখক স্বাধীনতাভ্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার অপভ্রংশকে নিজেদের গ্রন্থে প্রবেশ করাইয়া ভ্রান্ত সংস্কারের ফলে মনে করেন যে, গ্রন্থে কত আশ্চর্য্য কলাকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে! যাই হোক, উপন্যাসে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা যায়, কাজেই আর্ট ফুটাইয়া তুলিবার অনেক অবসর পাওয়া যায়, এবং তাহাতে কথার মিল, ছন্দের মিল প্রভৃতি কোনই বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হয় না; এই সকল কারণে সাধারণত আজকাল যাঁহারাই সাহিত্যচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের অনেকেরই উপন্যাস লিখিবার দিকেই ঝোঁক পড়ে।

এই কারণেই আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশও উপন্যাসে উপন্যাসে ছাইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে দেশ উপন্যাসে ছাইয়া যাইবার একটা বিষময় পরিণাম ঘটিয়াছে এই যে একটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই উপন্যাস পড়িবার দিকে এবং উপন্যাস-নামধেয় যাহা হৌক একটা কিছু লিখিবার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। যে সকল বিষয়ের আলোচনায় এতটুকুও কঠোর চিন্তা আবশ্যক, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে অল্পের মধ্যে অনেকটা জ্ঞানলাভ হইতে পারে; এমন কি, আর্ট সম্বন্ধীয় কোন কিছু, অথবা কোন উপন্যাসও পড়িতে যদি আমাদিগকে একটু বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাইতে হয়, তাহা হইলে সে সকল বিষয়ের কোন গ্রন্থই আমরা পড়িতেও চাহি না, লিখিতেও চাহি না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শোনা যায় যে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া ঐ সমস্ত কঠিন ও কঠোর বিষয় আলোচনা করিতে ভাল লাগে না। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যাঁহারা কিছু লেখাপড়া করেন, তাঁহারাই প্রায় চাকরীতেই ঢুকিয়া যান, অথবা চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া আশায় আশায় দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিকই, চাকরীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের, অথবা চাকরীর আশায় ছুটাছুটীর শ্রান্তি ও ক্লান্তির আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই উপরিউক্ত কথার সার্থকতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—উহাকে নেহাৎ নিরর্থক ও অন্যায় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

কারণ যাহাই হউক, এই প্রকার অবসাদের পরিণামে বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইচ্ছার অভাবে আমরা ভাল গ্রন্থ পড়িতে চাহি না, এবং পাঠকের অভাবে ভাল গ্রন্থ সহজে

বাহির, হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই। যে অভিব্যক্তিবাদ বা Theory of Evolution এর ভিত্তিতে বলিতে গেলে আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রত্যেক কাজটী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, জীবনের প্রত্যেক বিভাগে যে মত প্রযুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ন্যায় কৌতূহলপ্রদ আলোচ্য বিষয় খুব অল্পই আছে, সেই অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আজ শতাব্দীর ভিতরে মাত্র দুই-একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল !

প্রধানত এই দাসত্বজনিত অবসাদ ও তাহার পরিণামে ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জনের ফলে দেশ যে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক, সকল বিষয়েই কিরূপ শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা কয়জন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ? আমরা ভুলিয়া যাই যে, ব্রহ্মচর্য্যের উপরে ভারতবর্ষ যতটুকু দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, ততটুকুই এই পুণ্যভূমি প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখনকার বোধগম্য ভাষায় আমরা বলিতে চাহি যে, জর্ম্মানসুলভ বা জাপানীসুলভ কঠোরতা, দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার উপর দাঁড়াইতে না পারিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। কেবল বৃথা বাক্যরাশি বিক্ষিপ্ত করিলেই কখনও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে না।

শিলংএর জলপ্রপাত।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

খাসিয়া পাহাড়ে অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে তন্মধ্যে ক্রিনোলাইন, এলিফেন্ট, কালিকাইর নংছে, বিডন (উচ্চতা ছয় শত ফিট) ও বিশপ জলপ্রপাত উল্লেখযোগ্য। এই ঝরণাগুলি শিলংএর প্রকৃতিকে শ্রী-যুক্ত মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শেষোক্ত প্রপাত তিনটি শিলং সহরের বাহিরে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোল হইতে ভীমবেগে নিম্নে একটি গহবরে (খাশিয়া-কুকুং) ঋজুভাবে পতিত হইয়া বরপানির দিকে ফাঁপিয়া ফুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—এবং মিলিত স্রোত অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। লাবানের নদী হইতে নংছে ও বিডন এবং উমখ্রা নদী হইতে বিশপপ্রপাতের উৎপত্তি। পূর্ব্বে নংছে প্রপাত সাতটী ধারায় নীচে পড়িত, কিন্তু বিগত ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পের পর বড় বড় পাহাড় চাপা পড়িয়া উহার তিনটি ধারা—বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিডন ও বিশপের মহান্ দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হয়, কিন্তু নংছের নীচে ছোট ছোট শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া বিক্ষিপ্ত জলকণায় শরীর সিক্ত করা বড়ই আনন্দজনক ; তখন শরীরে একটা স্নিগ্ধতা এবং প্রাণে শান্ত ও পবিত্র উচ্ছ্বাসের ভাব আসে।

খাসিয়ারা প্রকৃতির উপাসক। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয়বিস্ময়মুগ্ধ হৃদয়ে তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া আসিতেছে। ঝরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জন্য বিপুল সম্ভারে পূজার আয়োজন করিয়া থাকে। শোভা, সৌন্দর্য্য ও উচ্চতায় বিডন প্রপাতটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। খাসিয়ারা এইটিকে বড়ই ভাল বাসে। লোকমুখে শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি বিফলমনোরথ খাসিয়া যুবতী ইহারই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই হইতে একটি শোকস্মৃতি বিডন প্রপাতের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষাগমে চতুর্দ্দিকের বিপুল জলরাশি প্রপাতকে নূতন সৌন্দর্য্য দান করে, সেই বিস্ময়পূর্ণ মনোহর দৃশ্য বঙ্গ-বিহার ও আসামের অন্যত্র দুর্লভ। ভূপর্য্যটকগণ ভারতভূমিকে পৃথিবীর প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ একমাত্র ভারতভূমি ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের একত্র সমাবেশ আর কোথায়ও দৃষ্টি গোচর হয় না। অভ্রভেদী সুউচ্চ পর্ব্বতমালা, অতলস্পর্শ সীমাবিহীন নীলাম্বু-রাশির আধার মহাসাগর, শস্যশ্যামল নয়নবিনোদন দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, নিদাঘ-উত্তপ্ত ঘোর মরুভূমি, মানবজাতির গৌরবের বাসস্থান উপবন-প্রাসাদবিভূষিত মহানগরী, বন্যপশুর আবাসভূমি গহন কানন, জগতের সমস্ত ঋতুর লীলাস্থল, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জলজন্তু ও বৃক্ষলতার আবাসভূমি ভারতবর্ষ, জগতের প্রতিরূপ এই গৌরবজনক খ্যতিলাভের যথার্থ উপযুক্ত বটে। প্রাগুক্ত জলপ্রপাত তিনটি আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ও অভূতপূর্ব্ব নায়েগ্রার আংশিক

অনুকরণে ভারতে অনন্যসাধারণ মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে নায়েগ্রা অথবা ভিক্টোরিয়া প্রপাতের বিশ্ববিমোহন ভীষণ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই জলপ্রপাতের বিমল সৌন্দর্য্য বুঝাইবার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা তাহা দর্শন করেন নাই, কেবলমাত্র বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনা করিবেন ভারত যেমন জগতের প্রতিরূপ, এই তিনটি জলপ্রপাতও তেমনি নায়েগ্রা বা ভিক্টোরিয়া প্রপাতের সজীব ছায়াচিত্র।

এই জলপ্রপাত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে দূর হইতে ইহার নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর ও ভীষণ জীমূতমন্দ্রবৎ ধ্বনি পর্য্যটকের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাঁহার মনোরাজ্যে এক বিরাট ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া তোলে। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে যখন দর্শকগণের নয়নসমক্ষে জলধারা সশরীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখনকার শোভাবৈচিত্র্য ভাষায় বর্ণনাতীত। উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভয়াবহ কল্লোলে যুগপৎ মন্দ্রে মন্দ্রে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের ভৈরব গর্জ্জন সৃজন করিয়া উন্মত্ত জলধারা নিম্নে উপত্যকায় পতিত হইতেছে। প্রচণ্ড বেগে পতন হেতু পুনরায় উর্দ্ধদেশে তুবড়ীর মত জলের অসংখ্য ফোয়ারা উত্থিত হইতেছে, আর অমনি অকস্মাৎ এক একটি ফোয়ারা প্রস্তরের আঘাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বারিকণায় পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—তাহাতে চতুর্দ্দিকে কি সুন্দর শীকরনির্ম্মিত মায়াজাল রচিত হইয়া উঠিতেছে। স্বভাবের এই অতুলনীয় শোভা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই আত্মহারা হইয়াছেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে প্রপাতের বিপরীতদিকের পাহাড়ে যে শোভাবৈচিত্র্য দেখা যায় তাহা অতি চমৎকার ও মনোরম। চন্দ্রকরপতিত জলপ্রপাতের ঐশ্বর্য্য মনোহারিত্ব অতুলনীয়।

(আমরা একদিন নানাবিধ কুসুমিত লতাপুঞ্জের মধ্য দিয়া এই প্রপাতের নিম্নদেশে গিয়াছিলাম তখন মনে হইয়াছিল, আমরা যেন কোলাহলপূর্ণ সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া 'পাতালে এক নূতন মুক্তরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের গায়ে বসন্ত-প্রভাতের মত সদা প্রফুল্ল প্রসূনরাজি ফুটিয়া রহিয়াছে। প্রপাতমুক্ত জলধারা গমন-পথে পাথরের উপর বাধা পাইয়া স্থানে স্থানে আছড়াইয়া পড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই জলোচ্ছ্বাসে এক মহা সঙ্গীতের প্রেমপূর্ণ ধ্বনি পাতালপুরীকে নিয়ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সে সঙ্গীত কি প্রাণস্পর্শী! ধীরে ধীরে অন্তরে কত পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। জলপ্রপাতের এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকে আমি প্রাণশূন্য জলধারা বলিয়া মনে করিতে পারি নাই—ইহার ভিতর ভগবৎশক্তির পূর্ণ বিকাশের আভাস পাইয়া আমার হৃদয় মন সেই শক্তির অনুভূতিতে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

শিলংএর ঝরণার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক উপকথা শুনিতে পাওয়া যায়। কালিকাইর * জলপ্রপাতের উৎপত্তির গল্পটা এই:—সে অনেক দিনের কথা। রঙ্গজীর খাঁ নামক গ্রামে কালিকাই নাম্নী এক দরিদ্র রমণী বাস করিত। সন্তানপ্রসবের পর তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। ভিখারিণী বলিয়া সন্তান লালনে এই রমণীকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশু হাঁটিতে শিখিলে তাহাকে অন্যান্য বালকবালিকাদের সহিত খেলা করিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণে কত না আনন্দ হইত। অনেক দিন পরে সেই বিধবা রমণী এক অন্য পুরুষকে বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী শিশুসন্তানটিকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিত।

দুইদিকে অভ্রভেদী পাহাড়। পাহাড়ের গা বাহিয়া স্রোতস্বতী কুল কুল রবে নীচে সমতল ভূমিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নদীর উভয় তীরে শরল ও শালবৃক্ষের বন। এক দিন কালিকাই লৌহ সংগ্রহ করিতে এই নদীর তীরে গিয়াছিল। যখন হতভাগিনী লৌহসংগ্রহে ব্যস্ত, তখন গৃহে তাহার নৃশংস স্বামী সরলতা ও পবিত্রতা মাখান কচি শিশুটিকে হত্যা করিয়াছে। কচি শিশুর কচি মাংসে সে তরকারী প্রস্তুত করিয়া শিশুর মায়ের

---

* শরৎ ঋতুতে কালিকাইর জলপ্রপাতের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। লাউট্ ফিন্‌সিউ পল্লী হইতে প্রপাতটি অতি মনোরম দেখায়। অতি দূরে সুনীল শৈলশিখরে খাসিয়া পল্লীর দুই-একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যায়।

জন্য রাখিয়া দিয়াছে। রন্ধনশেষে সে মস্তক ও হাড়গুলি দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু হাতের অঙ্গুলীগুলি ভুলক্রমে ফেলিয়া না দিয়া সুপারীর চুপড়ীতে রাখিয়াছিল। দুপুরে হত ভাগিনী লৌহ সংগ্রহের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামীকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। নৃশংস স্বামী বলিল, 'সে এই মাত্র কোথায় গিয়াছে।' কালিকাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাত ও তরকারী আছে কি ? স্বামী বলিল,—হাঁ, প্রস্তুত আছে। বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল। কালিকাই পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া মনে করিল, ইহা দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত কচি শূকরের মাংস হইবে। আহারের পর সে সুপারীর জন্য চুপড়িটি সম্মুখে রাখিল। হায়! হায়! একি, এই যে তাহার প্রাণতুল্য ক্ষুদ্র শিশুর আঙ্গুল। এই সমস্ত ঘটনায় তাহার কোমল বুকখানা ভাঙ্গিয়া গেল—সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শোকের বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া কালিকাই দৌড়িয়া পাহাড়ের শিরোভাগে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে ঝরণার কোলে লাফাইয়া পড়িল, সব ফুরাইল। গ্রামবাসীরা দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিল, কিন্তু কালিকাই'র হস্তে দা ছিল বলিয়া কেহই তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আত্মহত্যায় বাধা দিতে সাহস করিল না। সেই অবধি এই প্রপাতের নাম 'কালিকাইর' হইয়াছে।

শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা পূর্ব্বাবধি দেখিয়া আসিয়াছি যে মনুপ্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণ পতিসেবাকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব অথবা সতীত্বের মধ্যবিন্দু এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মকে পরিধিরূপে অবলম্বন করিয়া আর্য্যসমাজকে এক আশ্চর্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাজচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের রমণীকুলভূষণ মহারাণীর আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনে আমরা বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ঋষিদিগের জ্ঞানের এত প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াও বর্ত্তমান রহিমাধিক্ত যুগের অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি যে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন না তাহা জানি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা নিজে যে সকল কথা বলিবেন, তাহাই তাঁহারা বেদবাক্যরূপে প্রচার করিতে সচেষ্ট এবং ইহা তাঁহাদের অন্যায় আশা যে, তাঁহারা অপরাপর জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সেই সকল বাক্য বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবার আশা করেন। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মর্ম্মসংগ্রহে অক্ষম হইয়া কেবল দোষদর্শনে অভিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে শাস্ত্রের সহস্র গুণও দুর্লক্ষ্য, কিন্তু শাস্ত্রের ভ্রম থাকুক, বা না থাকুক, তাঁহারা শাস্ত্রের একটির পর একটি করিয়া ভ্রম বা দোষ বাহির করিতে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ও পাশ্চাত্য ভাবে গঠিতহৃদয় ব্যক্তি আমার শাস্ত্রসমর্থক বাক্য শুনিয়া আমার প্রতি যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে বিরত হইবেন না, আমার এরূপ আশঙ্কা হয়। এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিসংহিতাগ্রন্থে একটিও স্থানে স্ত্রীলোককে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা, স্ত্রীলোকের অস্বতন্ত্র থাকিবার কথা, গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবার কথা, এই সকল বিষয় অতিস্বাধীনতাপ্রিয় পাশ্চাত্যদিগের সুতরাং এখানকার শিক্ষিতাভিমানীদিগেরও চক্ষে অকর্ম্মণ্যতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক প্রতীয়মান হইলেও সংহিতাগ্রন্থসমূহে সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু যে সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির শিক্ষা ইহাঁদিগের চক্ষে রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার একটী কথাও, এক কথায় স্ত্রীলোকদিগকে আধুনিক দৃষ্টিতে বিদুষী করিবার কথা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে এরূপ বিদ্যাশিক্ষার কথা না থাকিলেও মনুপ্রমুখ সংহিতাকার ঋষিদিগের ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে তাঁহারা যে কেন একটীও কথা বলেন নাই, তাহার কারণ যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে এত বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন কেন, তাহাই দেখা যাইতেছে।

মনুসংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহা রচিত হইবার সমসময়ে মনু একদিকে যেমন সাধ্বী রমণীর রমণীয় সতীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবীর উপযুক্ত ভক্তি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে ব্যভিচারস্রোতও কিছু বেশী রকম প্রবাহিত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া

ছিলেন ; অনুমান হয় যে, এই সময়ে স্ত্রীজাতির অধিকারসম্বন্ধীয় দারুণ অশান্তিজনক এক মহা আন্দোলন উঠিয়া ব্যভিচারস্রোত বর্দ্ধিত করিবার বড়ই সহায় হইয়াছিল। এই আন্দোলনসূত্রে বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রশ্ন উঠিল যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ করিতেই হইবে কিনা এবং পানাহার ও যথেচ্ছ বিহরণ বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাই বা না থাকিবে কেন ইত্যাদি। মহর্ষি মনু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। মনু আন্দোলনকারীদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, একদিকে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য— দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মনুই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোককে পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, রোধ করা কর্ত্তব্য নহে ; পুরুষের অপেক্ষা যে স্ত্রীর বেশী সম্মান ছিল, তাহা পতিত স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্তেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু অন্যদিকে তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের পথ হইতে অতি সামান্যমাত্র মন্দ প্রসঙ্গ অপসারিত করা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে বারম্বার বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপে পূজার্হ ; অপরদিকে দুষ্ট স্ত্রীলোক বিশেষ অপরাধ করিলে তাহার মস্তক ভিন্ন পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে স্বামীকর্ত্তৃক বেত্রাঘাত করিবারও বিধি দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীজাতির মাতৃত্ব পরিস্ফুট করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আন্দোলনকারীদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে স্ত্রীলোকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য প্রজনার্থ অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকশিত করিবার জন্য—মাতৃত্বই স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার, এবং এই মাতৃত্ব বিকশিত করিতে গেলে স্ত্রীলোকের পতিগতপ্রাণ হইতে হইবে—পাতিব্রত্য ব্যতীত নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সতীত্ব রক্ষা করিতে গেলে স্ত্রীলোকের মদ্যপান পরগৃহবাস প্রভৃতি পানাহার ও যথেচ্ছ বিচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা, যাহার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা, তাহা দূর হইতে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। একমাত্র অবরোধপ্রথাই এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের প্রধান ঔষধ। মনু অন্য কোন কারণে নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতার ঔষধস্বরূপেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে থাকিয়া পতি পুত্র প্রভৃতির সহিত অস্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেহ যেন মনুপ্রবর্ত্তিত অবরোধপ্রথাকে মুসলমানগণকর্ত্তৃক অথবা তাহাদের ভয়ে প্রবর্ত্তিত কঠোর জেনানা-প্রথার ন্যায় বোধ না করেন। তীর্থদর্শন, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনোপযোগী কার্য্যস্থলে, আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত পতির সমভিব্যাহারে হিন্দুরমণীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কোন হিন্দুই দ্বিধা করেন না—আমি নিজে কত সধবা বিধবা রমণীকে আত্মীয়-স্বজনের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া পরব্রজে হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া এই বঙ্গদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি এবং হিন্দুরমণীর দেবভক্তি দেখিয়া এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে বিগলিত হইয়াছি। ধর্ম্মের নামে ও পতির কার্য্যে পতিপ্রাণা হিন্দুরমণী বিলাসবিভ্রম, সঙ্কোচ, মানবিভব প্রভৃতি সকলই অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। মনুর উপদেশ ও অনুশাসন হিতকর বলিয়া আন্দোলনকারীগণ এবং জনসাধারণও বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম স্থান ও অবস্থাভেদে একটু আধটু পরিবর্ত্তন সহকারে সমগ্র ভারতভূমিতে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ন্যায় ঋষিদিগের কৃপায় যে ভারতের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ব্যভিচার-স্রোত কিরূপ কমিয়া গিয়াছিল, সতীসাধ্বীর আবাসভূমি বলিয়া এই পুণ্যশ্লোক ভারতবর্ষের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রেরাও ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য পাইতেছে।

মনু অবরোধপ্রথা যে স্বীয় মস্তিষ্ক আলোড়ন পূর্ব্বক নূতন আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি যে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নহে", এবং "স্ত্রীলোকেরা গৃহে রুদ্ধ থাকিলেও আত্মরক্ষিত না হইলে অরক্ষিত," ইহাতেই আমাদের এরূপ অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে, মনুসংহিতার বহুপূর্ব্ব হইতেই অবরোধপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের আবহমান কাল হইতে এক সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে মনুস্মৃতির পূর্ব্বেই বৈদিককাল। অনেকে ইহা অস্বীকার করিলেও আমরা ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই সংস্কার পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। বরঞ্চ মনুস্মৃতির অনেকস্থলে আমরা বৈদিককালের ছায়া অনুভব করিতে পারি। সুতরাং মনুসংহিতার বহুপূর্ব্বাবধি স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কিরূপ ছিল দেখিতে গেলে দেখিতে হইবে যে বৈদিককালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল। ঋগ্বেদ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শ্রুতিগ্রন্থ এই অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অনেকের ধারণা আছে যে শ্রুতিগ্রন্থে, অন্ততঃ ঋগ্বেদে, বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা, অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে স্বাধীনতা বলেন তাহা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং বৈদিককালে বাল্যবিবাহ বা অবরোধপ্রথাও ছিল না ; এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের ইহাও ধারণা আছে যে মনু অন্ততঃ এই কয়েকটী বিষয়ে বেদবিরুদ্ধ পথে গিয়া সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ

সাধন করিয়াছেন—অর্থাৎ মনুই সর্ব্বপ্রথম বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটী সংস্কার এই যে যৌবনবিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা এবং বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা পরস্পর একান্ত সহযোগী। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা এই উভয় প্রকার সংস্কার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আপনাদের স্বাধীনচিন্তা প্রয়োগ করিবার অবসর পান নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়াও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পর্য্যালোচনাকালেই দেখিতে পাইব যে তাঁহাদের এই সংস্কার ভ্রান্ত। মনু নিজেও বলিয়াছেন যে তিনি যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সকলই বেদে অভিহিত হইয়াছে (১), এবং সকল শাস্ত্রকার একবাক্যে মনুসংহিতার বেদমূলকত্বহেতু শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন (২); আমরাও দেখিব যে প্রকৃতই মনু বেদেরই অনুসরণ করিয়া অবরোধপ্রথা রক্ষা করিয়াছেন এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে বাল্যবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে শ্রুতিগ্রন্থে যে সকল বিধি ও বৈদিক কালের আচারপদ্ধতি দৃষ্ট হয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনু তাঁহার সংহিতায় সেই সকল বিধিবদ্ধ করিয়া সংস্কৃত আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন।

বেদ খুলিলেই দেখিতে পাই যে দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ তখনকার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। ধর্ম্মসাধন এই সকল ক্রিয়াকলাপে স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া যোগ দিতেন। বেদে আছে "যে যজ্ঞে নারী প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে;" "যখন * আর্য্য * * দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকেন, তখন পত্নী * * অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন" (৩)। অনেকস্থলে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষে একত্র যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেন (৪)। মনুসংহিতায় আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট সম্মান ছিল; বেদে দেখিতে পাই যে, বৈদিককালেও স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন। বেদে আছে "যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম্ম করেন এবং অন্য সম্মানিত হয়েন।" (৫) বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া 'জায়াই গৃহ' (ঋগ্বেদ ৩ম, ৫৩সূ, ৪ঋ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গৃহ্যসূত্রেও স্ত্রীলোকের প্রতি ঠিক এইরূপ সম্মানের কথা দেখিতে পাই। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে দেখি "গৃহাঃ পত্নী" (৬) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং গৃহ্য অগ্নিতে পত্নীর হোম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

উপরে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, বৈদিক কালে আর্য্যেরা স্ত্রীলোকের যথার্থ সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। ঋষিরা স্ত্রীলোককে প্রধানতঃ গৃহকার্য্যের উপযোগী বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহারা ধর্ম্মসাধন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের কালে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তবে বাহিরে আসিবার কালে সংবৃত হইয়া আসিতেন (৭)। অন্যান্য বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলেও দেখা যায় যে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। বিবাহের পর যখন বধূ নববিবাহিত স্বামীর সহিত স্বামীগৃহে উপস্থিত হইতেন, তখন সুলক্ষণা পুরন্ধ্রীগণই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যান হইতে অবতরণ করাইতেন (৮)। আবার দেখা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে বৈদিকরমণী সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে দেখা যায় যে মুদ্গলঋষির পত্নী কিরূপ বীরত্বের সহিত শত্রুপক্ষের গাভী হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ দুই চারিটী ব্যতিরেকস্থল দেখা যায় বলিয়া যে তখন অবরোধপ্রথা ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরঞ্চ ব্যতিরেকই নিয়মের প্রমাণ এই প্রবচনের দ্বারা বৈদিক কালে অবরোধ প্রথার অস্তিত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। একটি নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই যে লোকে সাধারণ কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে উদ্যুক্ত নহে। বায়ু বহিতেছে, প্রাণীমাত্রেই উদর পূরণ করিয়া থাকে এই সকল সাধারণ ঘটনা অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা হইলেও কে তাহা লক্ষ্য করে এবং কয়খানা পুস্তকেই বা তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু যদি একদিন বিষম ঝটিকা আসিল

(১) যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

(২) মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

(৩) "যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে;" ঋ ১ম ২৮ সূ
"যদা সমর্য্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্য্যঃ।
অচিক্রদ্ বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আনিশিতং সোমসুদ্ভিঃ॥ ৪ম, ২৪সূ ৮ঋ

(৪) ভবতে মর্ত্তো মিথুনা যজত্রঃ।" ১ম, ১৭৩সূ ২ঋ

(৫) "যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্ত্তা সুকৃতোরন্য ঋন্ধন্। ৩ম, ৩১সূ ২ঋ

(৬) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিয়াছেন—"পত্নী গৃহকার্য্যের উপযোগিনী" আমার কিন্তু বোধ হয় যে বেদের অনুসরণ করিয়া "পত্নীই গৃহ" এইরূপ অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইত। গোভিল গৃহ্যসূত্র ১প্র, ৩খ, ১৫সূ দেখ। স্মৃতিশাস্ত্রেরও "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই উক্তি দ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হইতেছে।

(৭) ঋগ্বেদ ৮ম, ১৭সূ, ৭ঋ; ২৬সূ, ১৩ঋ দেখ।

(৮) গোভিল গৃহ্যসূত্র, ২প্র, ৪ই, ৬—৯

অথবা যদি কোন প্রাণী উদরপূরণ না করিয়া বহুদিবস সুস্থশরীরে জীবিত থাকিল, তবেই দেখিতে দেখিতে পুস্তকে পত্রিকায় তাহার কত ভাবে, কত ছন্দে উল্লেখ দেখা যায়। এই নিয়ম সত্য হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বৈদিক কালে অবরোধ প্রথা আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া বেদে তাহার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না; কেবল যে যে বিশেষ ঘটনাসূত্রে কোন বিশিষ্ট রমণী অথবা সাধারণত স্ত্রীলোকমাত্রেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রকাশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন বা হইতে পারেন তাহারই উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল প্রমাণ অবলম্বনে আমাদের অনুমান হয় যে বৈদিক কালাবধি আর্য্যদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল, এবং মহর্ষি মনু স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্ব বিকশিত করাইবার জন্য তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া, একটা প্রণালীর মধ্যে আনয়ন করিয়া বলিয়া গেলেন যে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে।

বিশ্বপ্রীতি।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

যে ক'টা দিন আছি ভবে
ভালবেসেই যাব
সবায় ভালবেসেই যাব!
যত ভাই বোন ধনী নির্ধন
সবার মুখেই চা'ব
হেসে সবার মুখেই চা'ব!
দিব নাকো ব্যথা কারো মনে
স্বার্থদ্বেষের—
রাখিব না ঠাঁই কোন কোণে
রব সদা শুভ চিন্তনে
সবার ভালোই চা'ব
আমি সবার ভালোই চা'ব!
যে ক'টা দিন আছি ভবে
তোমারি নাম গা'ব
আমি তোমারি নাম গা'ব
নিখিলের বুকে শুনি তব বাঁশী
অবাক হয়েই র'ব
আমি অবাক হয়েই র'ব!
ভালবেসে যাব পশুপ্রাণী
ধূলিতৃণমাঝে—
নত হয়ে নেব তোমা মানি
তোমাতেই র'ব, তোমা জানি
বিশ্বের বুকে পাব
তবে বিশ্বের বুকে পাব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের এই ভয় হইয়াছিল যে ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতিকে আমার মারিতে হইবে। অতএব সাংখ্যমার্গ অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও অশোচ্যত্ব হইতে ইহা সিদ্ধ করা হইল যে, অর্জ্জুনের ভয় বৃথা। আবার স্বধর্ম্মের সামান্য আলোচনা করিয়া গীতার মুখ্য বিষয়, কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আরম্ভ করা গিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম করিলেও উহার পাপপুণ্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেবল ঐ কর্ম্ম সাম্যবুদ্ধিতে করিয়া যাইবে, কেবল ইহাই এক যুক্তি বা যোগ। ইহার পরে শেষে যাহার বুদ্ধি এই প্রকার সম হইয়া গিয়াছে, সেই কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাও করা হইয়াছে। কিন্তু এইটুকুতেই কর্ম্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা সত্য যে, কোনও কাজ সমবুদ্ধিতে কৃত হইলে উহার পাপ লাগে না; কিন্তু যখন কর্ম্ম অপেক্ষা সমবুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ হইতেছে (গী. ২. ৪৯), তখন ফের স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়া লইলেই কাজ চলিয়া যায়—ইহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে কর্ম্ম করিতেই হইবে। অতএব যখন অর্জ্জুন এই সন্দেহ প্রশ্নরূপে উপস্থিত করিলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে "কর্ম্ম করিতেই হইবে]।"

অর্জ্জুন বলিলেন (১) হে জনার্দ্দন! যদি তোমার এই মতই হয় যে, কর্ম্ম অপেক্ষা (সাম্য-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে (যুদ্ধের) নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেন লাগাইতেছ? (২) (দেখিতে) ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দিগ্ধ কথা বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধিকে ভ্রমে ফেলিতেছ। এই

জন্য তুমি এমন একই কথা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বুঝাও, যাহাতে আমার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

§§ লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং॥ ৩॥
ন কর্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮॥

শ্রীভগবান বলিলেন—(৩) হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! পূর্ব্বে (অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি ইহা বলিয়াছি যে, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে—অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগীদিগের।

[আমি 'পুরা' শব্দের অর্থ "পূর্ব্বে" অর্থাৎ "দ্বিতীয় অধ্যায়ে" করিয়াছি। ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে জ্ঞানের বর্ণনা করিয়া আবার কর্ম্মযোগনিষ্ঠা আরম্ভ করা হইল। কিন্তু 'পুরা' শব্দের অর্থ "সৃষ্টির আরম্ভে"ও হইতে পারে। কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ (নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি) উভয়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্ভেই উৎপন্ন করিয়াছেন (শাং ৩৪০ ও ৩৪৭ দেখ)। 'নিষ্ঠা' শব্দের পূর্ব্বে 'মোক্ষ' শব্দ অধ্যাহৃত আছে, 'নিষ্ঠা' শব্দের অর্থে যে মার্গে চলিলে শেষে মোক্ষ লাভ হয় সেই মার্গ বুঝায়; গীতা অনুসারে এইপ্রকার নিষ্ঠা দুইটী আছে, এবং সেই দুইটী স্বতন্ত্র, কোনটী কোনটীর অঙ্গ নহে—ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (পৃঃ—) করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে তাহা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। একাদশ প্রকরণের শেষে (পৃ.) নিষ্ঠাদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহাও নক্সা সহ বর্ণনা করা হইয়াছে। মোক্ষের দুই নিষ্ঠা ব্যাখ্যাত হইল; এখন তাহার অঙ্গভূত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—]

(৪) (কিন্তু) কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তি হয় না, এবং কর্ম্মসন্ন্যাস (ত্যাগ) করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। (৫) কারণ কোন মনুষ্য (কোন-না কোন) কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণ প্রত্যেক পরতন্ত্র মনুষ্যকে (সর্ব্বদা কোন-না কোন) কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত করে।

[চতুর্থ শ্লোকের প্রথম চরণে যে 'নৈষ্কর্ম্য' পদ আছে, তাহার 'জ্ঞান' অর্থ মানিয়া লইয়া সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারগণ এই শ্লোকের অর্থ নিজেদের সম্প্রদায়ের এই ভাবে অনুকূল করিয়া লয়েন—"কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম্ম জ্ঞানলাভের সাধন।" কিন্তু এই অর্থ সরলও নহে আর ঠিকও নহে। নৈষ্কর্ম্য শব্দের উপযোগ বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রদ্বয়ে কয়েকবার করা হইয়াছে এবং সুরেশ্বরাচার্য্যের 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' নামে এই বিষয়ক এক গ্রন্থও আছে। তথাপি নৈষ্কর্ম্যের এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। কেবল সুরেশ্বরাচার্য্যই নহে, কিন্তু মীমাংসা ও বেদান্তের সূত্র রচিত হইবারও পূর্ব্বাবধিই উহার প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা বলা আবশ্যক নাই যে, কর্ম্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য পারা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উহাকে মারিয়া যেমন বৈদ্যগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেইরূপই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ব বা দোষ কাটিয়া যায়। এবং এই প্রকার যুক্তিতে কর্ম্ম করিবার অবস্থাকেই 'নৈষ্কর্ম্য' বলে। এই প্রকার বন্ধকত্বরহিত কর্ম্ম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশাস্ত্রের এই এক বড় প্রশ্ন আছে যে, এই অবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়? মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, নিত্য ও (নিমিত্ত হইলে পর) নৈমিত্তিক কর্ম্ম তো করা চাই, আর কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করা চাই। ইহা দ্বারা কর্ম্মের বন্ধকত্ব থাকে না এবং নৈষ্কর্ম্যাবস্থা সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মীমাংসকদিগের এই যুক্তি ভুল; এবং এই বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃ.) করা গিয়াছে। অপর কতকগুলি লোক বলেন যে, যদি কর্ম্ম না-ই করা হইবে, তবে উহার দ্বারা বন্ধন কিপ্রকারে হইতে পারে? এই জন্য তাঁহাদের মতে কর্ম্মশূন্যতাকেই 'নৈষ্কর্ম্য' বলে। চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, এই মত ঠিক নহে, ইহা দ্বারা তো সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষও লাভ হয় না; এবং পঞ্চম শ্লোকে ইহার কারণও উক্ত হইয়াছে। যদি আমি কর্ম্মত্যাগ করিবার বিষয়ে বিচার করি, তবে যে পর্য্যন্ত এই দেহ আছে সে পর্য্যন্ত শোয়া বসা প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই বন্ধনই হইতে পারে না (গী. ৫. ৯ ও ১৮. ১১). এই জন্য কোনও মনুষ্য কর্ম্মশূন্য কখনও হইতে পারে না। ফলত কর্ম্মশূন্যরূপ নৈষ্কর্ম্য অসম্ভব। সার কথা, কর্ম্মরূপ বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহির করা উচিত যাহা দ্বারা উহা বিষরহিত

হইয়া যায়। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মের মধ্য হইতে নিজের আসক্তি উঠাইয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উপায়। পরে অনেক স্থানে এই উপায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরেও সন্দেহ হইতে পারে যে, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই মোক্ষ লাভ করে, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মত্যাগ আবশ্যক। ইহার উত্তর গীতা এই প্রকার দেন যে, সন্ন্যাসমার্গীর মোক্ষ তো লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগের কারণে লাভ হয় না, কিন্তু মোক্ষসিদ্ধি তাঁহাদের জ্ঞানের ফল, যদি কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই মোক্ষসিদ্ধি হইত, তবে পাথরসমূহেরও মুক্তিলাভ করা চাই। ইহা হইতে এই তিন বিষয় সিদ্ধ হইতেছে—(১) নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মশূন্যতা নহে, (২) কর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু তাহা ত্যাগ হইতে পারে না, এবং (৩) কর্ম্মত্যাগ সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় নহে; এই বিষয়ই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। যখন এই তিন বিষয় সিদ্ধ হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' (গী. ১৮. ৪৮ ও ৪৯ দেখ) প্রাপ্তির জন্য এই এক মার্গই অবশিষ্ট থাকে যে, কর্ম্ম করা তো ছাড়িব না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আসক্তি ক্ষয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকিবে। কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তো বটে, কিন্তু কর্ম্মশূন্য থাকাও কখনো সম্ভব নহে, এইজন্য কর্ম্মের বন্ধকত্ব (বন্ধন) নষ্ট করিবার জন্য আসক্তি ছাড়িয়া সেই সকল করা আবশ্যক। ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলে; এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গই বিশেষ যোগ্যতাপূর্ণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—]

(৬) যে মূঢ় (হাত পা প্রভৃতি) কর্ম্মেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া মনেতে ইন্দ্রিয়বিষয়সকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দাম্ভিক বলে। (৭) কিন্তু হে অর্জ্জুন! যে মনেতে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযমন করিয়া, (কেবল) কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত বুদ্ধিতে 'কর্ম্মযোগের' আরম্ভ করে, তাহারই যোগ্যতা বিশেষ, অর্থাৎ সে-ই শ্রেষ্ঠ।

[পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (গী. ২. ৪৯), এই দুই শ্লোকে তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, যে মনুষ্যের মন শুদ্ধ নয়, কেবল অন্যের ভয়ে বা অপরে আমাকে ভাল বলিবে এই মতলবে, কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারকে নিরুদ্ধ করে, সে প্রকৃত সদাচারী নহে, সে কপট। "কলৌ কর্ত্তা চ লিপ্যতে"—কলিযুগে দোষ বুদ্ধিতে নহে, কিন্তু কর্ম্মেতে থাকে—ইহা এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যক্তি ইহা প্রতিপাদন করেন যে বুদ্ধি যেরূপই হৌক না কেন, কর্ম্ম মন্দ না হইলেই হইল; তাঁহার এই শ্লোকে বর্ণিত গীতার তত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সপ্তম শ্লোকে ইহা প্রকট হইতেছে যে, নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার যোগকেই গীতাতে 'কর্ম্মযোগ' বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গী কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করেন যে, এই কর্ম্মযোগ ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত দাম্ভিক মার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও সন্ন্যাসমার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যুক্তি সাম্প্রদায়িক আগ্রহের কথা, কারণ কেবল এই শ্লোকেই নহে, কিন্তু আবার পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে এবং অন্যত্রও, ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ (গী. র. পৃ —)। এই প্রকার যখন কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, তখন অর্জ্জুনকে এই মার্গেরই আচরণ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন—]

(৮) (নিজের ধর্ম্মানুসারে) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত কর্ম্ম তুমি কর, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। ইহা ব্যতীত, (ইহা বুঝিয়া লও যে, যদি) তুমি কর্ম্ম না কর, তবে (আহারও না পাইলে) তোমার শরীরনির্ব্বাহ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে না।

[‘ব্যতীত’ এবং ‘পর্য্যন্ত’ (অপি চ) পদের দ্বারা শরীরযাত্রাকে সর্ব্বাপেক্ষা কম কারণ বলা হইয়াছে। এখন 'নিয়ত' অর্থাৎ 'নিয়ত কৃত-কর্ম্ম' কি প্রকার এবং অন্য কোন্ গুরুতর কারণে উহার আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝাইবার জন্য যজ্ঞপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। আজকাল যাগযজ্ঞ প্রভৃতি শ্রৌতধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আধুনিক পাঠকগণের নিকট এই বিষয়ের কোন বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গীতার সময়ে এই সকল যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল এবং 'কর্ম্ম' শব্দে প্রধানত এই সকল বুঝাইত; অতএব গীতাধর্ম্মে ইহা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক ছিল যে, ধর্ম্মকৃত্য করা হইবে কি না, আর যদি করিতে হয় তো কি প্রকার। ইহা ব্যতীত, ইহাও মনে থাকে যেন, যজ্ঞ শব্দের অর্থ কেবল জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শ্রৌত যজ্ঞ বা অগ্নিতে কোনও বস্তুর হোম করাই নহে (গী. ৪. ৩২ দেখ)। সৃষ্টিনির্ম্মাণ করিয়া উহার কাজ ঠিক ঠিক চালাইবার জন্য, অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থ, ব্রহ্মা প্রজাগণের চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত যে যে কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন, সে সমস্তই 'যজ্ঞ' শব্দে সমাবেশ হয় (মভা. অনু. ৪৮. ৩; এবং গী. র. পৃ.-১)। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে এই সকল কর্ম্মেরই উল্লেখ আছে এবং এই

'নিয়ত' শব্দে উহাই বিবক্ষিত। এইজন্য বলিতে হয় যে, আজকাল যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায় হইলেও যজ্ঞচক্রের এই আলোচনা এখনও নিরর্থক নহে। শাস্ত্রানুসারে এই সকল কর্ম্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই জগতে মনুষ্যের কল্যাণ হইবে এবং তাহার সুখলাভ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ৪১-৪৪) এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মীমাংসকদিগের এই সহেতুক বা কাম্যকর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহা নিম্ন-শ্রেণীর। এবং মানিতে হয় যে, এখন তো ঐ সকল কর্ম্ম করিতে হয়; এইজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে যে, কর্ম্মের শুভাশুভ-লেপ বা বন্ধকত্ব কি প্রকারে কাটিয়া যায় এবং ঐ সকল করিতে থাকিলেও নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়। এই সমগ্র আলোচনা ভারতে বর্ণিত নারায়ণীয় বা ভাগবতধর্ম্মের অনুসারেই হইয়াছে (মভা. শা. ৩৪০ দেখ)।]

§§ যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

(৯.) যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ (কৃত) কর্ম্ম(ও) তুমি আসক্তি বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক।

[এই শ্লোকের প্রথম চরণে মীমাংসকদিগের এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। মীমাংসক-দিগের কথা এই যে, যখন বেদসকলই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম মনুষ্যের জন্য নিয়ত করিয়া দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বর-নির্ম্মিত সৃষ্টির ব্যবহারে ঠিক ঠিক চলিবার জন্য এই যজ্ঞ-চক্র আবশ্যক তখন কেহই এই কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না; যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে শ্রৌতধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত এই যে প্রত্যেক কর্ম্মের ফল মনুষ্যকে ভোগ করিতেই হয়; এই অনু-সারে বলিতে হয় যে, যজ্ঞের জন্য মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিষয়ে মীমাংসকদিগের উত্তর এই যে, 'যজ্ঞ' করিতে হইবে, ইহা বেদেরই আদেশ, এইজন্য যজ্ঞার্থ যে যে কর্ম্ম করা হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরসম্মত হইবে; অতএব ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা কর্ত্তা বদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কার্য্যের জন্য—উদা-হরণার্থ কেবল নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য,—মনুষ্য যাহা কিছু করে, তাহা যজ্ঞার্থ হইতে পারে না; উহাতে তো কেবল মনুষ্যেরই নিজের লাভ। এই কারণে মীমাংসক উহাকে 'পুরুষার্থ' কর্ম্ম বলেন, এবং উহাঁরা স্থির করি-য়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ যজ্ঞার্থের অতিরিক্ত অন্য কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষার্থ কর্ম্মের যাহা কিছু ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহা মনুষ্যের ভোগ করিতে হয়—এই সিদ্ধান্তই উক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে আছে (গী. র. প্র. ৩ পৃ)। কোন কোন টীকাকার যজ্ঞ = বিষ্ণু এইরূপ গৌণ অর্থ করিয়া বলেন যে, যজ্ঞার্থ শব্দের অর্থ বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ বা পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক; কিন্তু আমার মতে এই অর্থ টানাবুনা ও ক্লিষ্ট। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা ব্যতীত যদি মনুষ্য অন্য কোন কর্ম্মই না করে, তবে কি তাহার কর্ম্মবন্ধন দূর হয়? কারণ যজ্ঞও তো কর্ম্মই এবং উহার স্বর্গপ্রাপ্তি-রূপ যে ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, এই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফল মোক্ষ-প্রাপ্তির বিরোধী (গী. ২. ৪০-৪৪; ও ৯. ২০, ২১ দেখ)। এইজন্যই উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের যজ্ঞার্থ যাহা কিছু নিয়ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও সে ফলাশা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়া, করিবে এবং এই অর্থেরই প্রতি-পাদন পরে সাত্ত্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা হইয়াছে (গী. ১৭. ১১ ও ১৮. ৬)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম যজ্ঞার্থ এবং তাহাও ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিলে (১) ঐ মীমাংসক-দিগের ন্যায়ানুসারেই কোনও প্রকারে মনুষ্যকে বদ্ধ করে না, কারণ তাহা তো যজ্ঞার্থ কৃত হয়, এবং (২) উহার স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ শাস্ত্রোক্ত ও অনিত্য ফল মিলিবার পরিবর্ত্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কারণ তাহা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে এই অর্থই দুইবার প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসকদিগের "যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করা উচিত, কারণ তাহা বন্ধক হয় না"—এই সিদ্ধান্তে ভগবদ্গীতা আরও এই সংস্কার আনিয়া দিয়াছেন যে,

"যে কর্ম্ম যজ্ঞার্থ কৃত হয়, তাহাও ফলাশা ছাড়িয়া করিতে হইবে।" কিন্তু ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কৃত করিবার প্রযত্ন করিয়া যাগযজ্ঞাদি গার্হস্থ্যবৃত্তি বজায় রাখিবার অপেক্ষা ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেয়স্কর নহে? ভগবদ্গীতা এই প্রশ্নের এই এক স্পষ্ট উত্তর দেন যে 'তাহা নহে'। কারণ যজ্ঞচক্র বিনা এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না। অধিক কি বলিব, জগতের ধারণ পোষণের জন্য ব্রহ্মা এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন করিলেন, এবং যখন জগতের সুস্থিতি বা সংগ্রহই ভগবানের অভীষ্ট, তখন কেহই এই যজ্ঞচক্র ছাড়িতে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে, পাঠকদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'যজ্ঞ' শব্দ এখানে কেবল শ্রৌতযজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহাতে স্মার্ত্ত যজ্ঞের এবং চাতুর্বর্ণ্যাদি যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্মের সমাবেশ আছে।

(১০) প্রারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মা (উহাকে) বলিলেন, "এই (যজ্ঞের) দ্বারা তোমার বৃদ্ধি হোক; এই (যজ্ঞ) তোমার কামধেনু হইবে অর্থাৎ ইহা তোমার অভীপ্সিত ফলদাতা হইবে। (১১) তুমি এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে থাক, (এবং) সেই দেবতা তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে থাকুন। (এই প্রকারে) পরস্পর এক অপরকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিয়া (উভয়ে) পরম শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে থাক"। (১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বারা সন্তোষপ্রাপ্ত দেবতারা তোমার অভীপ্সিত (সমস্ত) ভোগ তোমাকে দিবেন। উঁহাদের প্রদত্ত উঁহাদিগকে (ফিরাইয়া) না দিয়া যে (কেবল স্বয়ং) উপভোগ করে, সে সত্যই চোর।

[যখন ব্রহ্মা এই সৃষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন করিলেন, তখন তাঁহার চিন্তা হইল যে, এই লোকসকলের ধারণ পোষণ কি প্রকারে হইবে। মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ইহার পর সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন; তখন ভগবান লোকসকলের নির্ব্বাহের জন্য প্রবৃত্তিপ্রধান যজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্য উভয়কে কহিলেন যে, এই প্রকার ব্যবহার পূর্ব্বক এক অপরের রক্ষাসাধন কর। উক্ত শ্লোকে এই কথারই কিছু শব্দভেদে অনুবাদ করা হইয়াছে (মভা. শা. ৩৪০. ৩৮ হইতে ৬২ দেখ)। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আরও অধিক দৃঢ় হইতেছে যে, প্রবৃত্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের তত্ত্বই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মে, যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (মভা. শা. ৩৩৬ ও ৩৩৭), এইজন্য পশুযজ্ঞের স্থানে প্রথম দ্রব্যময় যজ্ঞ সুরু হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া গেল যে, জপময় যজ্ঞ অথবা জ্ঞানময় যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (গী. ৪. ২৩-৩৩)। যজ্ঞশব্দের অর্থে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সকল কর্ম্ম; এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, সমাজের যথোচিতভাবে ধারণ পোষণ হইবার জন্য এই যজ্ঞকর্ম্ম বা যজ্ঞচক্র ভালরূপ বজায় রাখিতে হইবে (মনু ১. ৮৭)। অধিক বলিব কি; এই যজ্ঞচক্র পরে বিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত লোকসংগ্রহেরই এক আকার (গীতার. প্র. ১১ দেখ)। এইজন্য স্মৃতিসমূহেও লিখিত আছে যে, দেবলোক ও মানুষলোক, উভয়ের সংগ্রহার্থ ভগবানই প্রথমে যে লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম রচনা করিলেন, তাহা পরে ভালরূপ প্রচলিত রাখা মনুষ্যের কর্ত্তব্য; এবং এই অর্থই এখন পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে—]

(১৩) যজ্ঞ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণকর্ত্তা সাধুব্যক্তিসকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু (যজ্ঞ না করিয়া কেবল) নিজেরই জন্য যে (অন্ন) প্রস্তুত করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে।

[ঋগ্বেদের ১০. ১১৭. ৬ মন্ত্রেরও ইহাই অর্থ। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, "নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী"—অর্থাৎ যে মনুষ্য অর্য্যমা বা সখার পোষণ না করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল পাপী বুঝিতে হইবে। এই প্রকারেই মনুস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "অঘং স কেবলং ভুংক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ। যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে॥" (৩. ১১৮)—অর্থাৎ যে মনুষ্য নিজেরই জন্য (অন্ন) প্রস্তুত করে সে কেবল পাপভক্ষণ করে। যজ্ঞ করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'অমৃত' এবং অপরের ভোজন হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে (ভুক্তাবশিষ্ট) তাহা 'বিঘস' উক্ত হয় (মনু ৩. ২৮৫)। এবং সজ্জনের পক্ষে এই অন্নই বিহিত উক্ত হইয়াছে (গী. ৪. ৩২ দেখ)। এক্ষণে এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, যজ্ঞ প্রভৃতির কর্ম্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার জন্যই নহে, আর স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই নহে; বরঞ্চ জগতের ধারণপোষণ হইবার জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত অবলম্বিত]।

(১৪) প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জ্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়; এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

[মনুস্মৃতিতেও মনুষ্যের এবং তাহার ধারণার্থ আবশ্যক অন্নের উৎপত্তির বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণনা আছে। মনুর শ্লোকের ভাব এই যে, "যজ্ঞের অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে পৌঁছায় এবং আবার সূর্য্য হইতে (অর্থাৎ পরম্পরাসূত্রে যজ্ঞ হইতেই) পর্জন্য উৎপন্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়" (মনু. ৩. ৭৬)। এই শ্লোকই মহাভারতেও আছে (মভা. শা. ২৬২. ১১ দেখ)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২. ১) এই পূর্ব্ব পরম্পরা ইহা হইতেও পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে— "প্রথম পরমাত্মা হইতে আকাশ হইল এবং পরে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল; পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।" অতএব এই পরম্পরা অনুসারে, প্রাণীমাত্রের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কথিত পূর্ব্বপরম্পরাকে, এক্ষণে কর্ম্মের পূর্ব্বে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পূর্ব্বে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া, সম্পূর্ণ করিতেছেন—]

(১৫) কর্ম্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, এবং এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। অতএব (ইহা বুঝ যে,) সর্ব্বগত ব্রহ্মই যজ্ঞে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

[কেহ কেহ এই শ্লোকের 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থে 'প্রকৃতি' ধরেন না, তাঁহারা বলেন যে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে 'বেদ'। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' অর্থ করিলে "ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন" এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও এইরূপ অর্থ করিলে "সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেতে আছেন" ইহার অর্থ যথাযথ লাগে না। এই জন্য "মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম" (গী. ১৪. ৩) শ্লোকে "ব্রহ্ম" পদের যে প্রকৃতি অর্থ আছে, তদনুসারে রামানুজভাষ্যে এই অর্থ করা হইয়াছে যে এই স্থানেও 'ব্রহ্ম' শব্দে জগতের মূল প্রকৃতি বিবক্ষিত; এবং এই অর্থই আমারও ঠিক মনে হইতেছে। ইহা ব্যতীত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, যজ্ঞপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, "অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ব্বং যজ্ঞশ্চানুজগৎ সদা" (শা. ২৬৭. ৩৪)—অর্থাৎ যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ এবং জগতের পশ্চাতে যজ্ঞ। ব্রহ্মের অর্থ 'প্রকৃতি' করিলে এই বর্ণনারও আলোচ্য শ্লোকের সহিত মিল হইয়া যায়, কারণ জগতই প্রকৃতি। গীতারহস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতে জগতের সমস্ত কর্ম্ম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকারই পুরুষসূক্তেও বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবতারা প্রথম যজ্ঞ করিয়াই সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—]

(১৬) হে পার্থ! এই প্রকার (জগতের ধারণার্থ) প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম বা যজ্ঞের চক্রকে যে এই জগতে পরে না চালায়, তাহার জীবন পাপরূপ; ঐ ইন্দ্রিয়লম্পটের (অর্থাৎ দেবতাদিগকে না দিয়া স্বয়ং উপভোগকারীর) জীবন ব্যর্থ।

[স্বয়ং ব্রহ্মাই—মনুষ্যেরা নহে—লোক সকলের ধারণপোষণের জন্য যজ্ঞময় কর্ম্ম বা চাতুর্ব্বর্ণ্যবৃত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। এই সৃষ্টির ক্রম চলিতে থাকিবার জন্য (শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্ব্বাহ হইবার জন্য (শ্লোক ৮), এই দুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে; ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞচক্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে সর্ব্বদা চালাইয়া রাখা উচিত। এখন ইহা জানা গেল যে, মীমাংসকদিগের বা শ্রৌতধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড (যজ্ঞচক্র) গীতাধর্ম্মে অনাসক্ত বুদ্ধির যুক্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হইয়াছে (গীতার. প্র. ১১ পৃ দেখ)। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদান্তী সন্দেহ করেন যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষ যখন এইখানে মোক্ষলাভ করেন, তখন তাঁহার কোনও কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই—এবং তাঁহার কর্ম্ম করাও উচিত নহে। ইহার উত্তর পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে দেওয়া যাইতেছে।]

§ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

(১৭) কিন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার জন্য (কেবল নিজের) কোনও কার্য্য (অবশিষ্ট) থাকে না; (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে (কোনও কাজ) করিলে বা না করিলেও তাঁহার কোনও লাভ হয় না; এবং সকল প্রাণীতে তাঁহার কোনও (নিজের) অভীষ্ট রুদ্ধ থাকে না।

(১৯) অতএব অর্থাৎ যখন জ্ঞানীপুরুষ এই প্রকার কোনও অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমিও (ফলের) আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতে থাক; কারণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার পরমগতি লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বিবাহমঙ্গল।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

তোমারি আহ্বানে আজ পরিয়া মিলন-সাজ
এসেছে আশীষ তরে শুভ মিলনের পরে।
নীরব জীবন-পাথে ধরি' যেন তব হাতে
তোমারি করুণা পরে চলে নিরন্তর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥
সন্ততি কেলুক ছেয়ে শত কলতানে গেহ;
তব পুণ্য নাম গেয়ে ধন্য হোক প্রাণ দেহ।
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক ঘুচে যাক দুঃখ শোক;
আনন্দ হউক নিত্য, অনুচর সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II গা ধা। ণধা -ণা পা। মা পা। পমা -পা পা I ধা ধর্সা। ধা -া পা।
তো মা রি০ ০ আ হ্বা নে আ০ ০ জ প রি০ য়া ০ মি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মা পা। মপা -মজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -মা মা। রা রা। সা -া সা I
ল ন সা ০০ জ এ সে ছে ০ আ শী ষ ত ০ রে

২´ ৩ ০ ১
I রা মা। মা -পা পা। পা র্সনা। র্সা -ণা ধা II
শু ভ মি ০ ল নে র০ প ০ রে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II { মা পা। না -া না। না র্সা। র্সনা -র্সা র্সা I র্সনা র্সা। র্রাঃ -র্জ্ঞাঃ র্রা।
নী র ব ০ জী ব ন পা০ ০ থে ধ০ রি যে ০ ন

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্রা। র্সণা -া ধা } I ণা ধা। ণধা -ণা পধা। মা পা। পমা -পা পা I
ত ব হা ০ তে তো মা রি০ ০ ক০ রু ণা প০ ০ রে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ধা র্সা। ধা -া পা। মা পা। মপা -মজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -মা মা।
চ লে নি ০ র ন্ত র ক ০০ রে ত ব এ ০ আ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রা রা। সা -া সা I রা মা। মা -পা পা। পা র্সনা। র্সা -ণা ধা II
শী ষ শি ০ রে ঘ রে ল ০ য়ে যে ন০ ফি ০ রে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II ণা ধা। ণধা -ণা পা। মা পা। পাঃ মঃ পা I ধা র্সা। ধা -া পা।
স ন্ত তি০ ০ কে লু ক ছে ০ য়ে শ ত ক ০ ল

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মা পা । মপা -মজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -মা মা । রা রা । সা -া সা I
জ্ঞা নে গে ০০ হ ত ব পু ০ ণ্য না ম গে ০ য়ে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I রা মা । মা -পা পা । পা পা । পমা -পা পা I { মা পা । না -া না ।
ধ ন্য হো ০ ক প্রা ণ দে০ ০ হ জ্ঞা নে তে ০ উ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা । র্সনা -র্সা র্সা I র্সনা র্সা । র্রা -া র্সা । না র্সা । র্সণা -া ধা } I
জ্ব ল হো০ ০ ক ঘু০ চে যা ০ ক দু খ শো ০ ক

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ধা ধা । ণধা -ণা পা । মা পা । পমা -পা পা I ধা র্সা । ধা -া পা ।
আ ন ন্দ০ ০ হ উ ক নি০ ০ ত্য অ নু চ ০ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মা পা । মপা -মজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -মা মা । রা রা । সা -া সা I
স দা স ০০ ত্য ত ব এ ০ আ শী ষ শি ০ রে

০ ৩ ০ ১
I রা মা । মা -পা পা । পা র্সনা । র্সা -ণধা ধা II II
ধ রে ন ০ য়ে বে ম০ ফি ০০ রে

সরফরদা—আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান,
রবিজ ভয় রবে না রবে না।
পঙ্কজদলজল ইব জীবন চঞ্চল,
ধন জন চপলা-সমান, রবে না রবে না।
মোহপাশবন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন,
সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।
এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না।

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
রা II -পাঃ -মঃ -পমা -ণা I ধা -পা -মা -া । মপা মা -া -গা । -মগা -মরা রা -গা ।
হে ০ ০ ০০ ০ ম ০ ০ ন্ কর আ ০ ০ ০০ ০০ ত্মা ০

১ ২´ ৩ ০
I -গা মা পা -া । মা -া গা -া । -রঃ -গঃ -া -রা -া । -সা -া -া } সা I
০ নু স ০ ন্ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ র

১ ২´ ৩ ০
I সা সা সা -া। রা -গা -মা -মা। -রা -সা -ধ্া -ন্া। -সা -ন্া -ধ্া -প্া I
বি জ ড় ০ র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
I সা সা সন্া -রা। সা রা -া -া। -মা -গা -পা -া। -পা -পা -ণা -া I
র বে না০ ০ র বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
I -ধণা -পা -া -ধণা। ধা -পা -মা মা। পা মা -া -গা। -মা -রা -া রা I
০০ ০ ০ ০০ না ০ ০ ক র আ ০ ০ ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০
I -গা -গা মা পা। মা -া -গা -া। -রঃ গঃ -া -রা -া। -সা -া -া II
০ ০ মু স ঝা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

১ ২´ ৩ ০
পা II না -ধা -ণর্সা র্সা। র্রা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া র্সা I
প হ ০ ০০ অ দ ন ০ ০ ০ অ০ ০ ন ০ ০ ০ ই

১ ২´ ৩ ০
I র্সা র্রা র্সা -া। না -ধা ধনর্সা -রা। র্সা র্সা -র্সা -ধা। -ধণা -পা -া পা I
হ জী ব ০ ন ০ চ০০ ০ ঞ্চ ল ০ ০ ০০ ০ ০ য

১ ২´ ৩ ০
I পা ধা না -া। র্সা র্সনা -র্রা -া। র্সা না ধণা -পা। -ধণা ধপা -মপা -মা I
ব জ ন ০ চ প০ ০ ০ লা স মা০ ০ ০০ ন০ ০০ ০

১ ২´ ৩ ০
I গা রা সগা -রা। সা রা -া -া। -মা -গা -পা -া। -পা -পা -ণা -া I
র বে না০ ০ র বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
I -ধণা -পা -া -ধণা। ধা -পা -মা মা। পা মা -া -গা। -মা -রা -া রা I
০০ ০ ০ ০০ না ০ ০ ক র আ ০ ০ ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০
I -গা -গা মা পা। মা -া -গা -া। -রঃ -গঃ -া -রা -া। -সা -া -া II
০ ০ মু স ঝা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

১ ২´ ৩ ০
রা II পমা পমা -পা পা। ধা -া -ণা -পা। -মঃ -পঃ -া মা গা। -রঃ -গঃ -া -া গা I
মো হ০ পা০ ০ শ ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব ন ০ ০ ০ ০ জা

১ ২´ ৩ ০
I মা পা মা -া। গা মগা -া -রা। রা গমা -গমা -রা। -সসা -া -া রা I
না স্নে হ ০ র ছে ০ ০ দ ন০ ০০ ০ ০০ ০ ০ স

৭

১ ২´ ৩ •
I রা -পমা পা পা। ধা -ণা -পা -া। -া মপা মা -গা। মগা -া -া গা I
ত্তো • • ক র শ্রী • • • • তি পা • • • • ই

১ ২´ ৩ •
I মা পা মা -া। গা -া -রা -া। গরা -া -া -া। -সসা -া -া পা I
বে প ন্নি • ত্রা • • • ণ • • • • • • • এ

১ ২ ৩ •
I পা নধা -নর্সা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা। -া র্রা -র্সা র্সা। -া -া -া র্সা I
খ নি• • • হ ই বে • • • সু • খী • • • আ

১ ২´ ৩ •
I র্সা র্রা র্সা -া। না -ধা ধনর্সা -রা। র্সা র্সা -নর্সা -ধা। -ধণা -পা -া পা I
স্বা তে আ • স্বা • রে• • • দে খি • • • • • • ক

১ ২´ ৩ •
I পা ধা না -া। র্সা র্সনা -র্রা -া। র্সা না ধণা -পা। -ধণা ধপা -মপা -মা I
থা মা ন • প্র বী• • • ণ অ জ্ঞা• • • ন• • • •

১ ২´ ৩ •
I গা রা সসা -রা। সা রা -া -া। -মা -গা -পা -া। -পা -পা -ণা -া I
ভু ল না• • ভু ল • • • • • • • • • •

১ ২´ ৩ •
I -ধণা -পা -া -ধণা। ধা -পা -মা মা। পা মা -া -গা। -মা রা -া রা I
• • • • • • না • • ক র আ • • • • • স্বা

১ ২´ ৩ •
I -গা -গা মা পা। মা -া -গা -া। -রঃ -গঃ -া -রা -া। -সা -া -া II II
• • সু স ন্ধা • • • • • • • • • • • ন্

সংবাদ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব—বিগত ৯ আষাঢ় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সুরেশ বাবু ধর্ম্মের প্রয়োজন সম্বন্ধে একটী মনোগ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন। সমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক সামাজিক উপাসনা বিষয়ক যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশ করিলাম।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্টের খাতিরে আর্ট।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একে তো দেশ নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে ; তাহার পর যেটুকু বাকী আছে, নবপ্রকাশিত আধুনিক উপন্যাস-সমূহের কল্যাণে সেটুকুও বোধ হয় আর বাকী থাকে না। আজকাল যে সমস্ত উপন্যাস মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহাদের অনেকগুলিই দেশকে অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিবার জন্য যেন আড়েহাতে লাগিয়াছে। দেশের অধোগতির প্রতি অন্ধ থাকিয়া এই সকল কুৎসিৎ উপন্যাস প্রকশের অন্যতর প্রধান কারণ হইল আমাদের মজ্জাগত দাস-ভাব বা slave mentality। আমরা বাহিরের স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া চীৎকার করিলে হইবে কি ? বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানাবিধ কারণ মিলিত হইয়া দেশের প্রাণে দাসভাবকে খুদিয়া বসাইয়া দিয়াছে। আমাদের অন্তরের দাসভাব যে এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই, তাহার পরিচয় পদে পদে দেখিতে পাই। বিলাতী যাহা হোক একটা কোন ধুয়ার আমদানি হইলেই হইল, সেটী অমনি আমরা গিলিয়া খাইবার জন্য বসিয়া থাকি। এমন কি, আমাদের ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, এখনও সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখনিঃসৃত কোন প্রশংসাবাক্য উদ্ধৃত করিতে না পারিলে তাহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি না !

সাহিত্যসম্বন্ধে এই প্রকার হলাহলপূর্ণ একটা বিলাতী ধুয়া পাশ্চাত্য জড়জগতের মন্থনে উত্থিত হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং এদেশবাসীর আর্টের প্রয়োগপ্রণালীকে বিপথে পরিচালিত করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সেই ধুয়াটী হইতেছে art for art's sake—আর্টের খাতিরে আর্ট। একটা চলিত কথা আছে যে, জগতে শতকরা দশজন চিন্তাশীল লোক, যাহারা কিছু চিন্তা করে, নিজেদের মস্তিষ্ক মন্থন করিয়া একটা কিছু উদ্ভাবন করে ; আর অবশিষ্ট নব্বই জন আসলে অজ্ঞান, কাজেই "ধামা-ধরা"—যাহারা ভাবিবার, চিন্তা করিবার অবসরের অভাবেই হউক, অথবা অজ্ঞান ও আলস্যবশতই হউক, ঐ দশজনের কথা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহে। এই স্থলে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা হলওয়ে সাহেবের একটা গল্প মনে পড়িতেছে। হলওয়ে সামান্য একটু ডাক্তারি পড়িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছিলেন, আর তাঁহারই এক সহপাঠী চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। একদিন পথে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়ায়

কথায় কথায় সেই সুচিকিৎসক তাঁহার বন্ধু হলওয়েকে তাঁহাদের উভয়ের অর্থাগমের এই প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হলওয়ে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং বারান্দায় তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অধিকাংশ পথিকের বৃথা ছুটাছুটী দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও ধনী শতকরা দশজনের চিকিৎসার ভার সেই সুচিকিৎসক গ্রহণ করেন, আর বাকী মূর্খ নব্বই জনের মূর্খতা ও অজ্ঞানের উপর হলওয়ে নিজের জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। জগতের সকল ক্ষেত্রেই এই কথা—শতকরা দশজন ভাবে, আর শতকরা নব্বই জন মেষপালের ন্যায় অন্ধভাবে সেই দশজনেরই অনুসরণ করে।

ঐ যে বিলাতী ধুয়াটী এদেশে আসিয়াছে, উহাও কোন পাশ্চাত্য চিন্তাশীল কলা-সমালোচক স্বীয় অন্তরের কোন এক ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, যে জর্ম্মনিদেশে বিজ্ঞান ও দর্শন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত হয়, এবং সেই কারণে যে দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার পক্ষপাতী, সেই জর্ম্মনিদেশেরই এক আর্টসমালোচক আর্টকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে, চিত্রের অন্যান্য অঙ্গ হইতে আর্টকে পৃথকভাবে দেখিবার হিসাবে সর্ব্বপ্রথম "আর্টের খাতিরে আর্ট" এই তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার যে ভাব হইতেই হউক, তিনি এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরে তাঁহারই ধুয়া-ধরা আর্টিষ্টম্মন্য অনেক লোক তাঁহার এই উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সময়ে অসময়ে ক্ষেত্রে-অক্ষেত্রে "আর্টের খাতিরে আর্ট" এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঐ কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ঐ তত্ত্বের সেই আদিম আবিষ্কারকের সহিত জ্ঞানে বিদ্যায় একাসনের অধিকারী বিবেচনা করিয়া এবং জনসাধারণের নিকট সদম্ভে সেই আত্মকৃত অধিকার নানা উপায়ে প্রচার করিয়া মহা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

আবার ইহাঁদের এই কথাগুলির ভিত্তিতে আর্টসমালোচনার কলরব যখন এদেশে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এদেশেরও ইংরাজীশিক্ষিত অনেকে আপনাদিগের যশস্পৃহা চরিতার্থ করিবার এমন সহজ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহারা, আর্টের খাতিরে আর্ট, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই তত্ত্বের যে প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহারও আবার প্রতিধ্বনি এদেশে উঠাইয়া আপনাদিগকে স্বদেশের ক্ষুদ্র জগতে অশেষ অধ্যয়নশীল ও চিন্তাশীল "সমঝদার" কলাসমালোচনা করিবার উপযুক্ত কলাতত্ত্ববিৎ, এক কথায় সাধারণ স্বদেশবাসী অপেক্ষা আপনাদিগকে অনেক উন্নত জীব বলিয়া পরিচিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তাহার পর, "শতকরা নব্বই জনের" যে দুর্দ্দশা তাঁহাদেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিল—তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, শতমুখে ঐ "আর্টের খাতিরে আর্ট" কথাগুলি আওড়াইয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের বড়াই করিয়া মহা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

আমরা জানি না, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর্টের খাতিরে আর্ট কথাটী প্রকৃত কি ভাবে লোকেরা গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই কথাটী যে ভাবে গৃহীত হয়, সে ভাবে ধরিলে কথাটীকে নিতান্তই অন্তঃসারহীন একটা কথার কথা মাত্র বলিয়া মনে হয়। আমরা যে কাজই করি, সেই কাজই তো তাহার নিজেরই খাতিরে করিতে হয়। আমাদের আহার-বিহারের কোন্ কাজটাই না তাহার নিজের খাতিরে করি? সুতরাং "আর্টের খাতিরে আর্ট" কথাটাকে একটা বাজে কথার পুনরুক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? কিন্তু প্রত্যেক কাজই তাহার নিজের খাতিরে করিতে হইলেও তাহার একটা-না-একটা লক্ষ্য তো থাকিবেই—কোন না-কোন উদ্দেশ্য না থাকিয়া যাইতেই পারে না। খাওয়ার খাতিরে খাওয়া, কাপড় পরার খাতিরে কাপড় পরা, এই সমস্ত কথা একশতবার উচ্চারণ করিলেও বিশেষ কিছু বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যখন খাওয়া-পরার শরীররক্ষা বা আস্বাদ-গ্রহণ প্রভৃতি একটা কোন উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহার বিশেষত্ব বা সার্থকতা ব্যক্ত হইয়া উঠে। সেইরূপ আর্টের খাতিরে আর্ট

বলিয়া শত চীৎকার করিলেও বিশেষ কিছু ব্যক্ত হয় বলিয়া মনে হয় না—বিশেষ কোনই সার্থকতা দেখি না। আর্টকে একটা কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর দাঁড় করাইতেই হইবে, এবং দাঁড় করাইলেই তাহার সার্থকতা। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াও আসিয়াছি যে, জগতের মঙ্গল, স্বাস্থ্য ও উন্নতিসাধনই সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের খাতিরে আর্ট, এই তত্ত্বের আদিম আবিষ্কারক ও প্রচারক সম্ভবত বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে পরিপার্শ্ব হইতে আর্টকে পৃথক করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, আর্টকে খুঁজিয়া বাহির করিতে গেলে তাহাকে পরিপার্শ্বের ভিতর দিয়াই দেখিতে হইবে; পরিপার্শ্বের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তো আর্টের আর্টত্ব। প্রকৃতির মধ্যে একটা জড় পদার্থকেও আলোচনা করিতে গেলে, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়াই হউক বা অন্য যে ভাবেই হউক, পরিপার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করা অসম্ভব। একটা জীবিত জীবজন্তুকেও আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, সে কোন্ স্থানে বাস করে, তাহার আহার্য্য কি, কি ভাবে সে বিচরণ করে ইত্যাদি। আবার সেই জীবজন্তুকে মৃত অবস্থায় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে পরিপার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা নিতান্তই অসম্ভব। এই মাত্র বলিতে পারি যে, জীবিত অবস্থা হইতে মৃত অবস্থার পরিপার্শ্ব ভিন্ন হইয়া গেল। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আর্টের বস্তু উপভোগের ন্যায় একটা মানসিক বৃত্তিকেও তাহার পরিপার্শ্ব বা মনের অন্যান্য অবস্থা, বস্তুটীর অবস্থান, বস্তুটীর উপকরণ, আর্টিষ্টের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ও পৃথক করিয়া দেখা একেবারেই অসম্ভব। সেই কারণে আর্টের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যকেও অযথা সমালোচনার ছুরিকা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উপলব্ধি করানো অসম্ভব। পরিপার্শ্ব হইতে আর্টের বস্তুকে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব নহে বলিয়াই চিত্রের সহিত পরিপ্রেক্ষণের একপ্রকার নিত্যসম্বন্ধ বলিলেও চলে। সঙ্গীতেরই বল, আর সাহিত্যেরই বল, সকল বিষয়েরই আর্ট উপভোগ করিতে গেলে তাহাদের পরিপার্শ্বের ভিতর দিয়াই তাহা উপভোগ করিতে হয়। প্রকৃত আর্টকে পরিপার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অর্থে প্রাণকে প্রাণন কার্য্য হইত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা। ইহার বিপরীতে আমাদের মনে হয় যে, আর্টকে পরিপার্শ্বের সহিত সংশ্লিষ্টভাবেই আলোচনা করিতে হয়, উপভোগ করিতে হয়। এই প্রকার সংশ্লিষ্টভাবেই আর্টের বস্তুকে দেখিতে হয় বলিয়াই তাহা দ্বারা জগতের মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধনের কথা, তাহার সুন্দর-অসুন্দরের কথা স্বতই আসিয়া পড়ে। আর্টের খাতিরে আর্ট, এই কথার মূল্য বা সার্থকতা প্রকৃতই আমাদের উপলব্ধিতে আসে না।

মনসাতত্ত্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

সমগ্র বঙ্গদেশ আসাম ও কোচবেহার এই কয় বিভাগে আপামর-সাধারণ হিন্দুর গৃহে মনসা দেবী সমভাবে সমাদৃতা ও বিভিন্ন প্রণালীতে পূজিতা হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্য প্রাদেশিক দেবতার ন্যায়, ইহাকে প্রাদেশিক দেবতার শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। একাচুরা, বরকুমার প্রভৃতি দেবতাগণ নিতান্ত অল্পস্থানেই পূজিত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি তত্তৎপ্রদেশবাসী পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়দিগের নিজস্ব। উহা কোনও ধর্ম্মনিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কিন্তু মনসা পূজা সেরূপ নহে। উহা স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিথিতত্ত্বে, শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়-কৃত ব্রতকালবিবেকে এবং বাচস্পতি মিশ্র কৃত কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৈমনসিংহ প্রদেশে প্রচলিত "বর্ষকৃত্য" নামক নিবন্ধেও মনসাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি হইতে জানা যায়, মনসাব্রতসম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐগুলি "কৃত্যকামধেনু" নামক প্রাচীন নিবন্ধ হইতে সঙ্কলিত

হইয়াছে; সুতরাং আরও যে কত কত নিবন্ধে মনসা দেবীর ব্রত-পূজাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজসাধ্য নহে। ইহাঁর পূজা সাধারণতঃ নিত্য ও কাম্য, এই দুই প্রকার বলিয়া উল্লেখযোগ্য। পূজার কাল এবং অনুষ্ঠান প্রণালীরও প্রভূত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধেও মতভেদের অভাব নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে দেবীপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে এই দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বচনের অর্থ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবতার সহিত নিদ্রিত হন, অর্থাৎ বিষ্ণুর শয়ন হইলে সমস্ত দেবতারই নিদ্রা হইয়া থাকে। অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে মনসাদেবী জাগরিত হন। ঐ তিথিতে সিজবৃক্ষের শাখাস্থিত মনসাদেবীর পূজা কর্ত্তব্য। দেবীর পূজা এবং নমস্কার করিলে সাধকের সর্পভয় বিদূরিত হয়। দেবীর পূজার পরেই অনন্তাদি মহাসর্পগণের পূজা বিহিত হইয়াছে। সর্পদিগের পূজায় ক্ষীর ও ঘৃত বিশেষ নৈবেদ্যরূপে বিহিত হইয়াছে।

দেবীপুরাণে—

সুপ্তে জনার্দ্দনে দেবে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্॥
পন্নগাস্তে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
মনসাদেবীং বিষহরীং, স্নুহী সিজবৃক্ষঃ।
দেবৈরিতি সহার্থে তৃতীয়া।
দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্ মহোরগান্॥
ক্ষীরং সর্পিশ্চ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্।

বাচস্পতিমিশ্রকৃত "কৃত্যচিন্তামণি" গ্রন্থেও হরিশয়নের অনন্তর শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীতেই মনসা দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে, এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে গোময়ের দ্বারা বিষধর সর্প আঁকিয়া তাহাদের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু গৃহমধ্যে নিম্বপত্র স্থাপনেরও বিধান আছে। যথা—

কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চম্যাং কৃষ্ণস্বাপাদনন্তরম্।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহী-বিটপসংস্থিতাম্॥
শ্রাবণে মাসি পঞ্চম্যাং কৃষ্ণপক্ষে নরাধিপ।
দ্বারস্যোভয়তো লেখ্যা গোময়েন বিষোল্বণাঃ॥
যে বিমান্ পূজয়ন্তীহ নাগান্ ভক্তিপুরঃসরাঃ।
ন তেষাং সর্পতো বীর ভয়ং ভবতি কর্হিচিৎ॥
পিচুমর্দ্দস্য পত্রাণি স্থাপয়েদ্ ভবনোদরে।
পিচুমর্দ্দস্য নিম্বস্য। মনসাপঞ্চমীয়মিতি॥

বলা আবশ্যক যে, বাচস্পতি মিশ্র যে পঞ্চমীতিথিকে "মনসাপঞ্চমী" নামে অভিহিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে উহার নাম "নাগপঞ্চমী"। তন্ত্রশাস্ত্রে উহা দেবপর্ব্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে "আষাঢ়ে নাগ-পঞ্চমী" মুখ্যচান্দ্র আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমীই গৌণ চান্দ্র শ্রাবণের তিথি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত্যতত্ত্বে ভাদ্রের শুক্লাপঞ্চমীতে নাগ পূজার ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইহারই নাম "নাগপঞ্চমী"। পাঠকের অবগতির জন্য কৃত্যতত্ত্বের পাঠ এইস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"ভাদ্রশুক্লপঞ্চমীমধিকৃত্য ভবিষ্যোত্তরে—
"তথা ভাদ্রপদে মাসি পঞ্চম্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সর্পং লিখ্য নরো ভক্ত্যা কৃষ্ণবর্ণাদি-বর্ণকৈঃ॥
পূজয়েদ্গন্ধমাল্যৈশ্চ সর্পিগু‍্গ্গুলুপায়সৈঃ।
তস্য তুষ্টিং সমায়ান্তি পন্নগাস্তক্ষকাদয়ঃ॥
আসপ্তমাৎ কুলাত্তস্য ন ভয়ং সর্পতো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নাগান্ সংপূজয়েন্নরঃ।
ইয়মেব নাগপঞ্চমীতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ"॥

বেনারস হইতে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত কৃত্যচিন্তামণিতে "নাগপঞ্চমীর" কোন উল্লেখ দেখা যায় না। রঘুনন্দনধৃত পাঠের সহিতও কতক অসামঞ্জস্য আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আর একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও নাগ আঁকিয়া পূজা করিতে হইবে, ইহাতে কোন্ নাগ আঁকিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তথাপি শ্রাবণ পঞ্চমীতে যে সমস্ত নাগের পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই কর্কোট প্রভৃতি নাগদিগকেই আঁকিতে হইবে, এবং শ্রাবণী পঞ্চমীবিহিত রীত্যনুসারেই পূজা করিতে হইবে। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে শ্রাবণের শুক্ল পঞ্চমীই নাগপঞ্চমী নামে অভিহিত হই-য়াছে। যথা—

"চমৎকারচিন্তামণৌ
পঞ্চমী নাগপূজায়াং কার্য্যা ষষ্ঠীসমন্বিতা।
তস্যাস্তু তুষিতা নাগা ইতরা সচতুর্থিকা। ইতি

শ্রাবণে পঞ্চমী শুক্লা সংপ্রোক্তা নাগপঞ্চমী।
তাং পরিত্যজ্য পঞ্চম্যশ্চতুর্থীসহিতাঃ স্মৃতাঃ।
ইতি মদনরত্নেঽভিধানাচ্চ।

অতঃপর হেমাদ্রি হইতে গোময়লিখিত নাগপূজার বিধায়ক বচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

হেমাদ্রৌ ভবিষ্যে—

শ্রাবণে মাসি পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষে নরাধিপ।
দ্বারস্যোভয়তো লেখ্যা গোময়েন বিষোল্বণাঃ॥
পূজয়েদ্বিধিবদ্বীর দধিদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ কুশৈঃ।
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ।
যে তস্যাং পূজয়ন্তীহ নাগান্ ভক্তিপুরঃসরাঃ।
ন তেষাং সর্পতো বীর ভয়ং ভবতি কুত্রচিৎ॥

তবেই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার নাগপঞ্চমী এবং দাক্ষিণাত্যের ও হিন্দুস্থানের নাগপঞ্চমী এক তিথি নহে। বাঙ্গালার নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজার অঙ্গরূপে নাগপূজা হইয়া থাকে। আর দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দুস্থানে প্রধানরূপেই নাগপূজার ব্যবস্থা। মৈথিলমিশ্রের মতে বাঙ্গালার নাগপঞ্চমীতেই মনসাপূজার বিধান আছে, পরন্তু ঐ তিথি নাগপঞ্চমী বলিয়া পরিচিত নহে। ভাদ্রশুক্লা পঞ্চমীই নাগপঞ্চমী, এবং তাহাতেই স্বতন্ত্ররূপে নাগপূজার বিধান। বাঙ্গালীর গ্রন্থে নাগপঞ্চমীতে গোময়ের দ্বারা সর্পলিখনের ব্যবস্থা নাই, উহা মৈথিলের মতে আছে। ভাদ্রের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজার ব্যবস্থা মৈথিলের ও বাঙ্গালীর সমান। হেমাদ্রিধৃত বচন ভবিষ্যপুরাণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, বাঙ্গালী রঘুনন্দন-ধৃত কৃত্যতত্ত্বের বচনগুলিও ভবিষ্যোত্তরীয় বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মাসের ঐক্য নাই। সুতরাং ইহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক দেশপ্রভাব রহিয়াছে। বাঙ্গালার পুরাণ, মিথিলার পুরাণ ও দাক্ষিণাত্যের পুরাণ নামত এক হইলেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ এক নহে। নাগপূজার সহিত মনসাপূজার অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং মনসাপ্রসঙ্গে নাগপূজার বিস্তৃত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

মনসাদেবী অষ্টনাগসমাযুক্তা, এই কথা তাঁহার অনেকগুলি প্রাদেশিক ধ্যানে এবং প্রার্থনা প্রভৃতির মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। উহা প্রাদেশিক পদ্ধতির সমালোচনায় বিবৃত হইবে। তিথিতত্ত্বধৃত পুরাণান্তরের বচনে অষ্টনাগের নাম কথিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বচনোল্লিখিত নাম ও সংখ্যার যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এই বচনে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই আটটি নাগের নাম কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী পদ্মপুরাণের বচনে শেষ (অনন্ত), পদ্ম, মহাপদ্ম, কুলিক, শঙ্খপাল, বাসুকি, তক্ষক, কালীয়, মণিভদ্রক, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় এই তেরটি নাগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"শেষঃ পদ্মো মহাপদ্মঃ কুলিকঃ শঙ্খপালকঃ।
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালীয়ো মণিভদ্রকঃ॥
ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ।

ইহার পর গরুড়পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্মং কম্বলমেব চ।
তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ শঙ্খকম্॥
কালীয়ং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মণিভদ্রকম্।
যজেত্তানসিতান্নাগান্ দর্পমুক্তো দিবং ব্রজেৎ॥

ইহাতে অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক, কালীয়, তক্ষক, পিঙ্গল ও মণিভদ্র এই বারটি নাগ দেখা যায়।

যদিও দেবীর ধ্যান প্রভৃতিতে অষ্টনাগের উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি পূজাপদ্ধতিতে অষ্টনাগের অতিরিক্ত নাগদিগেরও পূজা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। কোন কোন ধ্যানে অষ্টনাগ দেবীর বিবিধ আভরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণের বচনে নাগদিগের "অসিত" বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আভিধানিক অর্থানুসারে অসিত শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু পদ্ধতিতে নাগদিগের যে ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতে ইহাদের নানা প্রকার বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পূজার কালবিশেষ ও দেবীর উৎপত্তিবিবরণ।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি-কৃত "ব্রতকালবিবেকে"

জ্যৈষ্ঠশুক্লদশমীতে "মনসাব্রত" বিহিত হইয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত বচনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, হস্তানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠশুক্লদশমীতে ব্রহ্মরূপিণী "মনসাদেবী" কশ্যপ হইতে জাত হইয়াছিলেন। কশ্যপের মন হইতে জাত হইয়াছিলেন, এই হেতু ইনি "মনসা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে ইঁহাকে ভক্তিসহকারে বিধানানুসারে পূজা করিতে হয়। মানব নিয়মতৎপর হইয়া অনন্তাদি অষ্টনাগেরও পূজা করিবে। শূলপাণি ইহাও বলিয়াছেন যে, হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে মনসাদেবীর ব্রত করিবে; হস্তানক্ষত্র যোগ না হইলে কেবল দশমীতেই পূজা কর্ত্তব্য। কারণ ইহা নিত্য কার্য্য; কোন বৎসরই উহার বাধ হইতে পারে না। বচনান্তরে এই পূজার কাম্যত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা নিত্য ও কাম্য।

জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাং হস্তানক্ষত্রযুক্তায়াং মনসাদেবীব্রতং কার্য্যং। হস্তাযোগাভাবে কেবলদশম্যামপি। যথা কৃত্যকামধেনুধৃতো-ব্যাসঃ—

জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যান্তু হস্তর্ক্ষে ব্রহ্মরূপিণী।
কশ্যপান্মনসাদেবী জাতেতি মনসা স্মৃতা।
তস্মাত্তাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বর্ষে বর্ষে বিধানতঃ।
অনন্তাদ্যষ্টনাগাংশ্চ নরো নিয়মতৎপরঃ॥

অত্র বিধৌ হস্তাযোগশ্রবণাৎ হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং পূজয়েদিত্যেকো বিধিঃ, কেবলদশম্যামিত্যপরশ্চ। অন্যথা প্রতিবর্ষকর্ত্তব্যত্বানুপপত্তেঃ। অতএব—

"তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনম্।
যোগাভাবে তিথিঃ কার্য্যা দেব্যাঃ পূজনকর্ম্মণীতি॥

অত্র দেব্যা ইত্যুপলক্ষণং। অতএব বর্ষে বর্ষে ইতি বীপ্সাশ্রুতেরস্য নিত্যত্বম্।

এবং—বর্ষে বর্ষে তু যঃ কুর্য্যাদ্মনসাব্রতমুত্তমম্।
তং রক্ষেৎ সততং দেবী বিষসর্পভয়াৎ স্বয়"মিতিতদ্বচনান্তরে ফলশ্রুতেঃ কাম্যত্বঞ্চ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শূলপাণির গ্রন্থেই জ্যৈষ্ঠশুক্লা দশমীতে মনসাপূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। অদ্যাপি রাঢ়দেশে ভগীরথ-দশহরার দিনে মনসার ঘটস্থাপন হইয়া থাকে এবং ঐদিন হইতেই পূজা আরম্ভ হয়। নাগপঞ্চমী, কর্কটসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণমাসের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক পঞ্চমীতেও পূজা হইয়া থাকে। রাঢ়ের পূজার আরও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পদ্ধতিপ্রসঙ্গে বিবৃত হইবে। আমাদের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে নাগপঞ্চমী দিনেই সিজের ডাল ঘরে স্থাপিত হয়, এবং ঐদিনে পূজা হয়। কর্কটসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণের অন্তঃপাতী প্রত্যেক পঞ্চমীতেই পূজা হইয়া থাকে। এই প্রথা বাঙ্গালার অনেক স্থলেই দেখা যায়। আমাদের দেশে বৃদ্ধপরম্পরায় মুখস্থ প্রমাণ প্রচলিত আছে যে,—

"সংক্রান্তিদ্বিতয়ে চৈব পঞ্চম্যাঞ্চ সিতাসিতে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্॥

কিন্তু ময়মনসিংহ সদরের অধীন পুঁটীজানা দেবগ্রাম অঞ্চলে নাগপঞ্চমীতে মনসার ঘটস্থাপন করা হয়। ঐ ঘটে প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। কর্কটসংক্রান্তি সিংহসংক্রান্তি ও শ্রাবণের প্রত্যেক পঞ্চমীতে স্বতন্ত্র ঘটস্থাপন করা হয়। মোট পাঁচটি ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে। যদি নাগপঞ্চমী তিথি সৌর শ্রাবণে যাইয়া পড়ে, তবে সিংহসংক্রান্তিতে দুইটি ঘট স্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশে মাঘের শুক্লপঞ্চমীতে মনসা পূজা হয়। মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে, উহা মনসার জন্মতিথি। রাজসাহীর তাণোর থানার অধীন কামারগাঁওনিবাসী শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট জানা গেল, ঐ প্রদেশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কর্কটসংক্রান্তিতে ঘটস্থাপন করেন; প্রতিদিন স্থাপিত ঘটে পূজা হইয়া থাকে। পুরুষপূজক সম্ভব না হইলে মেয়েরাও পূজা করিয়া থাকেন। শ্রাবণসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণের শুক্লাকৃষ্ণাপঞ্চমীতে কিছু ব্যাপক পূজা হইয়া থাকে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, তাঁহাদের হস্তলিখিত পদ্ধতিতে মনসাপূজা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের এই প্রমাণ আছে—

"রবৌ কর্কটকে চৈব ধনধান্যবিভূতয়ে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং প্রদোষে নাগমাতরম্॥
অষ্টনাগসমাযুক্তাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
সংক্রান্ত্যোরুভয়োশ্চৈব পঞ্চম্যোশ্চ বিশেষতঃ॥

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহাও বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রদেশে যে সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা কেবল নাগপঞ্চমী দিনেই মনসাপূজা করেন অধিকন্তু রাঢ়ীয়গণ কেবল সিজের ডালেই পূজা করেন, মূর্ত্তি করেন না। বারেন্দ্রগণ প্রতিমায় পূজা করেন, অনেক বাড়ীতে পূজায় ছাগ বলিদান

হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাঢ়দেশে প্রদোষসময়ে মনসা পূজা দেখিয়াছেন, এমত বলিলেন। তাঁহার কথিত প্রমাণেও প্রদোষ সময়ে নাগমাতা মনসা-দেবীর পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। ১৩২৭ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে রামপুর বোয়ালিয়া মোকামে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বর্ত্তমান বয়স ৭৮ বৎসর।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র সি, আই, ই, মহাশয় বলিলেন—তাঁহাদের অঞ্চলে (কুমারখালী) কর্কটসংক্রান্তিতে মনসার ঘটস্থাপন হয়। সিংহ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঘটে পূজা হইয়া থাকে। মেয়েরাই পূজা করেন, প্রতিবন্ধকবশতঃ মেয়েরা পূজা করিতে না পারিলে পুরোহিত পূজা করেন।

দেবীর উৎপত্তি।

শূলপাণিধৃত ব্যাসবচনে কশ্যপ হইতে মনসার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। দেবীভাগবতে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। দেবীভাগবত বলিতেছেন যে,—"ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং প্রোক্তং দেবীবিধানকম্"। অর্থ—মনসার ধ্যান এবং পূজার বিধান সামবেদোক্ত, অর্থাৎ এই পূজার অঙ্গ, ধ্যান, পরিপাটী প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় সামবেদেই নিহিত আছে, তাহা হইতে পরবর্ত্তী কালে উহা পুরাণাদিতে স্থান পাইয়াছে। ইঁহার নামের নিরুক্তিপ্রসঙ্গেই পুরাণে উৎপত্তিবিবরণ স্থান পাইয়াছে। যথা—

"সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসাদেবী মনসা যা চ দীব্যতি।
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন সা মনসাদেবী তেন যোগেন দীব্যতি॥
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষীণমীশ্বরঃ।
গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ॥
৯।৪৭।৩৯।৪২ দেবীভাগবত।

এই সকল বচনের অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ভগবতী "মনসাদেবী" কশ্যপের মানসী, অর্থাৎ মন হইতে উৎপন্না কন্যা। ইনি আত্মারামা সিদ্ধযোগিনী। ইনি মন হইতে জাতা, অতএব ইঁহার নাম "মনসা"। মনস্ শব্দের পরে "অর্শ আদ্যচ্" প্রত্যয়যোগে "মনসা" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মনের দ্বারা ধ্যান করেন, এইজন্যও ইঁহার নাম মনসা। ইনি তিন যুগ পর্য্যন্ত পরমাত্মা কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। ভগবান্ গোপী-পতি ঈশ্বর, তাঁহার তপঃক্ষীণ দেহকে জরৎকারু অর্থাৎ অতি জীর্ণ বস্ত্রাদির মত ক্ষয়প্রাপ্ত দেখিয়া অথবা জরৎকারু মুনির শরীরের মত ক্ষীণ দেখিয়া তাঁহাকে জরৎকারু নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

মনোজন্যত্বান্মনসা দেবনাদ্বা মনঃশব্দাদর্শ আদ্যচি কৃতে মনসেতি সিদ্ধং। মনঃকরণকধ্যানকর্তৃত্বাদ্বা মনসেতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ। অত্রাপ্যর্শ আদ্যচোব। জনকত্বেন দেবন ধ্যানসাধনত্বেন বা মনোঽস্তি যস্যা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তেন যোগেন পরমাত্মসমাধিরূপেণ যতো দীব্যতি তত ইত্যর্থঃ।
৩৯-৪০।

জরৎকার্ব্বতিজীর্ণং বস্ত্রাদিকং তদ্বৎ তপস্যায়া ক্ষীণং শরীরং মনসায়া দৃষ্ট্বা যদ্বা জরৎকারুমুনিবৎ ক্ষীণশরীরং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো. মনসায়া জরৎকারুরিতি নাম চক্রে ইত্যর্থঃ।
৪২। নীলকণ্ঠ।

দেবীভাগবতোক্ত ধ্যানটি এইরূপ—

"শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবরজ্ঞানিনাং বরাম্।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃ-দেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে"॥
৯।৪৮।১৩।

অর্থ—শুভ্রবর্ণ চম্পকপুষ্পের তুল্য বর্ণযুক্তা, রত্নালঙ্কারভূষিতা, বহ্নিশুদ্ধ (ইস্তিরী করা) বস্ত্রপরিধানা সর্পরূপ যজ্ঞোপবীতশালিনী, মহাজ্ঞানযুক্তা, উৎকৃষ্ট জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃ-সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধা দেবীকে ভজনা করি।

পূজার দুই প্রকার মন্ত্র দেখা যায়,—তন্মধ্যে একটি মন্ত্র দশাক্ষর, অপরটি দ্বাদশাক্ষর।

"ওঁ হ্রীং শ্রীং মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ যত্নতঃ।
দশাক্ষরেণ মূলেন দদৌ সর্ব্বং যথোদিতাম্"॥
৯।৪৮।২২।

"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ"।
(৯।৪৮।৬। দেবীভাগবত)

পূজার কালসম্বন্ধে দেবীভাগবতে কথিত হইয়াছে যে,—

"ব্রহ্মন্ স্নাত্বা তু সংক্রান্ত্যাং গূঢ়শালাসু যত্নতঃ।
আবাহ্য দেবীমীশানাং পূজয়েদ্‌যোঽভিযত্নতঃ॥
পঞ্চম্যাং মনসা ধ্যায়ন্ দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্।
৯।৪৮।৮-৯।

স্নানের অনন্তর গুপ্তগৃহমধ্যে সংক্রান্তি দিবস আবাহনের পর ঈশ্বরীদেবীর পূজা করিবে। পঞ্চমীতেও পূজা এবং বলিদান করিতে হইবে। আর একটি বচনে আষাঢ়সংক্রান্তিতে পঞ্চমী তিথিতে মাসান্তে অর্থাৎ শ্রাবণ-সংক্রান্তিতেও প্রতিদিন অর্থাৎ মাসব্যাপক পূজা বিহিত হইয়াছে।

যথা—

"যে ত্বাষাঢ়স্য সংক্রান্ত্যাং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ।
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং মাসান্তে বা দিনে দিনে॥
৯।৪৮।১৩২।

মহাভারতের আস্তিকপর্ব্বে মনসার জরৎকারু নাম, জরৎকারুমুনির সহিত বিবাহ এবং মনসার গর্ভে আস্তিকের উৎপত্তি এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বাসুকির ভগিনী এ কথাও আছে। কিন্তু জরৎকারু নামের নিরুক্তি ও কশ্যপের মন হইতে উৎপত্তি এ সমস্ত বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

আমরা যে সমস্ত পদ্ধতি পাইয়াছি, তত্রত্য ধ্যান প্রার্থনা আবাহন স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক স্থলেই মনসা দেবী শঙ্করের কন্যা নামে এবং পদ্মবনে সমুৎপন্না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মনসার ভাষাণ এবং মেয়েলী কথাতেও ইনি শঙ্করের দুহিতা এবং চণ্ডিকাদেবীর সপত্নীকন্যা বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, দেবতা ঋষি অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব নদনদী প্রভৃতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক স্থলেই পৌরাণিক আখ্যানের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। নিবন্ধকারগণ কল্পভেদে উৎপত্তির প্রভেদ স্বীকার করিয়া অগত্যা সমাধান করিয়া গিয়াছেন। আখ্যানের প্রাচীনতাই বৈষম্যের কারণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

আহ্বান।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ)

পূর্ব্বাশারে প্রভাতের জনম-উৎসব
মুক্ত করি কোষাগার অতুল বৈভব
ছড়ায়ে দিয়েছে বিশ্ব; বরমাল্যখানি
দিয়েছে প্রকৃতি সুন্দরের গলে আনি।
দিকে দিকে উঠে স্তুতি, উঠে জয়গান
পুলক রোমাঞ্চে কম্প্র এ নিখিল প্রাণ।
কোন্ কালে গবাক্ষের দ্বার গেছে খুলি
বাতাস আলোক গন্ধ জয়ধ্বনি তুলি'
অযাচিত বন্ধুপ্রায় অকুণ্ঠ আগ্রহে
দাঁড়ায়েছে ঘেরি, সবে মোরে ডাকি কহে
হে তন্দ্রিত, খোলো আঁখি অমৃতভাণ্ডার
মুক্ত আজি তব তরে; কর অধিকার
মানব-গৌরবে নিজ যত আয়োজন
করিয়াছে তব তরে নিখিল ভুবন।

কোন্ পথে ?

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

বাঙ্গালী আজ জীবনযাত্রার পথে এমন একটী সঙ্কটপূর্ণ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখান হইতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে যেমন বিপদজনক, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হওয়াও তেমনি সংশয়সংকুল। চারিদিক হইতে বিপরীত স্রোতের গতি আসিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে ধাক্কা মারিতেছে। তীব্র চঞ্চলতার মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব। তাহাকে যাইতেই হইবে; কিন্তু সমস্যা কোন্ দিকে—কে তাহার পথনির্দ্দেশ করিবে? রাষ্ট্রীয় শাসন দিন দিন তাহার শক্তি হরণ করিতেছে। নানা দেশের বণিক আসিয়া তাহার ধনভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিল; তাহার শিক্ষা তাহার মনুষ্যত্বকে বিলুপ্ত করিল; বৈদেশিক আদর্শ তাহার জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল; তিল তিল করিয়া সে মরণের পথে অগ্রসর! কে তাহাকে রক্ষা করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্লাবনে তাহার জীর্ণ কুটীরখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী আজ ঘরছাড়া হইয়া সেই সভ্যতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে। এতদিন দেব-আশীর্ব্বাদের মত সমস্ত জাতি সেই আদর্শকে শিরোধার্য্য করিয়াছি; সাধ করিয়া তাহাকে দেবতার আসন দিয়াছিলাম; কিন্তু আজ দেখিতেছি তাহার কুৎসিত নগ্ন মূর্ত্তি—দেবীর আসন তাহার যোগ্য নয়।

ছেলেবেলার ঠাকুরমার গল্পে শুনিয়াছি, রাক্ষসী

মোহিনী নারীর বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার পর দিন হইতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। নিশীথ রাত্রে রাক্ষসী আহার অন্বেষণে বাহির হয়। প্রতিদিন প্রাতে সংবাদ আসে—গো, মেষ, মহিষ ও মানবের রক্তে রাজপথ কলুষিত! কৃষকের ক্ষেত্রে শস্য রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, গোয়ালে গরু রাখিয়া শান্তি নাই, সর্ব্বত্র অমঙ্গল সর্ব্বত্র অশান্তি। অনেক দিন পরে রাজ্য যখন প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে তখন রাজা বুঝিতে পারিলেন—যাহাকে আদরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, রাজ-অন্তঃপুরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, সে দেবী নহে মানবী নহে—সে রাক্ষসী! রাক্ষসের স্বভাব এই যে, সে চায় নিজের ভোগ পূরামাত্রায়; তাহাতে অন্যের সুবিধা অসুবিধা কিছুই সে মানিবে না। যে কোন প্রকারে আত্মোদর-তৃপ্তিই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য—অন্য উদ্দেশ্য নাই। আমাদের এই বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার ভিত্তিও এই 'আত্মম্ভরিতায়'; উৎকৃষ্ট ভোগের মধ্যে নিজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিব তাহাতে অন্যের সুবিধা অসুবিধা মানিব না।

এই হৃদয়হীনতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট! আজকাল একটা কথা শুনা যায়—"Struggle for existence and survival of the fittest"—এই সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিব ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার নীতি। ব্যক্তি এবং জাতির পক্ষ হইতে এই নীচ স্বার্থ রক্ষা করাই নাকি আমাদের ধর্ম্ম! ইহাকেই যথার্থ কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি, এমনই আমাদের শিক্ষা-বিকৃতি ঘটিয়াছে। যুগে যুগে প্রতিসমাজে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মানবপ্রেমে আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা পথনির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—আবার যুগে যুগে মানুষের বুদ্ধি আপনার জটিলজালে আপনাকে বদ্ধ করিয়া সেই সরল পথ আবার সংশয়সমাকুল করিয়া তুলিতেছে!

বর্ত্তমান কালে কত প্রকার সমস্যা যে আমাদের জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সংখ্যানির্ণয় করা সহজ নহে। সকলগুলির মূল ঐ এক—স্বার্থপরতা! এই স্বার্থপরতা ভোগমূলক! উৎকট ভোগপ্রবৃত্তির দাসত্বনিগড়ে আজ সমস্ত মানবসমাজ বদ্ধ হইয়াছে। সে মুক্তি অন্বেষণ করিতেছে এই ভোগের মধ্যে—ফলে তাহার দাসত্বশৃঙ্খল দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মহীন শিক্ষা (godless education) এই ভোগের জন্মদাতা। ধর্ম্মহীন শিক্ষা মানুষকে দেখাইয়া দেয় ভোগই সার—আর সমস্ত অসার। বর্ত্তমান যুগে ইয়ুরোপ এই শিক্ষা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ভোগসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আলোকের অনুসন্ধানে অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারের গহ্বরে নিমজ্জিত হইতেছে। বিজ্ঞানের বর্ত্তিকা হাতে লইয়া Faustএর মত দিন দিন সে আঁধারের গর্ত্তে নামিয়া চলিতেছে। আর, এক অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইলে অন্য অন্ধের যে অবস্থা হয়—তাহাই হইয়াছে আমাদের—পাশ্চাত্য-অনুকারীগণের।

অথচ ইয়ুরোপের চিরদিন এমন অবস্থা ছিল না। একদিন সে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল—সত্যের উপাসনা করিয়াছিল। ধর্ম্মকে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে দিয়াছিল। সে বহুদিনের কথা নয়। তাহার পর জানিনা কবে কেমন করিয়া, কোন্ শয়তানের লুব্ধ প্ররোচনায় তাহার এই পতন! সে তাহার ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে—মুখে না করুক, কার্য্যে করিতেছে। আর্থিক ঐশ্বর্য্যের মোহে সে ভুলিয়া গিয়াছে—বস্তুকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে—মানবতাকে অপমান করিয়াছে! অপমানিত মানবতা আজ তারস্বরে জগতের দ্বারে রোদন করিয়া বেড়াইতেছে! সে রোদনের রোলে বিশ্বপতির যোগনিদ্রা ভাঙ্গিবে!

এই ধর্ম্মহীন শিক্ষা ইয়ুরোপকে স্বাধিকারপ্রমত্ত বলদৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে শুধু নিজের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করে—অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা, মানব-আত্মার স্বাধীনতা সে উপলব্ধি করে না। সেইজন্য জড়শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিকে দাস করিতে চায়। সে মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কার্য্যে সে সকলের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। তাহার "League of Nations" আত্মপ্রবঞ্চনা-

মাত্র। তাহারা যথার্থ স্বাধীন নহে, হিংসা ও লিপ্সার দাস। যথার্থ স্বাধীন যিনি, তিনি অন্যের স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। স্বাধীন এবং স্বাধিকারপ্রমত্তের প্রভেদ ইহাই!

এই পাশ্চাত্য অনুকরণে আমরা যে সকল জিনিষ পাইয়াছি তাহার অনেকগুলিই আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা যে ব্যবহারাজীবী পাইয়াছি, তাহার দ্বারা দেশে বিবাদের সংখ্যা ও জটিলতা বাড়িয়া চলিয়াছে; মীমাংসা বিশেষ হয় নাই। এ শিক্ষা আমাদিগকে এমনই স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসম্প্রদায় বিরাট জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমস্ত জাতির সহিত তাহার যেন কোন সংস্রব নাই। ইঁহাদের দেশহিতৈষিতা বক্তৃতা ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধে পরিসমাপ্ত হয়। পল্লীবাসকে ইঁহারা ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন; বলেন সেখানে ম্যালেরিয়া, কলেরা, জলকষ্ট, ভাল ডাক্তার নাই ইত্যাদি। অথচ যাহারা পল্লীতে বাস করিয়া এই সমস্ত অসুবিধা ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, বিপুল বিদেশী দ্রব্য ক্রয়ের জন্য দেশের অর্থ বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয়; পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার কারণও ইহাই। সহরের ভোগযজ্ঞে পল্লীগ্রামকে আত্মাহুতি দিতে হইতেছে। পল্লীবাসী সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, ভোগের জন্য সহর সে সমস্তই শোষণ করিয়া লইবে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের এত দুর্দ্দশা ছিল না; কেননা তখনকার সম্ভ্রান্ত পল্লীবাসীগণ যাহা ব্যয় করিতেন—আপন পল্লীতে বসিয়াই করিতেন, তাহার ফলভোগী হইত সেই পল্লীর অধিবাসিগণ। আদান-প্রদানের নীতি দ্বারা সমাজজীবন রক্ষিত হয়। এদেশে আদানেরই ব্যবস্থা আছে, প্রদানের নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে—কাজেই সমাজজীবন উৎসাদিত ক্ষীণ মুমূর্ষু।

ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় পল্লীর জীবন-পাত পরিশ্রমের উপার্জ্জন সহরে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। সেখানে আসিয়াও তাহার নিস্তার নাই, বিবিধ বৈদেশিক বিলাসব্যসনে তাহা বিদেশী বণিকের করায়ত্ত হইতেছে। দেশের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী স্বার্থমূলক শিক্ষা! সেই জন্যই অসহযোগ আন্দোলনের প্রোগ্রামে বর্ত্তমান বিদ্যালয় ও তাহার এই ভাবের শিক্ষাপ্রণালী বর্জ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছিল; জাতীয় শিক্ষার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ইংরাজীর তরজমা নহে। Geographyর পরিবর্ত্তে ভূগোল এবং Historyর পরিবর্ত্তে ইতিহাস পড়াইলেই জাতীয় শিক্ষা হয় না। জাতীয় শিক্ষা অনুকরণ নয়। জাতি আত্মস্থ হইলে তবেই জাতীয় শিক্ষার পথ আবিষ্কৃত হইবে, নতুবা নহে।

কিন্তু কেমন করিয়া জাতি আত্মস্থ হইবে? জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের যাহারা মেরুদণ্ড, যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভদ্রলোকের দগ্ধ মুখে আজও অন্নের গ্রাস উঠিতেছে, জাপান বা আমেরিকা হইতে এক টাকা সেরের চাউল কিনিতে হইতেছে না, তাহারা আজ মৃতপ্রায়! রোগে শোকে, দুঃখে দৈন্যে, অনাহারে তিল তিল করিয়া মরিতেছে। জীবনের শোণিত নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে! প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, ম্যালিরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া, জমিদারের কর্ম্মচারী, সুদখোর মহাজন, জলৌকাবৃত্তি ব্যবহারাজীব, পুলিশ, পেয়াদা প্রভৃতি সহস্র উৎপাত সহ্য করিয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিতসম্প্রদায় নির্ব্বাক নিস্তব্ধ অসাড় জড়ের মত দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন, নিজেদের দাসত্বের প্রচেষ্টায় মসগুল হইয়া আছেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দাসত্বও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়াও ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরী পাওয়া যাইতেছে না —অথচ সংসারের খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পল্লীগ্রামের বসতবাটী উৎসাদিত হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের বাসস্থান হইতেছে; আর সহরের এক কাঠা জমির উপর উত্থাপিত কোটরের ভাড়া শশীকলার মত প্রতিদিনই বাড়িয়াই চলিয়াছে—এক শত টাকায় কম একটা পুরা বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। সমস্ত দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে; সহরের কলেবর বাড়িতেছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক

—যাঁহারা অনেক কষ্টে "ভদ্র" আখ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে উন্মত্ত হইয়া সহরের দিকে ধাবিত হইতেছেন—উন্মত্ত অবস্থা—কি করিতে হইবে তাহা কেহই জানেন না—শুধু টাকা! টাকা! টাকা! টাকা চাই—দাসত্ব করিয়া হোক্, আত্মবিক্রয় করিয়া হোক্—যে কোন প্রকারে উপার্জ্জন করি না কেন, তাহাতে নিন্দা নাই; কিন্তু অর্থ চাই-ই চাই!

এই দেশের অবস্থা! উন্মত্ততার প্রেরণায় আত্মহত্যার দিকে সমস্ত জাতি অগ্রসর হইতেছে; সংসারসাগরে সে আজ লক্ষ্যহারা; তাহার ধ্রুবতারা দিক্‌চক্রবালে ডুবিয়া গিয়াছে—এবার 'ঘূর্ণিত জলে' তার প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। আমার অতি সাধের জাতীয় জীবনতরণীখানি এই মহাতরঙ্গের বুকে কে ভাসাইয়া দিলরে? বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই, নিষ্ঠা নাই—ভীষণ অপ্রত্যয় আসিয়া দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়াছে। কাণ্ডারী কে চিনিতে পারিতেছি না। কাণ্ডারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই। যেদিন সকালবেলা বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে জাতীয়-জীবন-তরী ভাসাইয়াছিলাম, তখন বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছিল; সুদূর উপকূলের দূরাগত বাঁশীর সঙ্গীতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের আভাস পাইতেছিলাম; সেদিন মনে হইয়াছিল বাতাস এমনি মধুর বহিবে। কিন্তু এখন একি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

গগনে গরজে ঘন খর বহে সমীরণ

আজ আক্ষেপ, তীব্র পরিতাপ, কেন কূল ত্যাগ করিয়াছিলাম; স্বজাতির আদর্শ কেন ছাড়িয়াছিলাম; আত্মবিস্মৃত হইয়া কেন পর-উপাসনার ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম! কেন মন-প্রাণ সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া দাসত্বকে বরণ করিয়াছিলাম! এমন করিয়া সানন্দে দাসত্বের শৃঙ্খল তো কেউ পরে না, আমরা যেমন পরিয়াছি!

আর বুঝি উপায় নাই। যে গ্রাম্য সরলতা, যে সহজ ধর্ম্মজ্ঞানকে স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়াছি, আর কি সে ফিরিবে? রুদ্ধদ্বার গৃহ হইতে অবমানিতা দেশলক্ষ্মী কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাই সমস্ত দেশ আজ গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া! 'উপায় কোন্ পথে' 'উপায় কোন্ পথে'—সমস্ত জাতির মর্ম্মমথিত হাহাকার আকাশে বাতাসে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! পথ কোথায়? কে পথ নির্দ্দেশ করিবে?

যে বিশ্বপ্রাণ মহাপুরুষ পথনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, প্রমত্ত রাজরোষ তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়াছে। অতি-বুদ্ধিমান তাঁহাকে আজ উপহাস করিতেছে! তাঁহার অপরাধ—সমস্ত জাতির মুক্তির মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—মুমূর্ষু জাতিকে সঞ্জীবনী সুধা পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! মহাত্মা গান্ধী কারাগারে—সমস্ত দেশ সংশয়াকুল! অবিশ্বাসের অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আবৃত। কেমন করিয়া পথ দেখিবে? কে পথ দেখাইবে? বিপুল মোহনিদ্রা প্রাণপণ বলে বিদূরিত করিয়া শতাব্দীর অসাড়তা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিয়া পথ দেখিতে হইবে। এখনও কারাগারের লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বজ্রগম্ভীররবে মুক্তির মন্ত্র ঝঙ্কৃত হইতেছে; মহাত্মা নিজের সমস্ত প্রাণশক্তি উজাড় করিয়া সত্যমন্ত্র শুনাইতেছেন; মরণপথযাত্রী দেশবাসী এখনও কি সে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না?

মন্ত্র সহজ সরল। তিনি চিরদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহাই। তাঁহার এক কথা—চরকা আর খদ্দর! দাসত্বের কলঙ্ক-কালিমা ক্ষালন করিবার মুমূর্ষুকে সঞ্জীবিত করিবার আর দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। "খদ্দরের" অর্থ—আপনার সহজ সরল জীবনযাত্রার পথে প্রত্যাবর্ত্তন। "খদ্দর" স্ব-তন্ত্র—তার নিজের একটী বিশিষ্ট আসন আছে; সে আপন দারিদ্র্যের গৌরবমহিমায় বিমণ্ডিত। বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতালোককে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়া আত্মস্বরূপে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি ও সাহস তাহার আছে। সে যথার্থ সাম্যমন্ত্রের সাধক। বর্ত্তমান সভ্যতার মৌখিক সাম্য সে অগ্রাহ্য করিতে পারে। ভারতের সনাতন সভ্যতার মুক্তধারায় অবগাহন করিয়া সে অমর হইয়াছে। তপঃমূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আজীবন তপস্যার ফলস্বরূপ এই মহামন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছেন। আধুনিক সভ্যতার নাগপাশে যাঁহারা বদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিবেন; তাঁহার স্বেচ্ছায় কারা-বরণ বাতুলতা বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহার আত্মোৎসর্গের মর্য্যাদা বুঝিবেন না। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল, যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আলোচনা

করেন, যাঁহারা তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেন, তাঁহারা মহাত্মানির্দ্দিষ্ট পথকেই একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকার করিবেন। মহাত্মার আন্দোলন কোন বিশিষ্ট শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে নহে—বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে। বর্ত্তমান সভ্যতা যে ঐশ্বর্য্যের পূজায় মানুষের আত্মাকে বলি দিয়াছে, যে জড়বলে বলীয়ান হইয়া মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে অস্বীকার করিয়াছে, যাহার অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন রথচক্রতলে জগতের যথার্থ কর্ম্মী শ্রমজীবী নিষ্পেষিত, বাক্যজীবী পরিপুষ্ট, বর্ত্তমান সভ্যতা যে বিজ্ঞানের মন্ত্রে প্রাণশক্তিকে অবহেলা করিয়া যন্ত্রশক্তির পূজা করিতেছে—মহাত্মার আন্দোলন এই প্রাণহীন সভ্যতার বিরুদ্ধে। যাঁহারা প্রাণশক্তি অগ্রাহ্য করেন না—প্রাণের বিকাশ কামনা করেন—তাঁহারা আপন অন্তরে মহাত্মার বাণী চিরদিন পোষণ করিবেন।

বহু শতাব্দীর দাসত্বভারে অবনত জাতি পথ পাইয়াও পায় না—বারবার হারাইয়া ফেলে। আজ দেশের লোক লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা হইয়া—নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া—জড়ের মত কালযাপন করিতেছে। ফিরাও ফিরাও, হে আদিদেব, এই অলস মন্থর গতি, এই নিষ্ঠুর আত্মহত্যার উন্মত্ত প্রয়াস! দূর কর এই মরণোন্মুখ জাতির মূঢ় অবসাদ! সমস্ত মানবজাতির দুঃস্বপ্ন ও আতঙ্কের অবস্থায় তুমিই স্নেহময়ী মাতার মত আপনার কল্যাণ-ক্রোড়ে তাহাকে রক্ষা করিয়া অমৃত পান করাইয়াছ। এই মুমূর্ষু জাতিকে আজ রক্ষা কর। বাহিরের সমস্ত প্রচেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইল—সে সমস্ত ব্যর্থতাকে সফলতামণ্ডিত করুক তোমার শুভ্র সুন্দর করুণা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের পরলোক গমনে—

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।)

ছন্দের রাজা তুমি
এ কি তব রঙ্গ
সহসা বিদায় নিলে
করি' যতি-ভঙ্গ!
কাননের পিক তুমি
গাহিছিলে গান
অকস্মাৎ এ কি হ'ল
নীরবিল তান!
নভশুকতারা তুমি
জ্বেলেছিলে বাতি
সহসা লুকা'লে কোথা
মিলাইল ভাতি!
ফুলমালা গাঁথিছিলে
কোথা চলি গেলে?
আধ-গাঁথা মালাখানি
দিবে কা'র গলে?
মৌন বটে বীণা তব
গুঞ্জন শেষ
তবু হে অমর কবি
রবে তার রেশ!
সেই গীত-রেশ শুনি
মুগ্ধ হবে লোক
তীর্থোদকে তব কবি
বিসরিবে শোক॥

শাস্ত্রে যৌবনবিবাহ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে, অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং বৈদিককালে এই দুইটির কোনটীই প্রচলিত ছিল না, মনুই প্রথম এই দুইটী প্রবর্ত্তিত করিয়া অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে অবরোধপ্রথা বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহা মঙ্গলজনক বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইতেছে না। এবারে আমরা দেখিব যে অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই, এবং বৈদিককালে অবরোধপ্রথা সত্বেও যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, আর মনুও বাল্যবিবাহের সপক্ষ নহেন। বেদে আছে "যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না"; (১) "যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণ-যুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর" (২) "নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিনী করিয়া দাও।" (৩)

---

(১) ৮ম, ২সূ, ১৯। (২) ১০ম, ৮৮সূ, ২১।
(৩) ১০ম, ৮৫সূ, ২২।

এই সকল উক্তি হইতে কি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে না যে বৈদিককালে যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল ? গোভিল-গৃহ্যসূত্রে বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে তথনকার কালে স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহের পক্ষে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। গোভিল বলেন বিবাহকালে বামপার্শ্ববর্তিনী "কন্যা স্বীয় দক্ষিণহস্তের দ্বারা বরের দক্ষিণ-স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে" এবং "হোমের পর উত্তরে উপবেশন করিবে" (১) অর্থাৎ উত্থানকালে বরের বামহস্ত কন্যার পৃষ্ঠ হইয়া বামস্কন্ধে থাকিবে।" (২) যদি ইংরাজদিগের বিবাহসম্বন্ধীয় পুরাতন উপানহ নিক্ষেপ পূর্ব্বকালের প্রচলিত আসুর বিবাহের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে গোভিলোক্ত এই আচার যে যৌবনবিবাহেরই সমর্থক, এ কথা কি প্রকারে অস্বীকার করিব ? নববিবাহিত যানারূঢ় বধূকে স্বামী-ভবনে প্রথম অবতরণকালে বামদেব্য সামগান করিতে হইত। ইহা অষ্টমবর্ষের গৌরীলক্ষণাক্রান্তা কন্যার কর্ম নহে, তাহা বলা বাহুল্য। যাই হউক, বেদে যে যৌবনবিবাহ সমর্থিত এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের কোনই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার উপরে অধিক বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক।

এই যৌবনবিবাহের উল্লেখসূত্রে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। বর্ত্তমানকালে আমাদের অনেকে, বিশেষত প্রাচীনপ্রথার পক্ষপাতী অনেকে মনে করেন যে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের একটী প্রধান কারণ স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহ। আমার তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয় দূষিত, তাহাদের বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবনবিবাহই হউক, তাহারা মন্দ কর্ম্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেই ; যাহাদের সাধু হৃদয়, তাহারা মন্দ কর্ম্মের দিকে কিছুতেই যাইবে না। অনেকে বলেন যে বাল্যবিবাহে, ভগ্নী যেরূপ ভাইকে প্রীতি করে সেইরূপ স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করিতে শিখে। আমার মতে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা আর একটু প্রগাঢ় হওয়া আবশ্যক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন হৃদয়ে নব অনুরাগের সূত্রপাত হইতে থাকে, সেই সময়ে বিবাহ হইলে সেই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ স্বামীর দেহ মন আচ্ছাদিত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে যৌবনবিবাহের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে "যৌবনবিবাহেই সন্তানগণ ও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ক্ষীণ হয় না।" (৩) আর বৈদিককালেও স্ত্রীলোকের ব্যভিচার, পতিবিদ্বেষ প্রভৃতির অস্তিত্ব যে ছিল তাহা বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়। (১) কিন্তু জ্ঞানবান ঋষিদের কেহই একথা বলেন নাই যে এই সকল দোষের মূল যৌবনবিবাহ। রক্ষকের অভাব, বৈধব্য ও দ্যূতক্রীড়া, অর্থলোভ এবং দ্যূতক্রীড়াতে স্বামীর আত্মনাশ ও স্ত্রীপরিত্যাগ, এই সকল যে স্ত্রীলোকের দোষের কারণ হয়, বেদে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। বেদের একটি সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার কুফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করিত। কিন্তু একমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্য্যা ত্যাগ করিলাম। যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। * * * পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন ; যদি কাহারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। * দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা আকুল। * * আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীতনিবারণের জন্য অগ্নিসেবা করিতে হয়।" (২)

মনুসংহিতায়ও আমরা দেখি যে, মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ পতিবিরহ, যথেচ্ছা বিচরণ, অকালনিদ্রা ও পরগৃহবাস এই ছয়টী স্ত্রীলোকের দোষের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কুত্রাপি যৌবনবিবাহ যে ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ, এরূপ উল্লেখ নাই। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মনুসংহিতায় যখন যৌবনবিবাহেরই উল্লেখ নাই, তখন তাহার স্ত্রীর দূষণ বলিয়া উল্লেখ থাকিবার কোন কারণ নাই। আমরা কিন্তু দেখিব যে মনু যৌবনবিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, তবে নিতান্ত বিশেষ কারণ থাকিলে তিনি বাল্যবিবাহ দিতেও নিষেধ করেন নাই। একথায় অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন, কারণ তাঁহাদের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ইহা উক্ত হইল। কিন্তু যখন বেদে যৌবনবিবাহের উল্লেখ আছে, তখন মনুও যে বেদের অনুসরণ করিয়া তাহারই বিধি দিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য

(১) পূর্ব্বে কটান্তে দক্ষিণতঃ পাণিগ্রাহস্যোপবিশতি দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণমংসমন্বারব্ধায়াঃ গোভিল গৃ সূ ২প্র, ১ম ২৩—২৩।

(২) সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অনুবাদ।

(৩) "প্রজা ন হীয়তে তস্যা রতিশ্চ ভরতর্ষভ।" মহাভা, অনু, ৪৪ অঃ।

(১) ঋগ্বেদ ৪। ৫। ৩, এবং মনু ৯ অ ১০।

(২) ঋং ১০ম, ৩৪ সূ।

কি—বরঞ্চ মনু যদি বিনা কারণেও বাল্যবিবাহ মাত্রেরই বিধি দিতেন, তাহাতেই আমরা অধিক আশ্চর্য্য হইতাম।

যাহা হৌক্ এখন দেখা যাউক যে মনু বিবাহসম্বন্ধে কিরূপ বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি উৎকৃষ্ট ও রূপগুণাদিসম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায় তবে কন্যা বিবাহের যোগ্য বয়ঃক্রম প্রাপ্ত না হইলেও পাত্রটীকে হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা তাহার সহিত সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবে। (১) কিন্তু যদি উপযুক্ত গুণবান পাত্র না পাওয়া যায়, আর মনুকে যদি মানিতে হয়, তবে এই অবস্থায় কন্যা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও পিতৃগৃহে আমরণ অপেক্ষা করিবে; মনু বড়ই জোরের সহিত আদেশ করিয়াছেন যে গুণহীন পাত্রে পিতা "কদাপি" প্রাপ্তযৌবনা কন্যাকেও সম্প্রদান করিবে না। (২) ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষিও তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে যৌবনসঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্রলাভ না করিলে বিবাহ দিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে মনুর মতে উপযুক্ত বর প্রাপ্ত হইলে কন্যার প্রাপ্তবয়স্কা হইবার অল্লাধিক তারতম্য থাকিলেও কন্যাসম্প্রদান কর্ত্তব্য। এখন কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে কন্যাকে কখন্ বিবাহের উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া বোধ করা যাইবে? ইহার উত্তরে মনু বলেন যে যৌবনের সূত্রপাত হইবার তিন বৎসরের পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল বলিয়া জানিতে হইবে। "কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর উদীক্ষা (৩) পূর্ব্বক কালযাপন করিবে; তাহার পরে সদৃশ পতি লাভ করিবে।" (৪) ভাষ্যকারের মতে যৌবনসঞ্চারের (বা ঋতুদর্শনের) কাল দ্বাদশ বৎসর— "ঋতুদর্শনঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণামিতি সূচ্যতে।" মনুরও ইহাই মত বলিয়া বোধ হয়; কারণ তিনি বিবাহের উপযুক্ত বয়সের ন্যূনকল্প দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন "ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবার্ষিকী কন্যাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু সেই কন্যার হৃদ্য অর্থাৎ সহজ কথায় 'বাড়ন্ত' হইয়া হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্যক। আমাদের অনুমান হয় যে, তখন অনেক লোকে ধনলোভ প্রভৃতি নানা কারণে একদিকে যেমন কন্যাসম্প্রদানে বিলম্ব করিত, সেইরূপ অনেক সময় অতি অল্পবয়স্কা বালিকার বিবাহ দিত। (১) তাই মনু দেশাচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, "অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্টবৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু দুই বিকল্পের মধ্যে যাঁহারা সত্বর হইয়া শেষোক্ত বিকল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ বালিকাবিবাহ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মে বা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহারা উন্নতির পরিবর্ত্তে শীঘ্রই অবনতি প্রাপ্ত হন। "ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।" ইহাতেই বোধ হইতেছে যে ষোড়শ বৎসরই মনুর মতে কন্যাসম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। তবে এ সময়েও অনুপযুক্ত গুণহীন পাত্রে কন্যাদান নিতান্তই অনুচিত, তাহাও মনু বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইয়াছে এবং কন্যার ষোড়শ বৎসর বয়সও হইয়াছে অথচ অভিভাবকেরা অর্থলোভবশতঃ বা অন্য কোন তুচ্ছ কারণে সেই পাত্রকে কন্যাসম্প্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিলেও পাপভাক্ হইবে না এবং যাহাকে বিবাহ করিবে সেও সেইরূপ পাপভাক্ হইবে না। (১) তবেই বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মনুর মত এই দেখিতেছি যে বাল্যবিবাহের (যথা. ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত আট বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের) ফল ধর্ম্মবিষয়ে অবসাদ; ন্যূনকল্পে ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বৎসরের "বাড়ন্ত" কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকল্প এই যে অন্যূন ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ অন্যূন ষোড়শবৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

এখন, মনুর এইরূপ বিধি থাকিলেও যদি অন্য কোন স্মৃতিকার ইহার বিপরীত কথা বলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবে, এ কথা বোধ হয় শাস্ত্রপক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না, কারণ "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" আমরা সম্বর্ত্তসংহিতায় দেখি যে

---

(১) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি। 'অপি' শব্দের দ্বারা 'হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা' এই ভাবার্থ আসিতেছে না কি?

(২) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯অ, ৮৮—৮৯

(৩) "উদীক্ষা" কালযাপন করিবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আমার বোধ হয়, "প্রতীক্ষা" বা "অপেক্ষা"র অর্থের সহিত "উদীক্ষা"র অর্থ কিছু বিশেষভাবে ভিন্ন। "উদীক্ষা"তে প্রতীক্ষার ভাব যেন থাকিয়াও নাই বলিয়া বোধ হয়।

(৪) "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥ ৯অ, ৯০

ইহার টীকায় টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের পরেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। এ কথা তাঁহারা এই শ্লোকে যে কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। এই সকল টীকাদি দেখিয়া সাধারণ লোকে কন্যার যৌবনবিবাহ দিতে ভয় প্রাপ্ত হয়। কোন্ অবস্থায় কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে, তাহা মনু তো নিজেই বলিয়া দিয়াছেন।

---

(১) "ধনার্থিনোঽপি বালাং বিবাহয়ন্তি।"
৯অ, ৮৮ শ্লোকের মেভাষ্য

(২) অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।" ৯অ, ৯১

ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই দশমবৎসরবয়স্কা কন্যার বিবাহই প্রশস্ত। তিনি "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা" সূত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ (শস্ত); কিন্তু কন্যার (অর্থাৎ দশবর্ষীয়ার) বিবাহই প্রশস্ত।' (১) পরাশরের মতে দশম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। (২) অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের এই সকল কথা আমার কেবলমাত্র অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয়। কন্যার হৃদয়ে ঋতুমতী হইবার পর পাছে একটুকুও আঁচড় লাগে, তাহারই অতিমাত্র ভয়ে তাঁহারা ঋতুমতী হইতে না হইতে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের মধ্যে কেবল বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন মনুর মত বেশ অনুসরণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। বশিষ্ঠ বলেন "কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে; তিন বৎসরের ঊর্দ্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে"; "পিতা ঋতুকাল-ভয়হেতু "নগ্নিকা" কন্যা দান করিবে, কারণ কন্যা ঋতুমতী হইয়া (অধিককাল) অপেক্ষা করিলে পিতা দোষ প্রাপ্ত হয়েন; উপযুক্ত পাত্র কর্ত্তৃক অভিযাচ্যমান এবং বিবাহেচ্ছু কন্যা (অপ্রদত্ত থাকিলে) যতবার ঋতুমতী হয়েন, ততবার তাহার পিতামাতা ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হয়েন।" (৩) যাই হোক, আমরা দেখি যে প্রামাণিক কোন সংহিতাগ্রন্থে অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার কোন কথাই উক্ত হয় নাই, অনেকগুলিতে দশমবর্ষীয়া কন্যাদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখা যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক স্মৃতি মনুসংহিতাতে যৌবনবিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। গৌরীদানের মাহাত্ম্য এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে আরও দুর্ব্বল করিবার জন্য কিরূপে তাহাদের অন্তরাসন গ্রহণ করিল তাহা বলা বড় সহজ নহে এবং সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গেলেও একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হয়। মরীচিসংহিতা নামক একখানি মাত্র সংহিতায় আছে যে গৌরীদানের ফল স্বর্গধাম, নবমবর্ষীয়া রোহিণীদানের ফল বৈকুণ্ঠধাম এবং কন্যাদানের ফল ব্রহ্মধাম লাভ। সুতরাং মরীচিরও মতে দেখি কন্যাদানই শ্রেষ্ঠ।

বশিষ্ঠোক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে "নগ্নিকা" সম্প্রদানের কথা আছে। অনেক আচার্য্য এই নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা অর্থাৎ যখন বালিকারা উপযুক্তরূপে বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিধান করিতে সমর্থ হয় না, সেই অর্থ ধরিয়া শৈশববিবাহ সমর্থন করিতে উদ্যত হয়েন। আমার বোধ হয়, যেমন অষ্টবর্ষীয়া বালিকার গৌরী, নবমবর্ষীয়ার রোহিণী নাম পারিভাষিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপ নগ্নিকা শব্দটী অনৃতুমতী কন্যার পারিভাষিক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে বৈদিককালে যৌবনবিবাহই প্রচলিত ছিল এবং গোভিলগৃহ্যসূত্রোক্ত বৈবাহিক আচারপদ্ধতি হইতে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু এই গৃহ্যসূত্রের একস্থানে আছে যে বিবাহকর্ম্মে "নগ্নিকা" কন্যাই শ্রেষ্ঠ। (১) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কহিলেন "যে কন্যার ঋতু প্রকাশ পায় নাই;" কিন্তু ইহার পরে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এবং নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত ভাবকে সমর্থন করিতে যাইয়া বলিলেন, "অথবা ঋতু প্রকাশ পাইলেও কুচোত্থান হয় নাই, এরূপ অপ্রাপ্তযৌবনা," "বিশেষতঃ ঐ কন্যা উলঙ্গভাবে খেলা করিতেও লজ্জিত না হয়, এরূপ বয়সের হইলেই ভাল হয়।" হায় কি বিসদৃশ ব্যাখ্যা! আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে নগ্নিকাশব্দ অনৃতুকা কন্যার পারিভাষিক শব্দমাত্র। নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা বা শিশু অর্থ হইলে মহাভা-

---

(১) তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥ সম্বর্ত্ত।

অনেকেই শেষ পংক্তির অর্থ করেন যে অষ্টমবর্ষীয় কন্যার বিবাহই প্রশস্ত; কিন্তু আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথম পংক্তির সহিত শেষ পংক্তির বিশেষ সম্পর্ক নাই। প্রথম পংক্তিতে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের কথা আছে; তাহার সহিত "কিন্তু অষ্টমবর্ষীয়ার বিবাহ প্রশস্ত" এ কথার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, কারণ অষ্টমবর্ষে ঋতুমতী হইবার কোন সম্ভবই নাই। এই কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে শেষ পংক্তির প্রথম চরণের প্রতিযোগিতা সম্পর্কেই "কিন্তু" ব্যবহার করিয়া "কন্যা" বিবাহেরই প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে।

(২) "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥
১ম অধ্যায় ৬—৭

(৩) কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ বিন্দেৎ তুল্যং। * * *
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি।
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥ ১৭অ
বৌধায়নও বলেন:—"ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতীং যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
স তুল্যং ভ্রূণহত্যায়ৈ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং॥
ন যাচতে চেদেবং স্যাৎ যাচতে চেৎ পৃথক্ পৃথক্।
একৈকস্মিন্ ঋতৌ দোষং পাতকং মনুরব্রবীৎ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতী কাঙ্ক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিং॥
অবিদ্যমানে সদৃশে গুণহীনমপি শ্রয়েৎ॥

এই উক্তির শেষ পংক্তির অর্থে আমি এইরূপ বুঝি যে যদি ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের ঊর্দ্ধে কন্যা সদৃশ পতির অভাবে গুণহীন কোন পাত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে তাহাকেও বিবাহ করিলে পাপভাক্ হইবে না।

(১) ৩ প্র, ৪ খ, ১—২।

মতে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে নগ্নিকা বলা চইত না। মহাভারতে আছে "ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়া 'নগ্নিকা' কন্যাকে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে"। (১) গৃহ্যসূত্রের মতে ঋতুমতী কন্যা অপেক্ষা নগ্নিকা বা অনৃতুকা কন্যাই বিবাহে প্রশস্ত। সকল শাস্ত্রকারদিগেরও ইহার মনোগত ভাব বলিয়াই বোধ হয়; তাই বলিয়া তাঁহারা যে বাল্য-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। (২) বর্ত্তমানের চিকিৎসা বিদ্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীনকালের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন। যে অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত ঋষির চিকিৎসাসম্বন্ধীয় অস্ত্র-বিবরণ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন. সেই সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত-ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদগ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয় অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থায় গর্ভাধান করিবে না।" (৩) সম্ভবতঃ এই কথারই আংশিক অনুসরণ করিয়া রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে, "কুড়ি বৎসরের পুরুষ পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে উত্তম সন্তান হয়, তাহার ন্যূন বয়সে হইলে অধম সন্তান হয়।" (৪) রঘুনন্দন তাঁহার গর্ভাধান বিষয়ক অনুশাসনের শেষে কোথায়ও বলেন নাই যে ঠিক কোন্ সময়ে গর্ভাধান কর্ত্তব্য; কেবল ঋতুকালে হওয়া কর্ত্তব্য ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর যখন, তিনি তাঁহার জ্যোতিষতত্বে "গর্ভ-যোগ্য ঋতু নিরূপণের একটী বিভাগ রাখিয়াছেন, তাহা দ্বারাই কি বুঝা যায় না যে গর্ভাধানের অযোগ্য ঋতু-কালও আছে?" * যাই হোক, এই সকল বিষয় লইয়া সম্মতি আইনের প্রস্তাবকালে এত অধিক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে আমি আর তাহা পুনরায় উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

---

(১) "ত্রিংশবর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

মহাভারত

(২) পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় গৃহ্যসংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যাবন্নৈব সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাং।
গন্ধর্ব্বৈস্তু গন্ধর্ব্বা, রজসাগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজামপয়োধরাং।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকান্তু প্রশস্যতে।

গৃ সং ২।১৭—২০

এ সকল কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ আজ পর্য্যন্ত বিবাহকালে, তাহা বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবন-বিবাহই হউক, যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তন্মধ্যে একটা মন্ত্রের অর্থই এই যে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি কর্ত্তৃক স্ত্রী ভুক্ত হইয়া, মনুষ্য তাহার চতুর্থ পতি। আমার বোধ হয় সোম কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে কন্যার কামবৃত্তির প্রথম উদ্রেক হইতেছে কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা অপ্রস্ফুটিত অবস্থায়; কুচোদ্গম হইলে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে কামবৃত্তি তখন কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয়; ঋতুমতী হইলে অগ্নি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে তখন কামবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে।

(৩) উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃপঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ। সুশ্রুত শারীরস্থান ১০ম।

(৪) "পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে শ্রেষ্ঠং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং।

জ্যোতিষতত্ব, শ্রীরামপুর সংস্করণ, ৩৪১ পৃঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

সারস্বত সমাজ।

[১৮৪১ শকের কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা সারস্বত সমাজের সভাপতি ৺ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং অন্যতর দুইজন সভ্য ৺রাজনারায়ণ বসু এবং ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই তিন মহোদয়ের ভৌগোলিক পরিভাষাগঠনসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সারস্বত সমাজের কার্য্যবিবরণ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। এই সমাজ বলিতে গেলে পরিভাষা স্থিরকরণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পথপ্রদর্শক। তদানীন্তন সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রণীমাত্রেই বলিতে গেলে এই সমাজের সভ্য ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার সভাপতি ছিলেন। তাহা হইতেই ইহার সাহিত্যসমাজের উপর প্রভাব অনুমিত হইতে পারে। উপরোক্ত সংখ্যায় বলিয়াছি যে ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবরণের শেষে তাঁহার স্বাক্ষর নাই—বোধ হয় উহা ছাপা হইয়াই সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। উপরোক্ত অধিবেশন পটলডাঙ্গাস্থিত আলবার্টহলে হইয়াছিল। তঃ সং]

১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপ-রাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবর্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, "সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক।" শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল গ্রন্থে নিজের

---

* মোহিনী বাবুর "Hinduism and the Age of Consent Bill" পুস্তিকা দেখ।

নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্ব্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে—এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরুমধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে "সঙ্কট" শব্দ, স্থলেও ব্যবহার করা যায় জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, Channel, mountain pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে "প্রণালী" ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে জল-নির্গমপথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্ত্তব্য।

Peninsula কে বাঙ্গলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপ বলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায়। অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝা যায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত-সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্যভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখন এটা হয় কখন ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান্ বলিয়া থাকে। বিভক্তি সুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দগ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত, এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা—বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ করিয়া দীর্ঘসাহেব বলে না—কিন্তু একটা পর্ব্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়ত ইহার বিপরীতাচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলাগিরি বলি—তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে white mountain বলিতে হয়—কিন্তু আমেরিকায় white mountain নামে এক পর্ব্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলাগিরির অনুবাদ করিতে হইলে, তাহাকে mont Blanc বলিতে হয়, অথচ mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটা নিয়ম স্থির না থাকিলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্য্য-রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র এক শব্দের এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই—কারণ অনেক শব্দ এখনো প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়—অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন—সারস্বত সমাজের তিন চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল :—

প্রথম—ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক। দ্বিতীয়—তদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালিবর বেদান্তবাগীশ
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ বসু
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়—তিন মাস পরে উক্ত সমিতির কার্য্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ—যে সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিতে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

স্বরলিপি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল দাদ্‌রা।

আকাশ যে ঐ ডাকে তোরে শুন্‌লি নে—শুন্‌লিনে!
বাতাস যে ঐ ডাকে তোরে শুন্‌লি নে—শুন্‌লিনে!
ঐ যে আলো সোনার ধারায় ঐ যে গো ঐ সাঁঝের তারায়
কাঁপিয়ে আকাশ ডাকে তোরে শুন্‌লিনে—শুন্‌লিনে!
ঐ যে গো ঐ সাঁঝের ফুলে সবুজ পাতায় নদীর কূলে
সুর উঠেছে দুলে দুলে শুনলিনে—শুনলিনে!
সুন্দর ঐ ডাকে তোরে বিশ্বভুবন ব্যাকুল করে—
ওরে বধির মধুর বীণা শুনলিনে—শুনলিনে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।

আস্থায়ী।

১´ ০ ১´ ০ ১´
সা II { রা -া -া। -া ররা গা। সরা -গরা সা। ন্‌া -া -া I ন্‌া -া সা।
আ কা ০ ০ শ্‌ যেঐ ডা কে০ ০০ তো রে ০ ০ শু ন্‌ লি

০ ১´ ০ ০ ॥ ১´
। ন্‌সা -রগা -মা I রগা -মপা মা। গা -া সা } I গা I পা -া -া।
নে০ ০০ ০ শু০ ০ন্‌ লি নে ০ "আ" বা তা ০ ০

০ ১´ ০ ১´ ০
। -া পপা পা I ক্ষপা -ধনা ক্ষা। পা -া -া I ক্ষপা -া মা। গরা সন্‌া -া I
স যেঐ ডা কে ০ ০০ তো রে ০ ০ শু :ন্‌ লি নে০ ০০ ০

১´ ০
I সা -া সা। ন্‌সা -রগা সা II
শু ন্‌ লি নে ০ ০০ "আ"

অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০ ১´
II পা -া পা। না না র্সা I ধনা -র্সরা না। র্সা -া -া I না -া না।
ঐ ০ যে আ লো সো না০ ০র্‌ ধা রা ০ য় ঐ ০ যে

০ ১´ ০ ১´ ০
। না না র্সা I ধনা -র্সরা র্সনা। ধপা -া -া I মমা গাঃ মঃ। ধা -াঃ ণঃ I
গো ঐ সাঁ ঝে০ ০র তা০ রায় ০ ০ কাঁপি য়ে আ কা শ্‌ ডা

১´ ০ ১´ ০ ১´
I পধা -ণর্সা ণধা। পা -া -া I পা -া মা। গরা -সন্‌া -া I সা -া সা।
কে০ ০০ তো রে ০ ০ শু ন্‌ লি নে০ ০০ ০ শু ন্‌ লি

০
। ন্‌সা -রগা সা II
নে০ ০০ "আ"

সঞ্চারী ও আভোগ।

১´ • ১´ • ১´

I সা -া ঋা। ঋা ঋা গা I সরা -গরা সা। ন্া -া -া I সা সা -া।

ঐ • যে গো ঐ সাঁ ঝে॰ •র ফু লে • • স বুজ •

• ১´ • ১° •

। রা ররা গা I রগা -মপা মা। গা -া -া I হ্মা -া হ্মা। পা পা পা I

পা তার স দী॰ •র কূ লে • • সুর্ • উ ঠে ছে দু

১´ • ১´ • ১´

I হ্মপা -ধনা হ্মা। পা -া -া I সা -া সা। ন্সা -রগা -মা I রগা -মপা মা।

লে॰ •• দু লে • • শু ন্ লি নে॰ • • • শু॰ •ন্ লি

•

। গা -া -া II

নে • •

১´ • ১´ • ১´

II পা -া পা। ঋা না র্সা I ধনা -র্সর্রা না। র্সা -া -া I না -া না।

সু ন্ দ র ঐ ডা কে॰ •• তো রে • • বি • শ্ব

• ১´ • ১´ •

। না নাঃ র্সঃ I ধনা র্সর্রা র্সনা। ধপা -া -া I মা গা মা। ধা ধাঃ পঃ I

ভু বন্ ব্যা কু॰ •ল্ ক॰ রে • • • ও রে ব ধি র্ ম

১´ • ১´ • ১´

I পধা -পর্সা পধা। পা -া -া I পা -া মা। গরা -সন্া -া I সা -া সা।

ধু॰ •র বী॰ ণা • • শু ন্ লি নে॰ • • • শু ন্ লি

•

। ন্সা -রগা সা II II

নে॰ • • "আ"

বাউল সুর—একতালা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।

আমি মায়ের হয়েই আছি
তাঁর যেমনি খুসী তেমনি আমি
হাসি কিম্বা নাচি!
মা যেদিনে জাগেন মনে
ফোটে যে ফুল চিত্ত-বনে
আমার দুঃখ ঘুচে অশ্রু মুছে
প্রাণ পেয়ে আমি বাঁচি!

আমার বাঁচন মরণ একই
মায়ের সনে রইলে বাঁধা
স্বর্গ যেথাই থাকি!
আজ দুঃখ নাই মোর ব্যথা নাই
পুণ্য যে হেরি সব ঠাঁই
আহা! ঘরে ঘরে আজ আছে যত ভাই
সবার হয়ে গেছি॥

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
সা সা II { সা গা -া | মা পধা -পা | মা পা -া | -া সা সা } I
আ মি মা য়ে র হ য়ে০ ই আ ছি ০ ০ "আ মি"

১ ২´ ৩ ০ ১
I -া -া ধধা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -র্র | না -া না | ধা পা -া I
০ ০ তাঁর যেম্ ০ নি খু সী ০ তে ম নি আ মি ০

২´ ৩ ০ ১
I না না -া | ধা পা মগা | মা পা -া | -া সা সা II
হা সি ০ কি ম্ বা না চি ০ ০ "আ মি"

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১ ২´
II { না নধপা -া | -া পা ধা | ধা না -া | ধা না -া I র্সা র্সা -া |
মা যে০০ ০ ০ দি নে আ গে ন্ ম নে ০ ফো টে ০।

৩ ০ ১ ২´
| -া র্রা র্গর্রা | র্সনা -ধা না | না র্সা -া } I পপা I ধা র্সা র্সা |
০ যে ফুল চি০ ০ ত্ত ব নে ০ আমার দুঃ ০ খ

৩ ০ ১ ২´ ৩
| র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা | র্রা র্সা -া I ননা ধপা -া | -া পা ক্ষা |
ঘু চে ০ অ ০ শ্রু মু ছে ০ প্রাণ পেয়ে ০ ০ আ মি

০ ১
| পা -ধা না | -া সা সা II
বাঁ ০ চি ০ "আ মি"

সঞ্চারী ও আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
সা সা II { সা গা -া | মা পধা পা | মা পা -া | -া সা সা } I -া -া I
আ মার বাঁ চ ন্ ম র০ ণ্ এ ক ই ০ 'আ মার্' ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া | না না না | ধা পা -া I না -া না | ধা পা মগা |
মা য়ে র স নে ০ র ই লে বাঁ ধা ০ স্ব ০ র্গ যে থা ০ই

০ ১ ১ ২´ ৩
| মা পা -া | -া সা সা } I -া -া ননা I না না ধপা | -া -া ধধা |
থা কি ০ ০ 'আ মার' ০ ০ আজ দু খ নাই ০ ০ মোর্

০ ১ ২´ ৩ ০
| ধা না না | -া -া না I র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্গর্রা | র্রর্সা না -া |
ব্য থা না ০ ০ ই পু ০ ণ্য যে হে রি০ সব ঠাঁ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
| -া -া না I { র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | সা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সা I
০ ০ ই ঘ রে ঘ রে আ জ্ আ ছে য ত তা ই

২´ ৩ ০ ১ ১
I না না -ধপা | -া পা ক্ষা | পা -ধা না | -া পা পা } I -া সা সা II
স বা ০র্ ০ হ য়ে গে ০ ছি ০ আ হা ০ "আ মি"

কামরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী)

সীমা—

উত্তরসীমা—ভুটানরাজ্য, দক্ষিণ সীমা—খাসিয়া পাহাড়, পূর্ব্ব সীমা—নগাঁও এবং দরঙ্গ জেলা; পশ্চিম সীমা—গোয়ালপাড়া।

জেলা—

ক্যাপটেন জেন্‌কিন্সের শাসনকালে (১৮৩৪ খৃঃ অব্দ) বর্ত্তমান আসাম রাজ্য কামরূপ, দরঙ্গ, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর ও মাতক (Muttock) এই ছয়খানি জেলাতে বিভক্ত হয়। মাতকে সামরিক কর্ম্মচারীরা অবস্থান করত কমিশনদিগকে সাহায্য করিতেন।

এক্ষণে এই জেলায় সাতটী থানা আছে; প্রত্যেক থানার অধীনে কয়েকটী পরগণা অবস্থিত।

গৌহাটী—

কামরূপ জেলার সদরস্থান "গৌহাটী" ব্রহ্মপুত্রের বামভাগে অবস্থিত। মুসলমানদিগের মধ্যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি করতোয়া নদী অতিক্রম করত সর্ব্বপ্রথম ১২০৫ খৃঃ অব্দে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে গৌহাটী নগরী অহমদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অহমেরা যখন আসামের রাজা ছিলেন তখন "গৌহাটী" নিম্ন-আসামের রাজধানী ছিল। তৎকালে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ (বড়ফুকণ) সেখানে থাকিয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এক্ষণে এখানে একজন বিভাগীয় কমিশনর সাহেব ও তাঁহার অধীনে কয়েকজন হাকিম থাকেন। এই গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকান্তর্গত জেলাগুলির মোকর্দ্দমার আপীলকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলিতে কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দরঙ্গ, নগাঁও, লখিম ও শিবসাগর এই ছয়খানি জেলা বুঝায়।

ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন কামরূপের প্রাচীনতম নাম "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর"। রাজতরঙ্গিণীতে এই স্থানের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাতে কামরূপ অথবা গৌহাটীর নামোল্লেখ নাই। চীনদেশের অন্তর্গত "চীন-লিউ" নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে (Si-yu-ki) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভগদত্তবংশীয় রাজা "ভাস্কর বর্ম্মা" তাঁহার চীনদেশে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে (৬৪২ বা ৬৪৩ খৃঃ অব্দে) তাঁহাকে কামরূপের রাজধানী গৌহাটীতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহার বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৩০ লিগ (৫ মাইল)। বর্ত্তমান গৌহাটী মহকুমার আয়তন ২৫৮৪ বর্গমাইল।

গৌহাটী নগরী কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পদপ্রান্ত হইতে প্রায় ৪ মাইল। গৌহাটীতে ভূগর্ভ হইতে অধুনা প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের চিহ্ন বহির্গত হইতেছে। এখানে "নর্থব্রুক ঘাট" নামে একটী রমণীয় বাঁধা ঘাট আছে। উহা লর্ড নর্থব্রুকের স্মৃতিকল্পে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্জ্জন গৌহাটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে গৌহাটীর Executive Engineer ক্যাপটেন পলকের তত্ত্বাবধানে গৌহাটীস্থ ট্রাঙ্ক রোডের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। বেলতলা, পাণবাড়ী, দেশডুমুড়িয়া ও রামশা এই চারিটী পরগণা এখানকার থানার অন্তর্গত।

গৌহাটী মহকুমার উত্তর সীমা ভুটান দেশ, দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড়, পূর্ব্বে নগাঁও ও দরঙ্গ জেলা এবং পশ্চিমে বড়পেটা মহকুমা এবং গোয়ালপাড়া জেলা। গৌহাটী সহরটী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—পূর্ব্বে উজান বাজার; পশ্চিমে ফাঁসিবাজার এবং সহরের মধ্যভাগে পাণবাজার।

উজান বাজার=এখানে অধিকাংশ অসমীয়া (Assamese)র বাস। বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প। এইস্থানে আদালত, পোষ্ট আফিস, কাছারী ও সাহেবদিগের বাসস্থান আছে।

ফাঁসিবাজার=এই স্থানের অধিকাংশই দোকান।

পাণবাজার=এখানে অতি অল্পসংখ্যক অসমীয়ার বাস; অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালীরা বসবাস করিতেছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে পাণবাজারে গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কলেজ বোর্ডিং এবং বিবিধ দ্রব্যের বড় বড় দোকান আছে।

গৌহাটীর রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; অধিকাংশ বাড়ী চাঁচের বেড়ার—দু'ধারে মাটির পুরু প্রলেপ, তদুপরি যথারীতি চুণকাম করা এবং দ্বার-জানালা বসান। বাড়ীগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত নয় বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। এখানে ভূমিকম্পের প্রকোপ অধিক বলিয়া অধিকাংশ বাড়ী এইরূপভাবে নির্ম্মিত। গৌহাটীতে গোদুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু মহিষদুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার টেলিগ্রাম-অফিস সমগ্র আসামের মুখস্বরূপ—অর্থাৎ আসামের যত টেলিগ্রাম এই অফিস দিয়া যায়। কলিকাতা হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইখানি জাহাজ (Sundarban despatch service) এখানে যাতায়াত করে। দক্ষিণ ট্রাঙ্করোড নামে একটী সুদীর্ঘ রাস্তা "ধুবড়ী" হইতে বহির্গত হইয়া এই গৌহাটীর উপর দিয়া আসামের সীমান্তস্থল শদীয়া (Sadiya) পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ শত মাইল বিস্তৃত।

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বিগত ১৩০৭ সালের ২৯ শে চৈত্র তারিখে গৌহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত মাসের সংক্রান্তি দিবসে তিনি স্থানীয় প্রাইভেট হাইস্কুল গৃহে "জাতিভেদ" সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ঐ স্কুল-গৃহে ইংরাজিভাষায় তাঁহার আরও দুইটী বক্তৃতা হয়। কমিশনর প্রমুখ বহু উচ্চপদস্থ সাহেব ও মেম ঐ দুই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় যে দুই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন Transmigration of soul" তন্মধ্যে অন্যতম। গৌহাটীতে দুই দিন অবস্থানের পর তিনি কামাখ্যাশৈলে জনৈক পাণ্ডার বাটীতে যান। এখানে ৮ কামাখ্যা দেবী দর্শনের দুই দিন পরে "শিলং" যাত্রা করেন। গৌহাটীতে ও শিলংয়ে সর্ব্বসাধারণে চাঁদা করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বড়পেটা—

১৮৪১ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে চাউলখোয়ানদী (মানসের উপনদীর) তীরস্থ বড়পেটাতে কামরূপ জেলার একটী মহকুমা স্থাপিত হয়; এই মহকুমার উত্তরসীমা ভুটানরাজ্য; দক্ষিণসীমা গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী মহকুমা; পূর্ব্বে গৌহাটী মহকুমা এবং এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া মহকুমা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা শঙ্করদেব কর্ত্তৃক এখানে সত্র (religious institution) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই নগরী বন্যার জলে প্লাবিত হইত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে বড়পেটা (Barapetta) একটী রমণীয় নগরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখের ভূমিকম্পনিবন্ধন এই স্থানে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। বড়পেটা মহকুমায় অনেকগুলি বিল আছে। তন্মধ্যে কাচকুরি ও কৈমরী বিল প্রধান। সরিষা, এড়িকাপড়, মুগাকাপড়, হস্তিদন্তনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট কলম ও বোতাম এখানকার বাণিজ্য দ্রব্য। জলপথে খোলাবান্ধা জাহাজঘাটায় এবং রেলে পাঠশালা, সরুপিটা অথবা সরভোগ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বড়পেটা মহকুমায় যাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য স্থান—

উত্তরগৌহাটী, পলাশবাড়ী, শোরলকুচি, রঙ্গিয়া, সুবনখাটা, হাজো, নলবাড়ী, দেওয়ানগিরি, কালদিয়া প্রভৃতি।

উত্তরগৌহাটী—

উমানন্দপাহাড়ের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে "উত্তরগৌহাটী" অবস্থিত। গৌহাটীস্থ শুক্রেশ্বরঘাট হইতে নৌকাযোগে ৩০।৩৫ মিনিটে উমানন্দপাহাড়ে যাওয়া যায়। উত্তরগৌহাটীতে "মণিকর্ণেশ্বর" নামক শিবালয় প্রতিষ্ঠিত। এখানে ডাকঘর, একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটী মধ্যবৃত্ত ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এখানে গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালায় ভাড়া দিয়া থাকিতে পারা যায়।

পলাশবাড়ী—

গৌহাটী হইতে ১৫ মাইল দূরে পশ্চিমদিকে "চাউলখোয়া" নদীর তটদেশে অবস্থিত। মাড়োয়ারী সওদাগরেরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে কার্পাস, লা, পাট, রেশম, ধান্য, চাউল, সরিষা প্রভৃতি ক্রয় অথবা অন্য বস্তু বিনিময়ে লইয়া এখান হইতে বিভিন্ন দেশে চালান দিয়া থাকে।

প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে একটী বৃহৎ হাট বসে। পলাসবাড়ীতে অতি উৎকৃষ্ট এড়ি-কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানকার ঘাটে সকল ষ্টিমার আসিয়া দাঁড়ায়।

শোয়লকুচি—

এইস্থান ব্রহ্মপুত্রের তটদেশে অবস্থিত। শোয়লকুচি এড়িকাপড়, মুগা কাপড়, মরাপাটও সরিষা রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

রঙ্গিয়া—

এখান হইতে চাউল ও এড়ি কাপড় রপ্তানি হয়। রঙ্গিয়াতে একটী থানা ও রেলওয়ে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুবনখাটা—

এইস্থান ঘোড়া, কম্বল, মোম, মরিচ প্রভৃতির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

শিলাশাঁকো—

কামরূপের "শিলাসিন্দুরী ঘোপা" গ্রামে প্রস্তর-নির্ম্মিত শাঁকোটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বখ্তিয়ার খিলিজির আসাম আক্রমণকালে এই সেতু বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল (Jour. A. S. B.) নামক পত্রিকায় উহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"This bridge, remnant of ancient times in Kamrup is situated about eight miles N. W. of northern Gouhati on the high alley and is built accross what may have been a former bed of the Bornadi. The structure is of solid masonary, built without lime mortar. There are no arches, the super-structure being a platform with a slight curve 140 ft, long and 8 ft. in breabth composed of slabs of stone, 6 ft. 9 inches long and 10 inches thick, numbering five in the whole breadth, resting on :understruc-ture of sixteen pillars, there in a row, equally divided by three large solid buttresses with a half buttress projecting from a cir-cular mass of masonary forming the abut-ments at each end of the road, there being in the whole length twenty one passages for the water. * * * *

ভূমিকম্প—

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখের ভূমিকম্পে আসামের অনেক ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কামরূপ জেলার যত অনিষ্ট হইয়াছে আর কোন জেলার তত অনিষ্ট হয় নাই। এই জেলার রাস্তা, ঘাট, পুল সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। গৌহাটী সহরে যত পাকা বাড়ী ছিল সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নদ-নদী—

ব্রহ্মপুত্র, চাউলখোয়া, তেকেলজ, পুঠিমারী, বাটা, দিগারু, সিঙ্গারা, (সোণাপুরী), ভাকিন্দা, কুলশি, অগ্রাণ, জলজুলীয়া, লখাইভারা, দীজমা. সজাং, কালদিয়া প্রভৃতি নদী কামরূপ জেলার প্রবাহিত। বড়নদীর দ্বারা কামরূপ জেলা দরঙ্গ (Darrong) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য রাস্তা—

(১) আসামট্রাঙ্ক রোড = গৌহাটী হইতে আজীয়া পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৮১ মাইল।

(২) গৌহাটী-শিলং রোড = দৈর্ঘ্যে ৬৫ মাইল।

(৩) হাজো-নলবাড়ী রোড " ১৮ "

(৪) আসামগাঁও-হাজো রোড " ১৪ "

(৫) ভবানীপুর = বড়পেটা রোড = ১২ "

অধিবাসী—

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে অহম, কাছাড়ী, কাটনী, কেওট, কোচ, খিয়েন, গারো, চামার, ছুটীয়া, ঝালো, নদীয়াল, ডোম, ভূঁইয়া পাটুনী, নেপালী, দোয়ানীয়া, লালং, রাভা, ভুটীয়া প্রভৃতি জাতি প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। আসামের মধ্যে কেবল এই জেলায় "শরনীয়া" জাতির বসবাস দৃষ্ট হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—

কৃষিদ্রব্যের মধ্যে ধান্য, চা, সর্ষপ, তিল, কার্পাস কলাই, তিসি, ইক্ষু, বোকাচাউল, পাট ইত্যাদি। এড়িকাপড়, মুগাসূতা, রবার আঠা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কামরূপ জেলার অনেক স্থানে পিত্তল ও কাঁসার দ্বারা নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত থালা, বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শর, খাগড়া, বংশ প্রভৃতি আবশ্যকীয় গাছগুলি স্বভাবতঃ বিস্তর

জন্মে। কামরূপের "কুলশী" নামক স্থানে অসংখ্য রবার গাছ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগ দ্বারা রক্ষিত। প্রতিবৎসর এই স্থান হইতে প্রায় ৫০০ শত মণ রবার উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ সম্বন্ধে পত্র।

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার মন্তব্যসহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিলে একান্ত বাধিত হইব।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মাব্দের গণনা সম্বন্ধে আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। সে প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে কাঠিন্য কিছুই নাই। একটু অনুসন্ধান পূর্ব্বক পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেই তাহা সহজেই হইতে পারে।

সম্প্রতি নানা স্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলীতে ভাদ্রমাসে ভাদ্রোৎসব হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতেও দৃষ্ট হয়, "১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ হইতে এই নূতন গৃহে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উক্ত দিবসেই সাম্বৎসরিক উৎসব হইতে থাকে; প্রথমে কিছু দিন ভাদ্র মাসে সাম্বৎসরিক উৎসব হইত।" (রাজার জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, ২৪৭ পৃঃ।)

পূর্ব্বেও এরূপ হইত এবং সম্প্রতি কিছুদিন হইতে যে নানাস্থানে ভাদ্র মাসে উৎসব হইতেছে, তাহার কারণ, ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখেই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"রাজা রামমোহন রায় স্বজনসহ ইউনিটেরিয়ানগণের উপাসনাসভায় উপাসনার্থ গমন করিতেন। একদিন উপাসনাসভা-ভঙ্গের পর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, 'বিদেশীয়দিগের উপাসনা সভায় আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।' রাজার মনে কথাটি লাগিল। তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ মুন্সির সহিত পরামর্শ করিলেন; পরে তাঁহার গৃহে এবিষয়ের মীমাংসার জন্য সভা আহূত হইল। সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে "যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই ভাদ্র উপাসনা-সভা সংস্থাপিত হইল।"

এই সভা সংস্থাপনের অল্প দিন পরেই যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে বর্ত্তমান সমাজ-গৃহ (আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়) নির্ম্মিত হইল। উক্ত মন্দিরের ভূমিক্রয়ের দলিলে লিখিত আছে "ব্রহ্মসমাজের নিমিত্ত মবলগে শিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুইশত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম।"

মহর্ষি মহাশয়ের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার একাংশ এইরূপ—মহর্ষি বলিতেছেন, "১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে (আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে) উঠিয়া আসিল, সেই শকে সতী দগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল।"

উপরে রাজর্ষির জীবনচরিত হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সহজেই প্রতীত হইবে যে, ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র যে উপাসনা-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল উৎস। মহর্ষিমহাশয়ের কথায় এবং রাজর্ষিমহাশয়ের জীবনচরিত-লেখকমহাশয়ের লেখায় সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র যে উপাসনা-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই সমবেত উপাসকমণ্ডলীর ও ব্রাহ্মসমাজের মূল উৎসব এবং তাহাকেই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গণনা করিতেন। সেই ব্রহ্মোপাসনা-সভাই ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া যে ব্রাহ্মসমাজরূপ মহাতরুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসকে ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় বলিয়া গণনা করিলে, বর্ত্তমানে ব্রহ্মাব্দ ৯৪ হয় এবং আগামী ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখ হইতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৫ গণনা করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার প্রতিনিধি—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং তত্ত্ব-কৌমুদীতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৩ লিখা হইতেছে। আরও বিবেচ্য এই যে, এখন ধর্ম্মতত্ত্ব এবং 'তত্ত্বকৌমুদী মাঘোৎসবের পর হইতে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ মাস হইতে ব্রাহ্মাব্দের গণনা করিতেছেন।

এখন আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এবং যাহাতে মতদ্বৈধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং মতদ্বৈধ থাকা উচিতও নহে। তাহাতে আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মসাধারণের সকলেরই একটি নির্ভুল ও প্রকৃত সিদ্ধান্ত হউক। ব্রাহ্মসমাজসকলের পত্রিকা এবং গ্রন্থাদিতে সেই প্রকৃত ও নির্ভুল সিদ্ধান্তই লিখিত হউক। ব্রাহ্মসমাজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে

বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকা যে প্রার্থনীয় নহে, সে বিষয়ে অধিক বলিবার আর কি আছে? এ বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমার পত্র শেষ করিতেছি।

৩২এ শ্রাবণ ১৩২৯। নিবেদক শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র প্রথম উপাসনা-সভা সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও ভাড়াটিয়া স্থানে হওয়াতে ঐ সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। ঐ তারিখ ধরিয়া যদি ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিতে হয়, তবে আডাম সাহেবের সহিত মিলিতভাবে যে সময়ে উপাসনা-সভা হইয়াছিল তাহা ধরিয়াই বা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা হইবে না কেন? ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি নবনির্মিত গৃহে যখন ব্রাহ্মসভা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অবধি ধরিয়াই ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা আমাদের মতে বিধেয়। এই হিসাবেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিয়াও আসিয়াছেন। এই গণনা যখন প্রথম অবধি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তখন কোন বিশেষ কারণ বিনা এই গণনা পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

লেখক বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়—ধর্ম্মসম্প্রদায় হউক বা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায় হউক—নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত দিন অবধি নূতন বৎসর গণনা করিতে থাকিলে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমস্ত ভারতে যখন ১লা বৈশাখ হইতে নববৎসর ধরা হয়, তখন অন্য কোন দিন হইতে নববৎসর গণনা করিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে খাজনা আদায় প্রভৃতির জন্য বামন দ্বাদশী হইতে বৎসর ধরিবার কারণে সাধারণ বৎসরের সহিত বড়ই গোলযোগ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব দেশের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কাজ করিলেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। তং সং]

বেদ ও পুরাণ।

(ডাক্তার ভাণ্ডারকরের লেখা হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

রাওবাহাদুর গোপালরাও-হরি-দেশমুখ পুরাণ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিষয়ে কতকগুলি কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলাম। তাহা লইয়া সংবাদপত্রাদিতে কিছু চর্চ্চা চলিয়াছিল। পুরাণের মধ্যে অমুক একটি ভাল অংশ আছে, আমরা দেখাইয়াছিলাম। রাও-বাহাদুরেরও গ্রাহ্য হইয়াছিল,—এইরূপ নাসিকস্থ আমাদের এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। কারণ রাও-বাহাদুরের ব্যাখ্যানের তাৎপর্য্য এই—"পর্ব্বোৎসবের মধ্যে "শিমগা" যেরূপ নিন্দনীয় সেইরূপ গ্রন্থাদির মধ্যে পুরাণ নিন্দনীয় এবং ভাগবতের মধ্যে বেদান্ত ব্যতীত, আর কিছুই গ্রাহ্য নহে; অতএব উহা ত্যাগ করিয়া বেদ অবলম্বন করিবে।" এবং আমাদের এই মত যে,—রামায়ণ, ভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে,—নীতি-উপদেশপর ও মনোরঞ্জক কথা ও কবিত্ব আছে; উহার মধ্যে ত্যাজ্য অংশ অপেক্ষা গ্রাহ্য অংশই অধিক। অনেক পুরাণের মধ্যে এমন সব প্রাচীন কথা আছে, সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও যাহার মধ্যে ইতিহাসের বীজ নিহিত আছে। কোন কোন পুরাণের মধ্যে,—প্রাচীন আর্য্যেরা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সব বিষয়ের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদাহরণ যথাঃ—অগ্নিপুরাণের মধ্যে রাজধর্ম্ম, ব্যবহার, ধনুর্বিদ্যা, বৈদ্যক অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র, গজ-চিকিৎসা, সাহিত্যশাস্ত্র (অর্থাৎ যাহার মধ্যে কাব্য নাটক প্রভৃতির লক্ষণ, গুণ, দোষ, অলঙ্কার ও রস এই সমস্ত নির্ণয় করা হইয়া থাকে), ব্যাকরণশাস্ত্র, শব্দবোধ প্রভৃতি অনেক প্রকরণ আছে। অনেক পুরাণের মধ্যে ভরতখণ্ডের ভূগোল এবং কলিযুগের রাজাদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আংশিক তথ্য আছে—এবং ভরতখণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের যাঁহারা আধুনিক তত্ত্বানুসন্ধায়ী, এই প্রকরণগুলি তাঁহাদের খুবই কাজে লাগে। যাক্; নিন্দনীয় অংশও পুরাণের মধ্যে অনেক আছে। দেশ ও কালসম্বন্ধে অতিশয়োক্তি, নানাবিধ ব্রত ও সেই সম্বন্ধে অনেক নীরস কথা ও তাহাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বর্ণনা, অনেক তীর্থ, সেই প্রত্যেক তীর্থে স্নান করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি, নানা জপ, নানা মন্ত্র, নানা দেবতা, এইরূপ অনেক জিনিস পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় গ্রন্থে, পৃথিবীর সাত দ্বীপ, ও চার যুগ—এই সম্বন্ধে যে অতিশয়োক্তি আছে, তাহা ছাড়া অন্যপ্রকার অতিশয়োক্তি বড় একটা পাওয়া যায় না। সকল পুরাণে একই বিষয় থাকে এরূপ নহে।

এখন, আমাদের নাসিকস্থ মিত্র বলেন, 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' এইরূপ আমরা বেদের নিন্দা করিয়াছি। তিনি যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন ত

করুন। কিন্তু আমরা বস্তুত কোন নিন্দা করি নাই। আমাদের দেশে যে-সমস্ত গ্রন্থ আছে, সকলেরই উপর আমাদের পূজ্যবুদ্ধি। কিন্তু যেহেতু পরমেশ্বর আমাদিগকে সদসদ্বিবেচনার সামর্থ্য দিয়াছেন, অতএব সেই সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। জানিয়া-বুঝিয়া ক্ষুধার সময় কোন বিষের গুলি আনিয়া দিলে, তাহা মুখের ভিতর ফেলিয়া আমরা গিলিয়া ফেলিব—এরূপ নহে। এইজন্য, বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সত্য যাহা আছে, তাহা পিতৃদত্ত জীবনের মতো মনে করিয়া, তৎসম্বন্ধে অভিমান পোষণ করিয়া, তাহাদিগকে খুব যত্নের সহিত আমরা রক্ষা করিব; এবং আমাদের গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করিয়া উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ভারতের অন্তর্গত অন্য কোন প্রকরণ, কোন কোন পুরাণ এবং তুকারাম-বাবার ন্যায় সাধুদিগের প্রাকৃত গ্রন্থ; ইহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের অনন্ত অচিন্তনীয় আনন্দময় পরম শুদ্ধস্বরূপ, নীতি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মাহাত্ম্য, অনন্যভক্তির আবশ্যকতা, নিষ্কামভাবে আমাদের কর্ত্তব্যপালনে শ্রেয়, এই সকল যোগ্যরীতিতে বর্ণিত হইয়াছে; ধর্ম্মসম্বন্ধে ও নীতিসম্বন্ধে এরূপ পাকারকমের বিচার-আলোচনা আছে যে, এই বিষয়ে অন্য দেশীয় গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে পিছাইয়া পড়িতে হয় না; শুধু তাই নহে, বরং অনেক অংশে উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সোনা ও মাটির মিশ্রণ হইয়াছে। সব গ্রন্থই সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য, তাহাতে যাহা কিছু আছে, সবই সত্য, ইহা আমরা মনে করি না। তাই, তাহাতে যে অসত্যের অংশ আছে, তাহাকে অসত্যই আমরা বলিব। নিরর্থক জেদ করিয়া, যাহা খারাপ তাহা খারাপ নহে, তাহা ভালই, এরূপ আমরা কখনই বলিব না; এই জন্যই বেদের মধ্যেও যে সকল খারাপ অংশ আছে তাহার দুই একটা উদাহরণ আমরা দিয়াছিলাম। সেই সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুর যদি কোন সংশয় থাকে, সেই সব কথা কোথায় আছে তাহাও বলিতেছি। ঋগ্বেদ সংহিতায় ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে পঞ্চম ঋকের মধ্যে পুষা নামে সূর্য্যের অংশভূত যে দেবতা আছেন তাহাকে আপন মাতার দিধিষু (অন্য পতি) ও ভগিনীর জার এইরূপ বলা হইয়াছে। সুব্রহ্মণ্যা নামে দেবতাদিগকে আহ্বান করিবার এক মন্ত্র আছে, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের দ্বাদশ অনুবাকে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে 'অহল্যার জার' এইরূপ ইন্দ্রের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ প্রজাপতি আপন কন্যার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন—এই কথা শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে। তাহাতে ঐ সব কথা স্পষ্ট ভাবে কথিত হইয়াছে এবং তাহার অর্থও ঋগ্বেদসংহিতার দশমমণ্ডলের ৯১ সূক্তের ৭ম ঋকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্য এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ আমরা লিখিতে পারিতাম; কিন্তু এই সব অশ্লীল কথা উচ্চারণ করাও সুনীতিসঙ্গত নহে বলিয়াই আমরা তাহা করি নাই। অতএব, পুরাণের অমুক কথা খারাপ বলিয়া রায়বাহাদুর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার মতানুসারে সর্ব্বোত্তম যে বেদ তাহাতেও ঐ প্রকার খারাপ অংশ আছে। এক্ষণে আর কেহ এই সকল অংশের অর্থ বুঝুক না বুঝুক, আর্য্যপত্রিকা বুঝিয়াছেন এবং দয়ানন্দস্বামীও বুঝিয়াছেন;—এইরূপ আমাদের নাসিকস্থ বন্ধু বলেন। সেই অনুসারে, পুরাণের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা বলিবেন যে, ইন্দ্রের ও প্রজাপতির জারকর্ম্মের কথায় যে সব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ রাওসাহেব জানেন না। তাহা হইলে এইরূপ গোলযোগ করিয়া, 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ 'সত্য', 'উপর' শব্দের অর্থ 'নিম্ন'—এইরূপ জেদ করিয়া,—রূঢ়ি, কোষ, ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া, এই নিয়মে সমস্ত বেদের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কখনই সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না, কেবল দুরাগ্রহ ও কুমতিই বর্দ্ধিত হইবে। এবং এই অর্থের উপর, কোন সুশিক্ষিত তত্ত্ববুভুৎসু ও সত্যাভিমানী ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। অতএব, এই দুরাগ্রহ ছাড়িয়া আমাদের সমস্ত গ্রন্থে যাহা ভাল তাহা সত্যভাবে বাছিয়া লইয়া, যাহা খারাপ তাহা নির্ভয়ে খারাপ বলিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। অসত্যরূপ মৃত্তিকা বিবেকানলে দগ্ধ করিয়া যে সুবর্ণরূপ সত্য, বেদের

মধ্যে, পুরাণের মধ্যে, এবং প্রাকৃত গ্রন্থাদির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে আছে, তাহা দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত নির্ভয়ে গ্রহণ করাই বিবেকী পুরুষের কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই আমাদের উন্নতি ও কল্যাণ অধিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির টীকাকারগণ অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল ভাবার্থই বলিতেছি। তিন শ্লোক মিলিয়া হেতু-অনুমানযুক্ত একই বাক্য। তন্মধ্যে ১৭ ও ১৮ শ্লোকে প্রথমে সাধারণ রীতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্ম না করিবার বিষয়ে যে সকল কারণ বলা হয়, সেই সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং এই কারণসমূহ হইতেই গীতা যে অনুমান বাহির করিয়াছেন তাহা ১৯ শ্লোকে কারণ-বোধক 'তস্মাৎ' শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে। এই জগতে শোওয়া, বসা, উঠা বা জীবিত থাকা প্রভৃতি সকল কর্ম্ম, কেহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেও, ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মত্যাগ করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যও হয় না, আর না তাহা সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়ই হয়। কিন্তু ইহার উপর সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে, "আমি কিছু সিদ্ধিলাভের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি না। প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে যাহা কিছু করে, তাহা নিজের বা অপরের লাভেরই জন্য করে, কিন্তু মনুষ্যের স্বকীয় পরম সাধ্য হইতেছে সিদ্ধাবস্থা অথবা মোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহা লাভ করেন, এই জন্য তাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে পর লাভ করিবার কিছু থাকে না (১৭ শ্লোক)। এই অবস্থাতেই চাই ঐ কর্ম্ম করুন বা নাই করুন—তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান। ভাল; যদি বলি যে, লোকের উপযোগের জন্য তাঁহার কর্ম্ম করা উচিত, তবে লোক-দের নিকটেও তাঁহার কোন লেন-দেন থাকে না (শ্লো. ১৮)। তবে ঐ কর্ম্ম করিই বা কেন"? ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, যখন কর্ম্ম করা আর না করা উভয়ই তোমার পক্ষে সমান, তখন কর্ম্ম না করিবার দিকেই তোমার এত ঝোঁক কেন? শাস্ত্র অনুসারে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আগ্রহবিহীন বুদ্ধিতে করিয়া ছুটী লও। এই জগতে কর্ম্ম জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই এড়াইতে পারে না। আপাতত দেখিতে ইহা বড়ই জটিল সমস্যা মনে হয় যে, কর্ম্ম চলিয়া গিয়া থাকে, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের জন্য উহা আবশ্যক নহে! কিন্তু গীতার নিকট এই সমস্যা কিছু কঠিন লাগে না। গীতা বলেন যে, যখন কর্ম্ম ছাড়েই না, তখন তাহা করাই চাই। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি না রাখিয়া তাহা নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। ১৯ শ্লোকে 'তস্মাৎ' পদের প্রয়োগ করিয়া এই উপদেশই অর্জ্জুনকে করা হইয়াছে; এবং ইহারই পোষণে পরে ২২ শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভগবান স্বয়ং নিজের কোনও কর্ত্তব্য না থাকিলেও, কর্ম্মই করেন। সারকথা, সন্ন্যাসমার্গের লোক জ্ঞানী ব্যক্তির যে অবস্থা বর্ণনা করেন, তাহা ঠিক মানিয়া লইলেও গীতার বক্তব্য এই যে, সেই অবস্থা হইতেই কর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষ সিদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে, সর্ব্বদা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার পক্ষই আরও দৃঢ় হইতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের কর্ম্মযোগের উক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত (৭, ৮, ৯) মান্য নহে; এইজন্য তাঁহারা উক্ত কার্য্যকারণভাবকে অথবা সমুদয় অর্থপ্রবাহকে, বা পরে ব্যাখ্যাত ভগবানের দৃষ্টান্তকেও মানেন না (২২, ২৫ ও ৩০)। তাঁহারা তিন শ্লোককে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে প্রথম দুই শ্লোকে এই যে নির্দ্দেশ আছে যে, "জ্ঞানী পুরুষের নিজের জন্য কোনই কর্ত্তব্য থাকে না", ইহাকেই গীতার চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া এই ভিত্তিকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভগবান জ্ঞানী-পুরুষকে বলিতেছেন যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও! কিন্তু এই প্রকার করিলে তৃতীয় অর্থাৎ ১৯ শ্লোকে অর্জ্জুনকে যে সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ দিয়াছেন যে "আসক্তি ছাড়িয়া কর্ম্ম কর' ইহা পৃথক হইয়া যায় এবং ইহার উপপত্তিও লাগে না। এই প্যাঁচ হইতে বাঁচিবার জন্য এই টীকাকারগণ এই অর্থ করিয়া নিজেদের সমাধান করিয়া লইয়াছেন যে, অর্জ্জুন অজ্ঞানী ছিল বলিয়াই তো অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার পরেও ১৯ শ্লোকের 'তস্মাৎ' পদ নিরর্থকই থাকিয়া যায়। এবং সন্ন্যাসমার্গীদের কৃত এই অর্থ এই অধ্যায়েরই পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের বিরুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য স্থলের এই উল্লেখেরও বিরুদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা উচিত; আবার পরে ভগবান যে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এই অর্থ তাহারও বিরুদ্ধ হয় (গী. ২. ৪৭; ৩. ৭, ২৫; ৪. ২৩; ৬. ১; ১৮. ৬-৯; এবং গী. র. প্র. ১১ পৃ.) ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে এই যে, এই অধ্যায়ে, যে কর্ম্মযোগের ফলে কর্ম্ম করিলেও তাহা

বন্ধনকারণ হয় না, সেই কর্ম্মযোগেরই বিচার চলিয়া আসিতেছে (গী. ২.৩৯); এই বিচারের মধ্যেই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই "কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল", এই অসম্বদ্ধ কথা বলিবে না। ভাল, ভগবান এই কথা কেন কহিতে লাগিলেন? অতএব নিছক সাম্প্রদায়িক ভাবের এবং টানাবুনা করা এই অর্থ স্বীকার করা যায় না। যোগবাসিষ্ঠে লিখিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম্ম করা উচিত এবং যখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাকে বল মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম কেন করিবে' তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন—

> জ্ঞস্য নার্থঃ কর্মত্যাগৈঃ নার্থঃ কর্মসমাশ্রয়ৈঃ।
> তেন স্থিতং যথা যদ্যৎ তত্তথৈব করোত্যসৌ॥

"জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম্ম করা হয় না, অতএব তিনি যখন যাহা পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকেন" (যোগ. ৬. উ. ১৯৯. ৪)। এই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গীতারই কথায় পূর্ব্বে কারণ দেখাইয়াছি।

> মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
> যথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ॥

"কোন বিষয় করা বা না করা আমার পক্ষে একই"; এবং দ্বিতীয় পংক্তিতেই বলা হইল যে, যখন উভয়ই একই প্রকার; তখন আবার "কর্ম্ম না করিবার আগ্রহই বা কেন? যাহা যাহা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হই, তাহাই করিতে থাকি" (যো ৬. উ. ২১৬. ১৪)। এই প্রকার ইহার পূর্ব্বে, যোগবাসিষ্ঠে "নৈব তস্য কৃতেনার্থো" প্রভৃতি গীতার শ্লোকই শব্দশ গৃহীত হইয়াছে. এবং পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "যদ্যথা নাম সম্পন্নং তত্তথাহস্ত্বিতরেণ কিং"—যাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই (জীবন্মুক্ত) করিতে থাকেন, এবং কিছু প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না (যো. ৬. উ. ১২৫. ৪৯, ৫০)। শুধু যোগবাসিষ্ঠেই নহে, গণেশগীতাতেও এই অর্থেরই প্রতিপাদক এই শ্লোক আসিয়াছে—

> কিঞ্চিদস্য ন সাধ্যং স্যাৎ সর্বজন্তুষু সর্বদা।
> অতোঽসক্ততয়া ভূপ কর্তব্যং কর্ম জন্তুভিঃ॥

উহাঁর অপর প্রাণীগণে কোনই সাধ্য (প্রয়োজন) বাকী থাকে না, অতএব হে রাজন্! লোকদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য অসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকা চাই" (গণেশগীতা ২. ১৮)। এই সকল উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে, এই স্থলে গীতার তিন শ্লোকের যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আমি উপরে দেখাইয়াছি, তাহাই ঠিক। এবং গীতার তিন শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যোগবাসিষ্ঠের একটী শ্লোকেই আসিয়া গিয়াছে, অতএব উহার কার্য্যকারণভাবের বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসরই থাকে না। গীতার এই সকল যুক্তি মহাযানপন্থার বৌদ্ধগ্রন্থকারগণও পরে লইয়াছেন (গী. র. পৃ. এবং)। উপরে এই যে বলা হইয়াছে যে স্বার্থ না থাকার কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তির নিজ কর্ত্তব্য নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হয়, এবং এই প্রকারে কৃত নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের বাধক হওয়া তো দূরের কথা, উহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়—ইহারই সমর্থনে এখন দৃষ্টান্ত দিতেছেন।]

> §§ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
> লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ২০॥
> যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১॥
> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি॥ ২২॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩॥
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং।
> সংকরস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥

(২০) জনকাদিও এই প্রকার কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ লোকসংগ্রহের উপরেও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করাই উচিত।

[প্রথম চরণে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহার উদাহরণ দিলেন এবং দ্বিতীয় চরণে ভিন্ন রীতির প্রতিপাদন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহা তো সিদ্ধ করা হইল যে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের লোকসমূহে কোন বাধা থাকে না; তথাপি যখন তাঁহারা কর্ম্ম ছাড়িতেই পারেন না, তখন তাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মই করা উচিত। কিন্তু, যদিও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কর্ম্ম যখন ছাড়াই যায় না, তখন উহা করাই উচিত; তথাপি কেবল ইহা হইতেই সাধারণ মনুষ্যের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। মনে সংশয় হয় যে, কর্ম্ম ছাড়িলেও ছাড়ে না বলিয়াই কি কর্ম্ম করা উচিত, উহাতে অন্য কোনই সাধ্য কি নাই? অতএব এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ইহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন যে, এই জগতে নিজ কর্ম্মের দ্বারা লোকসংগ্রহ করা জ্ঞানী ব্যক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। "লোকসংগ্রমেবাপি"র 'এবাপি' পদের ইহাই তাৎপর্য্য, এবং ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হইতেছে যে এখন ভিন্ন প্রণালীর প্রতিপাদন আরম্ভ হইয়াছে। 'লোকসংগ্রহ' শব্দে 'লোক'এর অর্থ ব্যাপক; অতএব এই শব্দে কেবল মনুষ্যজাতিকেই নহে, বরঞ্চ সমস্ত জগৎকে সৎমার্গে আনিয়া উহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভালরূপ ধারণ, পোষণ, পালন বা রক্ষা করা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই সমাবেশ হয়। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (পৃ.)এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে, তাই আমি এখানে উহার পুনরুক্তি

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

(৩১) যে শ্রদ্ধাবান (ব্যক্তি) দোষ অন্বেষণ না করিয়া আমার এই মতানুসারে নিত্য চলেন, তিনিও কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। (৩২) কিন্তু যে দোষদৃষ্টিতে সন্দেহ করিয়া আমার এই মতানুসারে না চলে, সেই সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অর্থাৎ নিরেট মূর্খ অবিবেকী-দিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও।

[কর্ম্মযোগ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার জন্য বলিতেছেন। উহার শ্রেয়স্করতা সম্বন্ধে উপরে অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা যে ফলশ্রুতি বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতেছে যে, গীতাতে কোন্ প্রকারের বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ-নিরূপণেরই পরিপোষণের জন্য ভগবান প্রকৃতির প্রবল ভাব এবং উহার প্রতিরোধের জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিতেছেন—]

§§ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

(৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলেন। সমস্ত প্রাণীই (নিজের) প্রকৃতি অনুসারে থাকে, (সেখানে) নিগ্রহ (জবরদস্তি) কি করিবে? (৩৪) ইন্দ্রিয় এবং উহার (শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়সমূহে প্রীতি ও দ্বেষ (দুই-ই) ব্যবস্থিত অর্থাৎ স্বভাবতই আছে প্রীতি ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে (কারণ) ইহারা মনুষ্যের শত্রু।

[৩৩ শ্লোকের 'নিগ্রহ' শব্দের অর্থে 'নিছক সংযমন'ই নহে, কিন্তু উহার অর্থে 'জবরদস্তি' অথবা 'হঠ'। ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযুক্ত সংযম তো গীতার অভিপ্রেত, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপূর্ব্বক বা জবরদস্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক বৃত্তিকেই একেবারে মারিয়া ফেলা সম্ভব নহে। উদাহরণ ধর, যে পর্য্যন্ত দেহ আছে সে পর্য্যন্ত ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি ধর্ম্ম, প্রকৃতি-সিদ্ধ হইবার কারণে, দূর হইতে পারে না; মনুষ্য যতই কেন জ্ঞানী হউক না, ক্ষুধা লাগিলেই ভিক্ষা করিতে উহাকে বাহির হইতে হয়, এইজন্য চতুর ব্যক্তিদিগের জবরদস্তি করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিবার বৃথা হঠ করা কর্ত্তব্য নহে; এবং যথাযুক্ত সংযমের দ্বারা উহাদিগকে নিজের বশে আনিয়া উহাদের স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তিসকলকে লোকসংগ্রহার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারই ৩৪ শ্লোকের 'ব্যবস্থিত' পদের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে সুখ ও দুঃখ দুই বিকার স্বতন্ত্র; এক অপরের অভাব নহে (গী. র. প্র. ৪ পৃ ও)। প্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অখণ্ডিত ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল বিষয়ও করিতে হয়, যাহা আমার নিজের পছন্দসই নহে (গী. ১৮. ৫৯); এবং যদি না করি, তবে নির্ব্বাহ হয় না। এইরূপ সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এই কর্ম্মসকলকে অনিচ্ছা সত্বেও কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিয়া যান, অতএব পাপ-পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকেন; এবং অজ্ঞানী উহাতেই আসক্তি রাখিয়া দুঃখ পায়; ভাস কবির বর্ণনানুসারে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ইহাই এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ। কিন্তু এখন আর এক সংশয় আসিতেছে এই যে, যদিও ইহা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সকলকে বলপূর্ব্বক মারিয়া ফেলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে না, কিন্তু অনাসক্ত বুদ্ধিতে সকল কর্ম্মই করিতে থাকিবে; কিন্তু যদি জ্ঞানী ব্যক্তি যুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্রূর কর্ম্ম করা অপেক্ষা কৃষি বা ভিক্ষা প্রভৃতি কোন অহিংসামূলক ও সৌম্যভাবের কর্ম্ম করে তবে তাহা কি প্রশস্ততর নহে? ভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন—]

§§ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

(৩৫) পরধর্ম্মের আচরণ সুখে করিতে পারিলেও তদপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত কর্ম্মই অধিক শ্রেয়স্কর; (ফের চাই) তাহা বিগুণ অর্থাৎ দোষযুক্ত হইলই বা। স্বধর্ম্ম অনুসারে (চলিয়া) মৃত্যু ঘটিলেও তাহাতে মঙ্গল হয়, (কিন্তু) পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর!

[স্বধর্ম্ম অর্থে স্মৃতিকারেরা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ত শাস্ত্রের দ্বারা যে ব্যাপার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন তাহা; স্বধর্ম্মের অর্থ মোক্ষধর্ম্ম নহে। সকল লোকের কল্যাণের জন্যই গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা (গী. ১৮. ৪১) শাস্ত্রকারগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অতএব ভগবান বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানী হইয়া গেলেও নিজ নিজ ব্যবসায় করিতে থাকিবে, ইহাতেই উহাদের ও সমাজের কল্যাণ, এই অবস্থায় বারম্বার গোলমাল করা উচিত নহে (গী. র. পৃঃ ও)। "তেলীর কর্ম্ম যদি তাম্বুলী করে, দৈব তারে নাহি মারে, আপনি সে মরে" এই প্রচলিত প্রবাদেরও ইহাই ভাবার্থ। যেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার চলন নাই সেখানেও, যে সমস্ত জীবন সৈনিকের কার্য্যে কাটাইল, তাহার যদি কোন কাজ করিতে হয়, তবে সিপাহির ব্যবসায়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে শ্রেয়স্কর মনে করিবে; দর্জির ব্যবসায় তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, এবং এই যুক্তিই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার জন্যও উপযোগী। চাতুর্ব্বর্ণ্য-

ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন ভিন্ন ; এবং তাহা এখানে উপস্থিতও হইতেছে না। এ বিষয় তো নির্ব্বিবাদ যে, সমাজের সমুচিত ধারণপোষণ হইবার জন্য কৃষির ন্যায় নিরুপদ্রব ও সৌম্যভাবের ব্যবসায়ের সঙ্গেই অন্যান্য কর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে। অতএব যখন একবার কোন উদ্যোগকে—চাই তাহা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারেই স্বীকার কর অথবা স্বেচ্ছাক্রমেই স্বীকার কর—ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরবিশেষে উহাতে ফাঁকি বাহির করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়া বসা ভাল নহে ; আবশ্যক হইলে ঐ ব্যবসায়েই প্রাণ দিতে হইবে। বস্, এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যে কোন ব্যাপার বা লাভের কর্ম্ম হউক না কেন, তাহাতে কোন-না-কোন দোষ সহজেই বাহির করা যায় (গী. ১৮. ৪৮)। কিন্তু এই একটু খুঁতের জন্য নিজের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যই ছাড়িয়া দেওয়া কখনও ধর্ম্ম নহে। মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে এবং তুলাধার-জাজলিসংবাদেও এই তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে, এবং তথাকার ৩৫ম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ মনুস্মৃতিতে (১০. ৯৭) এবং গীতাতেও (১৮. ৪৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবান ৩৩ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "ইন্দ্রিয়সমূহকে মারিবার হঠ চলে না ;" এই সম্বন্ধে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে মারিবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুষ্য নিজে ইচ্ছা না করিলেও মন্দ কর্ম্মের দিকে কেন ঝুঁকিয়া পড়ে ?]

অর্জ্জুন উবাচ।

§§ অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—(৩৬) হে বার্ষ্ণেয় (শ্রীকৃষ্ণ)! এখন (ইহা বুঝাও যে) মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কিসের প্রেরণায় পাপ করে, কোন্ প্রকার জবরদস্তিতে করিয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিলেন—(৩৭) এই বিষয়ে ইহা বুঝ যে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও অত্যন্ত পাপী এই কাম ও এই ক্রোধই শত্রু। (৩৮) যে প্রকার ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি, ধূলি দ্বারা দর্পণ এবং ক্লেদের দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, সেই প্রকারই ইহা দ্বারা এই সমস্ত ঢাকা আছে। (৩৯) হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কামরূপ নিত্যবৈরী সর্ব্বদাই অতৃপ্ত অগ্নিই ; ইহা জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

[ইহা মনুর উক্তিরই অনুবাদ ; মনু বলিয়াছেন যে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" (মনু ২. ৯৪)—কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরঞ্চ ইন্ধন দিলে অগ্নি যেমন বাড়িয়া যায়, সেইপ্রকারই ইহাও অধিকাধিক বাড়িতে থাকে (গী. র. পৃ)।

(৪০) ইন্দ্রিয়গণকে, মনকে, এবং বুদ্ধিকে, ইহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঘর বা গড় বলে। ইহার আশ্রয়ে জ্ঞানকে জড়াইয়া (ঢাকিয়া) উহা মনুষ্যকে ভুলের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। (৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান (অধ্যাত্ম) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান)-নাশক এই পাপীকে তুমি মারিয়া ফেল।

§§ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥
ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(৪২) বলিয়াছেন যে (স্থূল বাহ্য পদার্থসমূহের পরিমাপে উহাদিগের জ্ঞাতা) ইন্দ্রিয়সকল উপরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও শ্রেষ্ঠ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা। (৪৩) হে মহাবাহু অর্জ্জুন! এই প্রকারে (যিনি) বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জানিয়া এবং নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া দুরাসাদ্য কামরূপ শত্রুকে তুমি মারিয়া ফেল।

[কামরূপ আসক্তিকে ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া নিজের দাঁড়াইতে হইবে, উহা নিজের অধীনে থাকিবে। বস্, এখানে এইটুকু ইন্দ্রিয়নিগ্রহই বিবক্ষিত। ইহা অর্থ নহে যে ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মারিয়া সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে (গী, র, পৃঃ)। গীতারহস্যে (পরি. পৃঃ) দেখানো হইয়াছে যে, "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ' ইত্যাদি ৪২ম শ্লোক কঠোপনিষদের এবং উপনিষদের অন্য চার-পাচ শ্লোকও গীতাতে গৃহীত হইয়াছে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারের

।করিলাম না। এক্ষণে প্রথমে ইহা বলিতেছেন যে, ।লোকসংগ্রহ করিবার এই কর্ত্তব্য বা অধিকার শুধু ।জ্ঞানী ব্যক্তিরই কেন—]

(২১) শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী কর্ম্মযোগী) পুরুষ যাহা কিছু করেন, তাহাই অন্য অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যও করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুকরণ করে।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদেও প্রথমে 'সত্যং বদ' 'ধর্ম্মং চর' ।ইত্যাদি উপদেশ করা হইয়াছে এবং ফের শেষে বলা ।হইয়াছে যে "যখন সংসারে তোমার সন্দেহ হইবে যে ।এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ।ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবহার করেন সেই প্রকার ।ব্যবহারই করিবে" (তৈঃ. ১. ১১. ৪)। এই অর্থেরই ।এক শ্লোক নারায়ণীয় ধর্ম্মেও আছে (মভা. শা. ৩৭১ ।২৫); এবং এই ভাবেরই মরাঠীতে এক শ্লোক আছে, ।যাহা ইহারই অনুবাদ এবং যাহার সারমর্ম্ম এই যে, ।"লোকের কল্যাণকারী মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার করেন ।ঐ প্রকারই, এই সংসারে, সকল লোকই করিয়া ।থাকে।" এই ভাবই এই প্রকারে পরিস্ফুট করা ।যাইতে পারে—"দেখ, ভাল লোকেরই চালচলনে সমস্ত ।সংসার চলে।" এই লোককল্যাণকারী পুরুষই গীতার ।'শ্রেষ্ঠ' কর্ম্মযোগী। শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'আত্মজ্ঞানী ।সন্ন্যাসী' নহে (গী. ৫. ২)। এখন ভগবান স্বয়ং ।নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই অর্থই আরও দৃঢ় করিতেছেন ।যে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধি চলিয়া গেলেও, লোক- ।হিতকর কর্ম্ম তাঁহাকে ছাড়ে না—]

(২২) হে পার্থ! (দেখ যে,) ত্রিভুবনে আমার কোনও কর্ত্তব্যও (অবশিষ্ট) নাই, (আর) কোন অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবারও বাকী নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই চলিয়াছি। (২৩) কারণ যদি আমি কদাচিৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিবে। (২৪) যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি সঙ্করকর্ত্তা হইব এবং আমার হস্তে এই প্রজাগণের ধ্বংস হইবে।

। [ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্লোকে সুস্পষ্ট ।দেখাইয়াছেন যে লোকসংগ্রহ কিছু অন্যায় নহে। ।এইরূপ আমি উপরে ১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকের ।এই যে অর্থ করিয়াছি যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন ।কর্ত্তব্য না থাকিলেও জ্ঞানীর নিষ্কাম বুদ্ধিতে সমস্ত ।কর্ম্ম করিতে থাকা উচিত; তাহাও স্বয়ং ভগ- ।বানের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে। যদি না ।হয়, তবে এই দৃষ্টান্তও নিরর্থক হইবে (গী. র. পৃঃ)।

।সাংখ্যমার্গ ও কর্ম্মমার্গের মধ্যে এই একটী খুব বড় ।পার্থক্য আছে যে, সাংখ্যমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম ।ছাড়িয়া বসেন, চাই এই কর্ম্মত্যাগের ফলে যজ্ঞচক্র ।ডুবিয়া যাউক অথবা জগতের কিছু হউক—উনি ।তাহার কোন পরোয়া করেন না; এবং কর্ম্মমার্গের ।জ্ঞানী ব্যক্তি, শুধু নিজের জন্য আবশ্যক না হইলেও ।লোকসংগ্রহকে মহত্বপূর্ণ আবশ্যক কার্য্য জানিয়া, ।তজ্জন্য নিজ ধর্ম্মানুসারে সমস্ত কাজ করিতে থাকেন ।(গী. র. ১১ প্র. পৃ)। ইহা বলা হইয়াছে যে, ।স্বয়ং ভগবান কি করেন। এখন জ্ঞানীগণের ও ।অজ্ঞানীগণের কর্ম্মের ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, ।অজ্ঞানীদিগকে ভাল করিবার জন্য জ্ঞানীর আবশ্যক ।কর্ত্তব্য কি—]

§§ সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসংগিনাং।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

(২৫) হে অর্জ্জুন! যে প্রকার (ব্যবহারিক) কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী লোক ব্যবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছু জ্ঞানী ব্যক্তির আসক্তি ছাড়িয়া সেই প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। (২৬) কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে জ্ঞানী ব্যক্তি ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না; (নিজে) যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মই করিবে এবং লোকদিগকে আনন্দের সহিত করাইবে।

। [এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে ।ভেদভাব উৎপন্ন করিবে না এবং পরে ২৯ শ্লোকেও এই ।কথাই আবার বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অভিপ্রায় ।ইহা নহে যে, লোকদিগকে অজ্ঞানী করিয়া রাখিবে। ।২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির লোক- ।সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং লোকদিগকে চতুর করাই ।হইল লোকসংগ্রহের অর্থ। ইহার উপর সংশয় হয় এই ।যে, লোকসংগ্রহই যদি করিতে হয়, তবে জ্ঞানীপুরুষের ।স্বয়ং কর্ম্ম করা আবশ্যক নহে; লোকদিগকে বুঝাইয়া ।দিলেই—জ্ঞানের উপদেশ করিলেই—কাজ চলিয়া যায়। ।ভগবান তাহার এই উত্তর দেন যে, সদাচরণের দৃঢ় ।অভ্যাস যাহার হয় নাই, (এবং সাধারণ লোক এই ।প্রকারই হয়) তাহাকে যদি কেবল মুখে উপদেশ ।দেওয়া যায়—কেবল জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়—তবে সে

নিজের অনুচিত ব্যবহারের সমর্থনেই এই ব্রহ্মজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে; এবং "অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি তো এই প্রকার বলেন" এই প্রকার নিরর্থক কথা তাহাকে বলিতে-শুনিতে দেখা যায়। এইরূপে যদি জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি অজ্ঞানী লোকদিগের নিরুদ্যোগী হইবার পক্ষে এক দৃষ্টান্তই হইবেন। মনুষ্যের এই প্রকার বাক্‌চতুর, কথা-চালাচালি দ্বারা ভেদসাধক অথবা উদ্যোগহীন হওয়াই বুদ্ধিভেদ; এবং মনুষ্যের বুদ্ধিতে এই প্রকারের ভেদভাব উৎপন্ন করিয়া দেওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অতএব গীতা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য—লোকদিগকে কর্ম্মকুশল ও সদাচরণশীল করিবার জন্য—স্বয়ং সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থাৎ সদাচরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লোকদিগকে দেখাইবেন এবং তদনুসারে আচরণ করাইবেন। এই জগতে উঁহার ইহাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য (গী. র. পৃ)। কিন্তু গীতার এই অভিপ্রায় না বুঝিয়া কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের যদি বিপরীত অর্থ করেন যে জ্ঞানী-ব্যক্তির অজ্ঞানীদিগের সমানই কর্ম্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে অজ্ঞানী লোক বালক থাকিয়াই নিজ কর্ম্ম করিতে থাকে"! তবে বল যে, দাম্ভিক আচরণ শিক্ষা দিয়া অথবা লোকসকলকে অজ্ঞানী থাকিতে দিয়া জানোয়ারদিগের ন্যায় উহাদিগের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লইবার জন্যই গীতা প্রবৃত্ত হইয়াছে! যাহার ইহা দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে না, সম্ভবত তাঁহার নিকট লোকসংগ্রহ একটা ঢং বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মসমূহের মধ্যে লোকসংগ্রহ এক মহত্বপূর্ণ কর্ম্ম; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের উত্তম আদর্শের দ্বারা উঁহাদিগকে শোধরাইবার জন্য—বালক প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য নহে—কর্ম্মই করিবে (গী. র. প্র. ১১, ১২)। এখন এই সংশয় হইতে পারে যে, যদি আত্ম-জ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে থাকেন, তবে তিনিও অজ্ঞানীই হইয়া যাইবেন; অতএব স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, যদিও জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই সংসারী হয়, তথাপি ইহাদের ব্যবহারে প্রভেদ কি এবং জ্ঞানীর নিকটে অজ্ঞানীর কোন্ বিষয়ে শিক্ষা হইতে লইবে—]

(২৭) প্রকৃতির (সত্ত্ব-রজ-তম) গুণসমূহ হইতেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; কিন্তু অহঙ্কারমূঢ় (অজ্ঞানী ব্যক্তি) মনে করে যে আমি কর্ত্তা; (২৮) কিন্তু হে মহাবাহু অর্জ্জুন! "গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই আত্মা হইতে ভিন্ন" এই তত্ত্ব যিনি জানেন, সেই (জ্ঞানী ব্যক্তি) গুণসমূহের নিজেদের মধ্যে এই খেলা চলিতেছে ইহা বুঝিয়া ইহাতে আসক্ত হন না। (২৯) প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সংমূঢ় লোক গুণ ও কর্ম্মেই আসক্ত থাকে; এই অসর্বজ্ঞ ও মন্দ ব্যক্তিদিগকে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি (নিজের কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কোন অনুচিত মার্গে লাগাইয়া) বিচলিত করিবেন না।

[এখানে ২৬ শ্লোকের অর্থেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে এই যে সিদ্ধান্ত আছে যে, প্রকৃতি ভিন্ন এবং আত্মা ভিন্ন, প্রকৃতি অথবা মায়াই যাহা কিছু করিতেছে, আত্মা কিছু ধরে না করে না, এই তত্ত্ব যিনি জানিয়া লয়েন, তিনিই বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী হইয়া যান, কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হয় না, ইত্যাদি—উহা মূলে কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের। গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে (পৃঃ) ইহার পূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দেখ। ২৮ শ্লোকের কেহ কেহ যদি অর্থ করেন যে, গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গুণ-সমূহে অর্থাৎ বিষয়সমূহে বিচরণ করে, এই অর্থ শুদ্ধ নহে; কারণ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এগারো ইন্দ্রিয় এবং শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচ বিষয় মূল-প্রকৃতির ২৩ গুণের মধ্যেই গুণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল অর্থ তো এই যে, প্রকৃতির সমস্ত অর্থাৎ চব্বিশ গুণকে লক্ষ্য করিয়াই এই "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে"র সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে (গী. ১৩. ১৯-২২; এবং ১৪. ২৩)। আমি উহার লক্ষণ ও ব্যাপকভাবে অনুবাদ করিয়াছি। ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী একই কর্ম্ম করিলেও উহাতে বুদ্ধির দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য থাকে (গী. র. পৃ ও)। এখন এই সম্পূর্ণ আলোচনার সার-স্বরূপ এই উপদেশ করিতেছেন—]

§§ ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০॥

(৩০) (এইজন্য হে অর্জ্জুন!) আমাতে অধ্যাত্ম-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সংন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়া এবং (ফলের) আশা ও মমতা ছাড়িয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর!

[এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিলে কি ফল লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি হয়—]

§§ যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য পদার্থ সমূহের সংস্কার গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, মনের কার্য্য ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বুদ্ধি এই সকলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, এবং আত্মা এই সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত হইতে ভিন্ন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গীতা-রহস্যের ষষ্ঠ প্রকরণের শেষে (পৃঃ) করা হইয়াছে। কর্ম্মবিপাকের এই প্রকার অনেক গূঢ় প্রশ্নসমূহের বিচার গীতারহস্তের দশম প্রকরণে (পৃঃ) করা হইয়াছে যে, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য কামক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিধর্ম্মের কারণে কোনও কার্য্য করিতে কেন প্রবৃত্ত হইয়া যায়; এবং আত্ম-স্বতন্ত্রতা কারণে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সাধনের দ্বারা ইহা হইতে মুক্তিলাভের পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে।]

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদে কর্ম্মযোগনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

(পঞ্চম অঙ্ক)

(১৮৪৩ শকের শ্রাবণ সংখ্যার অনুবৃত্তি)

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন)

কুশলপ্রশ্নাদি শেষ হইয়া গেলে শার্ঙ্গধর মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ রাজাকে জ্ঞাপন করিতেছেন;—

"তিনি আপনার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা বলিয়াছেন"।

রাজা।

"ভগবান্ কি আদেশ করিয়াছেন"?

শার্ঙ্গরব কণ্বসন্দেশ বলিতেছেন;—

"আপনি যে আমার এই দুহিতাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছি। * * *

"আপনাকে আমরা পূজনীয়দের অগ্রগণ্য বলিয়া জানি; আর শকুন্তলাও যেন সৎক্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি! বিধাতা এইস্থলে তুল্যগুণ বধূবরের সম্মিলন করিয়া তিনি যে ঐরূপ সম্মিলন করিতে পারেন না, এই চির নিন্দার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে এই আসন্নসত্ত্বা পত্নীকে সহধর্ম্ম-চারিণীরূপে গ্রহণ করুন"।

গৌতমীও বলিলেন "আর্য্য! আমারও কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু বলিবার বিষয় কিছুই পাইতেছি না। শকুন্তলা গুরুজনের অপেক্ষা রাখেন নাই, আর আপনিও তাহার বন্ধুজনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, আপনারা উভয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় মত কার্য্য করিয়াছেন; অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং আপনারা নিজ নিজ কৃতকার্য্যের জন্য নিজেরাই দায়ী। অপরের এখানে বলিবার কি আছে?"

গৌতমী প্রবীণা—প্রবীণার মত কথাই কহিয়াছেন।

বলা শেষ হইয়া গেল। শকুন্তলা এবারে আর্য্যপুত্র কি বলেন, তাহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাই মনে মনে বলিতেছেন:—

"না জানি আর্য্যপুত্র কি বলেন"?

ঔৎসুক্যের কারণ কি? ইহা স্বাভাবিক। গুরুতর বিশ্বাস সত্ত্বেও এরূপ স্থলে কেহ স্থির থাকিতে পারে না। শকুন্তলার ঔৎসুক্যের কোন কারণ ছিল না। পক্ষান্তরে রাজা যে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল। তথাপি উৎসুক। অবশ্যম্ভাবী ফল জানা সত্ত্বেও তাহা না ঘটা পর্য্যন্ত মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। ঔৎসুক্য অনিবার্য্য।

রাজা শকুন্তলার বৃত্তান্ত সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। কবি বলেন দুর্ব্বাসার শাপই এই বিস্মৃতির কারণ।

মহাভারতেও শকুন্তলার উপাখ্যান আছে। তাহাতে দুর্ব্বাসার শাপের কথা নাই। রাজা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং শকুন্তলা অনেক কথা বলার পরে রাজার স্মরণ হয়। পুরাণের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলা একব্যক্তি নহে। একজনের জন্ম পৌরাণিক যুগে অন্যজনের জন্ম নাট্যযুগে! পৌরাণিক শকুন্তলার জন্মের বহুকাল পরে নাটকীয় শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল। সম্পূর্ণ পৃথক যুগ। আচার, ব্যবহার, সামাজিক অবস্থা ও মনোগত ভাব এই দুই যুগের লোকের মধ্যে অনেক অন্তর। পুরাণের শকুন্তলা প্রকৃতই ঋষিকুললালিতা। সে শকুন্তলার মধ্যে সরলতা, সত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, মিথ্যার প্রতি তীব্র ঘৃণা, প্রগাঢ় আত্মনির্ভর,

সুখ-দুঃখে সমতা, ঐহিক সুখে তাচ্ছিল্য এবং সাংসারিক দুঃখের দ্বারা অনভিভূততা প্রভৃতি আশ্রমসুলভ বহুতর গুণ দেখিতে পাইবেন। কালিদাসের শকুন্তলা সেরূপ নহেন। তিনি সেরূপ প্রখরা, তেজস্বিনী এবং সাংসারিক ভাবসকলের সেরূপ অতীতাও নহেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল, অতি ধীর, অতি নম্র এবং অতিশয় শান্ত। তিনি সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষিণী। তিনি ললিতা লতার মত অন্যের আশ্রয় ভিন্ন এক পাও দাঁড়াইতে পারেন না। কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে তিনি রাগ করিতে জানেন না। অদ্ভুত সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করেন। সরলতা তাঁহার ভিতরেও সম্পূর্ণভাবে আছে—কিন্তু ভাবে মাত্র ব্যক্ত হয়; মুখে ফুটিয়া বাহির হয় না; অসত্যের প্রতি তাঁহারও যথেষ্ট ঘৃণা, কিন্তু অসত্যবাদীকে তিনি কদাচ ঘৃণা করেন না—ক্ষমা করেন। পুরাণের শকুন্তলা তেজস্বিনী বিদুষী ঋষিকন্যা; আর কালিদাসের শকুন্তলা ধীরা, ললিতা, অবলা, সরলা এবং অতি কোমলা রমণী। কবি তাঁহাকে "মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া" (অর্চ্চনা) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিবার ইহা অপেক্ষা ভাবপ্রকাশক অন্য কোন কথা আছে কি না আমরা জানি না। এই একটী মাত্র কথা দ্বারা কবি শকুন্তলার জীবন্ত মূর্ত্তিটী পাঠকবর্গের সমক্ষেও উপস্থিত করিয়াছেন। আর কিছুই বলিতে হইবে না; ঐ একটী কথাই যথেষ্ট। উহাতেই শকুন্তলা সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিতা হইয়াছেন। পবিত্রতা, নম্রতা, নিরহঙ্কারিতা, শিষ্টতা, ধীরতা, শান্তভাব প্রভৃতি সমস্তই ঐ কথাটীর ভিতরে রহিয়াছে। অর্চ্চনা করিতে গেলে অর্চ্চকের প্রাণে যে সকল ভাবের উদয় হয় অর্চ্চনায় তাহাই প্রকাশ পায়; শকুন্তলা সেই অর্চ্চনারই প্রতিমূর্ত্তি।

পুরাণের শকুন্তলা তাহা নহে। পুরাণের শকুন্তলা বুদ্ধিবলে, শাস্ত্রবলে, শিক্ষাবলে বলীয়সী। একজন বিদুষী ঋষিকন্যা—অন্যজন হৃদয়ললামভূতা রমণী। কালিদাসের শকুন্তলা যদিও ঋষিকন্যা, কিন্তু ইঁহার শিক্ষা জনসমাজোপযোগিনী। রাজকুলে থাকিয়া রাজমহিষী হইয়া দয়া, দাক্ষিণ্য, কোমলতা, মৃদুতা, লজ্জাবনম্রতা, সহিষ্ণুতা, মৃদুমধুরভাষিতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহে ভূষিতা হইয়া পুরজনের মনোরঞ্জন করিবেন এইরূপ শিক্ষাই তিনি পাইয়াছেন; অথবা কবি তাঁহাকে সেইভাবে ভূষিতা করিয়া জগতের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছেন। এই শকুন্তলার পক্ষে পৌরাণিক শকুন্তলার মত প্রগল্‌ভবাক্ হইয়া রাজা দুষ্মন্তের স্মৃতিপথে পূর্ব্ববৃত্তান্ত আনয়ন করা সহজ ছিল না এবং সম্ভবও ছিল না। সুতরাং কবি সে পথে চলেন নাই।

কালিদাসের কালের সামাজিক অবস্থাও পৌরাণিক যুগের সামাজিক অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রণয়ী প্রণয়িনীকে ভুলিয়া যায় এ কথা যেমন আজকাল আমরা ধারণা করিতে পারি না, কালিদাসের সময়ের সমাজের লোকও সেইরূপ ধারণা করিতে পারিত না। আমরা ইহা অসম্ভবই মনে করি। অসম্ভব সম্ভব বিবেচনা করা সমস্তই মনের গঠনের উপর নির্ভর করে। কোন্ বিষয়টী আমাদের কিছুতেই ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে না? যেটী আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে এবং যাহাকে আমরা সর্ব্বোচ্চ ভাব মনে করি এবং যাহা সর্ব্বদাই আমাদের ধ্যানে থাকে, তাহাই আমরা কদাচ ভুলি না; আজ আমার অন্তরে যে ভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে এবং যাহাকে সর্ব্বোচ্চ আনন্দদায়ক ভাব মনে করিতেছি, কাল যদি তদপেক্ষাও উচ্চ ও আনন্দদায়ক ভাব আমার অন্তরে প্রবেশ করে, তবে ঐ উচ্চ ভাবের সংঘর্ষণে পূর্ব্বভাব অন্তঃকরণে আর স্থান পাইবে না; তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইব। পুরাণের শকুন্তলা যে সমাজের লোক, সেখানে পার্থিব প্রণয়ের ততটা প্রাধান্য ছিল না। নরনারীর পরস্পর-প্রণয় সেকালে ততটা উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইত না। সমাজের গতি যখন আধ্যাত্মিক জগতের পথ পরিত্যাগ করিয়া জড় জগতের দিকে ফিরে, তখনই ঐ-জাতীয় ভাবই শুদ্ধ হৃদয়ের উচ্চতম ভাবমধ্যে পরিগণিত হয়। আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ আমাদের ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আইসে। ধর্ম্মরাজ্যের উজ্জ্বল আলোকে সাংসারিক ভাবসকল ক্রমশঃ বিস্মৃতি-তিমিরে আচ্ছাদিত হইতে থাকে। আমরা যে নরনারীর পরস্পর-প্রণয়কে আজকাল সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়া থাকি, ঋষিদের নিকট

তাহা ততটা উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইত না। তাঁহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ যে প্রেম জাগরূক থাকিত, তাহার কাছে এই পার্থিব প্রেম উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর নিকট দীপপ্রভার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

নরনারীর পরস্পর-প্রেম একটী রমণীয় ভাব সন্দেহ নাই। ইহাতে পবিত্রতা ও অকৃত্রিমতার অভাব নাই; সাংসারিকভাবে ইহা একটী অতি পবিত্র বস্তু। কিন্তু যিনি এই সংসারগণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনন্ত প্রেমরাজ্যের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহা কতটুকু পবিত্র বা কতটুকু লোভনীয়? ঋষিগণ যে প্রেমে প্রেমিক ছিলেন, তৎকালের সমাজকেও তাঁহারা সেই প্রেমই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই প্রেমে ইনি আমার, আর ইনি আমার নহেন ইহা ছিল না। সে প্রেমে সবই আমার ছিল। পাপীও আমার ছিল পুণ্যাত্মাও আমার ছিল। পাপী ঘৃণিত ছিল না—তাহার পাপ ঘৃণিত ছিল। এই প্রেমের নিকট সাংসারিক প্রেম অতি তুচ্ছ বস্তু; সেখানে ইহার স্থান হয় না। রাজা দুষ্মন্ত ঋষিগণের গঠিত সমাজের একটী আদর্শ পুরুষ। তিনি লোকহিতে রত; বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধানের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন; স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বেড়াইতেন। এই রাজধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান, ও একমাত্র সাধনার বিষয় ছিল। তাঁহার হৃদয়ে এই পার্থিব প্রণয় কতটুকু স্থান অধিকার করিত? শকুন্তলার বৃত্তান্ত ভুলিয়া যাওয়া যদিও আমরা অসম্ভব মনে করি—এবং কবি কালিদাসও করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাভারতের দুষ্মন্তের পক্ষে সেটা কিছুই অসম্ভব ছিল না। তবে কালিদাসের দুষ্মন্ত তো ঠিক্ মহাভারতের দুষ্মন্ত নয়; তাই কবি তৎকালের সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি কৌশলের সহিত দুর্ব্বাসার শাপের কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তির অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কালিদাস একজন সমাজ-পণ্ডিত ছিলেন। দুর্ব্বাসার শাপ তাঁহার নিজের আবিষ্কার। যদিও পদ্মপুরাণে ঐ বৃত্তান্তটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কদাপি উহা প্রাচীন বৃত্তান্ত নহে। পদ্মপুরাণে কালিদাসাদি রচিত কাব্যবৃত্তান্ত আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ঐ পুরাণ যে কাব্যযুগের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কালিদাস যদি দুর্ব্বাসার শাপের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাটকের প্রধান নায়ক রাজা দুষ্মন্তকে তৎকালের সমাজের লোকেরা ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। ঋষিদের সেই উচ্চশিক্ষা তৎকালের সমাজের লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছিল—যেমন একালে আমরাও ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাণাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে একটী অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটে, এবং যাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না, সেইখানেই একটী অভিসম্পাতের অবতারণা হয়। কালিদাসও তাহাই করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বজ্ঞ বচন-সংগ্রহ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার অন্তর্গত মাসুর নামক গ্রামে বসবরস নামক জনৈক আরাধ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার কালে পথিমধ্যে অতিশয় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় তিনি অম্বলুর নামক স্থানে এক কুম্ভকারের গৃহে কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় মাড়ে নামক একটি বিধবার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এবং তিনি তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহাদিগের একটি পুত্র-সন্তান জন্মে। তিনিই পরে সর্ব্বজ্ঞ কবি নামে প্রসিদ্ধ হন।

আমাদের বঙ্গদেশে যেমন চাণক্যের শ্লোক, খনার বচন প্রভৃতি প্রতিগৃহে আগ্রহের সহিত কথিত হয়, কর্ণাট প্রদেশে সর্ব্বজ্ঞ কবির কবিতাও তদ্রূপ আদরণীয়।

সর্ব্বজ্ঞ কবি সর্ব্বজ্ঞবচন এবং সর্ব্বজ্ঞকালজ্ঞান নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম

গ্রন্থে চাণক্যশ্লোকের ন্যায় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় পুস্তকে খনার বচনসদৃশ জ্যোতিষ বচন আছে।

সর্ব্বজ্ঞ একজন সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার কবিতায় ইহার বিশেষ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে লিঙ্গায়ৎধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বসব ভিন্ন অন্য কোন সমাজসংস্কারকের নাম জানা যায় না।

মহীশূরের ভূতপূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ লুইস রাইস এম, আর, এ, এস সম্পাদিত "কর্ণাটক-ভাষাভূষণ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে সর্ব্বজ্ঞ কবি খৃঃ ১৮০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সর্ব্বজ্ঞলিখিত ভাষা সম্প্রতি কন্নাড় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞ কবি নিম্নলিখিত বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের শেষে অঙ্ক দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় কবিতার সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

সর্ব্বজ্ঞ-সংবারপদ্ধতি (৬৭), দৈবপদ্ধতি (২) দানপদ্ধতি (৬), হীনদান-পদ্ধতি (৮), যোগ্যপদ্ধতি (১৪), পীঠিকা-(পীঠস্থান) পদ্ধতি (৩৩), ইষ্টলিঙ্গ-পদ্ধতি (৩৪), ভক্তপদ্ধতি (৩০), মহেশ্বর-পদ্ধতি (১৪), জ্ঞানপদ্ধতি (১০২), সাকুসাকু-(বৈরাগ্য) পদ্ধতি (৩৭), যোগপদ্ধতি (৫৫), ধর্ম্ম-পদ্ধতি (৬৭), রাজনীতি-পদ্ধতি (৫৫), বিটগাতীর-(অসতী) পদ্ধতি (৩৩), স্ত্রী-পদ্ধতি (৩৪), প্রিয়র-পদ্ধতি (৩০), বিটগার-(লম্পট) পদ্ধতি (৪৬), কালজ্ঞান-পদ্ধতি (৩৪), বিধিবাসনে পদ্ধতি (৩৬), জৈন-পদ্ধতি (১৩), জাতিবর্গ-পদ্ধতি (৪১), মূর্খ-পদ্ধতি (৪০), জোষী (জ্যোতিষ) পদ্ধতি (৪০), ব্রাহ্মণপদ্ধতি (৪২), আনন্দপদ্ধতি (৪২), শিখামণি-পদ্ধতি (১৬), নীতিপদ্ধতি (২৫), লেসন-(ছলনীতি) পদ্ধতি (৪৮), নিন্দাপদ্ধতি (৭৩), বেশ্যাস্ত্রী-পদ্ধতি (৪২) এবং বেডগিন-(গোত্রাদি) পদ্ধতি (৩৮)। এতদ্ভিন্ন তিনি (১) হুচ্চনারী কচ্চিদকে (কুকুর-বিষ-বিষয়ক), (২) ইলিবিষকে (মুষিক-বিষ-বিষয়ক), (৩) সর্পদবিষকে (সর্পবিষসম্বন্ধে), (৪) চেড়ুবিষকে (বিচ্ছুবিষ-সম্বন্ধে) এবং কুন্দবিহাউন বিষকে (অতিবিষধর সর্পবিষবিষয়ে), প্রভৃতি সম্বন্ধে মুষ্টিযোগ ঔষধ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

আমাদের সংগৃহীত পুস্তকে সর্ব্বজ্ঞলিখিত ১৩৮৭টি কবিতা আছে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ কবির আরও অনেক কবিতা ছিল বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বজ্ঞ কবির প্রত্যেক কবিতায় তাঁহার নাম সংযুক্ত আছে।

সর্ব্বজ্ঞের কবিতা ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। কাব্যোৎকর্ষে তিনি প্রসিদ্ধ তেলুগুকবি বিমান এবং মহারাষ্ট্র কবি তুকারামের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হয়েন।

সর্ব্বজ্ঞ কবির কবিতার প্রত্যেকটিই সুন্দর। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহার কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। বলা বাহুল্য যে অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে।

যতদিন নৃপতির সাধিবেক হিত
তত দিন ভাল, কিন্তু জানিবে নিশ্চয়,
কভু যদি যাও তার ইচ্ছা-বিপরীত,
মধ্যাহ্ন তপন-তাপে দাহিবে তোমায়। ১

যতদিন রাজ-আজ্ঞা যতনে পালিবে,
লভিবে সকল সুখ—ধন মান যশ,
অহঙ্কারে মত্ত হ'লে, রাজ-কৃপা লাভে,
হইবে তাড়িত যথা শ্বন্ তাড়ে শশ। ২

কে রাখে চরণ শৈলে শৈবালে জড়িত,
পতনে অবশ্য মৃত্যু জানিয়া নিশ্চয়?
কে কহিবে রুষ্ট ভাব রাজার সহিত?
আপন বিনাশ কেবা আপনি মাগয়। ৩

নৃপতি সহায় যবে, তুমি ভাগ্যবান,
আজ্ঞাবহ রবে তব, অশ্ব-করী-রথী।
রাজা রুষ্ট হ'লে কিন্তু গণিবে বিষম,
অবশ্য জানিবে তব বিমুখ নিয়তি। ৪

স্রোতস্বতী নদী, আর বর্দ্ধমান লতা,
অশ্ব মেষ আদি, কিম্বা ধাবিত শকট,
নৃপতির ইচ্ছা আর অসতী বনিতা,
স্থাপিলে বিশ্বাস ইথে, ঘটয় সঙ্কট। ৫

জন্ম-বীর যেই, সেই বীর গণ্য হয়;
বীরে কি হইবে কভু মৃত্যু ভয়ে ভীত?
জন্মিলে মরিতে হয়, জানিয়া নিশ্চয়.
কোন্ বীর মৃত্যুভয়ে হয় সশঙ্কিত? ৬

যদি কভু রাজকার্য্যে হও নিয়োজিত,
সাধিলে রাজার হিত প্রাণ করি পণ,
অশ্বমেধ-ফল সম হবে পুরস্কৃত,
এ যোগে স্বরগ কিন্তু পিছোলে নিরয়। ৭

রাজকার্য্য সাধ যদি দৈবশক্তি ধর,
কিন্তু যদি সেই শক্তি না রহে তোমার,
নৃপতি কুঞ্জর আর সর্প বিষধর,
করিবে সতত তুমি, দূরে পরিহার। ৮

শত্রুতা সচিব সহ অতি ভয়ঙ্কর,
রাজা মন্ত্রী উভয়ের বৈরীভাব হ'লে,
রাজার অহিত-চিন্তা করি মন্ত্রীবর,
কালসম নাশে তারে সুযোগ পাইলে। ৯

সচিবের আত্মীয়তা রাজপত্নী সনে,
অথবা অরাতি মন্ত্রী হইলে রাজার,
কিম্বা কার্য্য-সমাধানে মন্ত্রণা-বিফলে,
বিপদ-লক্ষণ বলি জান নিরন্তর। ১০

আশ্রয় যে দেয় নৃপ পরনারীগণে,
ভ্রাতায় যে রাখে সদা পরম যতনে,
বাঁচায় বিপদে যেবা শত্রু-পাপীজনে,
বিরাজে কমলা সদা তাহার ভবনে। ১১

ধনে মানে শ্রেষ্ঠ যদি হয় সে নৃপতি,
দরিদ্রের কথা তার না লয় শ্রবণ,
সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেয় জানিবে নিশ্চিতি,
তথাপি তাহার কাছে না যাবে কখন। ১২

অতিথির যেবা নাহি করে সমাদর,
না বলে বসিতে যেবা অভ্যাগত জনে,
প্রভেদ করে না যেবা মার্জ্জার-শূকর,
কদাপি না যাবে সেই রাজসন্নিধানে। ১৩

অপমান-লব্ধ অন্ন, অন্ন নাহি গণি,
উপবাস অন্ন বিনা শ্রেষ্ঠ বলি জান,
ভূপতি গর্ব্বিত হ'লে ছাড়ি নৃপমণি,
শ্রেয় জ্ঞান করিবেক তাপস-গ্রহণ। ১৪

শরীর সম্বন্ধে যথা জানিবে জীবন,
যাহার অভাবে হয় শরীর পতন,
রাজ্যের সহিত রাজার সম্বন্ধ তেমন,
রাজার অভাবে রাজ্য হয় শূন্য মন। ১৫

রাজা হয়ে না করেছে অশ্ব আরোহণ,
যুদ্ধক্ষেত্রে যেবা কভু করেনি গমন,
সুদর্শনা নারীমন বুঝে না যে জন,
শব সম জান তায় বিগতজীবন। ১৬

যে জন দরিদ্রে অন্ন করে বিতরণ,
যে জন মধুর ভাবে তোষে সর্ব্বজন,
যে জন সকলে দেখে আপন সমান,
তার পক্ষে স্বর্গলাভ সহজ সাধন। ১৭

দান তুমি যত কর রহে গুপ্তধন,
ধন দিলে ধনহানি না হয় কখন,
দানদত্ত ধন হয় পাথেয় প্রধান,
পরলোক যাত্রাকালে সাধয়ে কল্যাণ। ১৮

দেবদত্ত যেই ধন পত্নীপুত্র-হিতে,
করহ সঞ্চয় তুমি দেহ করি ক্ষীণ,
না লাগয়ে নিজ কর্ম্মে নাহি পরহিতে,
পরহস্তে যাবে তাহা জানিবে অচিন্ন। ১৯

দেবতা-দাতায় বল প্রভেদ কেমন?
দেবতা করিছে দান অতুল ভুবনে,
উন্মুক্ত দাতার হস্ত সদা দীনজনে,
তাই দেবসম দাতা দানের কারণ। ২০

যদি পাও ধন-রত্ন দেবকৃপাগত,
সতত করিবে তাহা অযাচিত দান,
তাহলে স্বরগ তব হবে হস্তগত,
প্রতিবাসী-গৃহ-সম রবে সন্নিধান। ২১

ভিক্ষুকে যে দেয় ভিক্ষা করিয়া যতন,
লভে সে অক্ষয় পদ নাহিক সংশয়,
যে তারে বিমুখ করে সেই ধনীজন,
ভিক্ষুক হইবে ইহা জানিবে নিশ্চয়। ২২

কৃপণতা করে যেবা পেটে দিয়া ফাঁকি,
বস্ত্রের অভাব সহে থাকিতে সঙ্গতি,
দান নাহি করে যেবা থাকিতে শকতি,
তার ধন ভোগ করে তস্কর-নৃপতি। ২৩

জোঁক যদি লাগে কভু ধেনু-স্তনমূলে,
পান করে রক্ত কিন্তু দুধ নাহি লভে,
সেইরূপ জানিবেক কৃপণ সকলে,
জোঁক হতে হীন জন্তু বিচরয় ভবে। ২৪

বিমুখ হইলে ভিক্ষু পাপ উপজয়,
জানিয়া যে জন কভু লুকাইয়া রয়,
অথবা ত্যজিয়া গৃহ সরিয়া দাঁড়ায়,
নরহত্যা সম পাপ করে সে নিশ্চয়। ২৫

গোপনে যে করে দান—দাতা-শ্রেষ্ঠতম,
প্রকাশ্যে করে যে দান—দাতা সে মধ্যম,
দিব বলি যে না দেয় সেই পাপাধম,
সতত জানিবে তারে নিকৃষ্ট অধম। ২৬

অযাচিত দান করে সেই শ্রেষ্ঠ দানী,
যাচিলে যে দেয় তারে গণিবে মধ্যম,
চাহিলে না দেয় তারে নীচ বলে জানি,
তাহারে কৃপণ বলি দোষে সর্ব্বজন। ২৭

সময়ে তণ্ডুল-কণা মাণিক সমান,
অসময়ে মাণিকও হয় মূল্যহীন,
অতএব যদি চাহ করিবারে দান,
সময়ে করিবে সদা শুনহ প্রবীণ। ২৮

না লাগায়ে নিজ কর্ম্মে নাহি দিয়া পরে,
যতনে সঞ্চিত করি রাখ যেই ধন,
কোন ফল নাহি তায় জানিবে অন্তরে,
মধুকর সঞ্চে মধু পরের কারণ। ২৯

তৃতীয় হইবে যবে ষষ্ঠে পরিণত,
অষ্টক হইবে যদা দ্বাদশ নিশ্চিত,
বায়সের স্তনে হবে দুগ্ধ সমাগত,
তখনই পাপ হবে দূর পরাহত। ৩০

বিনাশ যখন হয় কাছে আগুয়ান,
বুদ্ধি-বিবেচনা সব হয় বিপরীত,
রাবণ কি করেছিল রাজ্যের রক্ষণ,
হনুমান যবে করে লঙ্কা ভস্মীভূত। ৩১

সূর্য্যের কিরণ পশে চণ্ডাল-ভবন;
নীচ সহবাসে সে কি জাতিচ্যুত হয়?
পরব্রহ্ম যার গৃহে সদা বিদ্যমান,
সেই সে উত্তম জাতি জানিবে নিশ্চয়। ৩২

চামারে খাইয়া মাংস ত্যজে মৃগচর্ম্ম,
ব্রাহ্মণ তাহাতে বসি করেন ভোজন,
বলহ আমারে তুমি ওহে জাতিমর্ম্ম,—
কোন্ জাতি মধ্যে রবে চর্ম্মকারগণ। ৩৩

পঞ্চভূত সহযোগে শরীর শ্রীমান,
পঞ্চভূতময় হয় সকল মানব,
তবে কেন বৃথা কর জাতি-অভিমান,
কোথা হতে আসে জাতি উচ্চ-নীচ তব। ৩৪

এক ভূমণ্ডলে সবে কর বিচরণ,
একই উদক পানে জীবন-ধারণ,
এক অগ্নি সবে তাপ করে বিতরণ,
তবে কেন জাতিভেদ করহ পোষণ। ৩৫

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভোগ আর ইচ্ছা কাম,
মানব-পাশব-পক্ষী সবার সমান,
এই রূপ যদি হয় জগত-বিধান,
কোথা হতে আসে তব জাতি-অভিমান। ৩৬

অস্থি-চর্ম্ম-শিরা আর মাংস সমবেত,
আছে তব দেহখানি চর্ম্মকোষে ঢাকা,
তার মধ্যে সঞ্চারিত স্বণিত শোণিত,
কোথা হতে আসে তব জাতিভেদ রেখা। ৩৭

যে ফুলে সুগন্ধ রয় তাহারে বাখানি',
কিবা ফল বল তার জাতি-কুল জানি?
সেইরূপ জাতিভেদ না করিবে জ্ঞানী,
দেবপ্রিয় যেই জন তারে শ্রেষ্ঠ মানি। ৩৮

কল্পবৃক্ষ বৃক্ষ নহে জানিবে নিশ্চয়,
কামধেনু ধেনুমধ্যে গণ্য কভু নয়,
পরশ পাথর কভু প্রস্তর না হয়,
সদ্‌গুরু কভু নাহি হন নীচাশয়। ৩৯

গুরু যদি মূর্খ হয় শিষ্য বুদ্ধিহীন,
উভয় মিলনে সদা গণিবে প্রমাদ,
অন্ধজন যথা হ'য়ে অন্ধের অধীন,
তড়াগে পতিত হয়ে ঘটায় বিপদ। ৪০

শিষ্যে যদি নাহি রহে ভক্তি বিদ্যমান,
শিক্ষায় যদি না রহে উদ্দেশ্য মহান্,
বৃথা সেই শিষ্য আর বৃথা শিক্ষাদান,
নীরস ভূমিতে যথা শস্যের বপন। ৪১

বলনা কখন তুমি ওহে বুদ্ধিমান,
এ-দেবতা ও-দেবতা দেবতা-প্রধান,
সকলের শ্রেষ্ঠ দেব একমাত্র হন,
যিনি সর্ব্ব জগতের পালন কারণ। ৪২

দুই ঈশ এক বিশ্বে সম্ভব কি হয়,
একমাত্র জন তিনি দ্বিতীয়-বিহীন,
সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞানময়
একমেব অদ্বিতীয় জানয়ে প্রবীণ। ৪৩

মন্দিরের ছাদ হয় প্রস্তর-নির্ম্মিত,
তাহারি গঠিত মধ্য, আর সব দেশ;
পাথরের দেবমূর্ত্তি তথা প্রতিষ্ঠিত,
বরদ স্বতন্ত্র কিন্তু জানিবে বিশেষ। ৪৪

কি ফল ফলিবে বল মন্ত্র উচ্চারণে,
শ্রেষ্ঠ দেব সন্নিধানে দিবস-রজনী,
অন্তরে পূজহ যদি সৃষ্টির কারণে
পূরিবে বাসনা তব নিশ্চয় তখনি। ৪৫

ভক্তশ্রেষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ যদি কে বা হয়,
জানিবে তাহার ভক্তি ধূলিকণাময়,
যদি তার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিপরীত যায়।
কর্ম্মযোগে ভক্তভক্তি হয় পরিচয়। ৪৬

অঙ্গুলি সঞ্চারি যদি জপের কারণে,
রসনা সচল হয় বাহ্য স্তুতি গানে,
তথাপি মানস যদি রহে অন্য ধ্যানে,
বাসনা পূরণ কভু না হয় জীবনে। ৪৭

চর্ম্মকার নীচ জাতি বুদ্ধিহীন জন,
পশুবলি দিয়া করে প্রস্তর পূজন,
না বুঝে প্রভেদ হতে নির্জীব পাষাণ,
সত্য নিরঞ্জন প্রভু দেবতা মহান্। ৪৮

কি ফল লভিয়া বল রমণী-রতন,
কি ফল লভিয়া বল পুত্র-কন্যাগণ,
কি ফল লভিয়া বল রজত-কাঞ্চন,
হৃদে যদি নাহি রহে ভক্তি-হেম-ধন। ৪৯

জ্ঞানীজনদেহ হয় তপন সমান,
জ্ঞানের আলোকে সদা রহে দীপ্যমান,
অজ্ঞানীশরীর হয় মরুর মতন,
কোন কাজে নাহি লাগে কহে বুধজন। ৫০

যে বলে সকল জানি বাক্য মিথ্যা তার,
অল্পজ্ঞানী বাক্যহীন রবে নিরন্তর,
একমাত্র সর্ব্বজ্ঞানী হয়েন ঈশ্বর—
সর্ব্বজ্ঞ যাঁহার নাম জগত-আধার। ৫১

পাপপুণ্য হেতু হয় মোদের নয়ন,
ইহ-পরলোক দেখে নয়ন কৃপায়,
ভূমণ্ডলে যত কার্য্য করি সম্পাদন,
নয়ন তাহার হয় প্রধান সহায়। ৫২

কেমনে লভিবে মোক্ষ কহ সর্ব্বজন,
মৃত্যু যদি হয় তব বৃথায় জীবন,
অতএব শুন সবে সর্ব্বজ্ঞ-বচন,
সময় থাকিতে কর মুক্তি অন্বেষণ। ৫৩

সংসারের জালপাশে হইয়া জড়িত,
ভ্রমিছে পৃথিবী মাঝে নর অবিরত,
ভ্রময় দিবস-নিশি পাগল যেমত,
করিয়া আপন অঙ্গ পঙ্কে বিভূষিত। ৫৪

সাধুসঙ্গ সদা জান তীরথ সমান,
সর্ব্ব কর্ম্ম হয় তার সদা তীর্থময়,
কেমনে গণিব তীর্থ তটিনী-জীবন,
স্রোতস্বতী-নীর কভু তীর্থ নাহি হয়। ৫৫

কুকুর শূকর যদি দেখিয়া মাতঙ্গ,
মাতঙ্গে আতঙ্ক হওয়া নহেক উচিত,
কুকুরের দেখাদেখি করিলে প্রসঙ্গ,
মাতঙ্গ হারায় তার গৌরব নিশ্চিত। ৫৬

কিবা ফল ভ্রমণেতে কাশী-কাঞ্চী দেশ,
কিবা ফল বল হবে বাড়াইলে কেশ,
অথবা মুণ্ডিয়া শির ধরি সাধুবেশ,
অন্তরে যদি বা রহে বাসনা অশেষ। ৫৭

যদি কেহ বলে সে যে লয়েছে সন্ন্যাস,
কভু না তাহার বাক্যে করিবে বিশ্বাস,
যদি না জানয় সেবা তত্ত্ব সবিশেষ,
পাপহৃদে পরব্রহ্ম না করয়ে বাস। ৫৮

মুক্তার জনম বটে সমুদ্র-সলিলে,
পুনঃ কিন্তু নাহি মিশে জলবিন্দুদলে,
অসার সংসার এই জানি জ্ঞানবলে,
জ্ঞানী জন নাহি সেই পড়ে বেড়া জালে। ৫৯

সাধুসঙ্গে যদি তব হয় কারাবাস,
তাহাও জানিবে শ্রেয় তাহে নাহি দুখ,
কভু না করিবে কিন্তু দুষ্ট-সহবাস,
পাও যদি ধন-রত্ন নানাবিধ সুখ। ৬০

বৃক্ষসম সত্য রহে প্রাঙ্গণে তোমার,
দেখহ অজ্ঞান নর ভাবিয়া অন্তর,
সত্যের লাগিয়া কেন যাবে দেশান্তর,
সতত থাকিতে ইহা সঙ্গেতে তোমার। ৬১

সতত সন্তুষ্ট যেবা দেবদত্ত দানে,
যাহা পায় তাই খায় প্রফুল্লিত মনে,
নিদ্রায় নাহিক যার ব্যাঘাত শয়নে,
সৌভাগ্য তাহার গৃহে রহে সর্ব্বক্ষণে। ৬২

সতত করিবে তুমি প্রতিজ্ঞা পালন,
প্রাণ যদি যায় কিম্বা করয়ে তাড়ন,
সত্যভ্রষ্ট কভু নাহি হয় যেই জন,
সেই পারে করিবারে চিত্ত-সংযমন। ৬৩

শ্রেয় গণি কারাগার বুধজন সাথ,
সাম্রাজ্য চাহি না তবু মূরখের সাথ। ৬৪

কিবা ফল অনুতাপে দগ্ধ হয়ে গেলে,
জলন্ত অঙ্গারে পদ করিয়া স্থাপন,
সেইরূপ জানিবেক পশি মূর্খদলে,
আপনি নাশয় লোকে আপন জীবন। ৬৫

বিবাদের চেয়ে ভাল হয় পরাজয়,
জানিবে সতত ইহা বুধজন কয়,
বিবাদ বাড়িয়া গেলে কথায় কথায়,
ঘটিবে প্রমাদ তাহে নাহিক সংশয়। ৬৬

জীবন-সঙ্কট যবে অথবা যখন,
প্রাণসম প্রিয়তম ছাড়য়ে জীবন,
ঘটয়ে বিপদ কিম্বা নিন্দে দুষ্টজন,
সেইকালে রহে ধীর যোগী যেই জন। ৬৭

পুঁথিগত বিদ্যা যার আছয়ে বিস্তর,
অথবা গৈরিকবাস করে পরিধান,
তারে নাহি যোগী বলি শুন সবিস্তর,
রিপু বশ করে যেই তিনি যোগী হন। ৬৮

ভক্তি যার বাঁধা সদা মনের বাঁধনে,
মন যার রহে সদা ভক্তির সাধনে,
বাসনা রেখেছে যেবা বাঁধিয়া যতনে,
কোন কাজ নাহি তার যাইয়া বিপিনে। ৬৯

শত উপদেশ দিয়া করিয়া যতন,
পার কি বাড়াতে তুমি মূর্খজন-জ্ঞান ?

প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে প্রস্তর যেমন,
বরষার জলবিন্দু নাহি করে পান। ১০
নয়ন রসনা আর মানবের মন,
এই তিন হয় জেন, পতন কারণ,
যখন দেখিবে তব হয়েছে পতন,
এই তিন ভিন্ন নাহি দূর অনাজন। ১১
আছে বহু অশ্ব কিন্তু খঞ্জ কার্য্যকালে,
আছে বহু সৈন্য কিন্তু ভীত যুদ্ধস্থলে,
আছে বহু ভৃত্য কিন্তু কার্য্য অবহেলে,
তাহলে রাজার রাজ্য যায় রসাতলে। ১২
সন্ধ্যায় সময় যদি আসিয়া যোগায়,
প্রভাত হইলে কিন্তু পুনঃ ফিরি যায়,
এ হেন যে কাল মেঘ দেখিবে আকাশে,
তাহা হতে বারিধারা কভু নাহি আসে। ১৩
আপনার ছায়া মাপি যত পদ হবে,
যতনে তাহায়ে তুমি দ্বিগুণ করিবে,
অঙ্ক একাদশ তাহে করিয়া যোজন,
দশক-দ্বিশতে কর তা' দিয়া হরণ,
এইরূপে ভাগফল যতেক হইবে,
দিবসের দণ্ড-পল তাহাকে জানিবে। ১৪ *
যোগীর নাহিক জাতি বুধজনে ছল,
আকাশের নাহি স্তম্ভ স্বরগে চণ্ডাল। ১৫
নাহিক জগতে কিছু সত্য-পরিমাণ,
ভক্তির তুলনা নাহি কহে বুধজন,
নাহি কেহ হিতকারী পুত্রের সমান,
মানবের সত্যলাভ কঠিন সাধন। ১৬

ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতবর্ষই যে জ্ঞান ও সভ্যতার আদিভূমি তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই এবং এক সময়ে যে এই দেশ জ্ঞান এবং সভ্যতার উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছিল তাহাও সর্ববাদসম্মত। কিন্তু আজ জ্ঞান ও সভ্যতার লীলাক্ষেত্র সেই ভারতবর্ষ অধীনতার কিরূপ দুশ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে!

আর্য্যগণ শান্তভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং অতিশয় হীন জীবের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন না। তাঁহারা দর্শনাদি নানা বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং এই সকল বিদ্যালোচনার ফলেই তাঁহারা কাহারও অমঙ্গল ইচ্ছা করিতেন না; এবং স্বভাবতঃ ভাবিতেই পারিতেন না যে কেহ তাঁহাদেরও অমঙ্গল করিতে পারে।

এইরূপে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে করিতে একদিন অকস্মাৎ তাঁহারা ভারতে এক বৃহদ্ দস্যুবাহিনীর আবির্ভাব দেখিলেন। আর্য্যগণ সেই বাহিনী কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় পাইলেন না; তথাপি তাঁহাদের রণকৌশল-দর্শনে দস্যুনেতা 'বীর' সেকেন্দর বাদসাহ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধই আর্য্যগণের পরাধীন জীবনের সূচনা করিয়া দিল।

আর্য্যগণ রাজনৈতিক জ্ঞানকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেন নাই। ঐ জ্ঞানই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত, তবে তাঁহারা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা রাজনৈতিক-জ্ঞান-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়কেই অধিক সম্মান দিতেন; সাধু-ফকির অপেক্ষা নবাব-বাদসাহকে উচ্চ আসন প্রদান করিতেন। কিন্তু ইহা জানা কথা যে, এই দেশে প্রকৃত সাধুর সম্মান পৃথিবীপতি সম্রাট্ অপেক্ষাও সহস্রগুণে অধিক। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে আর্য্যগণ চিরকাল ধর্ম্মকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। এই ধর্ম্মের জন্য আবশ্যক হইলে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

হিংসা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য। প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে হইলে হিংসা ত্যাগ করা আবশ্যক। সুতরাং ভারত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য হিংসা ত্যাগ করিল। ইহারই ফলে ভারতবাসী যুদ্ধে নরহত্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই বাণী উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধকার্য্য এবং তৎসঙ্গে নরহত্যা প্রভৃতি হিংসামূলক কার্য্য অতি নিন্দনীয় পাপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। তৎকালীন ভারতের মতে যাহারা নরহত্যা করিত, তাহারা নীচমনা রাক্ষস নামে অভিহিত হইত। এই মত ঠিক হইলেও, যাহারা মিছামিছি নরহত্যা করে মনুষ্যনামধারী সেই পিশাচদিগকে বধ করিলে কোনও অন্যায় করা হয় না, এই সামঞ্জস্যমূলক মতের

---

* ছায়া যদি ১০ পদ পরিমাণ হয়, তবে তাহাকে ২ দিয়া গুণ করিলে ২০ হইবে এবং তাহাতে ১১ যোগ দিলে ৩১ হইবে। ৩১ দিয়া ২১০কে পূরণ বা ভাগ করিলে, ৬ দণ্ড ৩৪ পল হইবে। আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা ধরিয়া গণিলে দিবসের সময় (ঘণ্টা) জানিতে পারিবে।

সহিত যদি উহা গৃহীত হইত তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস নিশ্চয়ই আর এক আকার ধারণ করিত।

'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' কেবল এই মত সাগ্রহে পোষণ করিতে যাইয়াই আর্য্যগণ অস্ত্রশস্ত্রের বা সৈন্যাদির উন্নতিসাধনে মন দিলেন না। তাহার ফলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মকর্ম্মে মন রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন—

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥

তাঁহাদের স্বাধীনতা হারাইবার ইহাই সূক্ষ্ম ও মূলকারণ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যতদিন তাঁহারা সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন ততদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সামঞ্জস্যের মূলসূত্রটী নষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা স্বাধীনতা হারাইয়া বসিলেন।

কিন্তু ভারতের আর্য্যেরা যখন ধর্ম্মকর্ম্মকেই প্রাণের সহিত ধারণ করিলেন, তখন তাহারই আলোচনায় মন দিয়া সেই বিষয়েই এতদূর উন্নতি করিলেন যে, আজও সমগ্র জগৎ ভারতের ধর্ম্মের নিকটে মস্তক অবনত করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। ভারতই আজ সমগ্র ভূখণ্ডকে ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি দেখাইয়া জগদ্বাসীর প্রাণ শান্তির অভিমুখে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ভারত ধর্ম্মবিষয়ে প্রতীচ্য অপেক্ষা কত উচ্চে অবস্থিত! ভারতে ধর্ম্মের যেরূপ প্রকৃত আদর, প্রতীচ্যে তাহার শতাংশের একাংশও আছে কিনা সন্দেহ। ভারত তাহার সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের চরণে বিলাইয়া ফকির হইতে চায়, কিন্তু প্রতীচ্যে কয়জন ধর্ম্মের জন্য সংসারের মায়া ছাড়িয়াছে? ভারতে ধর্ম্মের মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—বৃহদ্ রাজ্যাধিপতি সম্রাটও কপর্দ্দকশূন্য প্রকৃত সাধুর চরণে মস্তক অবনত করেন; কিন্তু প্রতীচ্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা পার্থিব ধনসম্পত্তিরই আদর বেশী। সেখানে যাহার ধনসম্পত্তি আছে, 'পশুশক্তি' অধিক আছে, তাহারই আসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে স্থাপিত, কিন্তু ভারতে ধর্ম্মের আসনই সর্ব্বোপরি। এই দেশের ধর্ম্মভাব এত অধিক যে ইহার সকল কার্য্যই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। ধর্ম্মহীন কার্য্য ভারতবর্ষে অতি নিম্নস্থান অধিকার করে। ভারতের প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াই মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে, 'এইরূপ ধর্ম্মপ্রধান ভারতবর্ষও অধীন হইয়াছে!'

এই মোক্ষমূলার যে ইংরাজজাতির অন্যতর আদর্শ ও শিরোমণি, যে ইংরাজজাতি নিজের 'গাঁটের পয়সা' ব্যয় করিয়া ক্রীতদাসের উদ্ধারসাধন করিয়াছে, যাহারা সেই ক্রীতদাসদের জন্য লাইবিরিয়া নামক প্রদেশে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত করিয়াছে, যাহারা বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, সেই ইংরাজ আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে যে অধীন করিয়া রাখিয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? আমেরিকা বিগত মহাসমরে ইউরোপের স্বাধীনতারক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিল; আর স্বাধীনতাভক্ত ও স্বাধীনতারক্ষক ইংরাজ জাতি আজ শতসহস্র বৎসর ধরিয়া সভ্যতার মধ্যে পরিপুষ্ট ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত কেন, তাহা কে বলিবে?

ভাস্কর রায়।

(শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ)

(আষাঢ় সংখ্যার অনুবৃত্তি)

অধ্যয়নসমাপ্তি ও অধ্যাপনা।

গম্ভীর রায় পুত্রের অধ্যয়নসমাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং নৃসিংহযজ্বার আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং বহু ধন, বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিয়া পুত্রের দ্বারা নৃসিংহ গুরুর অর্চ্চনা করাইয়া পুত্রসহ নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ভাস্কর রায় বাড়ীতে আসিয়া নানাবিদ্যার অধ্যাপনাকার্য্যে নিরত হইলেন।

বীজাপুরাধিপতি সচিবপুত্র ভাস্করের নানাবিধ সদ্গুণ অলোকসাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন; এবং ভাস্কর তাঁহার রাজকার্য্য পরিচালনে সম্যক্ সমর্থ হইবেন বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কৃতার্থতা জ্ঞান করিলেন। এই সময়ে গম্ভীর রায় রাজাদেশে সপুত্রক সৈন্য ও উপযুক্ত যানবাহনাদিসহ প্রজাদিগের রীতি-নীতি অবগত হইবার জন্য মফঃস্বল ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তথায় প্রজাদিগের সহিত ভাস্করের রাজকার্য্যোচিত ব্যবহার ও বুদ্ধিকৌশল পর্য্যালোচনা করত গম্ভীর রায় ভাস্করের রাজকার্য্য পরিচালনাক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন।

সাধুদর্শন।

গম্ভীর রায় একদা পথিমধ্যে বিশ্রামাবসরে এক পরম শৈব সাধুর আশ্রম দেখিতে পাইয়া পুত্রের সহিত সাধুদর্শনে গমন করিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সাধুকে প্রণাম করত উপবেশনপূর্ব্বক নিজের ও পুত্রের পরিচয় প্রদান করিলেন। সাধু ভাস্করের দেহশোভা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গম্ভীর রায়কে বলিলেন—তোমার পুত্র সামান্য মানব নহে, ইনি মহাদেবের যষ্ঠ মূর্ত্তির [সূর্য্যের] সাক্ষাৎ অবতার। তুমি ইঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিও না; যবনের

দাসত্ব করা দেবাংশ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। ইঁহার দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইবে। ইনি ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় কু-মত ধ্বংস করিয়া সৎসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিবেন। তুমি ইঁহাকে দিগ্বিজয়ে পাঠাইয়া দেও। সিদ্ধপুরুষের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, ভাস্কর নিশ্চয়ই ভাস্করের অবতার, গম্ভীর রায় এই মনে করিয়া শীঘ্রই বীজাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দিগ্বিজয়।

গম্ভীর রায় বাড়ী আসিয়া পুত্রকে বলিলেন—যবনরাজসেবা অতি নীচকর্ম্ম, ইহা তোমার শোভা পায় না; তুমি দিগ্বিজয়ে গমন কর। পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল কু-মত বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, বহুকাল অতীত হওয়ায় অধুনা সেই সকল মত আবার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে; তুমি সেই সকলকে সমূলে উৎপাটিত কর। অশেষ-বিদ্যাবিৎ নৃসিংহ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া তুমিও তাঁহার তুল্য হইয়াছ; তোমাকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না।

ভাস্কর রায় পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বহুশিষ্য, প্রচুর ধন, যানবাহন ও পরিচারকবর্গসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমত প্রতিষ্ঠান-পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রাজা ও ব্রাহ্মণগণ ভাস্করের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রতিষ্ঠানপুরে বহুদিন যাবৎ ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ চলিতেছিল। উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাস্কর রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ভাস্কর রায় উভয় পক্ষের প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া তাহাদের পরস্পর সখ্যস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভাস্করকে ইষ্টদেবতারূপে মনে করিতে লাগিল। তত্রত্য রাজা ও বণিক্লোকদিগের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তথায় কয়েক মাস অবস্থান করিলেন।

তত্রত্য রাজসভায় সদ্গুরুকৃতদীক্ষ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা এক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—পূর্ব্বে কোন পণ্ডিত আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানপুরের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই; এই ভাস্কর রায় আসিয়া ইঁহাদিগকে বিদ্যাযুদ্ধে অনায়াসে পরাজিত করিয়াছেন; অতএব ইনি সাধারণ পুরুষ নহেন। ইনি কোন সদ্গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া অথবা দেবতার প্রসাদে নিজেই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; নতুবা এইরূপ শক্তিলাভ করিবেন কিরূপে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্ম্মচারী একদিন প্রণিধানপূর্ব্বক ভাস্করকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ইনি মন্ত্রসিদ্ধ নহেন, পরন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই ইঁহার অভিজ্ঞতা নাই; কেবল বিদ্যাগুরুর প্রসাদে এইরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মচারী কোন সময়ে নির্জ্জনে ভাস্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—মহাশয় আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়া কেবল তন্ত্রশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সৌভাগ্যচিহ্নবিহীনা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন না। শীঘ্র তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপনার এই অভাব পূর্ণ করা উচিত। ভাস্কর এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে আত্মাকে ধিক্কার দিলেন,—আমার গুরু নৃসিংহ যজ্বা সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত; তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান। উপাসনার মূলীভূত তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন না করিয়া আমি কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি, আমাকে ধিক্। দেবতা মন্ত্রময়; মন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত না হইলে মন্ত্রসাধনার অন্য উপায় নাই। মন্ত্রসাধনা ব্যতিরেকে দেবতাপ্রসাদলাভেরও সম্ভাবনা নাই। দেবতাপ্রসাদলাভে বঞ্চিত থাকিলে আমার এই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতাই বৃথা। আমি নৃসিংহ গুরুকে অবহেলায় অতিক্রম করিয়াছি; এখন এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রগুরু কোথায় পাইব। ভাস্কর এইরূপ চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সেই কর্ম্মচারীকেই প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনিই আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন। তখন কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, আপনাকে মন্ত্র প্রদান করিবার অধিকার আমার নাই। আপনি সুরতনগরে (বর্ত্তমান সুরাট্নগরে) প্রকাশানন্দ গুরুর নিকট গমন করুন। তিনিই আপনার উপযুক্ত মন্ত্রগুরু।

ভাস্করের দীক্ষাগুরু প্রকাশানন্দ বা শিবদত্ত শুক্ল।

এখানে প্রকাশানন্দ গুরুর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গুরুপরম্পরাচরিত্রেই প্রকাশানন্দ গুরুর এইরূপ পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়।

গুর্জ্জর দেশে (গুজরাট) সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুরতনগরে (সুরাটে) মহাদেব নামক একজন শুদ্ধাচার অতি-নিঃস্পৃহ শিবভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গঙ্গা-নাম্নী তাঁহার পত্নীও পতির অনুরূপা ছিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্রকামনায় সৌরাষ্ট্রদেশস্থ সোমেশ্বর [সোমনাথ] মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন, তাঁহার নাম শিবদত্ত। মহাদেব অতি শুক্ল অর্থাৎ পবিত্রস্বভাব ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে শুক্ল বলিত; এইজন্য তাঁহাদের কৌলিক উপাধি শুক্ল হয়। শিবদত্তও শিবদত্ত শুক্ল, নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মহাদেব পুত্রকে পঞ্চমবর্ষ বয়সে উপনয়ন দিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন। শিবদত্ত অল্পদিনের মধ্যেই বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। দ্বাদশবর্ষ

বয়সে শিবদত্তের বিবাহ সম্পন্ন হইল। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি নিজগৃহে বহু শিষ্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। শিবদত্তের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

একদা আনন্দানন্দনাথ নামক এক সিদ্ধপুরুষ দ্বারকাপুরী দর্শনাভিলাষে গমন করিয়া সুরত নগরে শিবদত্তের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। শিবদত্ত সিদ্ধপুরুষকে গুরুর উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত প্রকাশানন্দ নাম ধারণ করিলেন। সিদ্ধপুরুষ শিবদত্তকে উপযুক্ত অধিকারী মনে করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানযোগসহ দেবারাধনার গূঢ় রহস্য উপদেশ দিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। শিবদত্ত গুরুর উপদেশ অনুসারে জগদম্বার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। দেবীর প্রসাদে বহু রাজা ধনী ও পণ্ডিতগণ শিবদত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং তাঁহার গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইল।

ভাস্করের গুরুগৃহে বাস।

অনন্তর ভাস্কর রায় কর্ম্মচারীর বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া শিষ্য ও অনুচরবর্গ এবং যানবাহন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানপুরে রাখিয়া তাহাদিগকে ছয়মাস ব্যয়ের উপযোগী অর্থ প্রদান করত পরিধেয় বস্ত্রমাত্র সম্বল করিয়া একাকী মলিনবেশে পদব্রজে সুরাটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করত শিবদত্ত গুরুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—তদীয় ধনজনসমৃদ্ধ গৃহে বেদবেদান্তাদি-অশেষশাস্ত্রবিৎ শিষ্যগণ তন্ত্রশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত আছে। শিবদত্ত যাগগৃহে অন্তর্যাগানন্তর জপকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই সময়ে ভাস্কর তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব ভাস্করের মলিনবেশ ও তেজস্বিতাব্যঞ্জক অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া "কোন মহাপুরুষ বিপন্ন হইয়া আমার এখানে উপস্থিত হইয়াছেন" এইরূপ মনে করিয়া ইঙ্গিতদ্বারা স্বগৃহে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ভাস্কর তদীয় অনুমতি লাভ করিয়া ভৃত্যের ন্যায় সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ঘরধোয়া, বাসনমাজা, কাপড়কাচা প্রভৃতি ভৃত্যোচিত কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন; গুরুর নিকটে প্রায়ই গমন করেন না; এবং নিজে যে লেখাপড়া জানেন, ইহা কাহাকেও জানিতে দেন না। শিবদত্তের বুদ্ধিমতী কন্যা ভাস্করের দেহকান্তি দর্শনে ইহাকে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; পরে ইহাঁর প্রতিকার্য্যে নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং পিতাকে বলেন—পিতঃ, ইনি সাধারণ মানুষ নহেন, ইহাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, কোন মহাপুরুষ ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়া এই সকল ভৃত্যজনোচিত নীচকার্য্য করিতেছেন। শিবদত্ত কন্যার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলেও অধ্যাপনা ও উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় অথচ ভাস্করও প্রায়ই তাঁহা হইতে দূরে দূরে থাকেন বলিয়া ভাস্করের সহিত আলাপের সুযোগ পাইলেন না।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগের সহিত ভাস্করের বিচার।

এই সময়ে দিল্লীশ্বরের আশ্রিত কয়েকজন পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের আজ্ঞা ছিল যে এই সকল পণ্ডিত যেখানে যাইবেন, তথাকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ অগ্রগমন করিয়া ইহাঁদের সম্বর্দ্ধনা করিবেন। তদনুসারে তাঁহারা সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতগণ সুরাটে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজা পণ্ডিতগণকে অগ্রগমন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শিবদত্ত গুরুকে অনুরোধ করিলেন। শিবদত্ত পণ্ডিত সম্বর্দ্ধনায় সময়াতিপাত হেতু আহ্নিক কর্ম্মের সঙ্কোচ করিতে হয় বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজার অনুরোধে বাধ্য হইয়া পণ্ডিতগণের প্রত্যুদ্গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তদ্দর্শনে ভাস্কর বলিলেন—পণ্ডিতসম্বর্দ্ধনার জন্য আপনার আহ্নিক কর্ম্মের সঙ্কোচ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি প্রত্যুদ্গমন না করিলেও পণ্ডিতগণ অবশ্যই আপনার নিকট আসিবেন; আপনার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও অশেষবিদ্যাবিৎ শিষ্যগণ বর্ত্তমান থাকিতে পণ্ডিতগণের নিকট ভয়ের কারণ নাই। শিবদত্তের কন্যাও ভাস্করবাক্যের অনুমোদন করাতে তিনি প্রত্যুদ্গমনে বিরত থাকিলেন। কেবল রাজাই পণ্ডিতগণকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া উত্তম বাসস্থান ও নানাবিধ ভক্ষ্য-পেয়াদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শিবদত্ত গুরু অগ্রগমন না করাতে পণ্ডিতগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আহারান্তে সদন্তে শিবদত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতগণ সংখ্যায় চারিজন ছিলেন; তাঁহাদের প্রথম শব্দশাস্ত্রের বিচারে, দ্বিতীয় শব্দ ও ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে, এবং তৃতীয় শব্দ ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের বিচারে শিবদত্তের নিকট পরাজিত হইলেন। চতুর্থ শব্দ ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের বিচারে পরাজিত হইয়া বেদান্তের পূর্ব্বপক্ষ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্ম সত্য স্বপ্রকাশ নির্ম্মল অনন্ত অবিনাশী ভেদরহিত অদ্বৈত এবং আনন্দস্বরূপ; বিশ্ব অসৎ পরপ্রকাশ্য দোষযুক্ত সান্ত বিনাশশীল ভেদযুক্ত বহু এবং সুখহীন। ঈদৃশ বিশ্ব তদ্রূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অবস্থিত আছে? এই উভয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে এই দোষ হয় যে—সূর্য্য ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্রহ্ম ও বিশ্বের

একত্র অবস্থিতি হইতে পারে না, অতএব বিশ্বের ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি বল বিশ্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অবস্থিত আছে, অন্য কাহারও আশ্রয়ে নহে; এই পক্ষে দোষ এই,—জড় বিশ্ব যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে তবে চেতন মানুষের প্রবর্ত্তনা ভিন্ন জড় শকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গমন করে না কেন? যদি বল সত্বাদি গুণত্রয়ই বিশ্বের প্রবর্ত্তক, ইহাও হইতে পারে না; যেহেতু সত্বাদি গুণত্রয় মায়াকল্পিত, পরন্তু মায়াই মিথ্যা। এখন তুমি এই সংশয়ের পরিহার কর, নতুবা আমাদিগকে জয়পত্র লিখিয়া দেও।

শিবদত্ত ইহার উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া জয়পত্রদানে উদ্যত হইলেন। ভাস্কর পূজার বাসন মাজিতে মাজিতে ইহাদের বিচার শুনিতেছিলেন। এখন গুরুর উত্তরদানে অসমর্থতা বুঝিতে পারিয়া গুরুর অপমানে অসহিষ্ণু ভাস্কর ভিজা ও কাদামাথা হাতেই গুরুকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন—আপনি দেহাত্মবুদ্ধি, আমার গুরু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন; এই অবস্থায় আপনাদের যথার্থ শাস্ত্রবিচার সম্ভব হইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রবিচারে উভয়ের তুল্যতার প্রয়োজন। আমি একজন দেহাত্মবুদ্ধি, আমার সহিতই আপনার বিচার উপযুক্ত হইবে। আমি আপনার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছি। প্রথম পক্ষের উত্তর এই—সূর্য্য ও অন্ধকার পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের একত্রাবস্থিতি সম্ভব না হইলেও বিশ্ব ও ব্রহ্ম বিবর্ত্তাধিষ্ঠান দ্বারা একত্র থাকিতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর এই—ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্", সত্বাদিগুণ এবং মায়া ইহারা মিথ্যা কল্পিত মাত্র। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জীবের আত্মজ্ঞান থাকে না; তদবস্থায় যে সকল স্বপ্নব্যাপার হইয়া থাকে তাহা জীবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; তখন আত্মবিস্মৃত জীব তাহার সাক্ষীমাত্র থাকিয়া সেই সকল স্বপ্নব্যাপারকে সত্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে সেই স্বপ্নব্যাপারের সত্যজ্ঞান থাকে না, মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ অজ্ঞ জীব এই মিথ্যাভূত জগতকে সত্যজ্ঞান করে; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর এই সত্যতাজ্ঞান থাকে না; তখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, মিথ্যা জগৎ ইহাতেই বিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারে। যেমন মিথ্যা স্বপ্ন পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ এই মিথ্যা জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত হইতেছে। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত পশুগণ মরীচিকাকে প্রকৃত জলপ্রবাহ মনে করিয়া জলের আশায় তাহার দিকে ধাবমান হয়, আর জ্ঞানী মনুষ্যগণ মরীচিকা মিথ্যা বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে; সেইরূপ আত্মজ্ঞানহীন জীব সংসারকে সুখের আশ্রয় মনে করিয়া তাহাতে জড়িত হয়, আর আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ জীব তাহাকে মিথ্যা মনে করিয়া দূরে থাকে। আপনি বিদ্বান্, আপনিই বলিতেছেন জগৎ মিথ্যা, অথচ প্রশ্ন করিতেছেন—এই জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে কি না। বন্ধ্যাপুত্র গৃহে আছে কি না, এই প্রশ্নের ন্যায় আপনার প্রশ্নই নিতান্ত অলীক। পণ্ডিত ভাস্করবাক্যে পরাজিত হইয়া বন্ধুগণের সহিত আবাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর গুরুদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইয়া আমার গৃহে নীচকার্য্যে লিপ্ত আছ কেন? ভাস্কর কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন—গুরুদেব আমি আপনার নিকট মহামন্ত্রের প্রার্থী; আপনি কৃপা করিয়া মহামন্ত্র প্রদান করিলে আমি কৃতার্থ হইব। শিবদত্ত বলিলেন—তুমি বেদবেদাঙ্গবিৎ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মত আর্য্যকে কে মহামন্ত্র প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। আমি অবশ্যই তোমাকে মন্ত্র দিব। পরদিন ভাস্কর গুরুকে বলিলেন—আমি পণ্ডিতদিগের আবাসস্থানে গমন করিব। ইহারা নিতান্ত কুটিল; শাস্ত্রবিচারে পরাজিত হইয়াছে, এখন অনন্যোপায় হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোন কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারে। শিবদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া ভাস্করকে উত্তম বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া শিষ্যবর্গের সহিত পণ্ডিতভবনে প্রেরণ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতভবনে উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। ভাস্কর ইহাঁদের মধ্যে প্রধান পণ্ডিতকে দেখিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত বাসভবনের মধ্যে একটি সুরম্য স্থান দেখিতে পাইয়া বলিলেন—এই স্থানটীতো বড় সুন্দর, ইহা দেখিতে হইবে। এই কথা বলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন,—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তথায় ঘটস্থাপন করিয়া বাদিমুখস্তম্ভনের জন্য কালামুখী প্রয়োগে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার বিরুদ্ধেই এইরূপ অবিচার করা হইতেছে, ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিনি আছাড় খাইবার ছলে ঘটের উপর পড়িয়া গেলেন; তাঁহার শরীরের আঘাতে ঘট চূর্ণ হইয়া গেল; তিনিও মূর্চ্ছার ভান করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অভিচারক্রিয়া ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই। সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিত ভাস্করকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুশ্রূষায় ভাস্করের কৃত্রিম মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি নিতান্ত লজ্জিতভাবে বলিলেন—আমি পিত্তাধিক্যবশতঃ হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম; কোন দৈবানুষ্ঠান হইতে-

ছিল, তাহারই মধ্যস্থলে যেন পতিত হইয়াছিলাম; হয়ত ইহাতে দৈবানুষ্ঠান ব্যাহত হইয়াছে। ইহাতে আমাকে নিতান্ত অপরাধী মনে করিয়া আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। পণ্ডিতগণ বলিলেন—আপনিত আর ইচ্ছা করিয়া পড়িয়া যান নাই, দৈববিপাকে এইরূপ হইয়াছে; এইজন্য আপনার কোন অপরাধ হয় নাই। আমরা শাস্ত্রবিচারে সকল দেশ জয় করিয়া জয়পত্র লইয়া আসিয়াছি; কেবল আপনার নিকট আমরা পরাজিত হইলাম। আপনার মত পণ্ডিত আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাকে আমরা দিতে অভিলাষী হইয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি প্রার্থনা করিলে কৃতার্থ হইব। আমাদের নিকট যাহা আছে তাহার মধ্যেই কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন, যাহা নাই তাহা কিরূপে দিতে পারিব। ভাস্কর উত্তর করিলেন—আপনাদের নিকট যে সকল দ্রব্য আছে তাহার মধ্যে পুস্তকগুলি আপনাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা প্রার্থনা করা যায় না। ধন, যান, বাহন, বস্ত্র, রন্ধন-ভাণ্ড প্রভৃতি প্রবাসে নিতান্ত উপযোগী, এইজন্য এইগুলিও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে। আপনাদের নিকট আর কি দ্রব্য আছে যাহা চাহিতে পারি। তবে আপনাদের নিকট এমন কোন দ্রব্য আছে, যাহা আপনাদের উপযোগী নহে; তাহা চাহিলে দিবেন কি? পণ্ডিতগণ বলিলেন—আমরা যখন প্রতিশ্রুত দিয়াছি, তখন যাহা চাহিবেন তাহাই দিব। ভাস্কর বলিলেন—আপনারা সমস্ত দেশ জয় করিয়া যে সকল জয়পত্র আনিয়াছেন, সেইগুলি আপনাদের উপযোগী নহে; আমি তাহাই প্রার্থনা করিতেছি। পণ্ডিতগণের মুখ শুকাইয়া গেল; ভাস্কর জয়পত্রগুলি চাহিবেন ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনেন নাই। প্রতিশ্রুতিভঙ্গভীরু পণ্ডিতগণ অনন্যোপায় হইয়া জয়পত্রগুলি ভাস্করকে প্রদান করিয়া সুরাট পরিত্যাগ করিলেন। ভাস্কর জয়পত্রগুলি আনিয়া গুরুর চরণে অর্পণ করতঃ বলিলেন—গুরুদেব, আমি আপনার ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া আসিলাম; এই জয়পত্রগুলি যে সকল পণ্ডিত দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দক্ষিণার সহিত ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে। শিবদত্ত অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সদক্ষিণ জয়পত্রসমূহ তত্তৎপণ্ডিতদিগকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

দীক্ষাগ্রহণ।

অনন্তর শিবদত্ত ভাস্করকে বলিলেন—তুমি এখন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও। দীক্ষার ব্যয়ের জন্য সঙ্কুচিত হইও না। আমরা যশকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বলিয়া মনে করি; ধন তুচ্ছ পদার্থ। তুমি আমার যশ রক্ষা করিয়াছ; অতএব আমার গৃহে যে সকল ধন এবং দ্রব্যাদি আছে, তুমি তাহা সকলই নিজের মনে করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পার। ভাস্কর গুরুবাক্যের কোন উত্তর না করিয়া গুরুর শিষ্যবর্গের সহিত ভ্রমণার্থ নগরে বহির্গত হইলেন। নগরবাসিগণ প্রিয়দর্শন ভাস্করকে দর্শন করিয়া শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল—এই দেবতুল্য মহাপুরুষ কে, ইহাঁকে ত আর পূর্ব্বে দেখি নাই? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় আছেন? এখানে আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি? শিষ্যগণ বলিলেন—ইনি একজন অশেষবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত; আমাদের গুরুদেবের সেবা করিবার জন্য কর্ণাটদেশ * হইতে এখানে আসিয়াছেন। দিল্লী হইতে যে সকল পণ্ডিত শাস্ত্রবিচারে গুরুদেবকে পরাজিত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইনিই বিচারে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত জয়পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এইজন্য অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকগণ সন্তুষ্টচিত্তে বলিল—এই মহাপুরুষকে অর্থপ্রদানে কে পরাঙ্মুখ হইবে? আমরা সকলে মিলিয়া ইহাঁর আবশ্যকীয় সমস্ত অর্থ প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া তাহারা শিষ্যবর্গ ও ভাস্করের সহিত শিবদত্ত গুরুর নিকট গমন করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত দীক্ষার আবশ্যকীয় দ্রব্যনিচয়ের তালিকা করিয়া বিনা যাচ্ঞাতেই তত্তদ্ দ্রব্য ও অর্থ প্রদান করিল।

প্রচার-বিবরণ।

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ ১৩২৯।

বৈশাখ মাসে:—

বিক্রমপুরের মধ্যে ভরাকর গ্রামে "অমৃত-নিকেতন" নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা করি। সেই গ্রামের

* আধুনিক বীজাপুর প্রাচীন কর্ণাটের অন্তর্গত।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ও সেই গ্রামে নানাভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। একটী প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত রায় মহাশয় বাত-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন, প্রতি সপ্তাহে, একদিন করিয়া তাঁহার গৃহে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছি। নড়াইল ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীযুত শশীভূষণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে নানাভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছি। তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। কলমা গ্রামনিবাসী জমিদার অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুত অরাকান্ত দাস চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ হইত; তিনি বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইলে দেশময় নব্য শিক্ষিত দল একেবারে খৃষ্টান হইয়া যাইত। ধুবড়ীর উকিল শ্রীযুত উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ভগবৎবিশ্বাস বিষয়ে জীবনগত সাক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক আলাপ করিয়া উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে:—

পুনায় আসিয়া বিশ্বাসী বন্ধুদিগের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনাদি করিয়াছি। শ্রীমান্ জদিরঞ্জন দাসের পত্নী বিয়োগে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করিয়াছি। প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছি। একদিন শ্রীমান শিশিরকুমার সেনের গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তিনি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আষাঢ় মাসে:—

বেনারস ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়াছি। লেডী ডাক্তার মিস্ সেনের গৃহে একদিন উপাসনা করি। অন্যান্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী হিন্দু পুরুষ ও মহিলাদিগের সঙ্গে আলোচনা ও প্রসঙ্গে হয়। বেনারসে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু উৎসাহ অভাবে কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়। বেনারসে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই এক একটী সমাজ ও মন্দির আছে, কেবল ব্রাহ্মদিগের নাই। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। একটী ভদ্রলোক নাকি একখানি বাড়ী দিয়াছিলেন; উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ নাকি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। তারপর সে টাকা কোথায় আছে তাহা জানিতে পারি নাই।

শ্রাবণ মাসে:—

কিছু দিন বেনারসে কাজ করি; পরে লক্ষ্ণৌ আসি। সেখানে ব্যারিষ্টার এ, পি, সেন মহাশয়ের গৃহে রবিবারে উপাসনা করি; সন্ধ্যায় অযোধ্যা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি। একদিন শ্রীযুত প্রেমানন্দ রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা করা হয়, পরে দেরাদুন চলিয়া আসি। সেখানে শ্রীযুত মুকুন্দ বাবুর গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনা করি। পাঞ্জাব হইতে লালা রঘুনাথ সহায় একদিন উপাসনা করেন; আমি উপদেশ দেই ও প্রার্থনা করি। আজ কয়েকদিন হরিদ্বারে আসিয়াছি; ধর্ম্মশালায় নিয়মিত উপাসনা করিতেছি। একজন শিখধর্ম্মবিশ্বাসীর সঙ্গে অনেক আলাপ হয়। একদিন বদরিকা আশ্রমের এক পাণ্ডার সঙ্গেও আলাপ হয়। আর একদিন জোয়ালাপুর কন্যা-পাঠশালা পরিদর্শন করি, ইতি।

প্রচারক—শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত।

গ্রন্থ-পরিচয়।

পুষ্পাধার। রচয়িত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস চৌধুরী। ৩২নং বিডন রো, কলিকাতা। ৬৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থ একখানি কবিতা পুস্তক। সুখের বিষয়, ইহা নামের নেশায় জোড়াতাড়া দিয়া বাহির করা কবিতার সংগ্রহ নয়। সহজ মনের স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা আপনার আনন্দে আপনি ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কাহারও অপেক্ষা রাখে নাই। তাহার উপর একটী স্নেহবিজড়িত সকরুণ শোকস্মৃতির সহিত অনুরঞ্জিত হওয়ায় ইহার ভিতর দিয়া একটী পবিত্রতার নির্ম্মল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কবি এই পুষ্পাধারকে সাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার অন্তরের পবিত্রভাবের স্পর্শে সকলকেই অনুপ্রাণিত করিবেন নিঃসন্দেহ। ইহার ভিতর হইতে পাঠকেরা দেবপূজার উপযুক্ত নির্ম্মাল্যের সুগন্ধ লাভ করিবেন। পুস্তকের বহিঃসৌন্দর্য্যও অন্তঃসৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ হইয়াছে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অতি উত্তম।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী। লেখক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর। প্রকাশক শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা। কলিকাতা ৪নং উইলিয়ম্স্ লেন, দাস-যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য।০ চারি আনা।

লেখক এই পুস্তিকাখানিতে নানাবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর বর্ত্তমানের হিন্দুয়ানী—ইহাদের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এ কথা সকলে না বুঝিলেও অনেকেই যে বুঝেন, ইহা নিঃসন্দেহ; তবে নানাকারণে কেহ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সাহসী হন না। লেখককে এবিষয়ে অগ্রণী দেখিয়া তাঁহার এই সৎসাহসের প্রশংসা করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, গৃহ্যসূত্রোক্ত বৈদিক সংস্কারকর্ম্মগুলি অশিক্ষিত পুরোহিতের দ্বারা বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইতে

দেখিয়া দুঃখও হয় হাসিও পায়। যাহা হউক লেখকের সহিত সর্ব্বাংশে আমাদের মতের মিল না থাকিলেও, স্থানে স্থানে কিছু কিছু অতিশয়োক্তি-দোষ ঘটিলেও, তাঁহার অনেকগুলি স্পষ্ট ও সত্য কথায় আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক হিন্দুকেই একবার পড়িয়া দেখিতে বলি।

আচার-তত্ত্ব। লেখক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর। কাশীধাম "ত্রিশূল-মুদ্রাযন্ত্রে" শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ; মূল্য পাঁচ আনা।

লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে আচার, পরিধান ও বাসপ্রণালী সম্বন্ধে এদেশী ও বিদেশী আচার-ব্যবহারের তুলনায় দোষ-গুণ উল্লেখ করিয়া এদেশের পক্ষে কোন্ আচার-ব্যবহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল তাহা নানা যুক্তিতর্ক, দৃষ্টান্ত ও মনীষীমত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। মোটের উপর লেখকের মতের সহিত আমাদের মতের বিশেষ কোন অমিল নাই। এখানি আচর-তত্ত্বের প্রথম খণ্ড। প্রকাশক জানাইয়াছেন, শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইবে। আমরা সেই দুইখণ্ড পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

প্রথম-পাঠ্যপুস্তক। লেখক ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ হেডমাষ্টার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। প্রকাশক শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল. ১২নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা মাত্র।

ইহা শিশুদের একখানি নবতম "বর্ণপরিচয়"। 'সনাতন' গতানুগতিকতার হাত এড়াইয়া লেখক নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে এই পুস্তিকাখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা যে সর্ব্বত্র সফল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে শিশুদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার এই শেষ বয়সের নূতন পথনির্দ্দেশের উদ্যমকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমরা এই নূতন পথে অন্য যোগ্যতর ব্যক্তিকে অগ্রসর দেখিতে চাই।

কমার্সিয়াল এড্‌ভার্টাইজার।—আজ কয়েক সপ্তাহ হইল ব্যবসায়বিষয়ক এই ইংরাজি সাপ্তাহিকখানি আমরা পাইতেছি। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্য শ্রমশিল্প প্রভৃতি বিষয়সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় তথ্য বাহির হয়। তদ্ভিন্ন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শ্রমশিল্পে উৎসাহদানই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। পত্রিকাখানি ১২৮নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানা হইতে বাহির হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা।

সংবাদ।

শারদাশ্রম সংস্কৃত কন্যাবিদ্যালয়।—জোয়ালাপুর হইতে হরিদ্বারের পথে "শারদাশ্রম" নামে একটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুবালিকারা ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষার ফলে যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের ভাব ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদের ভাবী গার্হস্থ্যজীবন ও ধর্ম্মজীবনকে মধুময় করিয়া তুলে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। "বিধবাশিল্পালয়" ও "ধর্ম্মশালা" নামে এই আশ্রমের আরও দুইটী অঙ্গ আছে। মোটের উপর নারীজাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য এই আশ্রম আপনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যাঁহারা এই আশ্রমের কার্য্যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা ইচ্ছামত অন্নবস্ত্র অথবা পুস্তকপ্রভৃতি দ্বারা যে কোন উপায়ে ইহার সহায়তা করিতে পারেন। এই আশ্রমের অধিকারিণী সেবিকার নাম শ্রীমতী নারায়ণী দেবী।

কারামুক্তি।—স্বাধীনতার জয়ঘোষণায় জন্য অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের ফলে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আজ কয়েক দিন হইল মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে আমাদের নতমস্তকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত রাজনীতির কোন যোগ না থাকিলেও আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজই এদেশে সকল জাতির মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আংশিক সংগ্রামেও যাঁহারা অগ্রসর, চিরদিনই তাঁহারা আমাদের নমস্য।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

উপনয়ন। বিগত ১০ই শ্রাবণ বুধবার ৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেনস্থ ক্ষিতীন্দ্রনাথভবনে পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিধিনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান আনন্দময় মুখোপাধ্যায়ের শুভ-উপনয়নকার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বর-বাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে

সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা-কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপনয়ন। বিগত ২৭ শে শ্রাবণ শনিবার বালিগঞ্জ ঝাউতলারোডনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র শ্রীমান অরুণনাথ ও শ্রীমান হেমাদনাথের শুভ উপনয়ন কার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচারীদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান এই বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের পথে বিধৃত রাখুন।

বিবাহ। বিগত ১৭ই শ্রাবণ বুধবার ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে মহর্ষিদেবেন্দ্রনাথ-ভবনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী গার্গী দেবীর সহিত পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিধিনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান আনন্দময় মুখোপাধ্যায়ের শুভ-বিবাহকার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে দম্পতীকে উপাসনান্তে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বিভিন্ন সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুগায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুরকণ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সময়োচিত পবিত্র সঙ্গীতে সভাকে পবিত্রতাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভগবান এই নব দম্পতীকে নিত্য প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বিবাহ। বিগত ২৭ শে শ্রাবণ শনিবার বালিগঞ্জ ষ্টেসন-রোডনিবাসী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মেধানাথের সহিত হুগলিঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর শুভ-পরিণয়কার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবান এই নব দম্পতিকে প্রেম ও সৌভাগ্যের পথে অগ্রসর করুন।

শোক-সংবাদ।

কবি ৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক প্রসিদ্ধ গদ্য প্রবন্ধলেখক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র বাংলার প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ বিগত ১০ই আষাঢ় শনিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চল্লিশের অধিক হয় নাই। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তিনি মাতৃভাষার একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও শব্দ-সম্পদের দ্বারা তিনি আজীবন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের গভীরতায় ও ছন্দনৈপুণ্যে তাঁহার কবিতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। ছন্দবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল এবং এই প্রতিভাবলে তিনি বাংলা ভাষায় অনেক রকম নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। কবিতার অনুবাদবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না—তাঁহার অনুবাদগুলি মৌলিক রচনার ন্যায় মনে হইত। তাঁহার তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা প্রভৃতি গ্রন্থ চিরদিন বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিবে। মানুষ হিসাবে তিনি স্বল্পভাষী সংযমী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কোনরূপ অন্যায় বা অসুন্দর তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার মত উদ্বোধনের সঙ্গীত আর কে শুনাইতে পারিবে? আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি। তাঁহার এই অসমাপ্ত জীবনের পিপাসা যেন ভগবানের অমৃতময় স্পর্শে চিরতৃপ্তি লাভ করে।
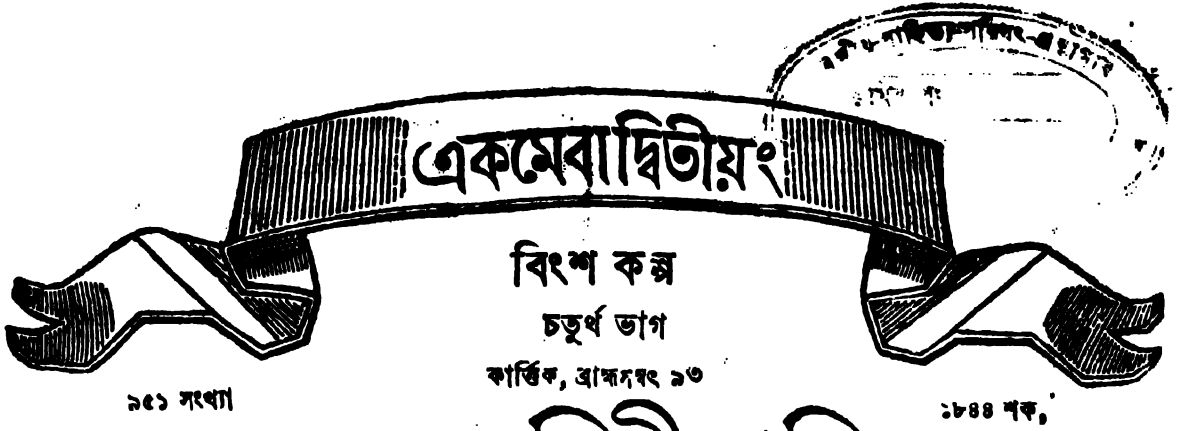
বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩

৯৫১ সংখ্যা ১৮৪৪ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺ রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকল্পে।

[গত ১লা আশ্বিন ৺ রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভায় শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত]

আমি আজ দিন তিনেক হইল বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে সংবাদপত্রের ও চিঠিপত্রের একটী স্তূপ সম্মুখে থাকিয়া আমাকে প্রতিক্ষণেই বিভীষিকা দেখাইতেছে। আমিও "শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং" এই মন্ত্র অন্তরে জপ করিতে করিতে সেই স্তূপাকার চিঠিপত্র ও সংবাদপত্র দেখিয়া দেখিয়া বিভীষিকার মূল নষ্ট করিতে যত্নবান ছিলাম। এমন সময়ে কাল প্রাতে সহসা এই সভায় রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মৃত্যু পর্য্যন্ত আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন এবং আমি আদিসমাজের বর্ত্তমানে অন্যতর কর্ম্মচারী। কাজেই তাঁহার স্মৃতিসভায় যদি আমি উপস্থিত না হই, এবং উপস্থিত থাকিয়া যদি তাহার সম্বন্ধে দুচারিটী কথাও না বলি, তবে তাহা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ এবং অত্যন্ত অসঙ্গত। তাই আজ তাঁহার স্মৃতিসভায় দুই চারিটী কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইলাম—আমার অক্ষমতা প্রকাশ পাইলে আশা করি আপনারা ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

রাজনারায়ণ বসু মহোদয়কে রাজনারায়ণ বসু বলিয়াই উল্লেখ করিলাম বলিয়া আশা করি আমি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না। তিনি আমাদের খুবই নিকট ও প্রিয় বলিয়াই যে নামে তিনি জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই নামেই আমরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে খুব নিকট ও প্রিয়বন্ধুভাবে উপলব্ধি করিতে চাহি। তাঁহাকে রাজনারায়ণ বোস বলিয়া উল্লেখ করিবার অধিকার তিনি নিজেও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ শেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একখানি নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রণয়নে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। আমি বাল্যকাল হইতেই বাপ-খুড়া-জ্যেঠা প্রভৃতি সকলের নিকট শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আমরা বারাণ্ডায় স্কুলের পাঠ পড়িতাম, আর কালেভদ্রে দেখিতাম যে একটী সবল বৃদ্ধ যুবক আসিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব, জ্যেঠামহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথন চালাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে সকলের মধ্য হইতে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, দেখিতাম যে তিনি আবার অন্তঃপুরে গিয়া বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের সঙ্গে আহারে বসিতেন এবং

মা, পিসি প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন লাভ করিতেন। আমরা দেখিতাম যে আমাদের বাড়ীর কোন মেয়ে বা বধূ, কেহই সেই লম্বিতপলিতশ্মশ্রু সদা-হাসিমুখ বৃদ্ধ-যুবকের নিকট লজ্জাবোধ তো দূরের কথা, এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। সেকালে বাহিরের লোকের সম্মুখে আমাদের বাড়ীতেও এরূপ একটা নিঃসঙ্কোচের ভাব একটু অসাধারণ ছিল। কাজেই আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হইয়া উঠিল। তখন শুনিলাম যে ইনিই সেই রাজনারায়ণ বসু। সেই অবধি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে যখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যুক্ত হইলাম, তখন সেই অছিলায় পূজ্যপাদ পিতামহদেবের নিকট হইতে তাঁহার দেওঘরের আস্তানায় যাইবার অনুমতি চাহিলাম এবং লাভ করিলাম। অনুমতি লাভ করিয়াই তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন যে, "তোমাকে পাণ্ডারা বড় বিরক্ত করিবে—যদি করে, তবে বলিবে যে রাজনারায়ণ বোস আমার পাণ্ডা, তাহলেই আর কেহ তোমাকে বিরক্ত করিবে না"। এই যাদুমন্ত্রের ফল তো প্রত্যক্ষ করিলামই এবং সেই অবধি বুঝিলাম যে, রাজনারায়ণ বসু মহোদয় প্রভৃতি অপেক্ষা "রাজনারায়ণ বোস"ই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় মন্ত্র।

আমি তাঁহার সদা হাসিমুখের উল্লেখ করিলাম। কেবল হাসিমুখ নহে, তাঁহার মুখের সেই প্রাণখোলা মনভোলা হাসি একবার যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন যে, যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিবে না। আমরাও বোধ হয় নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যাহার মুখে হাসি নাই, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। ইহা যদি সত্য হয়, যদি আমরা হাসিকে সরলতার, বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ততার মাপকাঠি বলিয়া ধরিতে পারি, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, আজকালকার দিনে সেরূপ সরলতার আধার মানুষ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, ইঁহারা দুইজনে যখন মুক্তভাবে হাসিতেন, সেই হাসির ভিতর দিয়া আমরা যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতাম এবং যে স্বর্গীয় সরলতার প্রতিচ্ছায়া হৃদয়ে অনুভব করিতাম, তাহার তুলনা সত্যই আজকালকার দিনে দেখিতে পাই না। আমরাও হাসি, কিন্তু সে হাসির মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির একটা চাপা ভাব অনুক্ষণ জাগিয়া থাকে—আত্মবিস্মৃতির একটা মুক্ত উদারভাব থাকে না। বোধ হয় বর্ত্তমান দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের দিনে সে প্রকার মুক্তভাব দেখিবার আশাও নাই—কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহা তো ভুলিতে পারিব না!

তাঁহার কথা বলিতে গেলেই তাঁহার হাসির পরেই তাঁহার শরীরের গঠন প্রভৃতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি লম্বা ছিলেন না, বরঞ্চ বেঁটে ছিলেন বলিতে পারি। কিন্তু তাঁহার দেহের একটা বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ঠ গঠন ছিল। কেবল গঠনেই দৃঢ়ভাব ছিল না, যৌবনে বাস্তবিকই তাঁহার দেহে যথেষ্ট বল ছিল। আজকালকার মত সেকালের লোকেরা মনে করিতেন না যে, লেখাপড়ায় বড় হইতে গেলে দেহেতে বলেতে ছোট হইতে হইবে। রাজনারায়ণ বাবুর দেহ ভেদ করিয়া তাঁহার সবল ভাব বাহির হইয়া পড়িত। তাঁহার গৃহে আমার আহার দেখিয়া তিনি তাহাকে পাখীর আহার বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং বলিলেন "এ রকম পাখীর আহার খাইয়া কি প্রকারে কাজ করিবে?" সেই উপলক্ষে তিনি বলিলেন যে, তিনি ছাত্রাবস্থায় স্কুলের ছুটির সময় এক পয়সায় তিনখানি করিয়া যে খাস্তা কচুরি পাওয়া যাইত, সেই কচুরি প্রতিদিন চার আনার জলপান করিতেন। আজকাল আমাদের মধ্যে কয়জন আটচল্লিশ খানা খাস্তা কচুরি প্রতিদিন জলপান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

তাঁহারাই বা কেন এই প্রকার প্রচুর খাদ্য আহার করিয়া সহজে পরিপাক করিতে পারিতেন, আর আমরাই বা পারি না কেন? তাহার কারণ একটী কথায় বলা যাইতে পারে—অসাধারণ সংযম। একটী দৃষ্টান্ত দিই—রাজনারায়ণ বাবু যৌবনের প্রথম অবস্থায় সেকালের রুচি অনুসারে মদ্যপান

করিতেন। অবশেষে যখন তিনি পূজ্যপাদ পিতামহদেবের সহিত আসিয়া মিশিলেন, তখন অবধি তাঁহাদের উভয়ের জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল—পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া যেন কোন কাজই করিতে পারিতেন না। যে সময়ে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে ছিলেন, সেই সময়ে মহর্ষিদেব সুরাপান বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয়-বন্ধু "হাফেজ" রাজনারায়ণ বসুকে পরামর্শ দিলেন। রাজনারায়ণ বসুর প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "হাফেজ" বলিয়া সম্বোধন প্রয়োগ করিতে আমরা শুনিয়াছি। রাজনারায়ণ বাবুও সেই পরামর্শ অনুসারে মদ্যপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। একদিনে, এক মুহূর্ত্তে মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মদ্যপান নিয়মিতভাবে করিতে থাকিলেও প্রকৃত সংযম হইতে তিনি পরিভ্রষ্ট হন নাই। তাই রাজনারায়ণ বসু আটচল্লিশ খানা খাস্তা কচুরি খাইয়াও—এক আধদিন নহে, প্রতিদিন খাইয়াও সহজে পরিপাক করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয় মদ্যপান তাঁহার এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, মদ্যপান পরিত্যাগ করিবার কারণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; চিকিৎসক তাঁহাকে শরীর রক্ষার জন্য কয়েক ফোঁটা করিয়া মদ্যপানের বিধান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি লইয়া বহুকাল যাবৎ সেই কয়েকটী ফোঁটামাত্র সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফোঁটা ধরিয়া সুরাপান এতই হাস্যকর ব্যাপার যে, মেদিনীপুরে কোন সুরাপায়ী কম পরিমাণে সুরাপান করিলে অপরাপর ব্যক্তিগণ "রাজনারায়ণ বসুর ফোঁটা" উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেন। "রাজনারায়ণ বসুর drop" বোধ হয় আজও মেদিনীপুর হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই।

সেই সময়ে কলিকাতায় গোরাদের অত্যাচারের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। খিদিরপুরের পুল, কলিঙ্গাবাজার প্রভৃতি কয়েক স্থানে গোরাদের উপদ্রবে এদেশীয়ের চলাচল কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি রাজনারায়ণ বাবুর মুখেই শুনিয়াছি যে একবার ঐরূপ কোন এক স্থানে তাঁহার উপর গোরারা অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইলে তিনি তাঁহার এক মোটা যষ্টির সাহায্যে তাহাদিগকে সে বিষয়ে ক্ষান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সময়ে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ কার্য্য বড় কম সংসাহসের পরিচয় নহে। কেবল মনের বল থাকিলেও এ কার্য্য সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না—মনের বলের সঙ্গে দেহেরও বল ছিল বলিয়াই সেকালের পশুর সমান গোরাদের হস্ত হইতে তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার মনের দৃঢ়তাও অসাধারণ ছিল। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা শত বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানুষ প্রস্তুত না হইলে দেশের মঙ্গল সম্ভবপর নহে। তাই তিনি ধনসম্পত্তির শত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া দেশের ছেলেদের মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য ডেপুটিগিরি অবলম্বন না করিয়া মেদিনীপুরের স্কুলমাষ্টারি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যকে চিরবন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এই যে মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি স্কুলমাষ্টারী লইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি। আমরা দেখি যে বোম্বাই প্রদেশে শ্রীমান গোখলে এ দেশের ছেলেদের মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য নিজের সমুদয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মাসিক ৭৫৲ বেতনে স্কুলমাষ্টারিকে মস্তকে ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের ইহা কি অল্প গৌরবের বিষয় যে, তাঁহার বহুপূর্ব্বে এই দরিদ্র বঙ্গদেশেও এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তি সেই একই উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই একই ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন? যেদিন দেখিব যে আমাদের দেশে ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত শতসহস্র ব্যক্তি স্বার্থপরতাকে পদদলিত করিয়া এই দুই মহাপুরুষের আদর্শ লইয়া দেশের ছেলেদিগকে মানুষ প্রস্তুত করিবার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সেইদিন দেখিব যে প্রকৃত স্বরাজ লাভের পথ শতসহস্র পদ অগ্রসর হইয়াছে। তখন আর ভারতমাতা দাসভাবে পূর্ণহৃদয় রাশি রাশি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি দাসজাতি প্রসব করিবেন না; তখন এই ধরাধামে স্বর্গধাম অবতীর্ণ হইয়া নবভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন সংসারে League of

Nations এর নবরঙ্গের অভিনয় করিবার প্রয়োজন থাকিবে না; তখন সত্যকার ধর্ম্মাধিকরণে সকল বিষয়ে প্রকৃত ধর্ম্ম্য ব্যবস্থা হইবে।

তাঁহার মনের এই দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই তিনি আদিসমাজের সহিত আপনাকে চিরসংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। আদিসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগের কথা উত্থাপন করিয়া আমি বিরোধবিবাদের সম্ভাবনা উপস্থিত করিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন, আর আমি সে সম্ভাবনা কিছুতেই আসিতে দিব না। কিন্তু তিনি যখন আজীবন, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আদিসমাজের সভাপতি ছিলেন, তখন আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ সম্বন্ধে অন্ততঃ দু'একটি কথাও না বলিলে আমি যে নিজেকেই হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিব। তাঁহার মতামত ভ্রান্ত ছিল কি নির্ভুল ছিল, সে বিষয়ে আমি কোনই তর্ক উপস্থিত করিব না, সুতরাং বিরোধবিবাদেরও সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে তাঁহার জীবনচরিত এবং তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আদিসমাজের সহিত তাঁহার চিরসংযোগের যে কারণের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার অনুমতি দিতে আশা করি আপনারা কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি তাঁহার সহিত এই বিষয়ে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার আছে বলিয়া মনে করি।

তিনি মনে করিতেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্ম্মমত, যাহা মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, সর্ব্বাপেক্ষা অসাম্প্রদায়িক, কারণ উহাতে একমাত্র অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যতীত সমাজনীতি বা রাজনীতি বা সংসারের অন্য কোন নীতির নামগন্ধও নাই; সুতরাং সে সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানবের নিজের নিজের অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতা আছে। আমি তাঁহার মুখে আদিসমাজের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহা শুনিয়াছি এবং তাঁহার রচিত পুস্তক পুস্তিকাদি হইতে এবিষয়ে তাঁহার যে মত বুঝিয়াছি, মাত্র তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করিলাম। আদিসমাজের ধর্ম্মমতকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া উপলব্ধি করা তাঁহার আদিসমাজের সহিত চিরসংযোগের একটা কারণ ছিল। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে আদিসমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠান প্রণালী, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই ধর্ম্মমতের প্রয়োগপ্রণালীর ভিতরে জাতীয়তা সংরক্ষণ। আদিসমাজের এই দুইটা বিষয় তিনি দেশের কল্যাণসাধনের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে এই দুই বিষয়ে স্বমতের সাড়া পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আদিসমাজের কার্য্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত রাখিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন রাজনারায়ণ বাবু যদি কেশবচন্দ্রের দলে মিশিতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে তাঁহার নাম যশ কত উচ্চে ঘোষিত হইত? কিন্তু তাঁহার নামযশেরও স্পৃহা ছিল না, আর অর্থেরও পিপাসা ছিল না, তাই তিনি যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই প্রাণের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেন। আদিসমাজের সহিত রাজনারায়ণ বাবুর চিরসংযোগে তাঁহার মনের দৃঢ়তা যে কতদূর ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এখনও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, মহর্ষি তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য করিতেন বলিয়া তিনি আদিসমাজের মত-সমর্থনে লেখনী ধারণ করিতেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমি যতদূর জানি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, মহর্ষির আর্থিক সাহায্যের কারণে তিনি আদিসমাজের চিরপক্ষপাতী হন নাই; কিন্তু তিনি স্বভাবতই আদিসমাজের মতের পরিপোষক হওয়াতে তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার আর্থিক অভাব হওয়াতে মহর্ষিও তাঁহাকে স্বতই সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অসাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তা, এই দুইটী তাঁহার প্রাণের জিনিস ছিল। তিনি দুই হস্তে এই দুইটী বস্তুকে বরাভয়ের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। জাতীয়ভাবের উপর তাঁহার প্রাণের টান যে কত গভীর ছিল, তাহা একটী ঘটনা হইতেই সপ্রমাণ হয়। "যে সময়ে লাহোরে কংগ্রেস হইতেছিল, তখন একদিন তাঁহার দৌহিত্রী গান করিতেছিলেন—'পর দীপমালা, নগরে নগরে; তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে;' রাজনারায়ণ বাবু উহা

শুনিয়া বলিলেন—"ও গান গাস্‌নে—সব কথা মনে হয়, শরীর দিয়ে আগুন বাহির হয়—মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। গাস্‌নে গাস্‌নে।" কিন্তু জাতীয়ভাবে তিনি নিজের প্রাণকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহার প্রাণে অসাম্প্রদায়িকতার কিছুমাত্র অভাব হইয়াছিল তাহা নহে।

জাতীয় কথাটা এখন এতই প্রচলিত যে বিজাতীয় কথাটাই আমাদের কানে বড় ব্যথা দেয়; কিন্তু সেকালে জাতীয় কথাটাই এদেশীয় জনসাধারণের কানে ব্যথা দিত। আদিব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনারায়ণ বাবু এবং নবগোপাল মিত্র জাতীয়তার প্রদীপ খুব উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। National কথাটা তাঁহাদের আবিষ্কার বলিলেও চলে। National Paper, জাতীয় হিন্দুমেলা, National Theatre প্রভৃতি যাহা কিছু জাতীয়, যাহা কিছু national, সে সমস্তই হয় তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল, অথবা তাঁহাদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবুর জাতীয়তা মুখের কথা ছিল না। তিনি সত্য সত্য দেশকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। ভাল বাসিতেন বলিয়াই "জাতীয়" যাহা কিছু শুভকার্য্য সেকালে সংঘটিত হইত, তাহাতেই হয় তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্ত দৃষ্ট হইত, অথবা সে বিষয়ে তিনি যাহা কল্যাণ বলিয়া বুঝিতেন তাহাই উপদেশ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

যে ব্যক্তি নিজের দেশকে সত্য সত্য ভাল বাসিবেন, তিনিই জাতীয়ভাবে নিজের জীবনকে সংগঠিত করিতে চাহিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। রাজনারায়ণ বাবুও দেশকে আশ্চর্য্য রকমে ভাল বাসিতেন, তাই তিনি জাতীয়ভাবের এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর প্রকৃতই, রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি দেশের গৌরবকাহিনীর মধ্যে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেন, তাঁহার পক্ষে এদেশকে ভাল না বাসা এবং জাতীয়ভাবের পক্ষপাতী না হওয়াই অসম্ভব মনে করি। অসাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তা, উভয় ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার ভিতরে একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টি জন্মিয়াছিল। সেই দৃষ্টির ফলে তিনি আমাদের শাস্ত্ররাশির ভিতর হইতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমতা লাভ করিবার কারণেই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডেরও তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা প্রকাশের ফলে comparative religion বিষয়ক ভাব অধ্যাপক মোক্ষমূলারের অন্তরে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল। আপনারা Sir John Woodroffe লিখিত Is India civilized অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন; কিন্তু আপনাদের ঘরের দুয়োরে রাজনারায়ণ বাবু সেই কথা যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন, আপনারা কয়জন তাহার সংবাদ রাখেন? আমি বলিতে চাহি না যে Woodroff সাহেব রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থ হইতে কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ আমি জানি না যে তিনি ঐ গ্রন্থের সহিত কোনরূপে পরিচিত ছিলেন কি না এবং ঐ গ্রন্থের কোন উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও মনে পড়ে না। কিন্তু উভয় মহাপুরুষের চিন্তার গতি সম্ভবত একই দিকে ধাবিত হওয়ায় আমরা দেখি যে, উডরফ সাহেবের গ্রন্থের অনেকস্থল রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থের অনেক স্থলের সহিত হুবহু এক—মনে হয় যেন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই ভাষান্তরিত করিয়া লিখিত। রাজনারায়ণ বাবুর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্যই এই বিষয় উল্লেখ করিলাম। তিনি ইতিহাসে সুপণ্ডিত হইলেও রাজনীতি প্রভৃতির দিকে মোটেই ঝোঁকেন নাই। তাঁহার হৃদয় বড়ই শান্তিপ্রিয় ছিল এবং সর্ব্বদাই অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ থাকিত। এবিষয়ে হাফেজ তাঁহার বড়ই সহায় হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের সহিত ঋষি রাজনারায়ণের যখন হাফেজ আলোচনা চলিত—ইনি একটী বয়েদ আবৃত্তি করিতেছেন, আর উনি তাহার প্রত্যুত্তরে আর একটী বয়েদ আবৃত্তি করিতেছেন, তার মধ্যে মধ্যে উভয়ের অন্তর ভেদ করিয়া আনন্দের উচ্চহাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—সে দৃশ্য একবার যাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না, তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাগুলি পড়িলেই দেখা যায় যে তাহার ভিতর হইতে

একটা কি সুন্দর সৌম্য-শান্ত ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

আমি রাজনারায়ণ বাবুর এই স্মৃতিসভায় এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার তর্পণ করিবার অবসর পাইলাম, তজ্জন্য আমি আমার জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি অনেক বিষয়ে তাঁহারই শিষ্য। যদি আমি নিজেকে তাঁহার আদর্শে গড়িতে পারি এবং আপনাদিগকেও তাঁহার আদর্শে জীবন সংগঠিত করিবার বিষয়ে এতটুকু সহায়তা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, আমাদের ভিতর হইতে দুজন দশজন নহে, শত শত রাজনারায়ণ বসু উত্থিত হইয়া দেশকে প্রকৃত স্বরাজের পথে অগ্রসর করিয়া দিন।

শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

[আসাম পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী]

পঞ্চদশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের তেমন কোন অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হয় না। তৎকালে অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন শাক্ত, বৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। আসামে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আধুনিক। মহাপুরুষ শঙ্করদেব, দামোদরদেব, গোপালদেব এবং হরিদেব প্রত্যেকেই আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শঙ্করদেব ও তদীয় শিষ্য মাধবদেব যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করেন তাহার নাম "মহাপুরুষিয়া"। দামোদরদেব, গোপালদেব এবং হরিদেব প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়গুলির নাম যথাক্রমে "দামোদরী, গোপালদেবী ও হরিদেবী"।

মহাপুরুষীয়েরা গৃহস্থ এবং উদাসীন এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। উদাসীনরা "কৌলিয়া ভকত" নামেও অভিহিত। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করত তাঁহারা সত্রে বসবাস করেন। কৌলিয়া ভকতদিগের শবদাহন এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কামরূপে মহাপুরুষিয়াদিগের প্রায় ২০০ শত সত্র আছে। ঐ সকল সত্র বড়পেটাস্থ সত্রের অধীন। প্রত্যেক মহাপুরুষিয়া সত্রে কৃষ্ণের মূর্ত্তি রাখা হয়। মহাপুরুষিয়েরা খাসী, পাঁঠা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন না, কিন্তু শিকারলব্ধ কোন প্রাণীর মাংসাহার তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অসমীয়া বৈষ্ণবগণ মৎস্য ভক্ষণে বিরত নহেন।

অত্রিগোত্রসম্ভূত "প্রেমপূর্ণানন্দ গিরি" ছিলেন শঙ্কর (ভূঞা) দেবের পূর্ব্বপুরুষ। শঙ্করের পিতার নাম "কুসম্বর", মাতার নাম "সত্যসন্ধা"। বহুকাল পর্য্যন্ত সত্যসন্ধার গর্ভে সন্তান না হওয়ায় কুসম্বর "শ্রীপতি ভূঞা"র কন্যা "অনুধৃতি"কে বিবাহ করেন। কিন্তু বড়দোয়া (বটদ্রবা) গ্রামে শঙ্করদেবের জন্মের (১৪৪৯ খৃঃ অব্দ) কিছুকাল পরে অনুধৃতির গর্ভে "বনগিরি গিরি"র জন্ম হয়।

শঙ্কর "কন্দলী" নামক গুরুর নিকট সংস্কৃত-ভাষা ও ভাগবতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে কামরূপের (বর্ত্তমান আসাম) রাজা ছিলেন অহমরাজ "চুহাংমুঙ্গ"। বড়দোয়ার অনতিদূরস্থ "আলিপুকুরিয়া" গ্রামে শঙ্করদেবের অবতারবাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। শঙ্কর নিজে গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন এবং সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, গৃহী হইয়াও সহজে বিশুদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়েও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম প্রবল ছিল। কিন্তু তিনি এরূপ গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, "বিকলা" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের পর একদিন শিবপূজা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

শঙ্করপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বারা শাক্ত ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এবং অহমরাজ চুহমুঙ্গের (চুপিমফার পুত্র) নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। রাজা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করত অব্যাহতি প্রদান করিলেও শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্ম্যে এবং বৌদ্ধ ও কাছাড়ীগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ায় নিরাপদে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব হইতে তিনি কোচরাজের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে কামাখ্যা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ কোচরাজ নরনারায়ণের নিকট তাঁহার

বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া সফলমনোরথ হন নাই। রাজা শঙ্করের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে শঙ্কর অসৎচরিত্র রাজাকে * শিষ্য করিবেন না বলিয়া নরনারায়ণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

শঙ্কর কোচবিহারে "ভোলা" নামক একটী সত্র স্থাপন করিয়া সেখানে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াছিলেন। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে ১১৯ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার জন্মকাল হইতে অসমীয়া বৈষ্ণবগণ "শঙ্করাব্দ" বলিয়া একটী বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। শঙ্করদেবের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নিম্নে তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের বংশলতা প্রদত্ত হইল :—

প্রেমপূর্ণানন্দগিরি
।
কৃষ্ণগিরি
।
সুবর্ণগিরি
।
রামাগরি
।
হেমগিরি
।
কৃষ্ণকান্তগিরি (কন্যা)
।
লণ্ডাদেব বা লণ্ডবর †
।
চণ্ডিবর বা দেবীদাস
।
রাজধর
।

।	।	।	।
সূর্য্যবর	জয়ন্ত	মাধব	হলায়ুধ
।	।	।	।
কুসম্বর	সত্যানন্দ	রতিকান্ত	
।	।		
শঙ্কর	জগতানন্দ বা		
	রামরায় = (নারায়ণপ্রিয়া স্ত্রী)		

অধ্যাপক পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা শঙ্করদেবের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে বিগত ১৩১৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার ঢাকা রিভিউ নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "শঙ্করদেবের ধর্ম্ম সহজসাধ্য অথচ কীর্ত্তনাদি সঙ্গীতের মধুর রসে অভিষিক্ত। তাই পার্ব্বত্যজাতীয়েরাও আসিয়া এই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে "শরণ" লইবামাত্রই তাহাদের কাছাড়ী, মিকির প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিসূচক নাম ঘুচিয়া "শরণীয়া" নাম হয়। তৎপরে দুই এক পুরুষ গেলে কোচ * সংজ্ঞা হয়। তখন তাহাদের দল উচ্চবর্ণের ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এই লাভ হইয়াছে যে আসামে মুসলমান বা খৃষ্টানের সংখ্যা অনেকটা কম। শঙ্করদেব এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম আসামে প্রচার করিয়াছিলেন।

শঙ্করদেব অসমীয়া নাটকের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার রচিত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মৈথিলী ও ব্রজবুলি শব্দ দৃষ্ট হয়। শঙ্করদেব রচিত সঙ্গীত (বড় গীত) গুলি অতি উচ্চ অঙ্গের ও মহাভাবসমন্বিত। নিম্নে ইঁহার রচিত একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল :—

"সোই সোই ঠাকুর যো হরি পরকাশা।
নাম স্মরত রূপ ধরত তাকেরি হামু দাসা॥
পণ্ডিতে পঢ়ে শাস্ত্র মাত্র, সার ভকতে লিয়ে।
অন্তর জল ছুটয়ে কমল, মধু মধুকর পিয়ে॥
যাহে ভকতি তাহে মুকতি, ভকতে এ তত্ত্ব জানে
যৈছে বণিক চিন্তা মাণিক, জানিয়া গুণ বাখানে॥
কৃষ্ণকিঙ্কর, শঙ্কর কহে ভজ গোবিন্দক পায়।
সোহি পণ্ডিত সোহি মণ্ডিত যো হরিগুণ গায়া॥

বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেম অবলম্বনে পদাবলী রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি। শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন তৎকালে বাঙ্গালা ভাষা নবকলেবরে গঠিত হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিত। শঙ্কর বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায় তাঁহার লেখাও অনেক

* ভারতী ১২৮৫, মাঘ সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৯।

† লণ্ডবর—ইনি চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুত্রলাভ হওয়ায় ইনি তাঁহার নাম রাখেন "চণ্ডীবর বা দেবীদাস"।

* কোচ—মিকির, নগা, মিরি প্রভৃতি অনেক লোক মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মপ্রচারক সকলের উপদেশত আপোন আপোন পার্ব্বত্য প্রদেশর পরা নামি আহি এই দেশত থাকি কোঁচ জাতির অন্তর্গত হ'ল। স্বর্গীয় গুণাভিরাম বরুয়াকৃত আসাম বুরঞ্জী।

অংশে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অনুরূপ। শঙ্করদেব রচিত সঙ্গীতসমূহ যে অতি উচ্চ অঙ্গের ও মহাভাব সমন্বিত তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, তাই "সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতা" বলিয়া তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন। শঙ্করদেব বঙ্গদেশ হইতে সঙ্কীর্ত্তনের সূত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর অনুকরণে আসামে সঙ্গীত দ্বারাই ভজন, প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাঁচটী রস আছে। এই পাঁচটী রস লইয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্ম; ইহার যাজনা যাঁহারা করেন তাঁহারাই রসিক বা পঞ্চরসিক এবং তাঁহাদিগের যাজিত ধর্ম্মই রসিকত্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের অনেকেই শান্ত, দাস্য ও সখ্য এই তিন রসেরই উপাসক ছিলেন, কিন্তু শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মতে বাৎসল্য ও মধুরের প্রাধান্য অধিক।

বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য দেবের পন্থানুযায়ী যুগল মূর্ত্তির উপাসক, কিন্তু শঙ্করদেব একমাত্র কৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসক। শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নিষ্কাম হইলেও দুই ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। শঙ্কর ও তদীয় শিষ্য মাধবদেবের মতে ধ্যান, ধারণা, যজ্ঞ, পূজাদি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে এই সমস্ত কর্ম্মযোগের অন্তর্গত বলিয়া উহা অপেক্ষা ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। শঙ্করদেবের ধর্ম্ম ভক্তিমূলক; শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রেমমূলক।

স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তদীয় "আসাম বুরুঞ্জী"তে শঙ্করদেবের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "কুসম্বর ভুঁইয়ার পুত্র শঙ্করদেব ভাটিদেশলৈ গৈ আহি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করি ধরি চিল।" অর্থাৎ 'কুসম্বর ভূঞার পুত্র শঙ্করদেব ভাটী * দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসামে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্করদেবের বঙ্গদেশে আগমন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, মহোদয় ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে "A Brief sketch of the religious Beliefs of the Assamese People" নামক তদীয় গ্রন্থের একস্থানে (পৃঃ ৬) লিখিয়াছেনঃ—At Borduar he (Sankar) lived for twelve years. At this time Chaitanya was preaching Vaisnavism in Bengal. Sankar had heard of this and one of his objects of the pilgrimage was to visit Chaitanya and receive edification from him. Accordingly he left for Bengal with his contemporaries Hari Dev and Damoodor Dev, who were to become leaders of the two different sects. Sanker, Hari Dev and Damoodar Dev accompanied in their Journey by Ram Ram Guru, Sanker's family priest. * * * *

শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর চলিহা বিগত ১৮৩৭ শকের বাঁহী পত্রিকার ২য় সংখ্যার একস্থানে (পৃঃ ৭৫) লিখিয়াছেন, "পাটবাউসীত থাকোঁতেই বঙ্গদেশের চৈতন্যদেয়ে শঙ্করদেয়ক দেখা করেছিল আরু শঙ্করদেয়র পরা জ্ঞান আরু ভক্তির তত্ত্বগ্রহণ করি শিক্ষালাভ করে।" অর্থাৎ পাটবাউসী (বড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত) নামক স্থানে শঙ্করদেবের অবস্থান কালে চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। ইহার প্রমাণার্থ তিনি উক্ত পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছেন :—

"শুনিয়া চৈতন্য কৃষ্ণ ধন্য ধন্য বুলি।
মাধব দেয়ক ধরিলন্ত আঁকোয়ালি॥
ই কার্য্যত আইলোঁ আমি তোমাসার থান।
আজি ধরি ভক্তি জ্ঞান করিলোঁ বিধান॥
এহি বুলি খন পুরি চৈতন্য চলিলা।
দেখিয়া শঙ্করদেব মহারঙ্গ ভৈলা॥
সেই দিনা হস্তে দেব চৈতন্য ঈশ্বর।
জ্ঞানত করিয়া ভক্তি করিলন্ত সার॥"

চলিহা মহাশয়ের এই উদ্ধৃত বচনের ভিত্তি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা-এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বড়দলৈ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ আসাম ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য অথবা মৈনা-কানাই বাজার নিবাসী বৈষ্ণব চুড়ামণি শ্রীযুক্ত অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি একথা স্বীকার করেন না। অহমেরা প্রথমে শঙ্করদেবপ্রচারিত নববৈষ্ণব ধর্ম্মে বিরক্ত

* ভাটীদেশ—মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনা নদের তীর পর্য্যন্ত সমগ্র নিম্ন ভূমিকে "ভাটীদেশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক ২৪ পরগনা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি জেলার কিয়দংশ ভাটীদেশের অন্তর্গত।

হইয়া অতি সামান্য অপরাধে তদীয় জামাতা হরিকে বধ ও শিষ্য মাধবকে বন্দী করিলে তিনি অহম অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক "পাটবাউসী"তে গিয়া বসবাস করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও প্রাগুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে লখনুরাম চৌধুরী কৃত "সাৎসম্প্রদায়" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপরোক্ত বচনের ভিত্তিহীনতা উপলব্ধ হইবে।

"লীলাচরিত" নামক গ্রন্থে শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ এবং শঙ্করের দ্বিতীয়বার জগন্নাথক্ষেত্রে গমনকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার বিষয় বিবৃত আছে। এই গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত থাকায় উহাতে সাল তারিখের উল্লেখ নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের Jour. A. S. B. নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় মহাপুরুষীয়াদিগের বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার কালে Capt. E. T. Dalton উল্লেখ (পৃঃ ৪৪৬) করিয়াছেন:—The Assamese all admit the interview between him (Chaitanya) and Sanker but the sect of whom I am treating do not wish it to be supposed that either of their followers (Sanker or Madhob) was under any obligation to the Bengal Saint. নীলকণ্ঠ কৃত দামোদর (অন্যতম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক) চরিত্রে উল্লেখ আছে:

"দামোদর দেব রত্নেশ্বরক আসিলা।
বরাহ কুন্তর পূর্ব্বে চৈতন্য আছিলা,
মণিকূটে দুই জনা সম্ভাষণ ভৈলা॥
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হইতে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ গৈলা॥"

শঙ্করদেবের জনৈক শিষ্য রামরায় লিখিত দামোদর চরিত্রের সহিত উক্ত গ্রন্থোক্ত বিবরণের বেশ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যদেবের আসাম-ভ্রমণ খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে যেরূপ স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজিত, আসামে শঙ্করদেবও তদ্রূপ ভগবানের অংশ বলিয়াই কীর্ত্তিত। শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব লিখিয়াছেন:—

"ত্রিভুবন বন্দে দৈবকীনন্দন যো হরি মরাল কংশ।
জগজ্জনতারণ দেব নারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ॥"

আর্ট ও দুর্নীতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিষয়ভেদে আর্টকে—আর্টের প্রয়োগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—উন্নতি-সাধক ও অবনতিসাধক, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর। যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট, এই ধুয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অনেকে এই শেষোক্ত অকল্যাণকর ও অবনতিসাধক আর্টকেই আর্ট বলিয়া ধরেন। এবং পাগল যেমন নিজকৃত কর্ম্মের ফলাফল বুঝিতে না পারিয়া গুরুতর অনিষ্টকর কর্ম্ম করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ ইঁহারাও ভ্রান্ত সংস্কারবশত ঐ ধুয়ার দোহাই দিয়া জগতে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার যক্ষ্মা-বীজ ছড়াইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। আজকালকার আইনে ক্ষণিক উন্মত্ততাকে আত্মহত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দুর্নীতি ও অশ্লীলতার যক্ষ্মাবীজ বিক্ষিপ্ত করাকেও আমরা সাময়িক উন্মত্ততার ফল বলিয়া ধরিতে পারি। এই সকল আর্টের নামে উন্মত্ত লেখকেরা মুখে আর্টের খাতিরে আর্ট বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেও বস্তুত আর্টকে কিছুতেই পরিপার্শ্ব হইতে পৃথক করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারেন না এবং দেখেনও না, কারণ তাহা নিতান্তই অসম্ভব। তাঁহারা আর্টকে জগতের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত কিছুতেই বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ করিয়া দেখিতে পারেন না, কারণ তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। তবে তাঁহারা করেন কি? রস্কিন প্রভৃতির ন্যায় মনীষীগণ উন্নত বিষয় ও ভাল ভাবের ভিতর দিয়া আর্টকে দেখিবার এবং দেখিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া জগতের উন্নতিসাধনে সহায়তা করেন; আর তোমার আমার ন্যায় অবোধ ব্যক্তিরা নিতান্ত অমঙ্গলপ্রসূ বিষয় ও অশ্লীল ভাবের ভিতর দিয়া আর্টকে দেখিয়া ও ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া যক্ষ্মারোগের বীজ ছড়াইয়া

জগতের অবনতিসাধনে সহায়তা করি—এই যা' প্রভেদ।

আর্টের খাতিরে আর্ট, এই ধুয়া ধরিয়া আজকাল আমাদের দেশের অনেক বড় বড় সাহিত্যিক কেবল যে আর্টের সার্থকতাকে ব্যর্থ করিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহারা বাস্তবিকই দেশের সর্ব্বনাশেরও পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি হইতে যেমন সময়ে সময়ে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া কত নগরপল্লী ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইরূপ ঐ ধুয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এদেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অগ্ন্যুদগার ও ভস্মরাশি দেশকে আচ্ছাদিত করিয়া রুদ্ধশ্বাস করিবার জোগাড় করিতেছে।

এই ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারই যমজ ভাইয়ের মত আরও একটা ধুয়া প্রচারিত হইতেছে—সেটার নাম realistic আর্ট বা প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট। যাঁহারা এই প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের দোহাই দেন, তাঁহারা এমন ভাব দেখান, যেন এই একটা তাঁহাদেরই নবাবিষ্কৃত মহা সত্য তত্ত্ব। এটাও আসলে পাশ্চাত্য কথা কয়েকটার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহার মধ্যে আমরা তো কোনই নূতনত্ব দেখিতে পাই না। আর্টের ভিত্তিই যখন সত্য প্রকৃতি, এবং প্রত্যক্ষ পদার্থ ও ভাবসকলও যখন সেই প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, তখন সাধারণ আর্ট হইতে প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের বিশেষত্ব যে কোথায়, তাহা তো খুঁজিয়া পাই না। তবে দেখিবার মধ্যে দেখিতে পাই এই যে, আর্টের খাতিরে আর্ট এবং প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট, এই দুইটার সহযোগে দোহাই দিয়া উচ্চ বিষয়ের ও উন্নত ভাবের পরিবর্ত্তে চারিদিকে এমন বীভৎস, কুৎসিৎ ও অশ্লীল গল্পচিত্র সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা ভদ্রসমাজে নিকটসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষেরও পরস্পরের মধ্যে জোরে পড়া যায় কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য্য এই যে, উন্নত ভাবের প্রত্যক্ষ বিষয়ের গল্পচিত্রগুলিকে এপর্য্যন্ত প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের মধ্যে ফেলা হইয়াছে দেখি নাই।

এই সকল কুৎসিৎ গল্পচিত্রের প্রতিবাদ উঠিলে এক সম্প্রদায় ঐবিলাতী art for art's sake, realistic art প্রভৃতি কতকগুলা বাঁধি কথার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া সেই চিত্রগুলির সমর্থনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তাঁহারা এমন ভাবে সদম্ভে কথা বলেন, যেন আর্ট বুঝিবার ও ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁহাদের ব্যতীত অপর কাহারও ঘটে নাই। এই প্রকার অশ্লীল চিত্রের আর্ট বুঝিবার অধিকার তাঁহারা রাখিতে চান, তাঁহাদের থাক্; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের ছেলেপিলে আছে, বিশেষত যাঁহাদের একটু বয়স্ক পুত্র-কন্যা আছে, তাঁহারা যে ঐ অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইবেন না, তাহা আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। এই সকল বীভৎস কুৎসিৎ চিত্র ও ভাব হইতে সন্তানগণের মনকে বাঁচাইবার জন্য বুদ্ধিমান পিতা-মাতাকে যে কি ভয়ভাবনায় পড়িয়া যাইতে হয়, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন;

বাল্যকালে কথামালায় একটা গল্প পড়িয়াছিলাম! এক পুষ্করিণীতে কতকগুলি ভেক আনন্দে সন্তরণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটা বালক তাহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ভেকরাজ বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বালকগণ! এই ঢিল ছুড়িয়া তোমরা আমোদ পাইতেছ বটে, কিন্তু আমাদের মৃত্যুর কারণ হইতেছে।" যে সকল সাহিত্যিক বিলাত হইতে আমদানি কতকগুলি ফাঁকা কথার দোহাই দিয়া অশ্লীল কুৎসিৎ গল্পচিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকেও সম্বোধন করিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "এইরূপ গল্পচিত্র প্রভৃতি প্রকাশের ফলে তাঁহাদের হস্তকণ্ডুয়নের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, তাঁহাদের যশস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে বটে, এবং তাঁহাদের মনের উদারতারও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এগুলি দেশের মৃত্যুর কারণ মরণবায়ু।"

দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অর্থ কি? আজকালকার দিনে আমরা ইহাদিগকে যে অর্থে গ্রহণ করি, আমাদের সহজ জ্ঞানে আলোচনা করিয়া সেই অর্থে আমরা এইটুকু বুঝি যে, যে সকল বিষয় দর্শন শ্রবণ স্পর্শন বা মননে আমাদের অন্তরে কামভাব অতিমাত্রায় জাগ্রত হয় এবং যাহা আমাদের মনু-

ব্যত্ব নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুদের সহিত সমস্তরে নামাইতে চেষ্টা করে, আমাদের কল্যাণের পথে, উন্নতির অভিমুখে, চলিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহাই দুর্নীতি ও অশ্লীলপদবাচ্য। যে সকল বিষয় আমাদের হৃদয়কে দেবত্বের দিকে উন্নীত করে, অন্তত মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইতে দেয় না, সেইগুলিই শ্লীল শ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। কাজেই আমরা ধরিতে পারি যে, মঙ্গলভাবই অথবা ভগবানের শিবস্বরূপই শ্লীলতার মূল ভিত্তি ও আদর্শ। এই পুরুষের দেহ, এই রমণীর দেহ, এই কামবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া তুমি আমি এমনভাবে নাড়াচাড়া করিতেছি যে, তাহার ফলে সমাজের পূর্ব্ব হইতেই জীর্ণ শরীরে অশ্লীলতার বিষবীজ প্রবেশ করিয়া সমাজকে একেবারে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে উদ্যুক্ত হইয়া বসিয়া আছে, সমাজকে ফোঁপরা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে; অথচ সেই সকল বিষয় লইয়াই মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান এমনভাবে কবিতা লিখিয়াছেন যে, সেই সকল কবিতা পাঠ করিলে মানুষের মন এক অপূর্ব্ব দেবভাবে সংগঠিত হইয়া উঠে। এইরূপে আমরা যে দিক দিয়াই দেখিতে যাই, সেই দিক দিয়াই দেখি যে, জগতের মঙ্গলসাধনে, শ্লীলতার প্রসার সাধনেই প্রকৃত আর্টের সার্থকতা।

এদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যজগতে আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল অশ্লীল ও দুর্নীতিপ্রবণ উপন্যাস বাহির হইতেছে, সত্য কথা বলিতে কি, লেখকদিগের কিছু আশাতীত অর্থাগম ও পাণ্ডিত্যের অতিমাত্র অভিমান সার্থক হওয়া ব্যতীত তাহাতে আর কি লাভ হয় জানি না। ইহার বিপরীতে আমরা বরঞ্চ দেখি যে, ঐ প্রকার উপন্যাসের পরিণামে লেখকদিগের পরিবারে, সমাজে ও দেশে বিষবৃক্ষের "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া সু-দৃশ্য, কিন্তু মৃত্যুর উপবনে পরিণত হয়, এবং সেই উপবন হইতে এক ভয়ানক বিষবায়ু সৃষ্ট হইয়া লোকসকলকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে আকর্ষণ করিতে থাকে। লেখকেরা কি মরুভূমির মাঝে, শ্মশানের মাঝে, অর্থের স্তূপের উপর বসিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন? অর্থশোষণের ফলে যদি রাজ্যের প্রজা শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে রাজা রাজ্য করিবেন কাহাকে লইয়া? খাজানা আদায় হইবে কাহার নিকটে? রাজার সুশাসনের বন্দোবস্ত উপলব্ধিই বা করিবে কে? সেই প্রকার, তোমাদের পাঠকেরা অশ্লীল ও দুর্নীতির যক্ষ্মাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িলে, দুইদিন বাদে, তোমাদের ঐ আর্টের খাতিরে আর্ট ও প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট, এই দুই নবাবিষ্কৃত মহান তত্ত্বে পূর্ণ উপন্যাসগুলি পড়িবে কে? তখন তোমরা হয়তো ইহলোকে না ও থাকিতে পার, কিন্তু যদি কখনও পরলোক হইতে ফিরিয়া আস, তবে নিশ্চয়ই দেখিবে যে, তোমরা এদেশের ধর্ম্মে, নীতিতে, শরীরে ও মনে তোমাদের কি সুমহান্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছ—একটা বিরাট—বিশাল—শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান!

মন্দ বস্তুকে কখনও লোকদৃষ্টিতে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে নাই। যে কামভাবকে এই সকল ঔপন্যাসিক তাঁহাদের চিত্রের ভিত্তি করেন, ভগবৎবিধানে তো তাহা মনুষ্যের মধ্যে নিম্নস্তরের জীবজন্তুদের সমানই প্রবলভাবে জাগ্রত আছে। সেই কামভাবকে যে কোন উপায়ে বড় করিয়া ধরিলেই, তাহার মনুষ্যত্বধ্বংসী আকারকে সুন্দর মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইলেই অবোধ পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেদের জীবনে তাহার অভিনয় করিতে গিয়া আপনাদিগকে যে পশুদের সঙ্গে সমস্তরে নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই কারণে যে সকল মনোবৃত্তি উদ্দাম হইয়া জীবনের সার মনুষ্যত্বকে ভাসাইয়া লইয়া যায় সে সকল মনোবৃত্তিকে সংযমের বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক নেতাদের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রের নেতাদের এই সংযম আনয়নে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। সংযম ধ্বংস করিবার সহায়তা করিলে তাঁহাদের ধামা-ধরা সম্প্রদায় দুই চারি দিনের জন্য তাঁহাদের কার্য্যে বাহবা দিতে পারেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সে কার্য্যের জন্য ভবিষ্যৎবংশীয়দের নিকট কখনই তাঁহাদের পৌরুষ ঘোষিত হইবে না, প্রত্যুত ইহার জন্য তাঁহারা চিরকাল নিন্দাস্পদ হইয়া থাকিবেন।

আসল কথা এই যে, যে সংযমের বলে ভার-

তের নিজস্ব রমণীর মাতৃত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, সে সংযম আমরা হারাইয়াছি ; হৃদয়ের সে মহত্ব, সে উদারতা আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। তৎপরিবর্ত্তে দাসভাবকে slave mentalityকে বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করিয়া পাশ্চাত্যদের অনুকরণে প্রিয়াসাধনে অগ্রসর! খুবই সহজ—নিজে নষ্ট হইয়া অপরকে নষ্ট করিবার ব্যবস্থা দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু প্রাণের ভিতর মাতৃভাবের সাধনা সংসিদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিলে সংযম চাই, ধৈর্য্য চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই। একটী কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই প্রিয়াসাধন সহজ হইলেও আসলে ইহার প্রচারে আমাদের অধিকার নাই। এক তো, আমার নিজেকে নষ্ট করিয়া আত্মঘাতী হইবার অধিকার আমার নাই ; তার পর, যদি বা আমি নিজেকে নষ্ট করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলেও অপরকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার কোনই অধিকার আমার নাই। আমি মন্দ হইতে পারি, তুমি মন্দ হইতে পার, কিন্তু মন্দকে ভাল বলিয়া আমাদের পরবর্ত্তী বংশের পর বংশকে মন্দের পথে, বিপথে চলিবার ব্যবস্থা দিবার অধিকার কিছুতেই আমাদের থাকিতে পারে না। সত্য-শিব-সুন্দর ভগবান যখন আর্টের কেন্দ্র, তখন আর্টের মধ্যে মন্দ বিষয়কে, মন্দ ভাবকে আনিয়া ফেলাই অত্যন্ত অন্যায় ; মন্দকে ভাল বাসিয়া একটুখানি মন্দ হইবার কথাও উল্লেখ করা যেমন ভগবৎবিধানের বিরুদ্ধ, তেমনি উহা যুক্তিবিরুদ্ধ, এবং তেমনি উহা আর্টের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধ। আস্তাকুঁড়ের পচা জিনিস যদি দূরে সরাইবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে, তবে তাহা ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া নিজের বাসগৃহে পচা গন্ধ বিস্তারে সহায়তা করা কতদূর সঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

[কর্ম্ম কাহারও দূর হয় না, এইজন্য নিষ্কামবুদ্ধি হইলেও কর্ম্ম করাই উচিত ; কর্ম্ম অর্থেই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ; কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে এই কর্ম্ম স্বর্গপ্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া করিতে হইবে ; জ্ঞানের দ্বারা স্বার্থবুদ্ধি দূর হইলেও কর্ম্ম দূর হয় না, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরও নিষ্কাম কর্ম্ম করাই উচিত ; লোকসংগ্রহার্থ ইহা আবশ্যক,—ইত্যাদি প্রকারের এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগের যে আলোচনা করা হইয়াছে, উহাই এই অধ্যায়ে দৃঢ় করা হইয়াছে। কোনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, জীবনযাপনের এই মার্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলা হয় নাই ; এইজন্য এই মার্গের প্রাচীন গুরুপরম্পরা প্রথমে বলিতেছেন—]

শ্রীভগবান বলিলেন—(১) অব্যয় অর্থাৎ কখনও যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না অথবা ত্রিকালেই বাধারহিত ও নিত্য এই (কর্ম্ম-) যোগ (-মার্গ) আমি বিবস্বান অর্থাৎ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম ; বিবস্বান (নিজের পুত্র) মনুকে, এবং মনু (নিজের পুত্র) ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন। (২) এই প্রকার পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত এই (যোগ)কে রাজর্ষিগণ জানেন। কিন্তু হে শত্রুতাপন (অর্জ্জুন)! দীর্ঘকাল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (৩) (সকল রহস্য মধ্যে) উত্তম রহস্য জানিয়া এই পুরাতন যোগ (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি তোমাকে আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার ভক্ত ও সখা।

[গীতারহস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ   ) আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, এই তিন শ্লোকে 'যোগ' শব্দের দ্বারা জীবনযাপনের সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গের মধ্যে যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অর্থাৎ সাম্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার মার্গই অভিপ্রেত। গীতোক্ত ঐ মার্গের যে পরম্পরা উপরের শ্লোকে উক্ত হইল, তাহা যদিও এই মার্গের মূল বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি টীকাকারগণ ইহার বিশেষ বিচার করেন নাই। মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভাগবতধর্ম্মের যে সিদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন যে, এই ধর্ম্ম প্রথমে শ্বেতদ্বীপে ভগবান হইতেই—

নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণান্নৃপ॥
এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

"নারদ প্রাপ্ত হন, হে রাজা! সেই মহান্ ধর্ম্মই

তোমাকে পূর্ব্বে হরিগীতা অর্থাৎ ভাগবদ্গীতাতে সমাসবিধিসহ বলিয়াছি"—(মভা. শা ৩৪৬. ৯. ১০)। এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে "যুদ্ধে অমনোযোগী অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে" (ম ভা. শা. ৩৪৮. ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ভাগবত ধর্ম্মের (গী. র পৃ)। বিস্তৃত হইবার ভয়ে গীতাতে উহার সম্প্রদায়পরম্পরা সৃষ্টির মূল আরম্ভ হইতে দেন নাই; বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু এই তিন জনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ নারায়ণীয় ধর্ম্মের সমস্ত পরম্পরা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ব্রহ্মার মোটে সাত জন্ম। তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন্মের, নারায়ণীয় ধর্ম্মে কথিত, পরম্পরার বর্ণন হইয়া গেলে, যখন ব্রহ্মার সপ্তম, অর্থাৎ বর্ত্তমান, জন্মের কৃতযুগ সমাপ্ত হইল, তখন—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ॥
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ॥
যতীনাং চাপি যো ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

"ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান মনুকে (এই ধর্ম্ম) দেন, মনু লোকধারণার্থ ইহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন, এবং ইক্ষ্বাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত হইয়াছে। হে রাজা! সৃষ্টির ক্ষয় হইলে পর (এই ধর্ম্ম) আবার নারায়ণের এখানে চলিয়া যাইবে। এই ধর্ম্ম এবং 'যতীনাং চাপি' অর্থাৎ ইহার সঙ্গেই সন্ন্যাসধর্ম্মও তোমাকে পূর্ব্বে ভগবদ্গীতায় বলিয়া দিয়াছি"—ইহা নারায়ণীয় ধর্ম্মেই বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন (মভা. শা. ৩৪৮. ৫১-৫৩)। ইহা হইতে দেখা যায় যে, যে দ্বাপরযুগের শেষে ভারতীয় যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ত্রেতাযুগেরই ভাগবতধর্ম্মের পরম্পরা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অধিক বর্ণন করেন নাই। এই ভাগবতধর্ম্মই যোগ বা কর্ম্মযোগ; এবং মনুকে এই কর্ম্মযোগের উপদেশ করিবার কথা, কেবল গীতাতে নহে, প্রত্যুত ভাগবত পুরাণেও (৮. ২৪. ৫৫) এই কথার উল্লেখ আছে এবং মৎস্যপুরাণের ৫২ম অধ্যায়ে মনুকে উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের মহত্বও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বর্ণনাই নারায়ণীয় উপাখ্যানে কৃত বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ নহে। বিবস্বান্-মনু এবং ইক্ষ্বাকুর পরম্পরা সাংখ্যমার্গের মোটেই উপযোগী নহে এবং সাংখ্য ও যোগ এই দুইয়ের অতি-রিক্ত তৃতীয় নিষ্ঠা গীতাতে বর্ণিতই হয় নাই, এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে অন্য প্রণালীতেও সিদ্ধ হয় যে, এই পরম্পরা কর্ম্মযোগেরই (গী. ২. ৩৯)। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ, এই দুই নিষ্ঠার পরম্পরা এক না হইলেও কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মের সিদ্ধান্তেই সাংখ্য বা সন্ন্যাসনিষ্ঠার সিদ্ধান্ত পর্য্যায়ক্রমে সমাবেশ হইয়া যায় (গী. র. পৃ)। এই কারণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতাতে যতিধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্মও বর্ণিত আছে। মনুস্মৃতিতে চার আশ্রমধর্ম্মের যে বর্ণনা আছে, উহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমে যতি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে ধর্ম্ম বলিবার পর বিকল্প হিসাবে "বেদ-সন্ন্যাসীদিগের কর্ম্মযোগ" এই নামে গীতা বা ভাগবত-ধর্ম্মের কর্ম্মযোগের বর্ণনা আছে এবং স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "নিস্পৃহতা দ্বারা নিজের কার্য্য করিতে থাকিলেই শেষে পরম সিদ্ধি লাভ হয়" (মনু ৬. ৯৬)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে কর্ম্মযোগ মনুরও গ্রাহ্য ছিল। এই প্রকারই অন্য স্মৃতিকারদিগেরও ইহা মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীতারহস্যের ১১ম প্রকরণের শেষে (পৃ) দেওয়া হইয়াছে। এখন এই পরম্পরা সম্বন্ধে অর্জ্জুনের এই সংশয় হইতেছে যে—]

অর্জ্জুন উবাচ।

§§ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥

অর্জ্জুন বলিলেন—(৪) তোমার জন্ম তো ইদানীং হইয়াছে এবং বিবস্বানের ইহার অনেক পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে; (এই অবস্থায়) আমি ইহা কি প্রকারে জানিব যে, তুমি (এই যোগ) পূর্ব্বে বলিয়াছ?

[অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতারসমূহের কার্য্য বর্ণন করিয়া আসক্তি-বিরহিত কর্ম্মযোগ বা ভাগবতধর্ম্মেরই পুনরায় সমর্থন করিতেছেন যে, "এই প্রকার আমিও কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি"—]

শ্রীভগবান বলিলেন—(৫) হে অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সেই সকল আমি জানি (এবং) হে পরন্তপ! তুমি জান না (ইহাই প্রভেদ)। (৬) আমি (সমস্ত) প্রাণীগণের প্রভু ও জন্মরহিত, যদিও আমার আত্মস্বরূপে কখনও ব্যয় অর্থাৎ

বিকার হয় না তথাপি নিজেরই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজের মায়ার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

[এই শ্লোকের অধ্যাত্মজ্ঞানে কাপিল-সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই মতের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্য-মতাবলম্বীদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি রচনা করে; কিন্তু বেদান্তী লোক প্রকৃতিকে পরমেশ্বরেরই এক স্বরূপ জানিয়া ইহা স্বীকার করেন যে, প্রকৃতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর তাঁহার প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সমস্ত জগত নির্ম্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 'মায়া' বলা হইয়াছে। এবং এইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই প্রকার বর্ণনা আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং" অর্থাৎ প্রকৃতিই মায়া এবং সেই মায়ার অধিপতি পরমেশ্বর (শ্বে. ৪. ১০.). এবং 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ'—ইহা হইতে মায়ার অধিপতি সৃষ্টি উৎপন্ন করেন (শ্বে. ৪. ৯)। প্রকৃতিকে মায়া কেন বলে, এই মায়ার স্বরূপ কি; এবং এই উক্তির অর্থ কি এই যে, মায়া হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়?—ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে করা হইয়াছে। ইহা বলিয়াছি যে, অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত কি প্রকারে হয়েন অর্থাৎ কর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে দেখা যায়; এখন খুলিয়া বলিতেছি যে, তিনি এইরূপ কখন্ এবং কি কারণে করেন—]

(৭) হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্ম প্রবলরূপে বিস্তৃত হয়, তখন (তখন) আমি স্বয়ংই জন্ম (অবতার) গ্রহণ করি। (৮) সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ এবং দুষ্টদিগের নাশের জন্য, যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি।

[এই দুই শ্লোকে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল পারলৌকিক বৈদিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু চারি বর্ণের ধর্ম্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও উহাতে মুখ্যরূপে সমাবেশ হয়। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যখন অন্যায়, দুর্নীতি, দুষ্টতা প্রবল হইয়া সাধুদিগের কষ্টদায়ক হয় এবং যখন দুষ্টদিগের প্রভাব অধিক হয়, তখন স্বরচিত জগতের সুস্থিতি বজায় রাখিয়া তাহার কল্যাণসাধনার্থ তেজস্বী ও পরাক্রান্ত পুরুষের রূপে (গী. ১০. ৪১) অবতার লইয়া ভগবান, সমাজের যে ব্যবস্থা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঠিক করিয়া দেন। এই রীতিতে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান যে কার্য্য করেন, তাহাকেই 'লোকসংগ্রহ'ও বলা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, এই কার্য্যই নিজ শক্তি ও অধিকার অনুসারে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরও করা উচিত (গী. ৩. ২০)। ইহা বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা যাইতেছে যে, এই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করেন তিনি কোন্ গতি লাভ করেন—]

§§ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

(৯) হে অর্জ্জুন! এবম্বিধ আমার দিব্যজন্ম ও দিব্য কর্ম্মের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ না করিয়া আমার সহিত মিলিত হয়েন। (১০) প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, মৎ-পরায়ণ এবং আমার আশ্রয়ে উপনীত অনেক লোক (এই প্রকার) জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আমার স্বরূপে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছেন।

[ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্যক যে, অব্যক্ত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা সগুণ কিরূপে হয়েন; এবং ইহা জানিলে অধ্যাত্মজ্ঞান হয় এবং দিব্য কর্ম্ম জানিয়া লইলে কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সারকথা, পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচয় হইয়া যায়; এবং মোক্ষলাভের জন্য ইহার প্রয়োজন থাকায় এই প্রকার মনুষ্যের শেষে ভগবৎপ্রাপ্তি না হইয়া যায় না। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম জন্মগ্রহণে সমস্তই আসিল; আবার অধ্যাত্মজ্ঞান অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করিতে হয় না। অতএব বক্তব্য এই যে, ভগবানের জন্ম ও কার্য্য আলোচনা কর, এবং উহার তত্ত্ব বুঝিয়া আচরণ কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাধনেরই অপেক্ষা নাই। ভগবানের ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এখন ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের উপাসনার ফল ও উপযোগিতা বলা হইতেছে—]

§§ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

(১১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাকে আমি সেই প্রকারেরই ফল দিই। হে পার্থ! যেদিক দিয়াই হোক, সকল দিক দিয়াই মনুষ্য আমারই পথে আসিয়া মিলিত হয়।

['মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি উত্তরার্দ্ধ প্রথমে (৩,

। ২৩) কিছু বিশেষ অর্থে আসিয়াছে, এবং ইহা হইতে। বুঝা যায় যে, গীতাতে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ অনুসারে অর্থ। কি প্রকার বদলাইয়া যায়। ইহা সত্য বটে যে, যে। কোন মার্গ ধরিয়া চলিলেই মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই। যায়, তথাপি ইহা জানা উচিত যে অনেক ব্যক্তি অনেক। মার্গে কেন যায়? এখন ইহার কারণ বলা হইতেছে—]

(১২) (কর্ম্মবন্ধনের নাশের নহে, কেবল) কর্ম্মফলের অভিলাষী ব্যক্তি এই লোকে দেবতাদিগের পূজা এই অভিপ্রায়ে করে যে, (এই) কর্ম্মফল (এই) মনুষ্যলোকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে।

। [এই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ে (২১, ২২) পুনর্ব্বার। আসিয়াছে। পরমেশ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ. । কিন্তু উহা তখনই পাওয়া যায়, যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া। একান্ত উপাসনার ফলে কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়; এই। প্রকার দূরদর্শী ও দীর্ঘ-উদ্যোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, অনেকে তো নিজের। উদ্যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা এই লোকেই কিছু-না-কিছু। প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার লোকই দেবতাদিগের পূজা। করে (গীতার. পৃঃ)। গীতা ইহাও বলেন যে, । পরোক্ষভাবে ইহাও তো পরমেশ্বরেরই পূজা এবং। বাড়িতে বাড়িতে এই যোগ পরিণামে নিষ্কাম ভক্তিতে। পর্য্যবসিত হইয়া শেষে মোক্ষপ্রদ হয় (গী. ৭. ১৯)। । পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য। পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে বলি-। তেছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কি করিতে হয়—]

§§ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

(১৩) (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকার) চারি বর্ণের ব্যবস্থা গুণ ও কর্ম্মভেদে আমি করিয়াছি। উহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি উহার কর্ত্তাও বটে আবার অকর্ত্তা অর্থাৎ উহা করি না, অব্যয় (আমিই)।

। [অর্থ এই যে, পরমেশ্বর কর্ত্তা হইলেই বা, কিন্তু। পরবর্ত্তী শ্লোকের বর্ণনানুসারে তিনি সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ, । এই কারণে অকর্ত্তাই (গী. ৫. ১৪)। পরমেশ্বরের। স্বরূপের 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' এই। প্রকার বিরোধাভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে (গী. । ১৩. ১৪)। চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ ও ভেদের নিরূপণ পরে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮, ৪১-৪৯) করা হইয়াছে। । এক্ষণে ভগবান "করিয়া অকর্ত্তা" এইরূপ নিজের যে। বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বলিতেছেন—]

(১৪) আমাতে কর্ম্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় না; (কারণ) কর্ম্মের ফলে আমার ইচ্ছা নাই। যে আমাকে এই প্রকার জানে, তাহার কর্ম্ম বন্ধক হয় না।

। [উপরে নবম শ্লোকে যে দুই বিষয় বলিয়াছি যে, । আমার 'জন্ম' ও 'কর্ম্ম' যে জানে সে মুক্ত হইয়া যায়, । তন্মধ্যে কর্ম্মের তত্ত্ব এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। । 'জানে' শব্দের দ্বারা এস্থলে "জানিয়া তদনুসারে আচরণে। প্রবৃত্ত" এইটা অর্থ বিবক্ষিত। ভাবার্থ এই যে, ভগ-। বানের কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হয় না, ইহার কারণ এই যে, । তিনি ফলাশা রাখিয়া কর্ম্মই করেন না; এবং ইহা। জানিয়া তদনুসারে যে চলে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয় না। । এক্ষণে, এই শ্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা। দৃঢ় করিতেছেন—]

(১৫) ইহা জানিয়া প্রাচীনকালের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্ম্ম করিতেন। এইজন্য পুরাকালীন লোকদিগের কৃত অতি প্রাচীন কর্ম্মই তুমি কর।

। [এই প্রকার মোক্ষ ও কর্ম্মের বিরোধ নাই, অতএব। অর্জ্জুনকে স্থির উপদেশ করিয়াছেন যে, তুমি কর্ম্ম কর। । কিন্তু সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে, "কর্ম্ম ছাড়িলে। অর্থাৎ অকর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়;" ইহার উপর। এই সংশয় আসে যে, এই প্রকার কথার মূল কি? । অতএব এক্ষণে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ। করিয়া তেইশতম শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অকর্ম্ম। কিছু কর্ম্মত্যাগ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মকেই অকর্ম্ম বলা। উচিত।]

§§ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবিবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

(১৬) কর্ম্ম কি আর অকর্ম্ম কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানদিগেরও ভ্রম হয়; (অতএব) এরূপ কর্ম্ম

তোমাকে শিখাইতেছি, যাহা জানিলে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

['অকর্ম্ম' নঞ্‌ সমাস। ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ = নঞ্‌ শব্দের 'অভাব' অথবা 'অপ্রাশস্ত্য' দুই অর্থ হইতে পারে; এবং ইহা বলা যায় না যে, এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবক্ষিত হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'বিকর্ম্ম' নামে কর্ম্মের তৃতীয় এক ভেদ করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে 'অকর্ম্ম' শব্দের দ্বারা, সন্ন্যাসমার্গী লোক যাহাকে 'কর্ম্মের স্বরূপত ত্যাগ' বলে সেই কর্ম্মত্যাগই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইতেছে। সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী বলে যে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও;' কিন্তু ১৮ম শ্লোকের টিপ্পনী হইতে দেখা যাইবে যে, এই বিষয় দেখাইবার জন্যই আলোচিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাসপন্থীদিগের কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত 'অকর্ম্ম' নহে, অকর্ম্মের মর্ম্মই আর কিছু।]

(১৭) কর্ম্মের গতি গহন; (অতএব) ইহা জানা আবশ্যক যে, কর্ম্ম কি এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকর্ম্ম (বিপরীত কর্ম্ম) কি এবং ইহাও জানিয়া লইতে হইবে যে অকর্ম্ম (কর্ম্ম না করা) কি। (১৮) কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম যিনি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত এবং সমস্ত কর্ম্ম-কর্ত্তা।

[ইহাতে এবং পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম খুলিয়া বলা হইয়াছে; ইহাতে যাহা কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদবর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (গী. ১৮. ৪-৭, ১৮ ২৩-২৫; ১৮. ২৬-২৮)। এখানে সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, দুই স্থলের কর্ম্ম-বিচারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দাঁড়াইল। কারণ টীকাকারেরা এই সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ বাধাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপত ত্যাগ করাই সন্ন্যাসপন্থীদিগের অভিপ্রেত, এই জন্য তাঁহারা গীতার 'অকর্ম্ম' পদের অর্থ টানাবুনা করিয়া নিজ পন্থার দিকে আনিতে চাহেন। মীমাংসকদিগের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম ইষ্ট, এই জন্য তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত আর সমস্ত কর্ম্মকেই 'বিকর্ম্ম' বলেন। ইহা ব্যতীত মীমাংসকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম-ভেদও ইহারই ভিতর আসিয়া যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রী নিজের আড়াই চাউলের খিচুড়ী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা রাখেন। সার কথা, চারিদিক হইতে এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে ইহা জানিয়া লওয়া কঠিন হয় যে, গীতা 'অকর্ম্ম' কাহাকে এবং বিকর্ম্ম' কাহাকে বলেন। অতএব প্রথম হইতেই এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গীতার যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মযোগীরই; কাম্য কর্ম্ম-কর্ত্তা মীমাংসকদিগের বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসপন্থীদিগের নহে। গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার করিয়া লইলে প্রথমে তো ইহাই বলিতে হয় যে, 'কর্ম্মশূন্যতা'র অর্থে 'অকর্ম্ম' এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে না অথবা কোন মনুষ্যই কখনও কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১); কারণ শোওয়া, ওঠা-বসা এবং জীবিত থাকা পর্য্যন্ত কেহই এড়াইতে পারে না। এবং যদি কর্ম্মশূন্যতা হওয়া সম্ভব না হয় তবে অকর্ম্ম কাহাকে বলিব তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার উপরে গীতা বলেন যে, কর্ম্মের অর্থে নিছক ক্রিয়া না বুঝিয়া উহা হইতে উৎপন্ন শুভ-অশুভ প্রভৃতি পরিণামের বিচার করিয়া কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বা অকর্ম্মত্ব স্থির কর। সৃষ্টির অর্থই যদি কর্ম্ম হয়, তবে মনুষ্য যে অবধি সৃষ্টিতে আছে, সেই অবধি তাহার কর্ম্ম দূর হয় না। অতএব কর্ম্ম ও অকর্ম্মের যে বিচার করিতে হইবে, তাহা এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে যে, মনুষ্যকে ঐ কর্ম্ম কতদূর বদ্ধ করিবে। করিলেও যে কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বলিতে হয় যে, উহার কর্ম্মত্ব অর্থাৎ বন্ধকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং যদি কোনও কর্ম্মের বন্ধকত্ব অর্থাৎ কর্ম্মত্ব এই প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তো সেই কর্ম্ম 'অকর্ম্ম'ই হইল। অকর্ম্মের প্রচলিত সাংসারিক অর্থ কর্ম্মশূন্যতা ঠিকই; কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে এস্থলে উহা ঠিক খাপ খায় না। কারণ আমি দেখিতেছি যে, চুপচাপ বসা অর্থাৎ কর্ম্ম না করাও অনেক সময়ে কর্ম্মই হইয়া যায়। উদাহরণ যথা, নিজের মা বাপকে কেহ যদি মারপিট করে, তবে উহাকে বাধা না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, সে সময়ে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অকর্ম্ম অর্থাৎ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা হইলেও কর্ম্মই— অধিক কি বলিব, বিকর্ম্ম; এবং কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে উহার অশুভ পরিণাম আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। অতএব গীতা এই শ্লোকে বিরোধাভাসের রীতিতে বড় জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, যিনি জানিয়াছেন যে অকর্ম্মেও (কখনো কখনো ভয়ানক) কর্ম্ম হইয়া যায়, এবং কর্ম্ম করিয়াও তাহা কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে মৃতবৎ, অর্থাৎ অকর্ম্ম হয়, তিনিই জ্ঞানী; এবং এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকে বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের বন্ধন না লাগিবার পক্ষে গীতাশাস্ত্র অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ

ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যাইবে (গী. র. পৃ   )। অতএব এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই গীতার মতে প্রশস্ত—সাত্ত্বিক—কর্ম্ম (গী. ১৮. ৯); এবং গীতার মতে তাহাই প্রকৃত 'অকর্ম্ম'। কারণ উহার কর্ম্মত্ব. অর্থাৎ কর্ম্মবিপাকের ক্রিয়া অনুসারে বন্ধকত্ব. ঘুচিয়া যায়। মনুষ্য যে কিছু কর্ম্ম করে (এবং 'করে' পদে চুপচাপ নিরিবিলি বসিয়া থাকারও সমাবেশ করিতে হইবে) তন্মধ্যে উক্ত প্রকারের অর্থাৎ 'সাত্ত্বিক কর্ম্ম' অথবা গীতা অনুসারে অকর্ম্ম সরাইয়া দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকিয়া যায় তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাজস ও তামস। তন্মধ্যে তামস কর্ম্ম মোহ ও অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য উহাকে বিকর্ম্ম বলে—আর যদি কোন কর্ম্ম মোহবশত ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাহা বিকর্ম্মই, অকর্ম্ম নহে (গী. ১৮. ৭)। এখন রহিল রাজস কর্ম্ম। এই কর্ম্ম প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাত্ত্বিক নহে অথবা গীতা যাহাকে সত্যসত্য 'অকর্ম্ম' বলেন, ইহা সে কর্ম্মও নহে। গীতা ইহাকে 'রাজস' কর্ম্ম বলেন; কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে এইপ্রকার রাজস কর্ম্মকে কেবল 'কর্ম্ম'ও বলিতে পারেন। তাৎপর্য্য, ক্রিয়াত্মক স্বরূপ অথবা খাঁটি ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম-অকর্ম্মের নির্দ্ধারণ হয় না; কিন্তু কর্ম্মের বন্ধকত্ব দ্বারা স্থির করা যায় যে ইহা কর্ম্ম বা অকর্ম্ম। অষ্টাবক্র-গীতা সন্ন্যাসমার্গের, তথাপি উহাতেও উক্ত হইয়াছে—

> নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
> প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী॥

অর্থাৎ মূর্খদিগের নিবৃত্তি (অথবা হঠবশত বা মোহের কারণে কর্ম্মের প্রতি বিমুখতা)ই প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম এবং পণ্ডিত লোকদিগের প্রবৃত্তি (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম) দ্বারাই নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের ফল-লাভ হয় (অষ্টা. ১৮. ৬১)। গীতার উক্ত শ্লোকে এই অর্থই বিরোধাভাসরূপ অলঙ্কারের রীতিতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। গীতোক্ত অকর্ম্মের এই লক্ষণ ভালরূপে না বুঝিলে গীতোক্ত কর্ম্ম-অকর্ম্মের বিচারের মর্ম্মও কখনও বুঝা যাইবে না। এখন এই অর্থকেই পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অধিক ব্যক্ত করা হইতেছে—]

(১৯) যাঁহার সমস্ত সমারম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন।

['জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়' ইহার অর্থে কর্ম্মত্যাগ করা নহে, কিন্তু এই শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, 'ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা,' এই অর্থই এস্থলে লইতে হইবে (গী. র. পৃ   )। এইপ্রকারই পরে ভগবদ্ভক্তের বর্ণনায় যে "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী"—সমস্ত আরম্ভ বা উদ্যোগত্যাগী—পদ আসিয়াছে (গী. ১২. ১৬; ১৪. ২৫) উহার অর্থের নির্ণয়ও ইহা দ্বারা হইয়া যাইতেছে। এখন এই অর্থকেই অধিক স্পষ্ট করিতেছেন—]

(২০) কর্ম্মফলের আসক্তি ছাড়িয়া যিনি সদাতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মফলসাধনের আশ্রয়-ভূত এ প্রকার বুদ্ধি রাখেন না যে, অমুক কার্য্যের সিদ্ধির জন্য অমুক কাজ করিতেছি)—বলিতে হয় যে—তিনি কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও কিছুই করেন না। (২১) আশীঃ অর্থাৎ ফলের বাসনাত্যাগী, চিত্তের সংযমকারী এবং সর্ব্ব-সঙ্গ হইতে মুক্ত পুরুষ কেবল শারীর অর্থাৎ শরীর বা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই কর্ম্ম করিবার কালে পাপের ভাগী হন না।

[কেহ কেহ বিংশ শ্লোকের নিরাশ্রয় শব্দের অর্থে 'গৃহ-সংসারত্যাগী' (সন্ন্যাসী) করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আশ্রয় অর্থে গৃহ বা ঘর বলা যায়; কিন্তু এস্থলে কর্ত্তার স্বয়ং থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ বিবক্ষিত নহে; অর্থ এই যে, তিনি যে কার্য্য করেন, তাহার হেতুরূপ ঠিকানা (আশ্রয়) কোথাও থাকে না। এই অর্থই গীতার ৬. ১ শ্লোকে 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং' এই শব্দগুলির দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং বামন পণ্ডিত গীতার যথার্থদীপিকা নামক প্রাকৃত মহারাষ্ট্রীয় টীকাতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এইপ্রকারই ২১শ শ্লোকে 'শারীর' অর্থে কেবল শরীর পোষণের জন্য ভিক্ষাটন প্রভৃতি কর্ম্ম নহে। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে "যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী লোক আসক্তি অথবা কাম্য-বুদ্ধি মনে না রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কর্ম্ম করেন" (৫. ১১) এই যে বর্ণনা আছে, উহার অর্থ এবং "কেবলং শারীরং কর্ম্ম" এই পদসমূহের অর্থ একই। ইন্দ্রিয়সমূহ তো কর্ম্ম করে; কিন্তু বুদ্ধি সম থাকিবার কারণে ঐ কর্ম্মসমূহের পাপপুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না।]

(২২) যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট, (হর্ষশোক প্রভৃতি) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, নির্ম্মৎসর, এবং (কর্ম্মের) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিকে যিনি একই বলিয়া মনে করেন সেই ব্যক্তি (কর্ম্ম) করিয়াও (তাহার পাপপুণ্যের দ্বারা) বদ্ধ হন না। (২৩) আসঙ্গরহিত, (রাগদ্বেষ হইতে) মুক্ত, (সাম্যবুদ্ধিরূপ) জ্ঞানে স্থিরচিত্ত এবং (কেবল) যজ্ঞের জন্যই (কর্ম্ম) করেন যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম বিলীন হইয়া যায়।

। [তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই যে ভাব আছে, যে মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং আসক্তি ছাড়িয়া করিলে সেই কর্ম্মই স্বর্গপ্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। "সমগ্র বিলীন হইয়া যায়" ইহাতে 'সমগ্র' পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংসকগণ স্বর্গসুখকেই পরম সাধ্য মনে করেন এবং উহারই দৃষ্টিতে স্বর্গসুখের প্রাপ্তিকারক কর্ম্ম বন্ধক হয় না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি স্বর্গ ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ মোক্ষের উপর আছে এবং এই দৃষ্টিতে স্বর্গপ্রদ কর্ম্মও বন্ধকই হয়। অতএব বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞার্থ কর্ম্মও অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে 'সমগ্র' লয় পায় অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়। তথাপি এই অধ্যায়ে যজ্ঞপ্রকরণ প্রতিপাদনে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের যজ্ঞপ্রকরণ প্রতিপাদনে এক গুরুতর ভেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শ্রৌত-স্মার্ত্ত অনাদি যজ্ঞচক্র স্থির রাখা উচিত। কিন্তু এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, যজ্ঞের এরূপ সঙ্কুচিত অর্থই ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে তিলতণ্ডুল বা পশু আহুতি দিবে অথবা চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসারে কাম্যবুদ্ধিতে করিবে। অগ্নিতে আহুতি ছাড়িবার সময় শেষে 'ইদং ন মম'—ইহা আমার নহে—এই শব্দগুলির উচ্চারণ করা হয়; ইহাতে স্বার্থত্যাগরূপ নির্ম্মমত্বের যে তত্ত্ব আছে, তাহাই যজ্ঞের প্রধান অংশ। এই প্রকারে "ন মম" বলিয়া অর্থাৎ মমতাযুক্ত বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ যজ্ঞ বা হোমই হইয়া যায়; এই যজ্ঞ দ্বারা দেবাধিদেব পরমেশ্বর অথবা ব্রহ্মের যজন করা হয়। সারকথা, মীমাংসকদিগের দ্রব্যযজ্ঞসম্বন্ধীয় যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহা এই বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী; এবং লোকসংগ্রহের জন্য জগতের আসক্তিরহিত কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ কর্ম্মের 'সমগ্র' ফল হইতে মুক্ত হইয়া শেষে মোক্ষ লাভ করেন (গী. র. পৃ.)। এই ব্রহ্মার্পণরূপ বৃহৎ যজ্ঞেরই বর্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা হইয়াছে এবং পুনরায় ইহা অপেক্ষা স্বল্পযোগ্য অনেক লাক্ষণিক যজ্ঞের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ২৩ম শ্লোকে সমগ্র প্রকরণের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে এইপ্রকার 'জ্ঞানযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।]

§§ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

(২৪) অর্পণ অর্থাৎ হোম করিবার ক্রিয়া ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ অর্পণ করিবার দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম হোম করিয়াছেন—(এই প্রকার) যাঁহার বুদ্ধিতে (সমস্ত) কর্ম্মই ব্রহ্মময়, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

। [শাঙ্করভাষ্যে 'অর্পণ' শব্দের অর্থ 'অর্পণ করিবার সাধন অর্থাৎ আচমনপাত্র ইত্যাদি' আছে; কিন্তু ইহা কিছু কঠিন। ইহা অপেক্ষা, অর্পণ=অর্পণ করিবার বা হবন করিবার ক্রিয়া, এই অর্থ অধিক সরল। ইহা ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যজ্ঞকর্ত্তার বর্ণনা হইল। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিতে কৃত যজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন—]

(২৫) কোন কোন (কর্ম্ম-) যোগী (ব্রহ্মবুদ্ধির বদলে) দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশে যজ্ঞ করেন; এবং কেহ ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের যজন করেন।

। [পুরুষসূক্তে বিরাটরূপী যজ্ঞপুরুষের, দেবতাদের দ্বারা, যজন হইবার যে বর্ণনা আছে—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" (ঋ. ১০. ৯০. ১৬) তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ উক্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞং যজ্ঞেনোপজুহ্বতি' এই পদ ঋগ্বেদের 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত' এই পদের সহিত সমানার্থকই দেখা যাইতেছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টির আরম্ভে এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে যে বিরাটরূপী পশুর হবন করা হইয়াছিল সেই পশু, এবং যে দেবতার যজন করা হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ হইবে। সারকথা, ২৪ম শ্লোকের এই বর্ণনই তত্ত্বদৃষ্টিতে ঠিক যে, সৃষ্টির সকল পদার্থে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ভরিয়া আছেন, এই কারণে ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহার করিতে করিতে ব্রহ্মের দ্বারাই সর্ব্বদা ব্রহ্মের যজন হইতে থাকে, কেবল বুদ্ধি ঐপ্রকারই হওয়া চাই। পুরুষসূক্তকে লক্ষ্য করিয়া গীতাতে এই একমাত্র শ্লোক নহে, প্রত্যুত

পরে দশম অধ্যায়েও (১০. ৪২) এই সূক্ত অনুযায়ী বর্ণনা আছে। দেবতার উদ্দেশে কৃত যজ্ঞের বর্ণনা শেষ হইল; এখন অগ্নি, হবি ইত্যাদি শব্দের লাক্ষণিক অর্থ লইয়া বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি পাতঞ্জল-যোগের ক্রিয়া অথবা তপশ্চরণও এক প্রকার যজ্ঞ—]

(২৬) এবং কেহ শ্রোত্র প্রভৃতি (কান, চোখ প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন এবং কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে (ইন্দ্রিয়সমূহের) শব্দ আদি বিষয়সমূহের হবন করেন। (২৭) এবং কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে হবন করেন।

[এই শ্লোকগুলিতে দুই তিন প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা আছে; যথা (১) ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম করা অর্থাৎ উহাদিগকে যথাযুক্ত সীমার ভিতরে নিজ নিজ ব্যবহার করিতে দেওয়া; (২) ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় অর্থাৎ উপভোগের পদার্থ সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা; কেবল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ব্যাপার বন্ধ করিয়া পূর্ণসমাধি লাগাইয়া কেবল আত্মানন্দেই মগ্ন থাকা। এখন এগুলিকে যজ্ঞের উপমা দিলে, প্রথম ভেদে ইন্দ্রিয়সমূহকে মর্য্যাদাবদ্ধ করিবার ক্রিয়া (সংযমন) অগ্নি হইল, কারণ দৃষ্টান্তস্বরূপে ইহা বলা যায় যে, এই মর্য্যাদার ভিতরে যা কিছু আসে, তাহার উহাতে হবন হইয়া গেল। এই প্রকারই দ্বিতীয় ভেদে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গণ হোমদ্রব্য এবং তৃতীয় ভেদে ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ উভয় মিলিত হইয়া হোম করিবার দ্রব্য হইয়া যায় এবং আত্মসংযমন অগ্নি। ইহার অতিরিক্ত এমনও লোক আছেন, যাঁহারা কেবল প্রাণায়াম ক্রিয়া করেন, উহাদের বর্ণনা ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে আছে। 'যজ্ঞ' শব্দের মূল অর্থ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকে লক্ষণা দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার সাধনের এক 'যজ্ঞ' শীর্ষেই সমাবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্গীতার এই কল্পনা কিছু নূতন নহে। মনুস্মৃতির চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—এই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ কোন গৃহস্থই ছাড়িবে না; এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, ইহার বদলে কেহ কেহ "ইন্দ্রিয়সমূহে বাণীর হবন করিয়া, বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাও পরমেশ্বরের যজন করে" (মনু. ৪. ২১-২৪)। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যাইবে যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রৌত গ্রন্থসমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়াছে; এবং যখন পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা, সন্ন্যাসের দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মার্গ অধিকাধিক প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিয়া উহাতেই মোক্ষের সমগ্র উপায়সমূহের লক্ষণা দ্বারা সমাবেশ করা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। ইহার মর্ম্ম ইহাই যে, পূর্ব্বে যে শব্দ ধর্ম্মের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, তাহারই উপযোগ পরবর্ত্তী ধর্ম্মমার্গের জন্যও করা যাইবে। যাহাই হোক; মনুস্মৃতির আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, গীতার পূর্ব্বে, অন্তত তাহার সমসময়ে, উক্ত কল্পনা সর্ব্বমান্য হইয়া গিয়াছিল।

(২৮) এই প্রকার তীব্র ব্রত আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষ কেহ দ্রব্যরূপ, কেহ তপরূপ, কেহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য স্বকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ, এবং কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। (২৯) প্রাণায়ামে তৎপর হইয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণবায়ু অপানে (হবন করেন) এবং কেহ অপান বায়ু প্রাণে হবন করেন।

[এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে প্রাণায়াম করাও এক যজ্ঞই। এই পাতঞ্জল-যোগরূপ যজ্ঞ ২৯ম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব ২৮ম শ্লোকের "যোগরূপ যজ্ঞ" পদের অর্থ কর্ম্মযোগরূপ যজ্ঞ করিতে হয়। প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দের দ্বারা শ্বাস ও উচ্ছ্বাস, উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণ=বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছ্বাস বায়ু, এবং অপান=অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওয়া হয় (বে. সূ. শাং ভা. ২. ৪. ১২; এবং ছান্দোগ্য. শাং ভা. ১. ৩. ৩)। মনে রেখো যে, প্রাণ ও অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। এই অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের—উচ্ছ্বাসের—হোম করিলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয়; এবং ইহার বিপরীত প্রাণে অপানের হোম করিলে রেচক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ ও অপান উভয়কেই নিরুদ্ধ করিলে সেই প্রাণায়ামই কুম্ভক হইয়া যায়। এখন ইহা ব্যতীত ব্যান, উদান, ও সমান এই তিনটী বাকী থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থলে থাকে, যাহা ধনুক টানা, ওজন উঠানো প্রভৃতি দম টানিয়া বা অর্দ্ধেক শ্বাস ছাড়িয়া জোর লাগিবার কার্য্যে ব্যক্ত হয় (ছা. ১. ৩. ৫)। মৃত্যুকালে যে বায়ু বহির্গত হয় তাহাকে উদান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৭), এবং সমস্ত শরীরে সর্ব্ব-

স্থানে একবিধ অন্নরস লইয়া যায় যে বায়ু তাহাকে সমান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৫)। এইপ্রকারে বেদান্ত-শাস্ত্রে এই শব্দগুলির সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষা বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয়। উদাহরণ যথা, মহাভারতের (বন পর্ব্বে) ২১২র অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বায়ুর বিশেষ লক্ষণই আছে, উহাতে প্রাণের অর্থ মস্তকের বায়ু এবং অপানের অর্থ নিম্নে বহির্গমনশীল বায়ু হইতেছে (প্রশ্ন ৩. ৫ এবং মৈত্র্য ২. ৬)। উপরের শ্লোকে যে বর্ণনা আছে, তাহার এই অর্থ যে, ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ করা হয়, তাহার অন্য বায়ুতে হোম হয়।]

(৩০-৩১) এবং কেহ কেহ আহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণেরই হোম করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞ জানেন, যাঁহার পাপ যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে (এবং যে ব্যক্তি) অমৃত (অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট) উপভোগ করেন, তাঁহারা সকলেই সনাতন ব্রহ্মে যাইয়া মিলিত হন। যে যজ্ঞ করে না তাহার (যখন) এই লোকে সফলতা হয় না, (তখন) ফের হে কুরুশ্রেষ্ঠ! (সে) পরলোক কোথা হইতে (পাইবে)?

[সার কথা, যজ্ঞ করা যদিও বেদের আদেশ অনুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তথাপি এই যজ্ঞ একই প্রকারের হয় না। প্রাণায়াম কর, তপস্যা কর, বেদ অধ্যয়ন কর, অগ্নিষ্টোম কর, পশুযজ্ঞ কর, তিলতণ্ডুল অথবা ঘিয়ের হবন কর, পূজা-পাঠ কর বা নৈবেদ্য-বৈশ্বদেব প্রভৃতি পঞ্চ গৃহযজ্ঞ কর; ফলাসক্তি দূর হইলে এ সকল ব্যাপক অর্থে যজ্ঞই হয় এবং ফের যজ্ঞ-শেষ ভক্ষণের বিষয়ে মীমাংসকদিগের যে সিদ্ধান্ত আছে, সে সমস্ত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক যজ্ঞের পক্ষে উপযুক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই যে, "যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না" এবং ইহার বর্ণনা ২৩ম শ্লোকে করা হইয়াছে (গী. ৩. ৯.এর উপর টিপ্পনী দেখ)। এখন দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থ পঞ্চমহাযজ্ঞের পর অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করানো শেষ হইলে পরে নিজের পত্নীসহ ভোজন করিবে; এবং এই প্রকার ব্যবহার করিলে গৃহস্থাশ্রম সফল হইয়া সদ্‌গতি দেয়। "বিঘসং ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতং" (মনু. ৩. ২৮৫) অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহা বাকী থাকে তাহা 'বিঘস' এবং যজ্ঞ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'অমৃত' উক্ত হয়; এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতিগুলিতেও উক্ত হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য বিঘসাশী ও অমৃতাশী হওয়া উচিত (গী. ৩. ১৩ ও গী. র. পৃ. দেখ)। এখন ভগবান বলিতেছেন যে সাধারণ গৃহযজ্ঞের উপযোগী এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বপ্রকার উক্ত যজ্ঞসমূহের উপযোগী হয়। যজ্ঞার্থে কৃত কোন কর্ম্মই বন্ধক হয় না, ইহাই নহে কিন্তু ঐ কর্ম্মসমূহের মধ্যে অবশিষ্ট কর্ম্ম যদি স্বয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাহা বন্ধক হয় না (গী. র. পৃ)। "যজ্ঞ বিনা ইহলোকও সিদ্ধ হয় না" এই বাক্য তত্ত্ব ও মহত্ত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ এইটুকুই নহে যে, যজ্ঞ ব্যতীত বৃষ্টি হয় না এবং বৃষ্টি না হইলে এই লোকের জীবননির্ব্বাহ হয় না; কিন্তু 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া, এই সামাজিক তত্ত্বেরও ইহাতে পরোক্ষভাবে সমাবেশ হইয়াছে যে, নিজের প্রিয় কোন কোন বিষয় না ছাড়িলে সকলের একই প্রকার সুবিধাও ঘটে না, আর না জগতের ব্যবহারই চলিতে পারে। উদাহরণ যথা—পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রপ্রণেতা এই যে সিদ্ধান্ত বলেন যে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতাকে পরিমিত না করিলে অন্যদের এক প্রকার স্বতন্ত্রতা লাভ হয় না, উহাই এই তত্ত্বের এক উদাহরণ। এবং, যদি গীতার পরিভাষায় এই অর্থই বলিতে হয় তবে এইস্থলে এইপ্রকার যজ্ঞপ্রধান ভাষারই প্রয়োগ করিতে হইবে যে, "যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্রতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে, সে পর্য্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চলিতে পারে না"। এইপ্রকার ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ দ্বারা যখন ইহা স্থির হইল যে, যজ্ঞই সমস্ত সমাজরচনার আধার; তখন বলা বাহুল্য যে, কেবল কর্ত্তব্যদৃষ্টিতে 'যজ্ঞ' করা যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত সমাজের ব্যবস্থা ঠিক থাকিবে না।]

(৩২) এই প্রকার নানাবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের (ই) মুখে বজায় আছে। ইহা জান যে, সে সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

[জ্যোতিষ্টোম আদি দ্রব্যময় শ্রৌত যজ্ঞ অগ্নিতে হবন করিয়া করা হয় এবং শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্নি; এই কারণে এই যজ্ঞ ঐ দেবতারা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে—অগ্নিতে—উক্ত লাক্ষণিক যজ্ঞ হয় না অতএব এই সকল লাক্ষণিক যজ্ঞের দ্বারা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে; তবে তাহা দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই মুখে হয়। দ্বিতীয় চরণের ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞবিধির এই ব্যাপক স্বরূপ—কেবল মীমাংসকদিগের সঙ্কীর্ণ অর্থই নহে—জানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ থাকে না, কিন্তু তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার অধিকারী হয়েন। এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কি—]

(৩৩) হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময়

যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ! সর্ব্ববিধ সমস্ত কর্ম্মের পর্য্যবসান জ্ঞানেতে হয়।

[গীতায় 'জ্ঞানযজ্ঞ' শব্দ দুইবার পরেও আসিয়াছে (গী. ৯. ১৫ ও ১৮. ৭০)। আমি যে দ্রব্যময় যজ্ঞ করি, তাহা পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য করি। কিন্তু পরমেশ্বর-প্রাপ্তি তাঁহার স্বরূপজ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান লাভের পর ঐ জ্ঞান অনুসারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বর লাভ করিবার এই মার্গ বা সাধনকে 'জ্ঞানযজ্ঞ' বলে। এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধি-সাধ্য, অতএব দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। মোক্ষশাস্ত্রে জ্ঞানযজ্ঞের এই জ্ঞানই মুখ্য এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। যাহাই হৌক, গীতার ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ-লাভ হয় না। তথাপি "কর্ম্মের পর্য্যবসান জ্ঞানে হয়" এই বচনের ইহা অর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে—এই বিষয় গীতারহস্যের দশম ও একাদশ প্রকরণে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আপনার জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কর্ম্মই করিতেই হইবে, এবং যখন তাহা জ্ঞান ও সমবুদ্ধি সহকারে করা হয়, তখন উহার পাপপুণ্যের বন্ধন কর্ত্তাকে লাগে না (পরে ৩৭ম শ্লোক দেখ) এবং এই জ্ঞানযজ্ঞ মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব গীতার সকল লোকের প্রতি ইহাই উপদেশ যে, যজ্ঞ কর, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর।]

§§ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥
অপি বেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥

(৩৪) মনে রেখো যে, প্রণিপাতের দ্বারা, প্রশ্ন করিলে এবং সেবা দ্বারা তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে ঐ জ্ঞানের উপদেশ করিবেন; (৩৫) যে জ্ঞান পাইয়া হে পাণ্ডব! ফের তোমার এই প্রকার মোহ হইবে না এবং যে জ্ঞানযোগে সমস্ত প্রাণীগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে।

[সমস্ত প্রাণীগণকে আপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখিবার, সমস্ত প্রাণীমাত্রে যে ঐক্যজ্ঞান পরে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ২৯), তাহারই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলে আত্মা ও ভগবান উভয়ে একরূপ, অতএব আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর সমাবেশ হয়; অর্থাৎ ভগবানেও উহার সমাবেশ হইয়া আত্মা (তে) অন্য প্রাণী ও ভগবান এই ত্রিবিধ ভেদ নষ্ট হয়। এই জন্যই ভাগবত পুরাণে ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ দিবার কালে বলা হইয়াছে যে, "সমস্ত প্রাণীকে ভগবানে এবং আপনাতে যিনি দেখেন, তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলিতে হইবে" (ভাগ. ১১. ২. ৪৫)। এই মহত্বপূর্ণ নীতি-তত্ত্বে বেশী খুলিয়া ব্যাখ্যা গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ.) এবং ভক্তিদৃষ্টিতে ত্রয়োদশ প্রকরণে (পৃ.) করা হইয়াছে।]

(৩৬) সকল পাপী অপেক্ষা যদি অধিক পাপী হও, তথাপি (এই) জ্ঞাননৌকা দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার করিয়া যাইবে। (৩৭) যে প্রকার প্রজ্বলিত অগ্নি (সমস্ত) ইন্ধন ভস্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকারই হে অর্জ্জুন! (এই) জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে (শুভ-অশুভ বন্ধনকে) জ্বালাইয়া দেয়।

[জ্ঞানের মহত্ত্ব বলিলেন। এখন বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান কি উপায়ে লাভ হয়—]

§§ ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥

(৩৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্য-সত্যই আর কিছুই নাই। সময়ে পাইয়া যাহার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি স্বয়ংই আপনাতে ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত করায়।

[৩৭ম শ্লোকে 'কর্ম্মের' অর্থ 'কর্ম্মের বন্ধন' (গী. ৪. ১৯)। নিজের বুদ্ধিতে আরব্ধ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করা, জ্ঞানপ্রাপ্তির মুখ্য বা বুদ্ধিগম্য মার্গ। কিন্তু যে নিজে এই প্রকার নিজের বুদ্ধিতে জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্য এখন শ্রদ্ধার দ্বিতীয় মার্গ বলিতেছেন—]

(৩৯) যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া উহারই পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, সে (ও) এই জ্ঞান লাভ করে; এবং জ্ঞান লাভ করিলে শীঘ্রই সে পরম শান্তি লাভ করে।

[সারকথা, বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও তাহাই পাওয়া যায় (গী. ১৩. ২৫ দেখ)।]

(৪০) কিন্তু যাহার স্বয়ং জ্ঞানও নাই আর শ্রদ্ধাও নাই, সেই সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহলোক আছে (আর) না পরলোক, এবং সুখও নাই।

[জ্ঞানলাভের এই দুই মার্গ বলিয়া আসিয়াছি, এক

। বুদ্ধির এবং দ্বিতীয় প্রকার। এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—]

(৪১) হে ধনঞ্জয়! যে আত্মজ্ঞানী-ব্যক্তি (কর্ম্ম-) যোগের আশ্রয়ে কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার (সমস্ত) সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কর্ম্ম বদ্ধ করিতে পারে না। (৪২) এইজন্য নিজের হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা কাটিয়া (কর্ম্ম-) যোগকে অবলম্বন কর। (এবং) হে ভারত! (যুদ্ধের জন্য) দাঁড়াও!

[ঈশাবাস্য উপনিষদে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'র পৃথক উপযোগ দেখাইয়া যে প্রকার উভয়কে ত্যাগ না করিয়াই আচরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে (ঈশ. ১১; গী· র. পৃঃ); সেই প্রকারই গীতায় এই দুই শ্লোকে জ্ঞান ও (কর্ম্ম-) যোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া উহার অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের সমুচ্চয়েই কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই দুইয়ের পৃথক-পৃথক উপযোগ এই যে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম করিলে পর উহার বন্ধন টুটিয়া যায়, এবং উহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের সন্দেহ দূর হইয়া মোক্ষলাভ হয়। অতএব শেষ উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার না করে, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় করিয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধের জন্য দাঁড়াইয়া থাকা উচিত ছিল, এই কারণে গীতারহস্যের পৃষ্ঠায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, যোগ শব্দের অর্থে এখানে 'কর্ম্মযোগ'ই ধরিতে হইবে। জ্ঞান যোগের এই মিলনই "জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ" পদের দ্বারা দৈবী সম্পত্তির লক্ষণে (গী. ১৬. ১) আবার বলা হইয়াছে।]

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বাদে, জ্ঞানকর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

[মনে থাকে যেন, 'জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস' পদে 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থে স্বরূপত 'কর্ম্মত্যাগ' নহে, কিন্তু নিষ্কামবুদ্ধিতে পরমেশ্বরে কর্ম্মের :সন্ন্যাস অর্থাৎ 'অর্পণ করা।' এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে উহাই খুলিয়া বলা হইয়াছে।]

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজকর্ম।

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই কিশোরীচাঁদ তদানীন্তন লিগাল রিমেম্ব্রানসার মিঃ আলেকজাণ্ডারের অধীনে কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী মিষ্টার থিওবোল্ডের অধীনে কিছুদিন কার্য্য করেন। কিন্তু এ সকল কার্য্য তাঁহার রুচির অনুরূপ ছিল না। সুতরাং তিনি এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ২৪ পরগণার তদানীন্তন প্রধান সদর আমীন (প্যারীচাঁদের অন্যতম পরমবন্ধু) হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলিপুর বিচারালয়ে বিচারবিভাগীয় কার্য্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি-লাভার্থ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিচারবিভাগীয় কার্য্যসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেন। ইহার কিছু পরে মিষ্টার হেনরী টরেন্স এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের কার্য্যের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করায় প্যারীচাঁদ তাঁহার ভ্রাতার সম্মতি লইয়া তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলে কিশোরীচাঁদ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্ম তাঁহার রুচির সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল এবং তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চায়ও বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার কার্য্য তদানীন্তন সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ মনঃপূত হইয়াছিল।

এই সময়ে কিশোরীচাঁদ তাঁহার জীবনের আদর্শ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল হরকরা' এই প্রস্তাবের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেন"We understand it is the production of a young educated native and it is altogether the best account we have ever seen of Rammohun, especially of his early life." 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'ও এই প্রবন্ধের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ভাষার মাধুর্য্যে, রচনার পারিপাট্যে, যুক্তির সারবত্তায় ও বর্ণনার অকৃত্রিমতায় ঐ প্রবন্ধ পাঠকমাত্রেরই নিকট অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটী গভর্ণর গুণগ্রাহী মিষ্টার (পরে সার ফ্রেডরিক) হ্যালিডে উহা পাঠ করিয়া এত প্রীত হন যে, তিনি কিশোরীচাঁদকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

তখন এ কার্য্যে ভারতীয়গণকে প্রায় নিযুক্ত করা হইত না এবং এই পদ অত্যন্ত সম্মানের বলিয়া বিবেচিত হইত। কিশোরীচাঁদ এই অযাচিত দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, "ইংরাজী ১৮৪২ সালে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সামরিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারিচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে তাঁহার ঐ জীবনী-প্রণয়নে মহাখ্যাতাপন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ডাক্তার ডফ্ সাহায্য করেন। ঐ জীবনী কিশোরী বাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটারী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনীরচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই।"

ডাক্তার ডফ্ যে উক্ত প্রবন্ধরচনায় সাহায্য করেন এই জনশ্রুতির মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা বিবেচ্য। ডাক্তার ডফ্ ঐ সময়ে 'কলিকাতা রিভিউ' সম্পাদন করিতেছিলেন। প্রাগুক্ত সংখ্যায় ভারতবাসীর শিক্ষা—(The Education of the People of India, its political importance and advantages) নামক একখানি পুস্তিকার সমালোচনায় ইংরাজী শিক্ষার কত দূর উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা প্রদর্শন করাইয়া উপসংহারে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"And when, in the spirit of the remarks there made, we simply state that the article in the present number, on RAMMOHAN ROY is *bonafide* the production of an educated Hindu, we think we have furnished a fresh argument to the friends of sound education to persevere more earnestly than ever in their philanthropic labours."

এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে, কিশোরীচাঁদ ডাক্তার ডফের নিকট বিশেষ কোনও সাহায্য লন নাই। ডাক্তার ডফ্ তৎকালে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সম্পাদক এবং কিশোরীচাঁদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই দুই কারণে এবং উক্ত প্রবন্ধের ভাষার লালিত্যে ও বিশুদ্ধিতে বিস্মিত তাৎকালীন ব্যক্তিবৃন্দের কল্পনা উক্ত জনশ্রুতির জনক বলিয়া অনুমান হয়। রাজনারায়ণ বাবুর আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত অংশটির শেষ ভাগে যাহা লিখিত আছে তাহা কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধরচনাসম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণস্বরূপ। কিশোরীচাঁদ কোনও বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নোটবুকে লিখিয়া রাখিতেন। বহু স্থান হইতে এবং বহু ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইত। পরে অবসর মত তিনি সেইগুলি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন ও চিন্তা করিতেন। উহার অনেক পরে প্রকৃত রচনা আরব্ধ হইত। এই জন্য কিশোরীচাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যেও এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থের উপকরণ লুক্কায়িত আছে। অথচ তাঁহার রচনার মধ্যে ভাবগুলি এরূপ ভাবে বিবৃত আছে যে, তাহা বহু চিন্তার পর সযত্নলিখিত বোধ না হইয়া নিতান্ত স্বাভাবিকতার সহিত লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় রামমোহন রায়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিতলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জন্যই কিশোরীচাঁদের উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। * বলা বাহুল্য 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত কিশোরীচাঁদের এই সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধটি সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লিখিত।

প্যারীচাঁদের রচিত ডেভিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল তারিখসম্বলিত একখানি পত্রে কিশোরীচাঁদ রাজসাহী গমনের জন্য হেয়ার-স্মৃতিসভার সম্পাদকের পদত্যাগ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে জ্ঞাপন করেন। সুতরাং উক্ত সময়েই যে তিনি রাজশাহীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম তথায় গমন করেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি আর একটি সাংসারিক সুখের অধিকারী হন। ১২৫২ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ কিশোরীচাঁদ একটি পুত্র লাভ করেন। কিন্তু ইহার ঠিক এক বৎসর পরেই বৈশাখ মাসে তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রলাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কিশোরীচাঁদের কোমল হৃদয় পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত একখানি অসমাপ্ত জীবনচিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, তখন তিনি এতদূর শোকাচ্ছন্ন হন যে, ১০।১২ দিন শয্যাগত থাকেন এবং তিনি ও তাঁহার বন্ধু 'নবনারী'-প্রণেতা ৺ নীলমণি বসাক মহাশয় (যাঁহার বাসায় কিশোরীচাঁদ তৎকালে অবস্থান

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত, "দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন"।

করিতেছিলেন) উভয়ে কয়েক দিবস কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। *

কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি কত দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? কর্ম্মের কি মহিমা! যখন কোনও কর্ম্মব্রত মহাত্মা হৃদয়ের একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সাংসারিক সকল চিন্তা দূর হয়। কিশোরীচাঁদ কর্ম্মের আহ্বান শ্রবণ করিলেন। অবসাদ উদ্যমে পরিণত হইল। কিশোরীচাঁদ অবিচলিত উৎসাহের সহিত দেশের কল্যাণকল্পে সচেষ্ট হইলেন।

কিশোরীচাঁদ সর্ব্বপ্রথমে রামপুর বোয়ালিয়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। রামপুরে বিদ্যালয় প্রভৃতির উন্নতিকল্পে তিনি অশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরামর্শে বাবু লোকনাথ মৈত্র রামপুর বোয়ালিয়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কেবল বালকগণের উন্নতিবিষয়ে যত্নবান ছিলেন না; পরন্ত বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে সময়ে ব্রিটিশভারতের রাজধানীতেও শিক্ষিত হিন্দুগণ বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, যখন কন্যাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছিল, সেই সময়ে সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত রামপুর বোয়ালিয়াতে বালিকাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা যে কতদূর দুঃসাধ্য কার্য্য ছিল তাহা আজিকার দিনে অনুভব করা অসম্ভব। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকালে কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক পঠিত কার্য্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ কল্যাণকর কার্য্যে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

"It now numbers six girls ;but the commitee expect many accessions soon, several respectable natives having promised to send in their daughters. The committee are fully aware of the difficulties inseparable from the introduction of female education in this district. The prejudices of some of the most respectable zemindars here would oppose a formidable resistace They will have also to contend against the apathy of not only their ignorant and illiterate countrymen but many of those who appreciate it and should lend them their co-operation. The successful example, however, set by the Hon'ble Mr. Drinkwater Bethune in Calcutta is very encouraging and ought to be followed in every part of the country. The recognition of female education by Government will, they also believe, greatly facilitate the accomplishment of this great object."

কিন্তু কেবল শিক্ষাবিস্তারেই কিশোরীচাঁদের দেশহিতৈষণা সীমাবদ্ধ ছিল না। যাহাতে জনসাধারণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি ১২৫৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন। প্রতি বুধবারে ইহার অধিবেশন হইত। কিশোরীচাঁদ এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। বোধ করি, এই সভাটি Hindu Theophilanthropic Societyর আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃতিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পুরাতন কাগজপত্রাদি দেখিয়া এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ তথ্যসংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রজলাল দাস মহাশয় ১৫ই জুন ১৯১০ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—

"In compliance with your letter of the 7th ultimo, I made a thorough search in the old records of the Samaj and consulted with the old friends of the time of your great-grand-father the late Babu Kissory Chand Mitra ; but I regret to let you know that this 'Rampur Boalia Brahmo Samaj' was not established by him. The late Maharshi Devendranath Tagore of Calcutta laid the foundation stone of the Samaj in 1273 B. S. Mr. Mitter was the Sub-divisional Officer of Nator in this District ; and what he did, he did possibly at Nator. He used to come here occasionally for his official business and delivered lectures in the meetings then held at the Samaj."

* নীলমণি বাবু তৎকালে কমিশনারের পার্শনাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন।

আমাদের বোধ হয়, ব্রজলাল বাবু পুরাতন কাগজপত্রে দেখিয়া থাকিবেন যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৭৩ সালে সমাজের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং কিশোরীচাঁদের পুরাতন বন্ধুবর্গের নিকট শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে কিশোরীচাঁদ মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার পত্রাংশে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, কিশোরীচাঁদ ১২৭৩ সালের বহু পূর্ব্বে রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং উহার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাজশাহীতে ছিলেন। সুতরাং তিনি সমাজে বক্তৃতা দিতেন, স্বীকার করিলে ১২৭৩ সালের বহু পূর্ব্বে সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের উপরিলিখিত বিবরণ কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত প্রাগুল্লিখিত জীবনচিত্র হইতে গৃহীত। এবং তিনি যখন সে সময়ে রাজশাহীতে ছিলেন তখন তাঁহার লিখিত বিবরণের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ বিদ্যমান নাই। মফঃস্বলস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের আগ্রহের অভাবে সমাজ লুপ্ত এবং পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রামপুর বোয়ালিয়া সমাজের ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং সম্ভবতঃ কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর উহা বিলুপ্ত হয় এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সমাজগৃহের ভিত্তিস্থাপন হয়।

রাজশাহীতে অবস্থানকালে ১২৫৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে কিশোরীচাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সবডিভিসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে কিশোরীচাঁদ ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া নাটোর সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' 'কিশোরীচাঁদ মিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যে পাঁচ বৎসর কয়েক মাস কিশোরীচাঁদ নাটোরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়টি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর ও গৌরবময় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দেশবাসী উদার মত, সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ও উচ্চতম আশা লইয়া দেশের একটি সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন জিলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে, অনেকে যাহা প্রাপ্ত হন না,—কিশোরীচাঁদ তাহা পাইলেন। তাঁহার শক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে এবং যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ভাগ্য বিজড়িত হইল তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণার্থ পরিচালন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগলাভ ঘটিল। কিশোরীচাঁদ সে সুযোগ হারাইলেন না। প্রথম হইতেই তিনি জিলার উন্নতিকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। শীঘ্রই তিনি জিলার মধ্যে একজন মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা দেশবাসীর মঙ্গলার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তিনি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, ঔষধালয়-স্থাপন, জলাশয়-খনন, পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং দেশবাসীর শারীরিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রাজশাহিতে তাঁহার নাম আজিও সকলে স্মরণ করেন এবং বহুদিন স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।"

নাটোরে অবস্থানকালে কিশোরীচাঁদের সহিত দীঘাপতিয়ার রাজা (তখন বাবু) প্রসন্ননাথ রায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অতি শুভক্ষণে এই দুই জনের বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। দুই জনের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজশাহি কয়েক বৎসরের মধ্যে হেয়তম অবস্থা হইতে দেশের একটি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জিলায় পরিণত হইয়াছিল। প্রসন্ননাথ যথার্থই একজন মহাত্মা ছিলেন। "রাজশাহীর রাজগণ" ("Rajas of Rajashye") নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"The unselfish life of the Raja, devoted to patriotic objects, challenges our unqualified admiration. The ancestors of Raja Prasanna Nath Roy were no doubt charitable. But his charity was discriminating. It was not exercised on Sraddhas and Nautches. It was not displayed in ostentatious manifestations. It sought proper objects and aimed at proper means" অর্থাৎ "এই রাজার দেশহিতে চিরনিয়োজিত নিঃস্বার্থ জীবন আমাদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। রাজা প্রসন্ননাথের পূর্ব্বপুরুষগণও দাতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহার দান অতি বিবেচনার সহিত প্রদত্ত হইত। শ্রাদ্ধ এবং নাচে ইঁহার অর্থ ব্যয়িত হইত না। বৃথা আড়ম্বরে ইহা দৃষ্ট হইত না। ইহা উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া ব্যয়িত হইত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিত।"

কিন্তু প্রসন্ননাথ যে তাঁহার অর্থ কখনও অনুপযুক্ত বিষয়ে অপব্যয়িত করেন নাই তাহার কারণ, কিশোরীচাঁদ তাঁহার দানের উপযুক্ত পথ তাঁহাকে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। প্রসন্ননাথের দান যে উপযুক্ত পথে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ কিশোরীচাঁদ সেই পথ আবিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও অসীম ক্ষমতাপন্ন বন্ধু প্রসন্ননাথ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইলে কিশোরীচাঁদের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ, তাঁহার অসাধারণ আত্মত্যাগ, অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত উদ্যম সত্ত্বেও হয়ত আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিত না।

যাহা হউক, আমরা রাজসাহীর উন্নতির ইতিহাসে কিশোরীচাঁদ বা প্রসন্ননাথের পারস্পরিক স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব না। এই পরিচ্ছেদে আমরা সরলভাবে তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিব মনস্থ করিয়াছি। এবং আশা করি, পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই মহান কর্ম্মবীরদ্বয়ের মহত্ত্ব ও বিশ্বপ্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। এই বিবরণ প্রধানতঃ কিশোরীচাঁদ রচিত "রাজসাহীর রাজগণ" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বীণা তব শুনি মোর পরাণ চাহে
যেতে যেয়ে তব চরণে হে।
রাখে কেবা বাঁধি মোরে
আজি মধু রাতে কঠিন শত বাঁধনে হে॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুর—হিন্দীর তালা।

১ ২´ ৩ ০
মা মা মপা -ণা পা II পা মা -া -জ্ঞা। -া পা মা -জ্ঞা। -রা -সরজ্ঞা -া -মা।
বী ণা ত০ ০ ব শু নি ০ ০ ০ মো র ০ ০ ০০০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
। -রা -সা -া সা I -ণ্‌া -া সা রা। সা -ণ্‌া -া সা। -ধ্‌া -প্‌া -া ণ্‌া।
০ ০ ০ প ০ ০ রা ণ চা ০ ০ হে ০ ০ ০ যে

১ ২´ ৩ ০
। সা রা মা -া I মা -পা মা -া। -জ্ঞা -া -া রা। মা পা -া -ধা।
তে যে য়ে ০ ত ০ ব ০ ০ ০ ০ চ র ণে ০ ০

১ ২´ ৩ ০
। -পধণা -া -ধণর্সা -া I -ণর্সা -র্রা ণর্সা -া। -ণা -া -া -ধা। -ধা -পধণা -া ণা।
০০০ ০ ০০০ ০ ০০ ০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০বী

১
। ণা পধা -ণা পা II
ণা ত০ ০ ব

১ ২´ ৩ ০
{জ্ঞা II মা পাঃ -ধঃ না I না র্সা -া -না। -র্সা র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সা।
রা খে কে ০ বা বাঁ ধি ০ ০ ০ মো রে ০ ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০
। র্রা র্সর্রা -র্জ্ঞা -া I র্মর্মা -র্জ্ঞা -র্রা -র্সা। -ণা র্রা র্সা -ণা। -ধা -পধণা -া} মা।
জি ম০ ০ ০ ধু ০ ০ ০ ০ রা তে ০ ০ ০০০ ০ ক

১ ২´ ৩ ০
। মা ণা -ধা না I র্সা -া পা র্সনা। র্সা -ণা -ধা -পধণা। -ঃ -ধণঃ -র্সা- -ণর্সঃ -র্রা র্সর্রঃ।
ঠি ন ০ শ ত ০ বাঁ ধ০ নে ০ ০ ০০০ ০০ ০ ০০ ০ ০০

১ ২´ ৩ ০
। -র্জ্ঞা -র্রজ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা I -র্রা -র্সা -ণা -ধা। -পধণা -া -মা -া। -জ্ঞা -রা -সা মা।
০ ০০০ হে ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০বী

১
। মা মা -পধা পা II II
ণা ত ০০ ব

———০———

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন।

গত আশ্বিনের অকাল বর্ষণে উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ বন্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে আজ লক্ষ লক্ষ নর-নারী গৃহহারা হইয়া চারিটী অন্নের জন্য একটুকরা বস্ত্রের জন্য পথের কাঙ্গাল হইয়া ফিরিতেছে। এই সব দুঃস্থ নর-নারীর সাহায্যার্থ দেশে যে তুমুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়। এই ভীষণ অমঙ্গলের মধ্যেও আত্মনির্ভররূপ এক মহা মঙ্গলের বীজ রোপিত হইতেছে। এই বন্যাজনিত অমঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়া আজ বাঙ্গালায় যে দেশাত্মবোধ ও ভ্রাতৃভাবের উদ্বোধন হইল, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। বাঙ্গালার যুবকগণ দুঃস্থ নর-নারীর সেবার জন্য বন্যাপীড়িত স্থলে স্থলে গিয়া উপস্থিত হইতেছেন। সমগ্র দেশবাসী আপনাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ-বস্ত্র এই সেবাযজ্ঞে আনন্দে আহুতি দিতেছেন। বালকগণ এই যজ্ঞেরই জন্য হবিঃ-সংগ্রহে পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। দেশের এ চিত্র সত্যই অভূতপূর্ব্ব! আমরা নিম্নে প্লাবন সম্বন্ধীয় সাহায্যার্থে ভিক্ষার্থী একদল বালকদিগের রচিত একটী ভিক্ষাসঙ্গীত প্রকাশ করিলাম। এই সব বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নর-নারীর সাহায্যের জন্য যিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু পাঠাইবেন আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিব।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত)

কাঁদিতেছে ওই শোন সবে ভাই
বন্যাপীড়িত গৃহহারা,
ক্ষুধার জ্বালায় করে হাহাকার
বস্ত্রহীন তারা॥
বন্যাস্রোতে আজ ভেসে যায় তারা
কতশত নর-নারী।
ঘুচাও তাদের এ ঘোর দৈন্য
মুছাও নয়নবারি॥
এসেছি আমরা তাই দ্বারে দ্বারে
লইয়ে ভিক্ষাঝুলি।
ভাই বোন যে তারাও মোদের
দেখ গো নয়ন মেলি।
পয়সা কাপড় খুদ কণা আজ
দাও গো ভিক্ষা নর-নারী॥
ঘুচাও তাদের ইত্যাদি।
দৈন্য তাদের হেরিয়া সবার
উঠে নাকি প্রাণ কেঁদে?
আজিও কি ভাই বসে রবে শুধু
আপন সুখের লাগি॥
দেখে এসো শত অমূল্য জীবন
নিতুই যেতেছে ঝরি।
ঘুচাও তাদের ইত্যাদি।

৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষিদেবের পৌত্র, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত ৩১এ ভাদ্র রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে মহর্ষির পরিবারে শোকের যে কৃষ্ণ ছায়া নিপতিত হইল, তাহা শীঘ্র অপনোদিত হইবার নহে, শান্তিনিকেতনে যে অভাবের সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আজ তাঁহার গুণের কথা চিত্তে ভরিয়া উঠিতেছে। সামাজিকতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সকলকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পদস্থ লোকের সহিত যখন মিলিত হইতেন, আপন বংশমর্য্যাদা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে জানিতেন, আবার অনুগত আশ্রিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত যখন মিশিতেন নিজের নিজত্ব যেন একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন। তিনি প্রেমের চক্ষে অনুরাগভরে সকলকে নিরীক্ষণ করিতেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রদ্যোৎ কালিকৃষ্ণ ঠাকুর, সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও অন্যান্য অসংখ্য ধনাঢ্য লোকের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহর্ষিদেবের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেন। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মৌলিক আদর্শে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার বিকাশকল্পে ও পরিদর্শন ব্যাপারে দ্বিপেন্দ্র বাবু তাঁহার যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। দ্বিপেন্দ্রবাবু প্রথমে পাথুরিয়ার জমিদার রাখাল বাবুর কন্যা শ্রীমতী সুশীলা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী নলিনী দেবী তাঁহারই গর্ভজাত। অকালে সুশীলা দেবীর মৃত্যু ঘটিলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত দ্বিপু বাবুর বিবাহ হয়। দ্বিপুবাবু যেমন তাঁহার পিতামহ মহর্ষিদেবের অপরিমেয় স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন তেমনি তিনি তাঁহার মাতৃহারা কন্যা নলিনী দেবীর প্রতি স্নেহধারা ঢালিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ দ্বিপুবাবুর সৌজন্যে বিমুগ্ধ ছিলেন। বালকবৃন্দ হেমলতা দেবীকে আশ্রমমাতা বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন করে। শান্তিনিকেতনের

বিরাট ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া দ্বিপুবাবু প্রত্যেককে দিয়া তাহার কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করাইয়া লইতেন। তিনি সুব্যবস্থার কৌশল বিশেষরূপ অবগত ছিলেন; অথচ কর্কশ ব্যবহার তাঁহার দৈনিক জীবনে কখনও দেখা যাইত না। তিনি সপ্তাহের ভিতরে দুই তিনদিন বোলপুর গিয়া উকীল প্রভৃতি ভদ্র লোকেদের সহিত নিরভিমানে মুক্তভাবে মিশিতেন; নানা বিষয়ের আলোচনায় সন্ধ্যাকাল আনন্দে কাটিয়া যাইত। উকীল বাবুগণের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ছিল। মহর্ষির বিশাল পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁহার এমনই একটি হৃদয়ের যোগ ছিল এবং তাঁহারা দ্বিপুবাবুর প্রতি এমনই অনুরক্ত ছিলেন যে, দ্বিপেন্দ্র বাবু দুই চারিদিনের জন্য যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহারা দলে দলে আগ্রহের সহিত তাঁহার সহিত দেখা করিতেন—এইরূপে স্নেহ প্রেম ও সদ্ভাবের আদান-প্রদান হইত।

প্রায় সপ্তাহকাল হইতে চলিল, পিতৃদেবের (৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের) চিঠির একখানি পুরাতন ফাইলে দেখিতেছিলাম, উহার ভিতরে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্র বাবুর লিখিত একখানি পত্র পাইলাম। দ্বিজেন্দ্র বাবু আমার পিতাকে লিখিতেছেন, "ঈশ্বর প্রসাদে গত ২১ আষাঢ় শুক্রবার আমার একটি নবকুমার হইয়াছে। আগামী বৃহস্পতিবার সায়ংকালে তাহার জাতার্থে অনুষ্ঠান করিবার মানস করিয়াছি। আপনাকে উপাচার্য্যপদে বরণ করিয়াছি। আপনি উক্ত কর্ম্মেতে উপাচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি ২৫ আষাঢ়। ১৭৮৪ শ" এই নবজাত পুত্র আর কেহ নহে, স্বয়ং দ্বিপেন্দ্রনাথ। হায় তখন বুঝিতে পারি নাই যে এত শীঘ্র তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। উক্ত পত্রখানি হইতে বুঝা যায় যে, দ্বিপুবাবুর বয়স ৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। পিতামহদেব স্বীয় আদরের পৌত্রকে নিজের নিকটে ডাকিয়া লইলেন। কিন্তু অমায়িকতার আদর্শরূপে ও সুশৃঙ্খলা-পরিচালকরূপে যিনি সকলের অনুরাগ লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন জানি না কে তাঁহার পুণ্যস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রবাবু পরিণত বয়সে পুত্রহারা হইলেন. তিনি আপনার আনন্দে বিভোর ছিলেন। এ দারুণ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি সেই শক্তিদাতা বিধাতা প্রদান করুন। তাঁহার বিয়োগবিধুরা পত্নী ও পুত্র কন্যার অন্তরে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করুণ। পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন। ইহাই পরমপিতার নিকট সকলের প্রার্থনা।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

শোক-সংবাদ।

৺ইন্দিরা দেবী। স্বনামধন্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বিগত ১৩ই আশ্বিন শনিবার ৺বিজয়া দশমীর প্রভাতে পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতামহ ও পিতার প্রতিভা বহুল অংশে ইঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল। বাল্যকালেই ইনি ভূদেব বাবুর নিকট সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই সাহিত্যে ইঁহার অনুরাগ এত অধিক ছিল যে, পঠদ্দশাতেই ইনি তাহার অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীর বধূ হইয়াও ইনি গৃহিণীর কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। এই সময়ে ইনি উপন্যাস রচনায় মন দেন এবং অল্পদিনের মধ্যে কয়েকখানি সুন্দর শ্লীলতাপূর্ণ উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন। ছোট ছোট গৃহশিল্পেও ইঁহার দক্ষতা বড় অল্প ছিল না। ইঁহার প্রকৃত নাম সুরূপা দেবী। ইন্দিরা ইঁহার ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামেই ইনি ইঁহার সমস্ত রচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা অনুরূপা দেবী ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী। পতি-পুত্র-পরিজনবর্গকে শোকার্ত্ত করিয়া ইনি ৪৪ বৎসর বয়সে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। করুণাময় ভগবান ইঁহাদের বেদনাতুর হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনসপ্ততিতম সাংবৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা ৬ ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে উৎসবে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

বেহালা,
১৮৪৪ শক,
২৩শে কার্ত্তিক
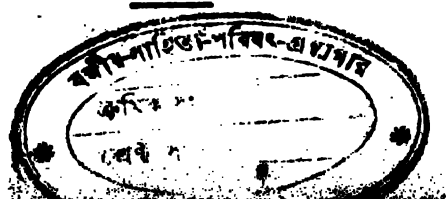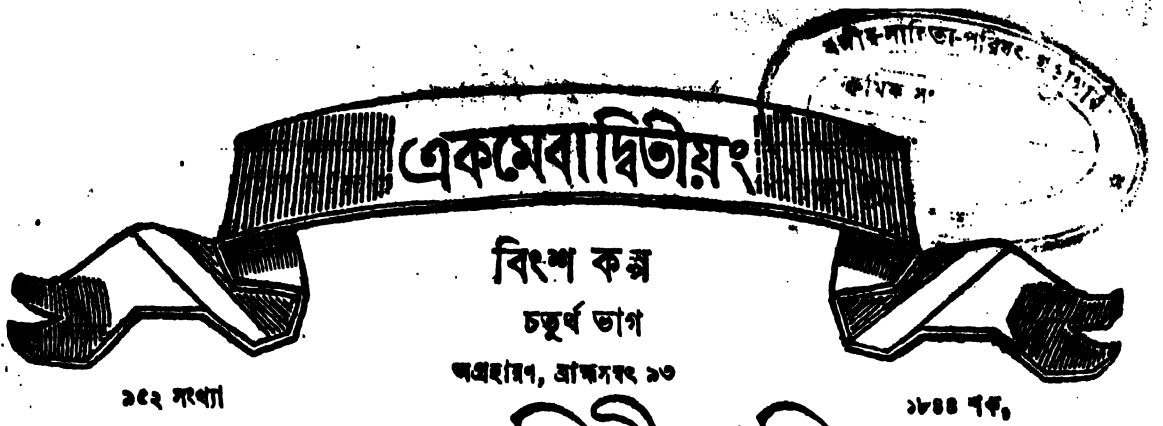
শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩

৯৫২ সংখ্যা   ১৮৪৪ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাগো ওগো জাগো!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজি নিরমল প্রভাত-তপনে
জাগো ওগো জাগো।
ছেড়ে দিয়ে অচৈতন্য
দূর করি' দুঃখ দৈন্য,
তাঁরি শুভ নাম লয়ে
বীরের হৃদয় লয়ে,
শুভ কর্ম্মে লাগো—
জাগো—ওঠ—জাগো॥
সুমঙ্গল তাঁর আশীষ ঝরিবে—
সুগন্ধ ফুলের পরাগ বহিবে।
থেকো না থেকো না নিদ্রামগ্ন আর
ডুবি' আলস্য স্বপনে
ভুলি' ধরমে করমে;
উঠে পড়—
আগে চল—
ভালমন্দ সবি সঁপি' পদে তাঁর
সকলের আগে চল—
চল ওগো চল॥
অতীতে করেছ   জানি ওগো জানি
অনেক অমূল্য   সময়েরে ব্যর্থ;
পদে পদে ভুল   করি' ওগো মানি
জগতে এনেছ   অনেক অনর্থ;
ভুলে যাও তাহা—
ছাড় কর হা-হা।
এখন অবধি
কাজে নিরবধি
লাগি' প্রাণপণে জীবনে অর্ঘ্য
কর ওগো কর—
শুভ কর্ম্ম যত
ধর ওগো ধর॥
জ্ঞানে বড় হও,
ধর্ম্মে বড় হও;
করমে ফুটায়ে তোল;
প্রাণের আঁধার—
নিরুদ্ধ দুয়ার
খোল ওগো খোল;—
আর কিছু যত
বাজে কথা শত
ভোল ওগো ভোল॥
জ্ঞানের প্রদীপ আলো—
ফুটুক উজ্জ্বল আলো।
সোজা পথে চলে যাও;
কাহারে কোরো না ভয়—
সম্মুখে রয়েছে জয়।
কেবা আছে
পড়ি' পাছে,
তার দিকে চেয়ো নাকো—
সম্মুখেতে দৃষ্টি রাখো।
জয় লাভ যদি চাও
শুভ কর্ম্মে লাগো—
জাগো ওগো জাগো॥

অজ্ঞেয়বাদ ও অধ্যাত্মজ্ঞান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এদেশে অনেকের এই একটা অমূলক সংস্কার আছে দেখা যায় যে, আত্মার আত্মা পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির নিতান্তই অগম্য। এই অমূলক সংস্কারের ফলে এদেশের অনেককে এই একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে দেখা যায় যে, যখন শুদ্ধসত্ত্ব পরব্রহ্ম আমাদের বিবেকজনিত ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত বুদ্ধিরও নিতান্তই অগম্য, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে তাঁহার অন্বেষণে বাহির হওয়া বাতুলতা। তাঁহাদের এ কথা পরব্রহ্মের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথা নহে, ইহা তাঁহাদের আলস্যমিশ্রিত অজ্ঞান-অন্ধতার কথা। যেটুকু জ্ঞান অর্জ্জন করিলে আমাদের সহজজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া অধ্যাত্ম বিষয়সমূহ আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল আকারে প্রকাশ করিয়া ধরিতে পারে, ততটুকুও জ্ঞান অর্জ্জনে যাঁহারা পরাঙ্মুখ, তাঁহারাই ঐ প্রকার ভ্রান্ত ধারণার নিকট মস্তক অবনত করেন। ইহার ফলে ঈশ্বর বস্তুত সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় না হইলেও ক্রমশ সত্য-সত্যই তাঁহাদের নিকট অজ্ঞেয় হইয়া পড়েন, কারণ তাঁহাদের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে এবং ঈশ্বরকে জানিবার যে স্পৃহা আছে, উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টার অভাবে তাহা ক্রমশই মলিন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরকে মানববুদ্ধির অগম্য বলিবার অর্থ আর কিছুই নহে—কেবল তাঁহা হইতে আপনাকে সরাইয়া রাখা। এইরূপে সরিয়া থাকিয়া আমরা নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনি। ঈশ্বর হইতে সরিয়া থাকিলে সর্ব্বনাশসাধন না হওয়াই আশ্চর্য্য। যে পরব্রহ্ম হইতে এই প্রকৃতি নিঃসৃত হইয়া অভ্রান্ত সত্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, যে মহান অগ্নি পরমাত্মা হইতে শতসহস্রলক্ষকোটী মানবাত্মা বিস্ফুলিঙ্গরূপে নিঃসৃত হইয়া তাঁহা কর্ত্তৃকই নিশ্বসিত হইতেছে, সেই পরব্রহ্ম যে মানবাত্মার স্বাধীনতারও মূল উৎস এবং সকল সত্যেরই মূল প্রস্রবণ, তাহা বলাই বাহুল্য। ঈশ্বর মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন সূত্রেই হউক, সেই স্বাধীনতার মূল উৎস ও সত্যের মূলাধার পরমাত্মা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেই যে আত্মার স্বাধীনতার স্রোত ক্রমশই শুকাইয়া যাইবে এবং সত্যের প্রতি একনিষ্ঠা ও সত্য অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা ক্রমশই ম্লান হইয়া পড়িবে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আর, মানবাত্মা স্বাধীনভাব ও সত্যনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইলে অধঃপতনের দিকে বিনাশের অভিমুখে যে কিরূপ দ্রুতগতি অগ্রসর হয়, জগতের ইতিহাস বিশেষত এদেশের ইতিহাস প্রতিপদে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা ও সত্যনিষ্ঠার উপরে দণ্ডায়মান হওয়াতেই উপনিষদ প্রভৃতির সময়ে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উন্নতির কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল; আর আজ সেই স্বাধীনতা ও সত্যনিষ্ঠা হারাইয়া আমরা অবনতির কত নিম্ন সোপানে অবতরণ করিয়াছি, তাহা তো প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে।

ঈশ্বরকে এই প্রকারে বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং অজ্ঞেয় বলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবার ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনতা ও সত্যনিষ্ঠা হারাইয়া মানুষ কতদূর বিপথে চলিয়া যায়, দুর্নীতির পূতিগন্ধ পঙ্কে কতদূর ডুবিতে পারে, দেশের যে কতদূর অধঃপতন হইতে পারে, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। অতি উচ্চ আদর্শ হইতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবধিই দেশের জনসাধারণ নানা বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া আলস্য ও অজ্ঞানের কারণে ঈশ্বরকে মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধন করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছিল। কাজেই তাহারা সে উচ্চ আদর্শ সম্যক ধারণ করিতে না পারিয়া তাহার বহিঃক্রিয়াকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লইল। জনসাধারণ আত্মার স্বাধীনতা ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলাতেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের যজ্ঞাগ্নি হইতে কুপঠিত মন্ত্রাহূত কৃত্যার ন্যায় দুর্নীতি-পরায়ণ কাপালিক প্রভৃতি ভীষণ সম্প্রদায়সকল উত্থিত হইয়া এই দুর্ভাগ্য দেশকে একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিল। একই প্রকার কারণে প্রেমের উচ্চ আদর্শ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলেও তাহারই নামে কুক্রিয়ান্বিত শত-শত কদর্য্য সম্প্রদায়সমূহ আবির্ভূত হইয়া দেশের অস্থিমজ্জা চুষিয়া লইবার, দেশকে সর্ব্বতোভাবে নির্বীর্য্য

করিবার কি প্রকার বেড়াজালের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা তো আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভারতের ঋষিমুনিরা সাধনেচ্ছুদিগের হিতৈষণাপ্রেরিত হইয়া ব্রহ্মের রূপকল্পনার কথা বলিলেন, আর আমরা ঐ স্বাধীনতা ও সত্যনিষ্ঠা হারাইবার কারণে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া অথবা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া ভীষণ অ-ভীষণ নানাবিধ মূর্ত্তির পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং পরিণামে সেই মূর্ত্তিপূজার দোহাই দিয়া পশুবলি, নরবলি, ব্যাভিচার প্রভৃতি শতবিধ অনাচার দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ খুলিয়া দিয়া দেশের কি সর্ব্বনাশই না সাধন করিয়াছি। সমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পৌরোহিত্য প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, গুরুভক্তির প্রতি কিছু বেশী সমাদর প্রদর্শিত হইল; কিন্তু আমরা স্বাধীনতা হারাইয়া সত্যের পথ হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইবার ফলে সে উদ্দেশ্য লক্ষ্য হইতে হারাইয়া অযথা পৌরোহিত্যের অতিমাত্র অধীনতা স্বীকার করিলাম এবং যোগ্যতা বা অ-যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আদিম গুরুর পুত্র-পৌত্রাদিকে কেবল গুরুবংশীয় বলিয়া গুরুর আসনে বসাইলাম এবং এক নবতর অভ্রান্ত গুরুবাদের সৃষ্টি করিলাম। ক্রমে এইপ্রকার পুরোহিত ও গুরুদের সমর্থনে আমরা নিজকৃত পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত আন্তরিক অনুতাপ করিবার পরিবর্ত্তে "শান্তি স্বস্ত্যয়ন" প্রভৃতি বিবিধ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম্মের দ্বারা লঘুতম অবধি গুরুতর পর্য্যন্ত সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ভার ঐ পুরোহিত ও গুরুদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে প্রবোধ দিতে থাকিলাম যে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল এবং আমরা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। এই প্রকার ভাবের অনুষঙ্গে দুর্নীতি যে দেশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করিতে থাকিবে, তাহা কি কিছু আশ্চর্য্য?

ঈশ্বর বাস্তবিকই কি মানববুদ্ধির অগম্য? ঈশ্বর আছেন কিন্তু মানববুদ্ধির অগম্য, সুতরাং অজ্ঞেয়, এই সংস্কার নিতান্তই ভিত্তিহীন ও অমূলক। ঈশ্বর যদি সত্যই মানববুদ্ধির অগম্য হইতেন, তবে ভারতের ঋষিমুনিরা তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও করিতেন না, এবং জনসাধারণকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবার জন্যও উপরোধ অনুশাসন করিতেন না। পরমাত্মাকে যদি সাধারণের পক্ষে আত্মাতে উপলব্ধি করা অসম্ভব হইত, তবে উপনিষদের ঋষি কখনই এমন বলের সহিত বলিতে পারিতেন না যে, "অদ্বিতীয়, সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নিত্য, চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, কামাবস্তুবিধাতা পরমেশ্বরকে যে ধীরেরা আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ নিত্য শান্তি হয়; অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" ঈশ্বর সত্যই বুদ্ধির অগম্য ও অজ্ঞেয় হইলে কালের এই সুদূর ব্যবধানে ঋষির ঐ উক্তি আজ আমাদেরও হৃদয়ে সাড়া পাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিত না। আমরা এই পর্য্যন্ত বলি যে, আমরা আমাদের সসীম জ্ঞানে ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি না—এক কথায়, তিনি আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলেও একেবারে অগম্য নহেন—তিনি জ্ঞেয়ও বটে, অজ্ঞেয়ও বটে। এই ভাবটী উপনিষদের একটী মন্ত্রে কেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে জানি যে এমনও নহে; "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

এইরূপ কথাই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদীর কথা। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ যে অর্থে আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে এই ভাবের সহিত অজ্ঞেয়বাদ শব্দ সংযুক্ত করিতে চাহি না—আমরা এই ভাবকে শ্রদ্ধা-সমন্বিত জিজ্ঞাসা বলিতে ইচ্ছা করি। এই শ্রদ্ধা-সমন্বিত জিজ্ঞাসা অবলম্বন করিলে আমাদের অনেক সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে ইহারই একান্ত অভাব। এই জিজ্ঞাসা অবলম্বনে আমরা আলোচনা করিয়া জানিতেছি যে, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ জ্ঞেয়ও নহেন, আবার একেবারে অজ্ঞেয়ও নহেন। আমরা মনুষ্য বলিয়াই ঈশ্বরকে যথাযুক্ত জানিতে পারি—নহিলে সেই ভূমা পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া মনুষ্য নামের গৌরব

থাকে কোথায় ? আবার, আমরা সীমাবদ্ধ মনুষ্য বলিয়াই সেই অনন্তস্বরূপ পূর্ণ সত্য পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ জানিতে পারি না—নহিলে আমরা প্রত্যেকেই তো এক-একজন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়া পড়িতাম ; তাহা হইলে এই বিচিত্র সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভাবনাই থাকিত না।

ঈশ্বর আছেন কিন্তু বুদ্ধির অগম্য এই সংস্কার অজ্ঞানান্ধতা হইতে স্বতই অভিব্যক্ত হইয়া এবং ভারতের ঐতিহাসিক ধারা অবলম্বনে ঘোর পৌত্তলিকতা, বামাচার প্রভৃতি আনয়ন করিয়া যেমন এদেশকে অভিভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, সেইরূপ ইহার সোদরপ্রতিম আর একটী সংস্কার বিজ্ঞানান্ধতা হইতে স্বতই অভিব্যক্ত হইয়া এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক ধারা অবলম্বনে নাস্তিকতার বিষবীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে অভিভূত করিবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে। সেই সংস্কারটী হইতেছে এই যে, ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই ; আর যদি বা থাকে, তবে তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর, সুতরাং আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ; অতএব ঈশ্বরের সন্ধানে বৃথা না ঘুরিয়া নিজেদের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও যুক্তিসিদ্ধ। বর্ত্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বিজ্ঞানপ্রকাশিত নিয়ম সকলের পশ্চাতে একজন নিয়ন্তা কেহ আছেন স্বীকার করিলেও, এখনও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা প্রকৃতির পশ্চাতে কোন নিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না ; তাঁহাদের মতে বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে যে কিছু ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সে সমস্তই প্রকৃতিরই লীলাখেলামাত্র। তাঁহাদের কাহারও বা গ্রন্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সঙ্গে সংশয়োক্তি দেখা যায় ; আর কাহারও বা গ্রন্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই—একেবারেই চুপচাপ ;—এই সকল গ্রন্থে ধর্ম্মহীন ও পরোক্ষভাবে ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয় বলা যাইতে পারে। এই সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের শিষ্যানুশিষ্যগণ নিরীশ্বরমতবাদেরই দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পরিণামে অনেকটা স্পষ্টভাবে স্বার্থসিদ্ধিকেই ইষ্টতম বলিয়া ঘোষণা করেন। স্বার্থসিদ্ধিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে তাহার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত উপায়সমূহের ন্যায্যতা অন্যায্যতার প্রতি তীব্র দৃষ্টির অনেক সময়ে অভাব ঘটে এবং পরিণামে দুর্নীতি যে ক্রমশঃ প্রবলভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে তাহা বলা বাহুল্য। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর আছেন কিন্তু মানববুদ্ধির অগম্য সুতরাং অজ্ঞেয়, প্রাচ্য অজ্ঞানান্ধতা হইতে প্রসূত এই সংস্কার, এবং ঈশ্বর নাই, থাকিলেও আমাদের জ্ঞানের অগোচর সুতরাং সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, প্রতীচ্য বিজ্ঞানান্ধতা হইতে প্রসূত এই সংস্কার, এই উভয় সংস্কার বিভিন্ন ভূমির বিভিন্ন ভাবধারা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আকারে প্রকারে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের পরিণাম ফল একই—দারুণ দুর্নীতি। তাই গীতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ ভাবেরই সংশয়াত্মাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাবান উভয়বিধ সংশয়াত্মাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল বিজ্ঞানান্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের সংশয়বাদ যদি কেবল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে হয়তো আমাদের কোন কথাই বলিবার থাকিত না ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যদিগের সহিত সংঘর্ষের ফলে এই সংশয়বাদ এদেশেরও অন্তরে আসিয়া আঘাত দিতেছে। এদেশবাসী অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠদিগের গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রাকৃতিক লীলাসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার ভাস্বরতায় এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, মুখে স্বীকার না করিলেও দেখা যায় যে, তাঁহারা সেই সকল সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের চরণে আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন ; ঈশ্বর প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে যে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্যান্য অনেক পণ্ডিত থাকিতে পারেন, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া কি বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্ম সকল বিষয়েই ঐ বিজ্ঞানান্ধ পণ্ডিতদিগেরই সহিত একমত হইয়া ক্রমে ক্রমে সংশয়বাদের দিকেই অগ্রসর হয়েন।

ঈশ্বর আছেন কিন্তু মানববুদ্ধির অগম্য, এই

সংস্কারও যেমন ভিত্তিহীন ও অমূলক, সেইরূপ ঈশ্বর নাই, এবং থাকিলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, এই সংস্কারও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। আত্মার যে সহজজ্ঞান অবলম্বনে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বহির্জগত সম্বন্ধীয় সত্যগুলিকে সত্য বলিয়া অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন, আত্মার সেই সহজজ্ঞান অবলম্বনেই আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যে, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তমঙ্গল পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। আত্মার সহজজ্ঞানের প্রতি আমাদের সংশয় উপস্থিত হইলে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ও চরম কথা এই যে, আত্মা দ্বারাই আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। ব্রহ্মবিষয়ে আমরা যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করি, তাহার আধারই হইল আমাদের আত্মা। আত্মার ভিতর দিয়া ব্যতীত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার দ্বিতীয় উপায় আছে বলিয়া জানি না।

এই আত্মাকে জানিবার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে—ইহা আমরা আমাদের সহজজ্ঞানে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। সূর্য্য যেমন জগতকে প্রকাশিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাতে গভীরনিহিত সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্যসকল আপনাদিগকেও যেমন প্রকাশ করে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আধার আত্মাকেও প্রকাশ করে। আমাদের "আমিত্বে" নিঃসংশয় হওয়া এই সকল সত্যের মধ্যে অন্যতর সত্য। "আমিত্বে" নিঃসংশয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সহজজ্ঞানের দ্বারাই জানিতেছি যে এই "আমি" বা আত্মা নিরবয়ব এবং দেহ-মন হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও দেহমনের নিয়ন্তা। যেমন বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত যন্ত্রসমূহ জ্ঞানলাভের দ্বারমাত্র, কিন্তু তাহারা স্বয়ং জ্ঞান নহে; সেইরূপ আমাদের শরীর ও মন আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বারমাত্র, কিন্তু আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত। আত্মা বিষয়ী এবং প্রকৃতিতে যাহা কিছু তাহার সম্মুখে যে কোন আকারে বা ভাবে হউক অবভাসিত হয় বা আত্মপ্রকাশ করে, সে সমস্তই তাহার বিষয়। এই হিসাবেই এই আত্মা সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত পিপ্পলাদ ঋষি বলিয়াছেন যে "এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, মনন করে, বোধ করে এবং কর্ম্ম করে"। *

সহজজ্ঞানে প্রাপ্ত এই "আমি"কে বা আত্মাকে আমাদের স্মৃতিশক্তি ও প্রতীক্ষার ভাব আরও মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে। স্মৃতিশক্তি ও প্রতীক্ষার ভাব আমাদিগকে খুব স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয় যে, এই আত্মা বা "আমি" দুইদিনের বস্তু নহে—আজ আছে কাল নাই, ইহা এ প্রকার বস্তু নহে; ইহা সদ্বস্তু ও অবিনশ্বর—ইহার নাশ নাই, ধ্বংস নাই। আত্মার সম্মুখে প্রকৃতির যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সমস্তই আজ আছে কাল নাই; আকারে প্রকারে তাহার প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—তাহার স্থায়িত্ব দেখা যায় না; কাজেই এক কথায় সে সমস্তকেই সদ্বস্তুর বিপরীত ও ক্ষণস্থায়ী বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেহ-মনের শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আজ যে আমি আছি, দশ বৎসর পূর্ব্বেও সেই আমি ছিলাম, এবং দশ বৎসর পরেও সেই আমিই থাকিব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেহের পরিবর্ত্তন বা বিনাশের সঙ্গে "আমি"র বা আত্মার বিনাশের সম্ভাবনা নাই। কাজেই আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যেমন এখনকার "আমি" দশবৎসর পরেও "আমি"ই থাকিব, সেইরূপ ইহলোকের আত্মা বা "আমি"ই মৃত্যুর পরপারে লোকলোকান্তরেও অবিনশ্বর আকারে "আমি"ই বা আত্মা থাকিব।

আমরা ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি, ততই আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়া যায়। এই ইচ্ছাশক্তি যে আমাদের আত্মা হইতেই প্রসূত হয়, তাহা প্রত্যেক মানবই সহজজ্ঞানে স্পষ্ট উপলব্ধি করে; এই শক্তি আমরা বাহির হইতে পাই না। এই শক্তি একটী মহান আধ্যাত্মিক শক্তি। কামনার প্রতিরোধ করিতে গেলেই ইহার উগ্র তেজ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোন শক্তিরই বিনাশ নাই। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি যদি সত্যই একটী আধ্যাত্মিক মহাশক্তি হয়, তবে তাহারও

* এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।

বিনাশ নাই এবং তাহার আধার আত্মারও যে বিনাশ সম্ভব নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

এই অবিনশ্বর আত্মাতে যেমন ভগবানকে জ্ঞানেতে জানিবার জন্য সহজজ্ঞান চিরনিহিত আছে, সেইরূপ সেই সহজজ্ঞানে অবলম্বিত কতকগুলি বৃত্তি আত্মাতে চিরনিহিত আছে, যেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিলে আত্মা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিবার অধিকার পায়। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা বলিয়া একটী উচ্চতম বৃত্তি আছে। সেই শ্রদ্ধাভক্তির সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে আমরা আমাদের পরম পিতা পরম মাতাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। এই শ্রদ্ধা কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্তস্বরূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। সহজজ্ঞানের দ্বারা আমরা পরমাত্মাকে পিতামাতা বলিয়া জানিলেও এই শ্রদ্ধাযোগেই আমরা তাঁহাকে পিতামাতারূপে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিতে পারি; এই শ্রদ্ধাযোগেই আমরা আপনাদিগকেও তাঁহার সন্তানরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দিতে পারি। এই শ্রদ্ধাযোগেই তাঁহাকে ভক্তবৎসল ও দয়াময় মঙ্গলময় বলিয়া উপলব্ধি করি এবং জগতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। এই শ্রদ্ধাভক্তিই সেই অনন্তপুরুষকে দেখাইয়া বলিয়া দেয় যে, তিনিই পরম সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য পরম মঙ্গল মহাশক্তি। যে শ্রদ্ধাবলে ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি, সেই শ্রদ্ধা মিথ্যাপদার্থ নহে— অতীব সত্য পদার্থ; সত্য পদার্থ না হইলে তাহা ভক্তদিগকে ব্রহ্মলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরিণামে শান্তি দিতে পারিত না। এই শ্রদ্ধাভক্তির প্রাবল্যে বৈদিক ধর্ম্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল; এই শ্রদ্ধাভক্তির বলে ঋষিরা সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া উপনিষদের সত্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সেদিনও এই ভক্তিযোগে ভগবৎপ্রেমের স্রোতে চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গভূমিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধাযোগে যেমন পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তেমনি আমাদের অন্তর্নিহিত নীতিজ্ঞান অবলম্বনে আমরা তাঁহাকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়াও উপলব্ধি করি। ভগবান আত্মাতে নীতিজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পুণ্যলাভে এত স্পৃহা এবং পাপের প্রতি এত ঘৃণা। এই নীতিজ্ঞান আমাদের অন্তরে থাকাতেই "কর্ত্তব্য" শব্দটী আমাদের নিকটে কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয় না—এই শব্দের এক গভীর আধ্যাত্মিক বল আছে। যে বীরহৃদয় পুরুষ সন্তোষের সহিত আপনার সমুদয় সুখসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সে বীরোচিত উৎসাহ কি কেবল "কর্ত্তব্য" শব্দ হইতে আসিতে পারে? কখনই না। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে একটা দায়িত্বজ্ঞানও আসে। আবার ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্যরূপে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের সম্মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে আমরা সদনুষ্ঠান করিলে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হই এবং অসদনুষ্ঠান করিলে আত্মগ্লানিতে মর্ম্মদগ্ধ হইয়া যাই। আমাদের সহজজ্ঞান ও শ্রদ্ধা, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তিকে চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা অধিক হইতে অধিকতর পরিস্ফুট করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের বীজ সৃষ্টি করিয়া আত্মাতে নিহিত করিতে পারে না। ইহাদের বীজ পরমেশ্বরই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

সহজজ্ঞান অবলম্বনে আমরা যেমন জানি যে আমাদের আত্মা শূন্যে শূন্যে ঝুলিয়া নাই, তেমনি ইহাও জানি যে এই সুবিশাল ব্রহ্মচক্রও তাঁহাতেই অধিশ্রিত হইয়া আছে। তিনিই ইহার স্রষ্টা, তিনিই ইহার রচয়িতা, তিনিই ইহার আশ্রয়। তিনি এই ব্রহ্মচক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাঁহারই ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, আত্মশক্তি প্রভৃতিকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং ইহাদের কোনটীই অন্য-নিরপেক্ষ সুতরাং স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রাকৃতিক কারণই দেখাইতে পারে, তাহার অকৃত কারণ প্রত্যক্ষ করা বা করানো বিজ্ঞানের অতীত। কিন্তু আমাদের আত্মা সেই অকৃত কারণে সেই স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরে না পৌঁছিয়া স্থির থাকিতে পারে

না। আমি যেমন জানি যে, আমার দেহমনের নিয়ন্তা আত্মা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, সেইরূপ এই বিশ্বজগতকেও আত্মাতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিলে সহজজ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডেরও আদি কারণ সেই ইচ্ছাময় মহানাত্মা।

একমাত্র পরমেশ্বরই এই জগতচরাচরের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই জড়শক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি সকলই প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনিই এই ক্ষুদ্র মানবদেহে কি অপূর্ব্ব কৌশলে অমিততেজা আত্মাকে স্থাপন করিয়া এক বিশাল জ্ঞানরাজ্যের, সুমহান শ্রদ্ধাভক্তির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। সেই পূর্ণজ্ঞান অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম এই জগতে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই জ্যোতির্ব্বেত্তা গ্রহউপগ্রহের গতিনিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন; উদ্ভিদবেত্তা উদ্ভিদের জন্মজরার, জীবতত্ত্ববিদেরা জীবগণের প্রাণনকার্য্যের এবং আত্মজ্ঞেরা অধ্যাত্মতত্ত্বের নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। প্রাকৃতিক ঘটনাসকল আকস্মিক ঘটিলে বা তাহাদের কোন নিয়ন্তা না থাকিলে তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম আবিষ্কার সম্ভব হইত না।

যেমন চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানে ঈশ্বরকে দয়াময় পিতা, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া জানিতে পারি, সেইরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এই জগতের অন্তরালে দেখি—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক:। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারাই এই বিশ্বজগত পূর্ণ রহিয়াছে।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অত্যধিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয় না অথবা অরণ্যবাসেরও প্রয়োজন নাই। এ সকল কথা আমাদের নিকট মূল্যহীন বলিয়া বিবেচিত হয়—এগুলি আসলে আলস্যের কথা। ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা না থাকিলে ওজর আপত্তিরও অভাব হইবে না; এবং অনুরাগ থাকিলে সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং"। ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, গীতা এই অমূল্য সত্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবান হইবার, শ্রদ্ধাভক্তিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রথম সোপান হইল নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তিসংযম। এই প্রবৃত্তিসংযমের সাধনে কঠোর অধ্যবসায় ও সবল স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য:" বলহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার, যিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কি অতুলনীয় বল পাওয়া যায়, দেহ মন আত্মা কি আশ্চর্য্য পবিত্র থাকে, এবং নিষ্কামচিত্তে কি কঠোর পরিশ্রম সুসাধ্য হয়। নিবৃত্তিকে অবলম্বন করিলে জয়-পরাজয়, লাভ অলাভ, মান-অপমান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বই উপেক্ষার সহিত দৃষ্টি করিবার এক দিব্য অধিকার জন্মে এবং নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তব্যসাধনে প্রভূত বল আসে। তখন ক্রমে ক্রমে আমাদের এক নবতর দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় এবং সেই দৃষ্টির সম্মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অধ্যাত্মতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়।

এই প্রকারে ব্রহ্ম আছেন এবং ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের আছে ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগসাধনে অগ্রসর হও। পরমাত্মাকে আত্মার ভিতর দিয়া জানিবার চেষ্টা কর এবং সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হও। তাঁহাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত দেখিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে বাস করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও। বিস্ফারিত নেত্রে প্রভাতের সূর্য্যকিরণরঞ্জিত অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি কর। মুদ্রিত নেত্রে আত্মার অন্তরে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ দর্শন কর, এবং তাঁহার পরিপূর্ণ অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হও। তাঁহাকে অজ্ঞেয় মনে করিয়া নিরাশহৃদয়ে আপনাকে মুহ্যমান রাখিও না। তুমি আপনাকে স্বাধীনতার উৎস ও সত্যের মূলাধার মুক্ত পুরুষের সন্তান বলিয়া উপলব্ধি কর। আত্মার স্বাধীনতা সেই পরম পিতামাতা পরমেশ্বর ব্যতীত কাহারও চরণে বিসর্জ্জন দিও না; সত্যের পথ অনুসন্ধান

করিতে এবং তাহা লাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে ভয় পাইও না। নিশ্চয়ই জানিও, সেই মহান্ পুরুষ নিজের ভাস্বর মূর্ত্তিতে তোমার আত্মাতে প্রকাশিত হইবেন। মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে তাঁহাকে ভাবের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে, বিপদের কশাঘাতে, সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে দর্শন কর। মৃত্যুমাঝে তাঁহাকে অমৃতসোপান বলিয়া উপলব্ধি কর। তোমাদের অধ্যাত্মযোগ সিদ্ধ হউক, তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ সার্থক হউক।

আর্ট ও মনীষীমত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান যখন আর্টের কেন্দ্র, তখন বলা বাহুল্য যে, আর্টের মূলমন্ত্র সম্বন্ধেও দেশ-বিদেশের মনীষী-দিগের মত একই হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা মনে করা ভুল যে, কাহারও কাহারও মত বিভিন্ন বা বিপরীত হইবে না। এই বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া ভগবান তো নিত্য বর্ত্তমান আছেন; সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিলেও, এমনও লোক কি নাই, যাঁহারা সে কথা অস্বীকার করেন? কিন্তু সেই অস্বীকার করিবার কারণে ভগবৎসত্তার নিশ্চয়ই অভাব হয় না। অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে, তাহাই তখন সেই অস্বীকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিতে থাকে। সেই-রূপ আর্টের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করেন, আমরা দেখি যে, তাঁহাদের স্বীয় কার্য্য হইতেই তাঁহাদের মতের ভুল ধরা পড়ে।

ভগবান আর্টের কেন্দ্র, এইটী হইল আর্টের অন্তরের সর্ব্বমূল কথা। সেই মূল বিন্দু হইতে নামিয়া আর্টের অন্যান্য মন্ত্রগুলি অবরোহ-প্রণা-লীতে ধরিলে তো কোন কথাই ছিল না—বিচার আলোচনারও কোন প্রয়োজন থাকিত না। এই সূক্ষ্ম কথা আমরা গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাধ্যমত খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি মনে হয় যে, ইহা অনেকের ধারণার অতীত। তাই আমরা সেই অন্তরের কথা পুনর্ব্বার বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, বহির্জগতের সহিত আর্টের যে যোগ, যাহার ফলে আর্ট আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে চায়, সেই যোগ ধরিয়াই এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব যে, সেই যোগের সূত্র-মন্ত্রগুলিও ঐ কেন্দ্র ভগবান হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে, এবং আসল্পে সেই মন্ত্র-গুলি সার্ব্বভৌমিক।

আমরা "আর্ট ও সত্য" প্রবন্ধে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে, সত্যস্বরূপ ভগবান যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভগবান হইতে এই যে প্রকৃতি নিশ্বসিত হইয়াছে, সেই সত্য প্রকৃতিই, সংক্ষেপে সত্যই প্রকৃত আর্টের ভিত্তি। এই প্রকৃতির ভিতর দিয়াই বহির্জগতের সহিত আর্টের যোগ। আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না, কারণ আমরা যতই কেন কল্পনায় নিজেকে ভাসাইয়া দিই না, প্রকৃতির বাহিরে আমরা কিছুতেই যাইতে পারি না। আর্টের ভিত্তি যদি অতিপ্রাকৃত কোন কিছু না হয়, প্রকৃতিই যদি তাহার ভিত্তি হয়, তবে স্বতই প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রকৃতিসিদ্ধতা বা স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ। কাজেই বলিতে হয় যে, আর্টে অস্বাভাবিক কোন কিছু স্থান তো পাইতেই পারে না; এবং পাইলেও তাহা হেয় ও পরিত্যাজ্য হইবে।

আর একটী বিষয় সর্ব্ববাদসম্মত। আর্টের লক্ষ্য বস্তু যে সুন্দর হইবে, অথবা তাহা সুন্দর না হইলেও তাহাকে যে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে, এবিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায় না। আর্টের বস্তু যদি সুন্দরই না হইল, তবে তাহার তো কিছুই রহিল না। আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের এতই অপরি-হার্য্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনেক সময়ে বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বাহিরের সৌন্দর্য্যকেই আর্ট মনে করিয়া গুরুতর ভ্রমে পতিত হন। সুন্দর-স্বরূপ ভগবান তাঁহার প্রকৃতির বহিঃপরিচ্ছদস্বরূপে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সৌন্দ-র্য্যের প্রত্যেক অংশে মঙ্গলভাবও নিহিত করিয়া দিয়াছেন; এই কারণে প্রকৃতির বহিরাকার সৌন্দর্য্য-মাত্রেও আর্ট থাকিতেই হইবে। কিন্তু আমরা

প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমাদের চিত্রাদিতে কেবলমাত্র বহিঃসৌন্দর্য্য-টুকুকেই আর্ট বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাই, তাহার অন্তরস্থিত মঙ্গলভাবকে দেখিতে ভুলিয়া যাই এবং ঐ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে সকল সময়ে চেষ্টাও করি না।

এই কারণে আর্টের সঙ্গে যেটুকু মঙ্গলের যোগ, সেইটুকু লইয়াই যাহা কিছু বিতর্ক বিরোধ দেখা যায়। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের উদ্দেশ্য বটে, অন্ততঃ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—জগতের স্বাস্থ্যসাধন, জগতের মঙ্গল ও উন্নতি-সাধন। কিন্তু যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট, প্রত্যক্ষদোতক আর্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্যভূখণ্ডের আমদানি কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহা-দের বক্তব্য আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সৌন্দর্য্যরূপ মাত্র বহিরঙ্গটুকু একটু চকচকে করিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করিলেই তাঁহারা তাঁহাকে আর্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন—তাঁহারা আর্টের ভিতরের কথা যেন আমলেই আনিতে চাহেন না বলিয়াই মনে হয়। ইহাঁদের মনের এইরূপ ভাব দেখিয়া বেলগাছিয়া বাগানের দুইটী চিত্রের গল্প মনে পড়ে। পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোক গমনের পর ঐ বাগানের যে সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী চিত্র ছিল—একটী চিত্র কোন অপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত এবং খুবই অল্প মূল্যের; দ্বিতীয়টী ইউরোপের কোন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত ও বহুমূল্য ছিল। প্রথম চিত্রের মূল্য-হীনতা ঢাকিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা করিবার জন্য তাহাকে কারুকার্য্যে খচিত মূল্য-বান কাষ্ঠবন্ধনে বাঁধানো হইয়াছিল; দ্বিতীয় চিত্রটী যৎসামান্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিজের অন্তর্গৌরবে নীরবভাবে ক্রেতার অপেক্ষা করি-তেছিল। ইতিমধ্যে এক ক্রেতা ঐ প্রকৃত বহু-মূল্য চিত্রটীর বেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সেই মূল্যবান বহিরঙ্গে শোভিত চিত্রটীকেই উপযুক্ত মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া নিজের আর্টসম্বন্ধীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করিলেন; তাহাতে দ্বিতীয় চিত্র-টীর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। ক্রেতার এরূপ ভ্রমের কারণ এই যে তিনি চিত্র দুইটীর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

শুধু বহিঃসৌন্দর্য্যকেই যদি কেহ আর্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন—ভাল কথা; কিন্তু তাঁহাকে আর্টেরই দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে সেই সৌন্দর্য্যকেও দেখিতে ও দেখাইতে হইবে। তখন সেই সৌন্দর্য্যরূপ বহিরঙ্গকেই আর্টের বস্তু হইতে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে যে, সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও কেন্দ্র আর্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্যশিবসুন্দর ভগবান; সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও ভিত্তি সত্যপ্রকৃতি; সেই সৌন্দর্য্যটুকুরও প্রাণ স্বাভাবিকতা; তাহারও লক্ষ্য জগতের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন এবং সেই সৌন্দর্য্যটুকুও আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাবকে ছাড়িয়া, সমস্ত পরি-পার্শ্বের সহিত সম্বন্ধ ছাড়াইয়া কেবল বহিঃসৌন্দর্য্য ধরিয়া কোন বস্তুকে আর্টের বস্তু বলিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি কিনা সন্দেহ। যাঁহারা আর্টের বহিঃসৌন্দর্য্যকেই আর্ট বলিয়া ধরিতে চাহেন, অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাবের সহিত বহিঃসৌন্দর্য্যের কোন যোগবন্ধন স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহা-দিগকে আমরা এইটুকু জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা কেবল বহিঃসৌন্দর্য্যের ভিত্তির উপর যে আর্টের বস্তু রচনা করিবেন, তাহা দ্বারা তাঁহারা কি চাহেন? তাঁহাদের সেই রচনা দ্বারা অন্তত তাঁহা-দের একটা সুনাম হইবে, এটুকুও তো তাঁহারা চাহেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই চাহেন না যে, তাঁহা-দের রচনা দ্বারা জগতের অমঙ্গল হউক, অথবা তাঁহাদের দুর্নাম হউক। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, ইহা হইতেই তো প্রতীতি হইবে যে, আর্টের বস্তুকে যতই কেন বহিঃসৌন্দর্য্যে সজ্জিত করা হউক না, মঙ্গলভাব তাহাতে অন্তঃসলিলভাবে নিগূঢ় মূর্ত্তিতে না থাকিয়া যাইতে পারে না।

আমাদের দেশের ঋষিমুনি পণ্ডিতেরা এই সূক্ষ্মতত্ত্বটী বড়ই পরিষ্কারভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই শ্রুতিতে শিবস্বরূপ ভগবানকে

সৌন্দর্য্যের নিকর্ষহিসাবে রসস্বরূপ বলিয়া, বলিতে গেলে তাঁহাকেই সমস্ত আর্টের মূলে স্থাপন করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের প্রয়োজন বলিতে গিয়া প্রকারান্তরে আর্টের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবায় বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্য (যাহা আর্টের বস্তুসমূহের অন্যতর) রচনার উদ্দেশ্য হইতেছে—"যশ, অর্থ, আচারব্যবহারের জ্ঞানবিস্তার (যথা, রাম প্রভৃতির ন্যায় সংসারে চলা উচিত, রাবণ প্রভৃতির ন্যায় নহে, এই প্রকার), অমঙ্গলনাশ, সদ্য সদ্য আনন্দলাভ, এবং সাধ্বী-স্ত্রীর ন্যায় সুমিষ্টভাবে উপদেশ প্রদান"। ইহার মধ্যে যশ ও অর্থকে আমরা কাব্য প্রভৃতি আর্টের বস্তু-রচনার ফল বলিয়া ধরিতে পারি। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের উক্তি ধীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে জ্ঞানবিস্তারের সাহায্যে অমঙ্গলনাশ এবং মিষ্টতা বা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া মঙ্গলসাধনই হইল কাব্যরচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত কাব্য এই মন্ত্রই চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া রচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও আমরা এই ভাবেরই নানা প্রতিধ্বনি পাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছেন "যাহা উপকারে আসিবে, তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা ক্ষতিকারক, তাহাই অশ্রেষ্ঠ"। বৌমগার্টেন বলেন যে প্রকৃতিতেই সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত আদর্শ পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতির অনুকরণ করাই আর্টের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।* সুলজার, মেণ্ডেলসহ্ন্ এবং মরিজ, ইঁহারা বলেন যে, মঙ্গলই আর্টের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্য নহে। * মেণ্ডেলসহ্ন্ বলেন যে, নৈতিক উৎকর্ষই আর্টের লক্ষ্য। * য্যাফ্‌টস্‌বেরির মতে যাহা সুন্দর তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য ও সুন্দর তাহাই মঙ্গল; ঈশ্বর, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলভাব উভয়েরই মূল। * ফিহ্‌কটের মতে আর্টের লক্ষ্য সমস্ত মানবত্বের অনুশীলনা। * যেলিঙ্গের মতে সসীমের মধ্যে অসীমের উপলব্ধিই সৌন্দর্য্য। * হেগেলের মতে আমাদের সত্য ও সুন্দর মূলে এক।* কুর্জ্যার মতে সৌন্দর্য্যের মূল ভিত্তি সুনীতি। * গুইয়োর মতে আমাদের উচ্চতম চিন্তা ও অনুভূতির বহির্বিকাশেই আর্টের পরিণতি। * কসটার বলেন, ঈশ্বর সত্য-শিব-সুন্দর, এবং এই সত্য, শিব ও সুন্দরের ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত। * সার টমাস ব্রাউন বলেন, প্রকৃতির পরিণতিই আর্ট; ভগবানের আর্টের নামই প্রকৃতি। † হ্যাজলিট্ বলেন যে, প্রকৃতির সহিত আর্টকে যোগবদ্ধ হইয়া থাকা চাই। † জুবেয়ার বলেন, আর্টের মধ্যে যাহা সুন্দর তাহাই হিতকর, প্রয়োজনীয়; আর্ট মনকে উন্নত করে বলিয়া উহা নীতিবিদেরও পক্ষে আবশ্যক †। রস্কিন বলেন, উদার মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তিই আর্ট; যে উপায়েই হউক দর্শকের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সর্ব্বোচ্চ ভাবের উদ্রেক করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট—উন্নত মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে ভাব যে পরিমাণে উহাকে অধিকতর উন্নত করিতে পারে, সেই অনুপাতে সেই ভাব উচ্চ †। রস্কিন আরও বলেন, আর্টের বিভিন্ন চতুষ্পাঠীর প্রত্যেকটীর দ্বারে আমি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিতে চাই—সংযম †। বিলার বলেন, আর্ট প্রকৃতির দক্ষিণ হস্ত †। কাউণ্ট টল্‌স্টয়ের মতে মানবের মঙ্গলসাধনই আর্টের লক্ষ্য। ‡ এমার্সন বলেন যে, বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা যিনি, তিনি সত্যস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহা হইতেই প্রকৃতির প্রয়োজনীয় বা সুন্দর, সর্ব্বপ্রকার আর্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে; আমরা যখন সর্ব্ববিষয়েই প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বাধ্য, তখন আমাদেরও আর্টকে স্থায়িত্ব দিতে চাহিলে তাহাকে সুনীতি দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। § আর্ট, বিশ্বচরাচরে, সৃষ্টির মূল প্রাণ। §

উপরোক্ত উক্তিসমূহ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আর্ট বস্তুত ভগবৎ-কেন্দ্রক বলিয়াই আর্টসম্বন্ধীয় সাধারণ মূলতত্ত্বগুলিও দেশনির্বিশেষে সমভাবেই স্বীকৃত। তাই বলিয়া এ বিষয়ে বিরোধী মত যে

* উদ্ধৃত উক্তিগুলি কাউণ্ট টল্‌স্টয় লিখিত "আর্ট কি" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় হইতে গৃহীত।

* উদ্ধৃত উক্তিগুলি কাউণ্ট টল্‌স্টয় লিখিত "আর্ট কি" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় হইতে গৃহীত।

† নারায়ণ মাঘ ১৩২৩।

‡ টল্‌স্টয়-লিখিত What is art গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখিত "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"।

§ Emerson's Complete prose Works—Essay on art।

দেখা যায় না তাহা নহে। এক পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডেরই তো পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এই প্রকার বিরোধী মত দৃষ্ট হয়। বিন কোলম্যান নামক এক লেখক বহিঃসৌন্দর্য্যটুকুকেই আর্টের লক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মঙ্গলভাবের কোনই সম্পর্ক নাই। এইরূপ মাত্র বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যটুকুকেই সমস্ত আর্টের লক্ষ্য বা সার বলা যে কতদূর অসার কথা, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইতিপূর্ব্বে কথিত আমাদের মন্তব্যসকল প্রণিধান-পূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিবেন। আরও অনেক লেখককে সম্পূর্ণ এই পথে না হইলেও প্রথমোক্ত পথ হইতে অনেকটা ভিন্ন পথে যাইতে দেখা যায়। এক সময়ে বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয় যুগে অনেক বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিতেন। ক্রমে বিজ্ঞান যতই গভীরভাবে আলোচিত হইতে লাগিল, ততই দেখা যাইতে লাগিল যে, বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে তাহাদের এক নিয়ন্তাও স্বীকার না করিলে চলিতেই পারে না। সেইরূপ আর্টের এই নব-অভ্যুদয় যুগে আর্টের বহিরঙ্গ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া যতই কেন তাহাকে তাহার কেন্দ্র ভগবান এবং তাহার লক্ষ্য অন্তরঙ্গ মঙ্গলভাব হইতে পৃথক করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা হউক না, সময়ে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে আর্টকে যেমন তাহার বহিরঙ্গ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য হইতেও পৃথক করা যায় না, সেইরূপ তাহাকে তাহার কেন্দ্র ভগবান বা তাহার লক্ষ্য মঙ্গলভাব হইতে বা তাহার প্রাণ প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভাবিকতা হইতে কিছুতেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইতে পারে না। প্রকৃতি, স্বাভাবিকতা, মঙ্গলভাব, সৌন্দর্য্য এবং ভগবান, এই সমস্তকে লইয়া, সমস্তের সঙ্গে যোগসংবদ্ধভাবে আর্টকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

শান্তি।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এল)

পর্ণকুটীরে থাকি যদি আমি
তাহে মোর নাই লজ্জা
অন্তরে যদি শান্তি বিরাজে
তায় চেয়ে নাই সজ্জা!
থাকি যদি সদা প্রফুল্ল-প্রাণ
সকালে ও সাঁঝে গেয়ে যাই গান
নিখিলের পরে করি প্রেমদান
তবে রহিবে কি দুখ-দৈন্য?
ভালবাসি যদি ধূলি-তৃণ-পাখী
রবি শশী তারা ফুল ফল শাখী
প্রতিদিন যদি পূজা-ফুল গাঁথি
তবে আমিও যে ধনী গণ্য!
ধনীও যে ধনে বঞ্চিত রহে
আমি তাতে সদা ধন্য!
বরি' নেব আলো তাঁর আলো বলে'
আঁধারে হেরিব তাঁর আঁখি জলে
সুখ দুখ শোকে তুলে নেব বুকে
তাঁর স্নেহ দান বলে'
জীবনের পথে কুসুম বিকাশি'
চলে যাব সুখে মুখে লয়ে হাসি
মরণ যেদিন ল'বে মোরে গ্রাসি'
খুশী হয়ে যাব চলে
এই যদি হয় মোর সম ধনী
রহিবে ধরণীতলে?

শূকরবলি।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

শূকরবলির কথা শুনিলে হয়ত অনেকেই মনে করিবেন যে, এই প্রথা পাহাড়িয়া অসভ্য জাতির নিকট হইতে অনুন্নতমস্তিষ্ক হিন্দুগণ অবিচারিত-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণার অনুকূল কোনও প্রমাণ নাই; প্রত্যুত হিন্দুর বিভিন্ন-গ্রন্থে প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরিকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের বলিপ্রকরণে কথিত হইয়াছে যে "দেবতার উদ্দেশে শূকর বলিদান করিলে দেবতার পঞ্চাশ বৎসর প্রীতি হয়"। (১) আরও অনেক গ্রন্থে শূকর বলি-দানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অনাবশ্যক বোধে প্রমাণান্তরোপন্যাস উপেক্ষিত হইল। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেবতার নিকট অদ্যাপি শূকর বলিদান হইয়া থাকে। অনুসন্ধানের ফলে আমরা এ পর্য্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

(১) বরাহেণ তু পঞ্চাশদ্বর্ষং চন্দ্রেণ তু। ২৩। প্রকাশ।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ থানার অধীন গাঙ্গাটিয়া গ্রামে থলকুমারী দেবতার পূজায় (এই দেবতা প্রাদেশিক) শূকর বলি হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলার কুলবাড়িয়া থানার অধীন পুটিজানা দেবগ্রাম অঞ্চলে বনদুর্গার পূজায় নাপিত ক্ষুরের দ্বারা শূকরের গলা কাটিয়া দেয়। মহামারী নিবৃত্তির জন্য কৌলিকগণ কালীপূজায় শূকর বলিদান করিয়া ঐ শূকর মাটিতে প্রোথিত করিতেন, এমত শুনা গিয়াছে। মুক্তাগাছার ছোট হিস্যার অন্যতম পুরোহিত শ্রীমান্ শশিভূষণ কাব্যবিনোদের নিকট জানা গেল, মুক্তাগাছার জমিদার মহোদয়দিগের কৌলিক নিয়মানুসারে বনদুর্গার পূজায় একটি শূকর ও একটি শূকরী বলিরূপে উপন্যস্ত হয়। শূকরের গলার একটুস্থান ক্ষত করিয়া তাহা হইতে কলার অগ্রপাতে ২-৪ বিন্দু রক্ত দেওয়া হয়; ঐ পাতে শূকরীটিকে শোয়াইয়া বাট্-বাট্ বলা হয়। পরে শূকর ও শূকরীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডোমে অথবা মেথরে ঐ শূকর ধরিয়া লইয়া যায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার সন্নিহিত গোলাকান্দাই অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তিতে ঠাকুরপণ্ডিতের (প্রাদেশিক দেবতা) নিকট শূকর বলি হইয়া থাকে। নমঃশূদ্রের বাড়ীতে পূজার অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণগণও নমঃশূদ্রের বাড়ীতে শূকর পাঠাইয়া কাটান।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার থানার অধীন সোনারগাঁও পরগণার কৃষ্ণহরানিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট জানা গেল, তাঁহাদের প্রদেশে "গৌড়পালের" (প্রাদেশিক) পূজায় শূকর বলি দেওয়া হয়। পূজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন। পূজার পদ্ধতি আছে, (উহা আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিব)। উক্ত তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন, তাঁহাদের তিন ভ্রাতার জন্যই গৌড়পালের পূজা ও শূকরবলি মানসিক আছে। শিশুকালে ছেলেদের শরীর হঠাৎ নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দেয়, এমন অবস্থায় গৌড়পালের পূজা মানসিক করা হয়। সকল পূজায় শূকর বলি হয় না, পাঁঠা বলি হইয়া থাকে। অর্দ্ধশূকর বলি মানসিক করিলে একটি শূকর দিতে হয়। একটি মানসিক করিলে দুইটি দিতে হয়। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "শুড়া পালের" পূজা বলে। এই পূজা বাহিরে উঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় শূকরকে চিৎ করিয়া তাহার গলা কাটা হয়। যে তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে এই তথ্য সংগৃহীত হইল, কুমিল্লা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাঁর বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে উচ্চ শ্রেণীর নৈয়ায়িক। এক সময়ে কৃষ্ণপুরাতে ৪২টি ন্যায়ের টোল ছিল।

রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছারাধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট জানা গেল, পাবনা জেলার অন্তর্গত বেরা থানার অধীন করঞ্জা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট শূকর বলিদান হইয়া থাকে। এই দেবী একটি পাথরের ঢিপি মাত্র। জ্যৈষ্ঠমাসে সিদ্ধেশ্বরীর মেলা হইয়া থাকে।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দা থানার অধীন মান্দা বিলে প্রথম বাইছের দিনে অর্থাৎ বৎসরের প্রথম যেদিন বিলে জাল ফেলান হয়, সেইদিন "শূকরকালীর" পূজা হইয়া থাকে। উহাতে শূকর বলিদান করা হয়। দক্ষিণা কালীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে পূজা করা হয়। পূজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন। পূজার অন্তে ডোমে শূকর ছেদন করে। কিন্তু শূকর উৎসর্গ করা হয় না। কালীর উদ্দেশে শূকর বলিদান করা হয়, সম্ভবতঃ এই কারণেই দেবী "শূকরকালী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজসাহী তানোর থানার অধীন কামার গাঁনিবাসী শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণটি সংগৃহীত হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বর্ত্তমান বয়স ৭৮ বৎসর।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট শূকরকালী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত বিবরণ জানা গিয়াছে। তাঁহারা পুরাতন প্রস্তর-মূর্ত্তি সংগ্রহের সময়ে রাজসাহীর একস্থানে গাছ-তলায় একটি ভগ্ন মকরমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। তত্রত্য সাধারণ লোকেরা উহাকে "শূকর কালীর" মূর্ত্তি মনে করিয়া, উহার উপর পুষ্প, সিন্দুর প্রভৃতি প্রদান করিত। ইহাতে মনে হয়, অতি দীর্ঘকাল হইতে ঐ প্রদেশে শূকরকালীর পূজা অর্থাৎ কালীর নিকট শূকর বলিদান প্রচলিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রামকেলি—তেতালা।

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন।
আত্ম উপাসনা-বীজ কর রে রোপণ।
প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেকবৈরাগ্যবারি,
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন।
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্য জ্ঞান ফলোদয়,
নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে।
ইহাতে হইলে মতি, যাইবে দুঃখদুর্গতি,
হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন।

কথা—রাজা রামমোহন রায়। }
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। }

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
II দদা -পমা -পা মগা | -মগা মা -পমা পা I পা ণদা -া পা | -া -দদা -পমা -পমা |
চি• •• • ত্ত• ••ক্ষে•• ত্র প বি• •ত্র •••••••

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -গঃ -মঃ া -া গা | পা মা -া পা I মা -া -পঃ -গঃ | -ঋা ঋা সা -া |
• • • • ক রি য়ে • ও রে • • • • • ম ন •

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -া -া -া মা | -া মা গা -া I মা -দা -া -া | -দমা পা পা -া |
• • • আ • ত্ম উ • পা • • • •• স না •

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| গা -মা ণদা -া | -র্সা -া -া দা I দা দদনা -র্সঋর্সা -নর্সা | র্সা -ঃ -র্সঃ দা পা II
বী • জ• • • • • ক র রে•• ••• •• ব • • প ন

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -া -া -া দা | দা না -র্সা র্সা I ঋা ঋা -া -র্সর্সা | র্সা -না র্সা -া |
• • • প্র য ত্ন • সে চ নী • •• ধ • রি •

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -া -া -া দা | দা না -র্সা র্সা I ঋা ঋা -র্সা -না | -র্সা দা পা -া |
• • • বি বে ক • বৈ রা গ্য • • • বা রি •

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -া -া -া মা | মা মা গা -া I মা দা -া -া | -দমা পা পা -া |
• • • প্রা ণ প ণে • প্র তি • • •• ক্ষ ণে •

•　　　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　৩
| -া -া -া গা | মা ণদা -র্সা -া I দদা -নর্সা -ঋর্সা -র্সনা | -র্সা -দা দা পা II
• • • ক র রে• • • সে• •• •• •• • • চ ন

০ ১ ২´ ৩
-া -া -া সা। সা মা -গা মা I পা -া পা -া। -দদা -পমা পা পা।
• • • হ বে ব্র • হ্ম মো • ক্ষ • •• •• ম য়

০ ১ ২´ ৩
। -া -া -া দা। দা পা -দা পা I মা মা -গা -পা। মা -া গা -া।
• • • নি ত্য জ্ঞা • ন স্ব লো • • দ • য় •

০ ১ ২´ ৩
। -া -া -া দা। দা দা -া দা I দা পা -া -মা। -মপা পা পা -া।
• • • নি শ্চি ত • অ মৃ ত • • •• লা ভ •

০ ১ ২´ ৩
। -া -া -া সা। সা সঋগা -মপা মা I মা -া -গা -া। -ঋা -া সা -া II
• • • সে ক ল•• •• ক লি • • • • •লে •

০ ১ ২´ ৩
-া -া -া দা। দা না -র্সা র্সা I ঋা ঋা -া -র্সর্সা। র্সা -নর্সা র্সা -া।
• • • ই হা তে • হ ই লে • •• ম •• তি •

০ ১ ২´ ৩
। -া -া -া দা। দা না -র্সা র্সা I ঋা -া র্সর্সা -া। র্সনা -র্সা দা পা।
• • • যা ই বে • দুঃ খ • •• • দু• • র্গ তি

০ ১ ২´ ৩
। -া -া -া মা। মা মা -া গা I মা দা -া -া। -দমা পা পা -া।
• • • হ ই বে • প র ম • • •• গ তি •

০ ০ ২´ ৩
। -া -া -া গা। মা ণদা র্সা র্সা I দদা -নর্সা -ঋঋা -র্সনা। -র্সাঃ -র্সঃ দা পা II II
• • • মি লি বে• প র ম• •• •• •• • • ধ ন

—•—

ললিত—একতালা।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়।
আকাশ যাঁহার নাম, সাদৃশ্য দিব কোথায়।
দেশ-কাল উভে জিনি বিস্তারেণ রাজ্য যিনি;
বাক্য কি বলিবে তাঁরে মন যাঁরে নাহি পায়।
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিত্তে চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা জ্ঞান,
নাহি আর অন্য উপায়॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়।
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

```
          ১              ২´              ৩                 ০              ১
{ ন্‌া II ঋা মা মা ।  মা মা -া ।  মা মা -া ।  ঋা গা ঋা I  দা না দা ।
    ব    চ  ন  অ     তী  ত  ০     যা  হা  ০     ০  ০  ক     রে কি বু

   ২´             ৩                             ০             ০
। ঋা মা -া ।  ( মা ঋমা গমা ।  ঋা সা ) }  ঋা -া মা ।  গা -া ঋা I
   ঝা  ন  ০      বা  ০০  ০০     ০  র      যা  ০  ০     ০  র  আ

   ১              ২´             ৩              ০             ১
I দা র্সা র্সা ।  র্ঋা না দা ।  না দা ঋা ।  মা গা মা I  না দা ঋা ।
   কা  শ  ধা      হা  র  ০     ০  না  ০     ০  ম  সা     দৃ  শ্য দি

   ২´             ৩                   ০
। মা মা -া ।  ঋমা গমা গমা ।  ঋা সা II
   ব  কো  ০     ধা০  ০০  ০০     ০  র

   ০             ১              ২´              ৩                 ০
-া -া ঋা I  দা র্সা র্সা ।  র্সা র্সা -া ।  র্সনা র্সা র্সা ।  -া -া ঋা I
 ০  ০  দে     শ  কা  ল     উ  ত্তে ০     জি০  ০  নি     ০  ০  বি

   ১              ২´             ৩              ০             ১
I দা না র্সা ।  র্সা র্সা না ।  দা না দা ।  ঋা মা ঋা I  দা না র্সা ।
   ত্তা রে  প     ক্ষা  ন্য ০     ০  বি  নি     ০  ০  বা     কা কি  ব

   ১              ২´             ০              ১              ২´
। র্ঋা না দা ।  দা ঋা -া ।  -মা -া মা I  না দা ঋা ।  মা মা -া ।
   জি  বে  ০     তাঁ  রে  ০     ০  ০  ম     ন  ধী  রে     না  হি  ০

   ৩                  ০
। সগা মঋা গমা ।  ঋা সা II
   পা০  ০০  ০০     ০  র

 ০          ১            ২´           ৩            ০            ১
-া -া মা । দা ঋা মা । মা -া মা । গা ঋা সা । -া -া ন্‌া I ঋা মা মা ।
 ০  ০  ব   ন্য পি  চা   হ  ০  আ   ০  বি  ত্তে  ০  ০  দৃ   চ  ক্ষ  ব

   ২´             ৩               ০             ১              ২´
। দা দঋা -দা ।  ঋা মা -া ।  -া -া ঋা I  দা না র্সা ।  র্ঋা -না -দা ।
   ক  রি০  ০     চি  ত্তে ০     ০  ০  চি     ন্ত  হ  তাঁ     হা  ০  ০

   ৩             ০            ১            ২´            ৩             ০
। -ঋা মা -া । -া -া গা I মা দা না । র্সা র্সা না । -র্ঋা র্সা -া । -া -া দা I
   ০  র  ০    ০  ০  পা    ই  যে  ব    থা  র্থ  ০    ০  জ্ঞা  ০    ০  ন  না

   ১              ২´                 ৩               ০               ১
I না র্সা র্গা ।  র্মা র্গর্ঋা -র্সর্সা ।  র্ঋা -না -দা ।  -ঋা -মা মা I  দা মদা নর্সা ।
   পি  বে  ক     মি  থ্যা০  ০০     ত  ০  ০     ০  ন্‌  না     হি  আ০  ০র

   ২´             ৩               ০
। না দনা দা ।  ঋা মা গঋা ।  -সা -া II II
   অ  ন্যা০  ০     উ  পা  ০০     ০  র
```

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজকর্ম্ম।

কিশোরীচাঁদ যখন নাটোর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হয়েন তখন বোয়ালিয়া ও দীঘাপতিয়া দুইটি প্রধান নগরের মধ্যে কোন সুগম পথ না থাকায় উভয় নগরবাসিগণের যাতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা ছিল। কিশোরীচাঁদ এই অসুবিধা নিবারণার্থ ফেরী ফণ্ড কমিটীর নিকট একটি প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণের জন্য আবেদন করেন ও আনুমানিক ব্যয় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত কমিটী অবিলম্বে এই লোক-হিতকর প্রস্তাবের অনুমোদন না করিয়া অনুসন্ধানে ও আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিশোরীচাঁদ এই বিলম্ব দর্শন করিয়া তাঁহার বন্ধু প্রসন্ননাথকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলেন। প্রসন্ননাথ তৎক্ষণাৎ (১৮৫০ খৃঃ অব্দে) কিশোরীচাঁদের দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু দীঘাপাতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ নিতান্ত আবশ্যক ও জেলার অত্যন্ত মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় এবং সংগৃহীত অর্থ ও সরকারের প্রতিশ্রুত সাত হাজার টাকা ঐ পথ নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট নহে, তিনি স্বয়ং উক্ত পথ ও পথের সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক। এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয় এবং উক্ত লোকরঞ্জক ভূম্যধিকারী এতদর্থে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। প্রথমে বোয়ালিয়া হইতে নাটোর পর্য্যন্ত উক্ত পথ নির্ম্মিত এবং পরে দীঘাপতিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই সময়ে নাটোরে বালকগণের শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশিয়াল কমিশনার মিষ্টার আডাম মফঃস্বলে শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ক রিপোর্টে যে কথা প্রকাশ করেন তাহাতে দেশের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত। তখন শতকরা ৮ জন বালকও বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত না, এবং যাহারা বিদ্যালয়ে যাইত তাহারা কিরূপ শিক্ষিত হইত বুঝাইবার জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রগণের বয়স গড়ে ৫ হইতে ১০ বৎসর এবং বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্রগণের বয়স ১৫ হইতে ১৬ বর্ষ মাত্র এবং শিক্ষকগণ সরলচিত্ত হইলেও নিতান্ত দরিদ্র ও বিদ্যাহীন, তাঁহারা তাঁহাদের গুণ ও আশার অনুযায়ী ব্যবসায় বলিয়া শিক্ষকতাগ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের মহৎ ব্রত সম্বন্ধেও অত্যন্ত উদাসীন। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর রাজশাহীতে একটি জিলা স্কুল স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাবু লোকনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক রামপুর বোয়ালিয়ায় একটি ইংরাজী-বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নাটোরবাসিগণের পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার কোন সুযোগ ছিল না। যাঁহারা আপন আপন পুত্রদিগকে রামপুরে রাখিতে পারিতেন তাঁহারা সন্তানদিগকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেন। যাঁহাদিগের সে ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল না, তাঁহাদিগের পুত্রগণ নিম্নতম শিক্ষাও প্রাপ্ত হইত না। কি ভয়ানক অবস্থা! সমাজে অজ্ঞতার সহিত সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অনাচারও বৃদ্ধি পাইতেছিল।

নাটোরের অধিবাসীগণের এই প্রধান অভাব মোচনের জন্য কিশোরীচাঁদ উক্ত স্থানে নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৪ জানুয়ারী তারিখে উক্ত বিদ্যালয় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রসন্ননাথ আকাডেমীর সহিত সম্মিলিত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীচাঁদ উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে নিম্নলিখিত সারবান্ বক্তৃতা করেন—

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে সভাপতি পদে বৃত করিয়া আমাকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল, আপনারা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এই ভার অর্পিত করেন, তথাপি আপনাদের প্রদত্ত এই কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি সেই বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত স্বত্বাধিকারীর নামে, অদ্য যে বালকগণ ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নামে এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষার নামে আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আমার বোধ হয়, শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা দেশহিতসাধনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষতঃ এতদ্দেশবাসীর, কর্ত্তব্য। লোকের সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত শিক্ষা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশ যে পাপসমূহ দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষাই সে সকলের একমাত্র মহৌষধ; কারণ ভারত নানা ব্যাধিতে পীড়িত এবং সে সকলের জন্য নৈতিক ও শারীরিক উভয়বিধ প্রতিষেধকের প্রয়োজন। আমি আরও জ্ঞাত আছি যে, এতদ্দেশীয় জলবায়ু ও বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমানের অত্যাচার আমাদের অধঃপতনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতীতি যে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এই অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। কেন জনসাধারণ জমীদারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, মহাজন কর্ত্তৃক

প্রসন্ননাথ এবং জমীদারবর্গ কর্তৃক আহূত হইতেছে? কেন চাপরাশীর আবির্ভাব সমস্ত গ্রামকে সন্ত্রস্ত করে এবং চাপরাসধারী অন্যায় উপায়ে অর্থ আদায় করিতে পারে? কেন সর্পাঘাতে বা জলমগ্নে মৃত্যুবিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত থানার বরকন্দাজ মফঃস্বলে এত ভীতি উৎপাদন করে এবং ঐরূপ মৃত্যু ইচ্ছাকৃত হত্যা বলিয়া প্রকাশ করিবে ও নির্দ্দোষ গ্রামবাসিগণকে এই অপরাধের অনুষ্ঠান ও অপরাধ গোপনজন্য 'হুজুরের' নিকট 'চালান' দিবে, এই বিভীষিকা দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করে? কারণ, জনসাধারণ তাহাদের অধিকারসম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহাদিগের অধিকার কি শিক্ষা দাও, তাহারা সপৌরুষে অধিকার প্রতিপাদন করিবে। তাহাদিগকে জ্ঞান বিতরণ কর, তাহারা বেকনের উপদেশ প্রত্যক্ষীকৃত করিবে। তাহাদিগকে বিদ্যাদান কর, তাহারা আর অত্যাচারিত ও পদদলিত হইবে না। অনেকে শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপিত করেন যে, ইহা জনসাধারণকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার ও কর্ত্তব্যের অনুপযুক্ত করিবে। কিন্তু আমি এই বৃহৎ জনসাধারণের জন্য সারবান্ এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষার সমর্থন করিতেছি—উচ্চ শিক্ষার নহে। আমি তাহাদিগকে কার্য্যের শিক্ষা দিতে চাহি; বাক্যশিক্ষা দিতে চাহি না। উচ্চবংশীয় বালকগণ, যাঁহারা আজীবন জ্ঞানচর্চ্চার অবসর পাইবেন এবং দেশবাসীর মানসিক উন্নতিকল্পে উচ্চ জ্ঞান ব্যবহৃত করিতে পারিবেন তাঁহাদিগের জন্য আমি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহি; কিন্তু আমি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই মনে সর্ব্বসম্প্রদায়সম্মত এবং সকলের প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উদার ও উচ্চ ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিতে চাহি।

"এই সকল ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া রাজশাহির ভবিষ্যৎ সুদিনের অগ্রদূত বলিয়া প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠা আমি আনন্দের সহিত স্বাগত করিতেছি। এই জিলার একজন সমৃদ্ধিশালী এবং প্রতাপান্বিত জমীদার এই বিরাট আয়োজনের সহিত এই বিদ্যালয় রক্ষা এবং সম্বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার আয়ের এক অংশ যেরূপে বিনিয়োজিত করিলেন তাহা দেশের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল বিশ্বাসের আনন্দদায়ক ও শুভদায়ক উদাহরণের সমর্থন করে যে, যাঁহারা সেই আলোকে পথ চলিবেন তাঁহারাই বর্ত্তিকা ধরিবেন। সুখের বিষয়, এ দেশে শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে দেশবাসীর পোষকতা আর অসামান্য ঘটনা নহে। কিন্তু বাবু প্রসন্ননাথ আর একটি প্রশংসনীয় এবং লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা এই জিলার অধিবাসিগণের চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমি নাটোর পথ সংস্কারের কথা বলিতেছি। সেই পথনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়—প্রায় পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রা—তিনি একাকী বহন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি অন্যান্য জমীদারবর্গের সম্মুখে সমুচ্চ বদান্যতার উজ্জ্বল আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। যদি পুরাতন কলহ লইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের বদলে অথবা এক বিঘা বা এক কাঠা জমী লইয়া বিবাদবিসম্বাদের পরিবর্ত্তে এবং শ্রাদ্ধ, নাচ, ও 'নাম কা ওয়াস্তে' পূজায় অপরিমিত ধনব্যয়ের বিনিময়ে তাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণকর এবং তাঁহাদের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়তপরিশ্রমশীল হীনাবস্থাপন্ন ও দরিদ্র রায়তগণের উন্নতিবিধায়ক বিষয়ে জমীদারগণ প্রতিযোগিতায় পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিবে। তাহা হইলে আমরা অল্পসময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক জিলা তাহার নিজের বিদ্যালয়ের, নিজের চিকিৎসালয়ের ও নিজের অতিথিশালার এবং নিজের সরাইয়ের জন্য গর্ব্ব করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আজ যে সহস্র সহস্র ক্ষতচরণ যাত্রী ভাগীরথীর পথে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, পথিপার্শ্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, প্রিয়তম পরিবারবর্গের আনন্দদায়িনী উপস্থিতি ও সেবার সুযোগ পাইতেছে না—তাহারা স্থানীয় পান্থনিবাসে আশ্রয় এবং উপযুক্ত যত্ন ও সেবা পাইবে। আমরা দেখিতে পাইব, প্রত্যেক গ্রামের দরিদ্র, রুগ্ন ব্যক্তি—কবিরাজগণের দুশ্চিকিৎসা (!) হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে। যেরূপ 'গঙ্গামায়ীর' অনিবার্য্য ও কল্যাণকর প্রবাহ প্রাচুর্য্য এবং মাঙ্গল্য বহন করে আমরা দেখিতে পাইব, সেইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ দেশের প্রতি অংশ পরিপূর্ণ করিবে, মানসিক ক্ষেত্র প্লাবিত ও উর্ব্বর করিবে।"

এই প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমীতে অনেক ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াছেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তথায় একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজশাহিতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীচাঁদের এই সকল চেষ্টা ও যত্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে করাচমারিয়ার জমীদার বাবু রাজকুমার সরকারের প্রযত্নে কিশোরীচাঁদের একখানি প্রতিকৃতি রাজশাহি কলেজে স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ নাটোরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর,

বাবু প্রসন্ননাথ রায় প্রভৃতি স্থানীয় জমীদার ও সম্রান্ত ব্যক্তিগণ এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক চাঁদা প্রদান করিতেন। কিশোরীচাঁদ কেবল অর্থ সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; পরন্তু ইহার কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া পরিশ্রম সহকারে ইহার উন্নতি-সাধন করেন। এই চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় ডাক্তার জে, আর, বেডফোর্ড কিশোরীচাঁদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী দেখাইয়া তাঁহাকে "Man of Ross"এর সহিত তুলনা করেন। ডাক্তার বেডফোর্ড একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এতদ্দেশে স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভায় তিনি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়া ও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া কিশোরীচাঁদকে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন তাহার এক অংশে লিখিত ছিল—

"You have the proud satisfaction of feeling that you are in advance in that mighty social change which is now working in Hindustan and that the wheel of progress has received one of its earliest impulses from your hand" অর্থাৎ "হিন্দুস্থানে যে মহান্ সামাজিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে আপনি তাহার অন্যতর অগ্রণী এবং উন্নতির চক্র যাঁহাদের হস্ত হইতে প্রথম আবর্ত্তনবেগ প্রাপ্ত হইয়াছে আপনি তাঁহাদের অন্যতর। এই কারণে আপনি গৌরব ও সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন।"

নাটোরে উত্তম জলাশয় না থাকা তথায় রোগাধিক্যের একটি প্রধান কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কিশোরীচাঁদ অশেষ চেষ্টায় তত্রত্য সম্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়া নাটোরবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

কৃষি ও পুষ্পপ্রদর্শনীর উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি নাটোরে একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে অনেক য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সম্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করেন।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে যে সকল কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে মুর্শিদাবাদ বিভাগের তদানীন্তন কমিশনর মিঃ টি, টেলর, রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এ, সুইন্টন, জজ মিঃ জি, সি, চিপ্, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা ও স্থানীয় জমীদারগণ ও কুঠিয়াল য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব পরহিতৈষণা ও অসামান্য কর্ত্তব্যশীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাস্তবিক কয়েক বৎসরের মধ্যে কিশোরীচাঁদ রাজশাহী জেলার এত উন্নতি সাধন করিলেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজিও উচ্চশিক্ষিত সম্রান্তবংশীয় রাজকর্ম্মচারীরা প্রভূত ক্ষমতাসহ মফঃস্বলে প্রেরিত হইতেছেন; আজিও মফঃস্বলের অবস্থা ঈপ্সিত আদর্শ হইতে বহু নিম্নে; কিন্তু কয়জন এইরূপ অবিচলিত উৎসাহ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দেশের উন্নতিসাধনার্থ যত্নবান ?

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হইলেন। জাহানাবাদ সবডিভিসন তখন ডাকাইতি ও অন্যান্য ভীষণ পাপের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণের উপরেই এই মহকুমার ভার অর্পিত হইত। এই স্থানেও কিশোরীচাঁদ উপরিতন কর্ম্মচারিগণের প্রশংসা ও স্থানীয় জমীদার ও প্রজাদিগের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেন। কিশোরীচাঁদের নিয়োগসম্বন্ধে 'প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন—"আমাদের পরম বন্ধু কার্য্যকুশল সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র জাহানাবাদ এলাকাখণ্ডে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় উক্ত স্থানে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" 'প্রভাকরে' দেখা যায়, জাহানাবাদে কিশোরীচাঁদ নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয় সংসৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিলে "বিদ্যানুরাগী উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতানিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়েরা" তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিতে সম্মত হন।

কিশোরীচাঁদের অসামান্য কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে ৩০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সদস্যপদে নিযুক্ত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পরে আরও উচ্চ পদ প্রদান করিবার আশা দেন। যদিও সরকারী চাকরীতে কিশোরীচাঁদ এই সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইতেন তথাপি তিনি স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য রাজকর্ম্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু যে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও কর্ত্তব্যশীলতার সহিত কিশোরীচাঁদ নাটোরে এবং জাহানাবাদে রাজকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন এবং দেশবাসীর সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রযত্ন করেন তাহা গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হ্যালিডের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি এই কর্ম্মনিষ্ঠ যুবককে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রসময় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে রায় হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হইলেন তখন সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্ল্ল

পদে পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে অতিক্রম করিয়া, মাত্র আট বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ কিশোরীচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই পদের বেতন তখন মাসিক ৮০০ শত টাকা ছিল। বলা বাহুল্য কিশোরীচাদ সর্ব্বপ্রকারে এই পদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৬ই জুলাই (২৩শে আষাঢ় ১২৬১ বঙ্গাব্দ) তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'প্রভাকরে' কিশোরীচাঁদের পদপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"আমরা পূর্ব্বে ইংলিসম্যান-পত্রদৃষ্টে লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের সুবিজ্ঞতম রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যতৎপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ৬০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা পুলিসের কনিষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেটি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এইক্ষণে আবার উক্ত পত্রেই দৃষ্ট হইল ঐ পদের বেতন কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ যে ৮০০৲ টাকা বেতন পাইতেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাহাই পাইবেন। যাহা হউক, এতৎ সুসংবাদে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদিগের মিত্র মিত্রবাবু পূর্ব্বে ৩৫০৲ পাইতেন অধুনা ৪৫০৲ টাকা বৃদ্ধি হইল। রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতির প্রতি এরূপ প্রসন্নতা প্রকাশ করাতে অত্যন্ত যশস্বী হইবেন, তাহাতে সন্দেহই নাই।"

রাউলপিণ্ডির পথে।

(শ্রী—দেবী)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিলে আমরা শাজাহানপুর হইতে সন্ধ্যার ডাক গাড়ীতে কাশ্মীরভ্রমণে যাত্রা করিলাম। আমরা দলে বেশ ভারি ছিলাম,—আমি, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শাজহানপুরনিবাসী শ্রীমু— দেবী, তাঁহার পুত্র শ্রীমান জ্যো— তাঁহারই হাস্যমুখী এক পালিত কন্যা, দুইটি সারমেয়, আমার আর এক ভাগিনেয়ী শ্রীম— দেবী ও আমার একটি চারি বৎসরের শিশু পুত্র শ্রীমান ভা—নাথ।

এই দলবল লইয়া একটি কম্পার্টমেন্ট নিজেদের খাসে না লইলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে জানিয়া আমরা যদিও পূর্ব্ব হইতেই একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টেসনে যাইয়া শুনিলাম যে যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট সেই দিবসেই নৈনিতাল গমন করিতেছেন; সুতরাং গাড়ী কিছুতেই রিজার্ভ পাওয়া যাইবে না। অগত্যা একটি মহিলাগাড়ীতেই উঠিলাম। দেখি একটি বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গিনী বসিয়া দিব্য আরামে সুরাপান করিতেছেন। আমার কনিষ্ঠার আগ্রহে কুকুর দুইটিকে সঙ্গে লওয়া চাইই। অতএব সেগুলিকে আমাদের গাড়ীর ভিতরেই লওয়া হইল। এতগুলি কৃষ্ণকায় ভারতবাসী, তার উপর আবার দুইটা কুকুর—ইহা দেখিয়াই ত শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মেজাজ দেখানটা একেবারেই গ্রাহ্য করিলাম না। এইখানে বলা আবশ্যক আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীও আমাদের সহিত একত্র শাজাহানপুর হইতে বুদায়ুন সহরে তাঁহার গৃহে ফিরিতেছিলেন। বৃদ্ধার ঐ অন্যায় ক্রোধ দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম। আমার দিদি ও অ—উহাঁর সম্বন্ধে বাঙ্গলায় হাস্যরস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে এক আধটা ইংরাজীর ছিটা থাকাতে উহাঁর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ হাস্যরসের অবতারণা হইতেছে। বেরিলী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি ষ্টেসনে কতিপয় পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এই সমুদায় দেখিয়া মেমটি আমাদের সহিত অন্য প্রকার ব্যবহার শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া আমার ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত ক্রমশঃ মিষ্ট কথায় গল্প আরম্ভ করিলেন ও ছেলেদের কেক্ প্রভৃতি মিষ্টান্ন দিতে চাহিলেন। ইহাকেই বলে "দুর্ব্বলের যম আর সবলের দাস"।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় আমাদের ভগ্নীপতি মিঃ এন্ বেরিলিষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত। এই ষ্টেষনে বুদায়ুনের জন্য গাড়ী বদল করিতে হয়। এইখানে দিদি নামিয়া গেলেন। আমরাও কিছু জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্রমে ট্রেন মুরাদাবাদ লক্সর প্রভৃতি ছাড়িয়া রাত্রি ৩টার সাহারাণপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু রাত্রি দুইটায় গাড়ী লক্সর ষ্টেসনে পৌঁছিলে পশ্চিম দিক্ হইতে খুব বেগে বায়ু বহিতেছে মনে হইল। গাড়ী লক্সর ছাড়িলে আমরা একটু একটু ধূলার গন্ধ পাইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ অতি বেগে ঝড় বহিতে লাগিল—আর তাহার সহিত কি ধূলার রাশি! সমস্ত ট্রেনটা ঝড়ে দুলিতে লাগিল—কি ঝন্ ঝন্ শব্দ! ভাঙ্গিয়া যায় আর কি! আমাদের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, ধূলায় পূর্ণ; বেঞ্চ, বিছানা ও জিনিষপত্রে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ ধূলা জমা হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! পশ্চিমবাসী বাঙ্গালীদের নিকট এ আঁধি নূতন নয়, কিন্তু আমাদের ন্যায় কলিকাতাবাসীদিগের নিকট এরূপ ধূলার ঝড় ভীষণ ব্যাপার মনে হয়। সাহারাণপুরে আমরা নামিলাম ও waiting room-এ আশ্রয় লইলাম। এইখানে কিছু অধিক গরম বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার কনিষ্ঠা ভগি-

নীর পরিচিত কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তাঁহার পুত্রটিকে লইয়া তিনি অতি প্রত্যূষে ষ্টেসন হইতে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে গেলেন, আমিও সেই সুযোগে বাড়ীতে দুই একখানি পত্র লিখিতে বসিলাম।

সাহারাণপুরের লকেট ফল খুব বিখ্যাত। দুই আনা করিয়া সের। কোম্পানিবাগ হইতে তিন চার সের লকেট আনাইলাম। এত বড় ও এত সুমিষ্ট সরস ফল আমরা কলিকাতায় প্রায়ই পাই না। বেলা ১০টার সময় শু— ফিরিয়া আসিলেন; সঙ্গে তাঁহার পুরাতন বন্ধু সাহারাণপুরের সিভিল সার্জ্জনের স্ত্রীও আসিলেন। আর সময় নাই। আমরা শীঘ্র প্রাতর্ভোজনে বসিলাম, ইত্যবসরে সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার হো— উপস্থিত হইলেন। আমার কনিষ্ঠায় পুত্রটির জন্য আমরা কিছু উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলাম। তাহার পরিচিত শৈশবসহচর সঙ্গে কেহ নাই। না জানি কি ক্রন্দনের রোলই উঠাইবে! কিন্তু রেলগাড়িতে উঠিয়া অবধি বড়ই আনন্দ। মিসেস্ হো—র মোটরে করিয়া তাহারা ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়াছিল; সেই সময় হইতে তাহাকে একটি মোটর গাড়ী কিনিয়া দিবার নিমিত্ত সে তাহার মাতার নিকটে বাহানা আরম্ভ করিয়া দিল।

১২টার সময় আমরা রাউলপিণ্ডির জন্য যাত্রীগাড়ীতে রওনা হইলাম। ডাকগাড়ী রাওলপিণ্ডিতে রাত্রিকালে পৌঁছে। সেই সময় সীমান্তপ্রদেশে অনেক প্রকার গোলযোগ হইতেছিল, শুনা গেল। আফগানদিগের সহিত ইংরাজদের তখন যুদ্ধ হইবার উপক্রম চলিতেছিল। রাউলপিণ্ডির ন্যায় অশান্তিময় স্থানে রাত্রিকালে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলাম না, বিশেষতঃ তথায় রাত্রিযাপনের কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। রাওলপিণ্ডি, পেশাবার প্রভৃতি স্থানে সামরিক আইনানুযায়ী সর্ব্বাগ্রে সৈনিকপুরুষদিগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। দুগ্ধপোষ্য বালকদিগকে লইয়া এরূপ ভয়সঙ্কুল স্থানে রাত্রিযাপন করা নিরাপদ নয় স্থির করিয়া আমরা সাহারাণপুরে গাড়ী বদল করিয়া যাত্রীগাড়ীতে উঠিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে রাউলপিণ্ডিতে পৌঁছিব। ট্রেণে উঠিয়া অতিশয় গ্রীষ্মবোধ হইতে লাগিল। শুইয়া বসিয়া কোনও প্রকারে দিনটা কাটাইলাম। ৪॥০ টার সময় লুধিয়ানা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। লুধিয়ানার নাম শুনিয়া আমাদের লুধিয়ানার শালের কথাটা অগ্রেই মনে উদয় হইল। কলিকাতা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি; সুদূর গৃহে পুত্র-কন্যাদিগের কথা তখন স্মরণ হইতে লাগিল। পুনরায় কতদিন পরে তাহাদিগকে দেখিব। চিন্তার স্রোতের-বিপরীত দিকে গাড়ীটা হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিল; ক্রমে জলন্ধরে আসিয়া উপস্থিত। দিবসের অতিবৃষ্টি ও উষ্ণ বায়ুর তুলনায় এখন অবধি কিছু ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। জলন্ধর বহু পুরাতন সহর। দূরে বামদিকে সমস্ত সহরটি যেন চিত্রের ন্যায় প্রলম্বিত। পঞ্জাবে পদ দিয়া অবধি রেলের দুই ধারে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় সমস্তই আবাদী জমী দেখিলাম। যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে যেরূপ তৃণশূন্য অথবা আগাছাপূর্ণ দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের পর প্রান্তর দেখা যায় পঞ্জাবে সেরূপ দেখিলাম না। রেলের দুই ধারে যেন সবুজ রঙের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে; তাহারই মধ্য দিয়া আমাদের রেল গাড়ীটি শত শত যাত্রীদিগকে লইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এখন অবধি আর অধিক গ্রীষ্ম বোধ না হওয়াতে সমুদায় দরজা জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া আমরা তন্ময় চিত্তে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। রাত্রি আট ঘটিকায় ট্রেণ অমৃতসহরে উপস্থিত হইল। একি! এযে পাগড়ীওলার দেশ! ইতরভদ্র সকলেরই মস্তকে শুভ্র ধবধবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ, আর ষ্টেশনে কি লোকারণ্য! স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত গাড়ীতে একটু স্থান লাভের নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেছে। এক্ষণে আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইল যে এই সুবৃহৎ ট্রেণটি কিরূপ যাত্রীপূর্ণ! এবং আমরা পূর্ব্ব হইতে যে একটি গাড়ী রিজার্ভ করিয়াছিলাম তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছিল। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলাম, গাড়ীর দরজা খুলিয়া যাত্রীরা যেই প্রবেশ করিতে চাহিতেছে তিলার্দ্ধ স্থান নাই বলিয়া ভিতর হইতে তাড়া খাইয়া অমনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। অমৃতসহরে গাড়ী থামিতেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি একটি তরুণী ভদ্রমহিলার প্রতি পড়িল। তিনি শাড়ীপরিহিতা, ক্রোড়ে একটি শিশুপুত্র ও সঙ্গে একটি পঞ্জাবী যুবক। ট্রেণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কতবার তাঁহারা গমনাগমন করিতেছেন—কোথাও একটু বসিবার স্থান পাইতেছেন না। আমাদের গাড়ীতে দুইবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু "রিজার্ভ" দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহার সঙ্গী যুবকটি আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহার ভগিনীকে লাহোর অবধি বসিবার একটু স্থান দেওয়া হউক বলিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। একটি ভদ্র মহিলার সত্যই বিপদ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে স্থান দিলাম। তিনি ভিতরে আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে তিনি কলিকাতার কোনও খ্যাতনামা কলেজের এক অধ্যাপকের স্ত্রী। ইনি খাস লাহোরী। পঞ্জাবদেশে স্ত্রী-পুরুষদিগের পোষাকের মধ্যে কিছু প্রভেদ সৃষ্টি হয় না,

অর্থাৎ উত্তরেরই সাধারণ পোষাক ; পায়জামা ও আজানুলম্বিত ঢিলাহাত কোর্ত্তা। কিন্তু ইনি সেই পোষাক পরিত্যাগ করিয়া নারীর উপযোগী পোষাক শাড়ী পরিধান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মস্তকের কেশও বঙ্গমহিলাদিগের ন্যায় খোঁপাবাঁধা দেখিলাম—সে দেশের রীতি অনুযায়ী রজ্জুমণ্ডিত আপাদলম্বিত এক বৃহৎ চুঁটিয়া নহে। পূর্ব্বে দুই একবার পঞ্জাবে আসিয়াছিলাম তখন পঞ্জাবীদিগকে শাড়ীপরিহিত বিদেশী স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে শাড়ীওয়ালী বলিয়া উপহাস করিতে শুনিয়াছিলাম। এখন সেই শাড়ী, খাস লাহোরী উচ্চ রাজপদস্থিত এক পঞ্জাবীর স্ত্রী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে দেখিয়া বাস্তবিক একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। আমার ভগিনীর গৃহে আরও দু-একটি উচ্চপদস্থ পঞ্জাবীর স্ত্রীদিগকেও শাড়ী পরিতে দেখিয়াছিলাম ; তাহাতে মনে হইল, বোধহয় আজিকালিকার ভদ্র পঞ্জাবী মহিলাগণ শাড়ীকে, স্বদেশীয় চিরপ্রচলিত পায়জামা কুর্ত্তা হইতেও অধিক সুন্দর, মনোরঞ্জক ও স্ত্রী-অঙ্গের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বিবেচনা করিয়া শাড়ীর আদর করিতেছেন। সত্যই আমাদের চক্ষে নারীর অঙ্গে পুরুষোচিত পোষাক, পায়জামা কোর্ত্তা পরিধান করা যেন কি অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয়, এরূপ পরিচ্ছদে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও কোমলতার অভাব আছে। মনে পড়ে, নৈনিতালে আমার পাঁচ বৎসরের শিশুটি পাতিয়ালার রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীবৃন্দের পরিধানে চুড়ীদার পায়জামা এবং আজানুলম্বিত লাহোরী কোর্ত্তা দেখিয়া সবিস্ময়ে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা, এরা মেয়ে মানুষ না পুরুষ মানুষ ?" তাহার শিশুবুদ্ধিতে স্ত্রীলোকেরা যে এরূপ পায়জামা পরিবে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই। তাহার এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে খুব হাসির রোল উঠিয়াছিল।

ট্রেনের "রেষ্টরাঁ" গাড়ীর খাদ্যসামগ্রী কিরূপ উপাদেয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। লাহোর ও অমৃতসহরের হিন্দু রিফ্রেশমেণ্টের সুখ্যাতি শুনিয়া "রেষ্টরাঁ"র আহারের পরিবর্ত্তে আমরা পঞ্জাবী খাদ্য আহার করিতে মনস্থ করিয়া দুই ব্যক্তির উপযুক্ত খাদ্য আনিতে বলিলাম। দুই থাল আহার সামগ্রী আনীত হইল। তাহাতে মৎস্য মাংস কিছু ছিল না বটে কিন্তু অতি সুস্বাদু। এবং ঐ দুই থালে খাদ্য এত বেশী পরিমাণে ছিল যে আমরা চারিজনে তাহা শেষ করিতে পারিলাম না। দুই তিন প্রকারের অন্ন ছিল। নিমকী চাউল বা ভাত, মিঠা চাউল ও জর্দ্দা পোলাও। ডাল ও চারি প্রকারের ব্যঞ্জনাদি, ছোট ছোট মুলকী রুটি, সবশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ"এর জন্য ক্ষীরও ছিল। আমরা সকলেই খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। আহারান্তে স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিলাম—কি জানি পুনরায় কেহ ভিতরে আইসে, তাহা হইলেই ত বসিয়া রাত্রি প্রভাত করিতে হইবে।

১৭ই প্রত্যূষে গুজারখাঁ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। এখান হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বঙ্গদেশের নদনদী খাল-বিলপূর্ণ, আম্র কাঁঠাল কদলী প্রভৃতি সহস্র প্রকারের বৃক্ষাদিসুশোভিত হরিদ্বর্ণের সহিত এখানকার শুষ্ক গেরীমাটির রঙের ভূমির কি প্রভেদ! কিন্তু এখানকার লোকদের গঠন ও আকৃতি বড়ই সুন্দর। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দীর্ঘকায় ;—সকলেরই উন্নত নাসিকা, আয়ত চক্ষু ও বর্ণ উজ্জ্বল। ইহাদের পরিধানে পায়জামা, কামিজ, ফতুই-কোর্ত্তা ও কোট; মস্তকে সাফা (পাগড়ী)। শত গ্রন্থিযুক্ত হইলেও গরীব-দুঃখীদেরও পোষাক একই প্রকারের। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। অবশ্য কলিকাতাতেও সচরাচর অনেক পঞ্জাবী আমরা দেখি, কিন্তু ইহাদের দেশে আসিয়া ইহাদের পোষাক ইত্যাদি দুইটি কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রথমতঃ, আমাদের দেশে রাস্তায় দৃষ্টিপাত করিলে অধিকাংশ লোককেই একটিমাত্র ধুতি-পরিহিত নগ্ন গাত্র ও স্কন্ধদেশে একখানি গামছা বা উড়ানি রক্ষিত আছে দেখি। কেহ বা চটী জুতা পায়ে, কেহ বা জুতাশূন্য পায়েই চলিয়াছে। কিন্তু এখানে একটি লোককেও পাদুকাশূন্য এবং বিনা কোটে দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ভদ্র-অভদ্র কাহারও মস্তক উষ্ণীষশূন্য নহে। ইহা দেখিলে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, আমাদের দেশেই কিরূপে পোষাক এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইল! বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদও একখানি শাড়ীমাত্র ; ইহা কি লজ্জার কথা! ভারতের অন্যান্য স্থানে স্ত্রীলোকের পোষাক কোথাও দশ গজ বিশ গজ বস্ত্রের বড় বড় লাগা (ঘাগরা) কুর্ত্তা ও ওড়না, কোথাও বা পনেরো ষোল হস্ত পরিমিত শাড়ী চোলী ও কুর্ত্তি। ভারতের আর কোনও প্রদেশে বঙ্গীয় স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় এত স্বল্প বস্ত্র-পরিহিত মনুষ্য নাই বলিলেই হয়।

এ স্থানের জমি পার্ব্বত্য। হিমালয়ের তলদেশ জলাধিক্যবশতঃ স্বভাবতঃই অতিশয় উর্ব্বরা, সুতরাং সমস্তই প্রায় কর্ষিত ভূমি। কোথাও বা ক্ষেত্রে শস্য কর্ত্তন সম্পন্ন হইবার পর পুনরায় লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে ; কোথাও বা শস্য পাকিয়া রহিয়াছে, দু-এক দিবসেই কাটা আরম্ভ হইবে। এদেশের শস্যক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া শস্য কাটে। মধ্যে মধ্যে এক-একটি গ্রাম আমাদের

দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছিল। দূরে গ্রামগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হইতেছিল। আমাদের দেশের খড়ের ছাউনি এ সকল গ্রামে দেখিলাম না। গৃহগুলি চতুষ্কোণ, গৃহের ছাদ সমতল, শ্লেটের ন্যায় পাতলা পাথর বা টিন নির্ম্মিত। একটি গৃহের ছাদ ছাওয়ান হইতেছিল দেখিলাম; বৃক্ষের গুঁড়ির উপর সদ্য ছিন্ন হরিদ্রাবর্ণের লতাপাতা, তাহার উপর শুষ্ক অড়হর বৃক্ষ দিয়া মৃত্তিকার লেপ দিতেছে। যতই অগ্রসর হইতেছি, ভূমি ততই শৈলময় ও বন্ধুর। কোন কোন স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের ট্রেণটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সহসা দুই তিনটা পর্ব্বতসুড়ঙ্গের গাঢ় অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তীব্র আলোক মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেই বালকদিগের আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত।

১৭ই তারিখে প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আমরা রাউলপিণ্ডিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইখানেই রেলগাড়ীর সহিত আমাদের এতদিনের সম্পর্ক আপাততঃ শেষ হইল। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ বাষ্পীয় শকটের নিকট বিদায় লইলাম।

(এ স্থানটি সত্যই পাঠানের দেশ। আমাদের দেশে কিসমিস, বাদাম, পেস্তা আমদানীর কর্ত্তা কাবুলী বলিয়া যাহাদিগকে জানি, সেই প্রকারের লোকই চতুর্দ্দিকে গিসগিস করিতেছে। যাহাদের দু একটি দেখিয়া আমরা দেশে ভয়ে জড়সড় হইয়া যাইতাম, আজ সেইরূপ অসংখ্য কাবুলীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেশাচারের পিঞ্জরের মধ্যে থাকিয়া আমরা যে ভয় করিতাম, এই ভীম-অবতারদিগের দেশের মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সে ভয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে; হৃদয় তো এতটুকুও কম্পিত হইতেছে না! তবে কি ইহা সত্যই আমাদের বায়ুর দোষ? বেহারা, ভিস্তি, খানসামা সেই দেশের সকলকেই কাবুলী বলিয়া বোধ হয়।)

উৎসবের উদ্বোধন।*

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী)

ভোরেই যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, প্রথমেই মনে পড়িল 'আজ আমাদের উৎসব'। উৎসবের কথা মনে আসিতেই আমার সমগ্র হৃদয়-মন আনন্দের স্পর্শে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। আজ আর দিনের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে আমাকে বাঁধা পড়িতে হইবে না; আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি মুক্ত! মুক্তির এই আভাস লইয়া সেই যে কখন্ শয্যা ত্যাগ করিয়াছি, সারাদিন আর এতটুকু বসিবারও অবসর পাই নাই। উৎসবের বিচিত্র কর্ম্মস্রোতের মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে কি আনন্দেই দিনটি কাটিয়া গেল। বাস্তবিক, আমার মনে হয় আনন্দই উৎসবের মূর্ত্তি—আনন্দই উৎসবের শরীর। সকাল হইতেই তো দেখিতেছি, যাঁহারা এই উৎসবক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেছেন, যাঁহারা ইহার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা এখন এই সভাকে পূর্ণ করিয়া অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন, সকলেরই হৃদয়ের দুই কূল আজ আনন্দের জোয়ারে ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে কম্পিত করিয়া মুখরিত করিয়া আনন্দস্রোত আজ অপ্রতিহতবেগে বহিয়া চলিয়াছে। আমাদের মুখের প্রফুল্লতায় কণ্ঠের প্রসন্নতায় অন্তরের সেই 'আনন্দ' আজ মুহুর্মুহু ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এইটুকুতেই আমরা তৃপ্ত নহি। ইহাকে আরও ব্যক্ত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিব—এই আগ্রহ আমাদের জাগিয়াছে। তাই তো এই সুবাসভরা ধূপের ধোঁয়া, এই প্রদীপ্ত দীপাবলী, সুসজ্জিত বেশ। এই জন্যই তো কণ্ঠ ভেদ করিয়া সঙ্গীত ছুটিতেছে, অন্তর কাঁপাইয়া বাণী ফুটিতেছে।

কিন্তু দেখিও, নিজেকে যেন ছলনা করিও না। উৎসবের আনন্দ যেন তোমার হৃদয়ের উপর দিয়া পিছলাইয়া না যায়, তাহাকে তোমার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে দাও। জীবনের পথে চলিতে চলিতে মানুষ ক্রমাগতই তো আঘাত পাইতেছে। কোন আঘাত ব্যর্থতার, কোনটা বেদনার, কোনটা অবহেলার—এমন শত শত আঘাত আমাদের হৃদয়-গুহায় আসিয়া কাঁটার মত বিঁধিতেছে। রাত্রিদিন আমরা সেই বেদনাকে অন্তরে অন্তরে পুষিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছি, তবুও নিখিলের মাঝে বসিয়া নিখিলনাথের চরণতলে তাহা নিবেদন করিতে সাহস হয় না—লজ্জা পাই—এমনই আমাদের দুর্ব্বলতা! আজ কিন্তু মনের দ্বারে সতর্কতার প্রহরীকে বসাইয়া দাও; যেন দুর্ব্বলতার মোহ আজ আমাদের পাইয়া না বসে; আজ যেন আমরা হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া আহত অলকে উন্মুখ করিয়া ভগবানের কাছে তুলিয়া ধরিতে

---

* বেহালা সাম্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত।

পারি। উৎসবের আনন্দধারায় যেন অন্তর্লোকের সমস্ত ক্লেদকে ধৌত করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে পারি।

একটি কথা আমরা আজ অকপটে স্বীকার করিব। আমরা ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে চাই, কিন্তু চিরদিনই একটা জায়গায় গিয়া বাধা পাই। তাঁহার আনন্দরূপকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। সে আসে, সে চলিয়া যায়; স্থায়ী হয় না; তাহাকে আমাদের চিরসঙ্গীরূপে পাই না। উৎসবের দিন যে আনন্দ অন্তরে বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, উৎসবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। চিরদিনের শ্রীহীন শুষ্ক জীবন আবার তাহার তৃষ্ণালু স্বভাব লইয়া জাগিয়া উঠে। ভগবানের রাজ্যে কিন্তু আনন্দের অভাব এতটুকুও দেখি না। সেখানে তো রাত্রিদিনই অবিশ্রান্ত ধারায় আকাশ হইতে আনন্দ ঝরিতেছে; বসুন্ধরার বক্ষ ফাটিয়া আনন্দের ফুল ফুটিতেছে, পাহাড়ের গা বহিয়া আনন্দের ঝরণা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সর্ব্বত্রই আনন্দ মুখর হইয়া ছুটিতেছে; আর মানুষ আমরা এই বিশ্বব্যাপী আনন্দের তীরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছি! নিজেরা এই আনন্দের ছন্দে যোগ দিতে পারিতেছি না! বিশ্বকে মন্থন করিয়া ভগবানের যে আনন্দরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, আমাদের জীবনে তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।

কেন? বহুদিন হইতে চিত্তের মাঝে এই প্রশ্ন জাগিতেছে কেন? কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি নাই যে, এই আনন্দ আসে কোথা হইতে। ভগবানের এই আনন্দরূপের মূল উৎস কি? এই তো কতক্ষণ সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার আঁধারে দিনের আলো নিবিয়া গেল। পাথরের মত কালো আকাশ ভরিয়া তারার আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই সময়ে বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া অলসনেত্রে বিশ্বের এই সৌন্দর্য্যময় অপূর্ব্ব দৃশ্যপটের দিকে তাকাইয়া ভগবানের শান্ত আনন্দরূপকে উপলব্ধি করিতে আমরা ভালবাসি। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি যে এই চিত্তোন্মাদী সৌন্দর্য্যের, ভগবানের এই আনন্দরূপের পশ্চাতে তাঁহার কি বিরাট শক্তিরূপ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে? গ্রহচক্রের কি প্রবল ঘূর্ণনে দিনের পর রাত্রি নামিয়া আসিতেছে; রজনীর ঘনায়িত অন্ধকারকে ছিন্ন করিয়া জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে; পূর্ব্বাকাশের উষার আলোয় তাহা আবার ম্লান—পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছে! আমরা জীবনকে আনন্দময় করিতে চাই, কিন্তু তাহার তত্ত্বকথাটুকু মনে রাখি না কোনদিনই; মনে রাখি না যে শক্তিই কর্ম্মের মধ্য দিয়া আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বের দিকে তাকাইলেও তো এই সত্যই উপলব্ধি করি; সেখানে দেখি ভগবানেরই এক অফুরন্ত শক্তির উৎসমুখ হইতে যে বিপুল বিচিত্র কর্ম্মের জোয়ারা অজস্র ধারায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে তাহাই তো ভুবনে-ভুবনে আনন্দের তুফান সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে।

এই সত্যকে, বিশ্বের এই চিরন্তন নিয়মকে আমরা দীর্ঘদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আমরা যে নিতান্তই কর্ম্মবিমুখ হইয়াছি, তাহা নয়; তবে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে ভগবানের জ্ঞান-বলক্রিয়া স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত; সে কোন স্বার্থের গণ্ডী কাটিয়া লাভক্ষতির হিসাব করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় না। আপনার আনন্দে আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া নিরন্তই সে কর্ম্মের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। ভগবানের আনন্দরূপকে যদি আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তি-স্ফূর্ত্তির শরণ লইতেই হইবে। স্বার্থের গণ্ডী কাটিয়া কাটিয়া এই যে আমরা মলিন কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি—ইহা আমাদের শক্তির উৎস-মুখকে আজ রুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। সমগ্র সমাজ যেন নিদ্রাতুরের মত অসাড় হইয়া পড়িতেছে। একই চৈতন্যে যে ইহার সমগ্র অনুভূতি বিধৃত, একই শক্তির সূত্রে যে ইহার বিচিত্র বহুমুখী কর্ম্মগুলি গ্রথিত তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইহারই ফলে আমাদের জীবন যেমন একদিকে শক্তিহীন হইয়া পঙ্গু হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে আনন্দের বাজারেও সে একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। নিজের উপার্জ্জন এতটুকুও নাই, শুধু পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়াই কোন রকমে দিন কাটাইতেছে।

আজ কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিয়া মনে

হইতেছে, স্রোত বুঝি ফিরিল—জাগরণ বুঝি আসিল। সমাজদেহের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে জীবনের দীপ নিভ-নিভ হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শক্তিহীন—অসাড় তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আবার যেন নূতন প্রেরণায় চলমান হইয়া উঠিতেছে। মানুষ আজ স্বার্থের সেবা ভুলিয়া ভগবানের পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে শিখিতেছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে মর্ত্ত্যের প্রতি যে মমত্বময় মোহ আমাদের জন্মিয়াছিল, আজ ভূমার প্রকাশে তাহা ছিন্ন হইয়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছে। স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিগুলিকে ভাঙ্গিয়া প্লাবিত করিয়া পবিত্র কর্ম্মের স্বচ্ছ স্রোত আজ আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা পঙ্কিলতাকে বিধৌত করিয়া সে আজ শুচি শুদ্ধ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। দেশব্যাপী আজ একি নবতর উদ্বোধন! প্রত্যেকেই যেন নিজের জীবনে একটা মহান্ লক্ষ্যের আভাস পাইয়া তাহারই দিকে ব্যগ্র হইয়া ছুটিতেছে।

মানুষের জীবন-পথের চিরদিনের বাধাকে আজ কে ভাঙ্গিয়া দিল রে। তাহার সংশয়-জালকে ছিন্ন করিয়া অজ্ঞানান্ধকারকে ধ্বস্ত করিয়া ঐ যে সেখানে ভূমার আবির্ভাব আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের দিকে দিকে আজ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উদ্বোধনের কত আভাস কত ইঙ্গিত নব নব দৃশ্যে সেখানে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। ঐ যে দূরে কতকগুলি লোক নিজেদের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে; কক্ষে তাহাদের কৃপাণ দুলিতেছে, বক্ষে তাহাদের শক্তি জাগিতেছে, তাহারা নির্ব্বাক হইয়া নিপীড়ন সহ্য করিতেছে; চিনিতে পার উহাদের? সত্যের একটা জ্বলন্ত মূর্ত্তি—আত্মার অপরাজিত ভাস্বর জ্যোতি ঐ যে উহাদের দৃষ্টির সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, নদীর জল উদ্বেলিত হইয়া গ্রামের মধ্যে প্লাবন আসিতেছে। মাঠ ভাসিল, গ্রাম ডুবিল, গৃহ পড়িল; মানুষগুলি একগলা জলের মধ্যে মরণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে; এমন সময় কে উহারা দলে দলে নৌকায় করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আর্ত্ত বিপন্ন নরনারীকে ভাই-ভগিনী বলিয়া আপনার কোলে টানিয়া তুলিল; মৃত্যুর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া জীবনের মাঝে ফিরাইয়া আনিল—কে উহারা? নিজেদের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া সুখ-সুবিধা ভুলিয়া দলে দলে পরসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—কে উহারা? চিরদিনের দুঃখভীরু মানুষ আজ কি পরম দুঃখেরই মাঝে তাহার চরম সুখের সন্ধান পাইল? কোন্ নবতর প্রেরণা আজ ইহাদের দীর্ঘদিনের অসাড় প্রাণকে নাড়া দিয়াছে? আলস্য অবসাদ বিদূরিত করিয়া মোহ মমতা নষ্ট করিয়া আজ অতর্কিতে ইহাদের মধ্যে এই একাত্মবোধের ভ্রাতৃভাবের উদ্বোধন ঘটিল কিরূপে? এই যে আমাদের সমাজকে ব্যাপিয়া বেষ্টন করিয়া আজ চারিদিকেই শুধু উদ্বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, ইহা কি উৎসবেরই সূচনা করিতেছে না? উৎসবের মূর্ত্তি আনন্দ, এবং ইহার গতি ঊর্দ্ধদিকে ভূমার মাঝে ভগবানের মাঝে নব জন্ম লাভ করা। মানুষ আজ এই নব জন্মলাভ করিতেছে। তাইতো আজ বিশ্ব ব্যাপিয়াই উৎসবের বাঁশী বাজিতেছে। আমাদেরও এই উৎসব শুধু গৃহকোণের উৎসব নয়, ইহাও ঐ বিশ্বোৎসবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আজ সার্থক হইল। এই উদ্বোধনও ঐ বিশ্বোদ্বোধনের বাণী বহন করিয়াই পূর্ণ হইল। নিখিলনাথ আজ এই উৎসবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তিনি আমাদের জীবনকে শক্তি কর্ম্ম ও আনন্দের ত্রিধারায় নিত্য প্লাবিত রাখুন।

নিবেদন।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সুপবিত্র তীর্থে তব আজি গো অতিথি মোরা
মিটাও মনের ক্ষুধা ঢালি শুভাশিসধারা॥
ভুলে সব দ্বেষ দ্বন্দ্ব না রাখি' পাপের গন্ধ
সম মনে সম প্রাণে সদা যেন থাকি মোরা॥
ভেদাভেদ ছাড়ি' সব মিলি' পদ প্রান্তে তব
মাতি' পূত কর্ম্মে সবে হই যেন আত্মহারা।
কভু না বিপথে যাই, সুপথে সুদৃঢ় রই—
সংসারের দুখে যেন লভি তব প্রেমধারা।

অভাগা আতুর জনে ভাবি' ভ্রাতৃভাবে মনে
তাদের বেদনা মুছি' ঢালি শান্তি সুধাধারা॥
ধরণীর কর্ম্ম সাধি' পুণ্যেতে হৃদয় বাঁধি।
তব পুণ্যরূপে শেষে হই যেন আত্মহারা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

[চতুর্থ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্ন্যাসমার্গীদের যে সংশয় হইতে পারে, তাহাই অর্জ্জুনের মুখে প্রশ্নরূপে বসাইয়া এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। যদি সমস্ত কর্ম্মের পরিণাম জ্ঞান হয় (৪.৩৩), যদি জ্ঞানের দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় (৪.৩৭), এবং যদি দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ হয় (৪.৩৩); তবে দ্বিতীয় অধ্যায়েই "ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর" (২.৩১) বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথা কেন বলা হইল যে "অতএব তুমি কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও" (৪.৪২)? এই প্রশ্নের গীতা এই উত্তর দিতেছেন যে, সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; এবং যদি মোক্ষের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক না হয়, তথাপি কখনও না ছাড়িবার কারণে উহা লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক; এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সমুচ্চয়ের নিত্য অপেক্ষা আছে (৪.৪১)। কিন্তু এ সম্বন্ধেও সংশয় আসে যে, যদি কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য উভয় মার্গই শাস্ত্রবিহিত হয়, তবে এই উভয়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় সাংখ্যমার্গ স্বীকার করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলে হানিই বা কি? অর্থাৎ এই উভয়মার্গের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণয় হইয়া যাওয়া উচিত। এবং অর্জ্জুনের মনে এই সংশয়ই আসিল। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে যেপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেইপ্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে,—]

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২॥

(১) অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! (তুমি) একবার সন্ন্যাসকে এবং আর একবার কর্ম্মসমূহের যোগকে (অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবার মার্গকেই) উত্তম বলিতেছ; এখন নিশ্চয় করিয়া আমাকে একই (মার্গ) বল, যাহা এই উভয়ের মধ্যে যথার্থই শ্রেয় অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত। (২) শ্রীভগবান বলিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ; কিন্তু (অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের যোগ্যতা সমান হইলেও) এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের বিশেষ যোগ্যতা আছে।

[উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর উভয় নিঃসন্দিগ্ধ ও স্পষ্ট। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে প্রথম শ্লোকের 'শ্রেয়' শব্দের অর্থ অধিক প্রশস্ত বা খুব ভাল, দুই মার্গের তারতম্য-ভাববিষয়ক অর্জ্জুনের প্রশ্নেরই এই উত্তর যে, 'কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে'—কর্ম্মযোগের যোগ্যতা অধিক। তথাপি এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যমার্গের ইষ্ট নহে, কারণ উহার কথা এই যে, জ্ঞানের পরে সমস্ত কর্ম্মের স্বরূপত সন্ন্যাসই করা উচিত; এই কারণে এই স্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট প্রশ্নোত্তরের ব্যর্থ টানাবুনা কেহ কেহ করিয়াছেন। যখন এই টানাবুনা করিয়াও সমাধান হইল না, তখন তাঁহারা এক তুড়ী বাজাইয়া কোন প্রকারে নিজেদের সমাধান করিয়া লইলেন যে, 'বিশিষ্যতে' (যোগ্যতা বা বিশেষত্ব) পদের দ্বারা ভগবান কর্ম্মযোগের অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবলমাত্র স্তুতি করিয়া দিয়াছেন—আসলে ভগবানের ঠিক অভিপ্রায় এরূপ নহে! যদি ভগবানের এই মত হইত যে, জ্ঞানের পরে কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তবে কি তিনি অর্জ্জুনকে এই উত্তর দিতে পারিতেন না যে "এই উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ"? কিন্তু এরূপ না করিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে বলিলেন যে, "কর্ম্ম করা ও ত্যাগ করা, এই উভয় মার্গ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ"; এবং পরে 'তু' অর্থাৎ 'কিন্তু' পদের প্রয়োগ করিয়া যখন ভগবান নিঃসন্দিগ্ধ বিধান করিলেন যে, 'তয়োঃ' অর্থাৎ এই উভয় মার্গের মধ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার মার্গ অপেক্ষা কর্ম্ম করিবার পক্ষই অধিক প্রশস্ত (শ্রেয়); তখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবানের এই মতই গ্রাহ্য যে, সাধনাবস্থায় জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কৃত নিষ্কাম কর্ম্মই, জ্ঞানী ব্যক্তি পরে সিদ্ধাবস্থাতেও লোকসংগ্রহের জন্য আমরণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া করিতে থাকিবেন। এই অর্থই গীতা ৩.৭ এ বর্ণিত হইয়াছে, এই 'বিশিষ্যতে' পদই সেখানেও আছে; এবং উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে অর্থাৎ গীতা ৩.৮এ আবারও এই স্পষ্ট শব্দ আছে যে, "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ"। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষদের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. ৪. ২২) বর্ণনা আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি লোকৈষণা ও পুত্রৈষণা প্রভৃতি না রাখিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পরিভ্রমণ

করেন। কিন্তু উপনিষদেও ইহা উক্ত হয় নাই যে, জ্ঞানের পরে এই একই মার্গ আছে—দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব কেবল উক্ত উপনিষদ বাক্য দ্বারাই গীতার একবাক্যতা করা উচিত নহে। গীতা ইহা বলেন না যে, উপনিষদে বর্ণিত এই সন্ন্যাসমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে। কিন্তু যদিও কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস, দুই মার্গ একই প্রকার মোক্ষপদ, তথাপি (অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের ফল একই হইলেও) জগতের ব্যবহার বিচার করিয়া গীতার ইহা স্থির মত হয় যে, জ্ঞানের পরেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিবার মার্গই অধিক প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত এই অর্থ গীতায় অনেক টীকাকারের মান্য নহে; তাঁহারা কর্ম্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে; এবং গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (বিশেষত পৃ. ৩০৭-৩১৫) ইহার কারণ সকল সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে; এই কারণে এখানে উহার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক নহে। এই প্রকারে উভয়ের মধ্যে অধিক প্রশস্ত মার্গ নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন ইহা সিদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই দুই মার্গ ব্যবহারে লোকের চক্ষে বিভিন্ন দৃষ্ট হইলেও তত্ত্বত উহারা দুই নহে—]

§§ জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাংক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। ৩।
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং। ৪।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ৫।
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি। ৬।

(৩) যে (কাহাকেও) দ্বেষ করে না এবং (কোন কিছুরও) ইচ্ছা করেন না, সেই ব্যক্তিকে (কর্ম্ম করিলেও) নিত্যসন্ন্যাসী বুঝিতে হইবে; কারণ হে মহাবাহু অর্জ্জুন! যে (সুখ দুঃখ প্রভৃতি) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া যায় সে অনায়াসেই (কর্ম্মের সমস্ত) বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। (৪) মূর্খ লোকে বলে যে, সাংখ্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্ম্মযোগ) ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বলেন না। কোন এক মার্গের ভালরূপ আচরণ করিলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়। (৫) যে (মোক্ষ-) স্থানে সাংখ্য (মার্গাবলম্বী ব্যক্তি) পৌঁছায়, সেইখানেই যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগীও যায়। (এই রীতিতে এই দুই মার্গ) সাংখ্য ও যোগ একই; যে ইহা জানিয়াছে সে-ই (যথার্থ তত্ত্ব) জানিয়াছে। (৬) হে মহাবাহু! যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাসপ্রাপ্তি কঠিন। যে মুনি কর্ম্মযোগ-যুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হয় না।

[সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন করা হইয়াছে যে, সাংখ্যমার্গে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কর্ম্মযোগে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িলেও লাভ হয়। এস্থলে তো এইটুকুই বলা দরকার যে, মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাদি কাল হইতে আগত এই মার্গ-দ্বয়ের ভেদভাব বাড়াইয়া বিবাদ করা উচিত নহে; এবং পরেও এই যুক্তিগুলিই পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে (গী. ৬. ২. ও ১৮. ১, ২ এবং উহার টিপ্পনী দেখ) "একং সাংখ্যং যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" এই শ্লোকই অল্প শব্দভেদে মহাভারতেও দুইবার আসিয়াছে (শাং. ৩০৫. ১৯; ৩১৬. ৪)। সন্ন্যাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মানিয়া লইলেও ঐ জ্ঞানের সিদ্ধি কর্ম্ম না করিলে হয় না, এবং কর্ম্মমার্গে কর্ম্ম করিতে হইলেও তাহা জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃত হয়, এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গী. ৬, ২); তখন দুই মার্গ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঝগড়া বাড়াইয়া লাভ কি? কর্ম্ম করাই বন্ধন-কারণ যদি বলা যায়, তাই এক্ষণে বলিতেছে যে, এই আপত্তিও নিষ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে করিতে পারা যায় না—]

§§ যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৭।
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। ৮।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্। ৯।
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ১০।
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ১১।
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে। ১২।
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্। ১৩।

(৭) যিনি (কর্ম্ম-) যোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়সকল জয় করিয়াছেন এবং সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁহার আত্মা হইয়া গিয়াছে, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিলেও (কর্ম্মের পাপ-পুণ্য হইতে) অলিপ্ত থাকেন। (৮) যোগ-যুক্ত তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির বুঝিতে হইবে যে, "আমি কিছুই করিতেছি না"; (এবং) দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে, আঘ্রাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) বলিতে, বিসর্জ্জন করিতে, গ্রহণ করিতে, চক্ষের পলক খুলিতে ও বন্ধ করিতেও, (কেবল) ইন্দ্রিয়সকল নিজ

নিজ বিষয়সমূহে বিচরণ করিতেছে, এই প্রকার বুদ্ধি রাখিয়াই ব্যবহার করিবে।

। [শেষের দুই শ্লোক মিলিত হইয়া এক বাক্য হইয়াছে। এবং উহাতে উক্ত সমস্ত কর্ম্ম বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার; উদাহরণ যথা—বিসর্জ্জন করা উপস্থের, গ্রহণ করা হাতের, পলক ফেলা প্রাণবায়ুর, দেখা চক্ষুর ইত্যাদি। "আমি কিছুই করিতেছি না" ইহার ভাব ইহা নহে যে ইন্দ্রিয়সকলকে যাহা চায় তাহাই করিতে দাও; কিন্তু ভাব এই যে, 'আমি' এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে অচেতন ইন্দ্রিয় স্বতই কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না—এবং উহারা আত্মার অধীনে থাকে। সার কথা, কোন ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ করিতেই থাকিবে। অধিক কি, ক্ষণকাল জীবিত থাকাও কর্ম্মই হইতেছে। তখন এই ভেদ কোথায় রহিল যে, সন্ন্যাসমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ছাড়েন এবং কর্ম্মযোগী করেন? কর্ম্ম তো উভয়েরা করিতেই হয়। তবে অহঙ্কারযুক্ত আসক্তি দূর হইলে ঐ কর্ম্মই বন্ধনকারণ হয় না, এই কারণে আসক্তি ত্যাগই ইহার মুখ্য তত্ত্ব; এবং এক্ষণে উহারই অধিক নিরূপণ করিতেছেন—]

(১০) যিনি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিয়া আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করেন, যেমন পদ্মপত্রে জল দাঁড়ায় না, সেইরূপই উঁহাতে পাপ সংলগ্ন হয় না। (১১) (অতএব) কর্ম্মযোগী (আমি করিতেছি এই প্রকার অহঙ্কারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল) শরীরের দ্বারা, (কেবল) মনের দ্বারা, (কেবল) বুদ্ধির দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও, আসক্তি ছাড়িয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন।

। [কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভৃতি কর্ম্মের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে শরীর, মন ও বুদ্ধি শব্দ আসিয়াছে। মূলে যদিও "কেবলৈঃ" বিশেষণ 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' শব্দের পূর্ব্বে আছে, তথাপি তাহা শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রতিও প্রযোজ্য (গী. ৪. ২১)। এই কারণেই অনুবাদে উহাকে 'শরীর' শব্দেরই ন্যায় অন্য শব্দেরও পূর্ব্বে লাগাইয়া দিয়াছি। যেমন উপরের অষ্টম ও নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই এখানেও উক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার আসক্তি ছাড়িয়া কেবল কায়িক, কেবল বাচিক বা কেবল মানসিক কোনও কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না। গীতা ৩. ২৭; ১৩. ২৯ এবং ১৮. ১৬ দেখ। অহঙ্কার না থাকিলে যে কর্ম্ম হয়, তাহা মাত্র ইন্দ্রিয়গণের এবং মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রকৃতিরই বিকার; অতএব এই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তার বন্ধনকারণ হয় না। এখন এই অর্থকেই শাস্ত্রমতের মিল করিতেছেন—]

(১২) যিনি যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল ছাড়িয়া শেষের পূর্ণ শান্তি লাভ করেন এবং যে অযুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত নহে, সে কামের দ্বারা অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ফলের বিষয়ে আসক্ত হইয়া (পাপপুণ্যের দ্বারা) বদ্ধ হইয়া যায়। (১৩) মনের দ্বারা সকল কর্ম্মের (প্রত্যক্ষ নহে) সন্ন্যাস করিয়া জিতেন্দ্রিয় দেহী (ব্যক্তি) নবদ্বারের এই (দেহরূপ) নগরে না কিছু করেন আর না করান, আনন্দে পড়িয়া থাকেন।

। [তিনি জানেন যে, আত্মা অকর্ত্তা, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতির এবং এই কারণে স্বস্থ বা উদাসীন হইয়া পড়িয়া থাকেন (গীতা. ১৩. ২০ ও ১৮. ৫৯)। দুই চক্ষু, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র, মুখ, শিশ্ন ও উপস্থ—এই কয়টীকে শরীরের নব দ্বার বা নয়টী দুয়ার বলে। অধ্যায়সঙ্গতিতে এই উপপত্তিই বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও কি প্রকারে মুক্ত হইয়া থাকেন—]

§§ ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

(১৪) প্রভু অর্থাৎ আত্মা বা পরমেশ্বর লোকদের কর্তৃত্বকে, উহাদের কর্ম্মকে (বা উহাদের প্রাপ্য) কর্ম্মফলের সংযোগকেও নির্ম্মাণ করেন না। স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতিই (যাহা কিছু) করে। (১৫) বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না। জ্ঞানের উপর অজ্ঞানের পর্দ্দা পড়িয়া থাকিবার কারণে (অর্থাৎ মায়া দ্বারা) প্রাণী মোহিত হইয়া যায়।

। [এই দুই শ্লোকের তত্ত্ব আসলে সাংখ্যশাস্ত্রের (গীতার পৃ. ১৬৪-১৬৭), বেদান্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশ্বর, অতএব বেদান্তী লোক পরমেশ্বর সম্বন্ধেও 'আত্মা অকর্ত্তা' এই তত্ত্বের উপযোগ করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই প্রকার দুই মূল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতবাদী সমগ্র কর্তৃত্ব প্রকৃতির বলেন এবং আত্মাকে উদাসীন বলেন। কিন্তু বেদান্তী লোক ইহার পরে চলিয়া স্বীকার করেন যে, এই দুইয়েরই মূল এক নির্গুণ পরমেশ্বর এবং তিনি সাংখ্যবাদীদের আত্মার ন্যায় উদাসীন ও অকর্ত্তা এবং সমস্ত কর্তৃত্ব মায়ার (অর্থাৎ প্রকৃতির) (গীতার. পৃ. ২৭০)। অজ্ঞানের কারণে সাধারণ মনুষ্য এই বিষয় জানিতে পারে না; কিন্তু কর্ম্মযোগী কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বের প্রভেদ জানেন; এই কারণে তিনি কর্ম্ম করিয়াও অলিপ্তই থাকেন, এক্ষণে ইহাই বলিতেছেন—]

§§ জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

(১৬) কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার এই অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাঁহার নিকট তাঁহারই জ্ঞান পরমাত্মতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত করে। (১৭) এবং সেই পরমার্থতত্ত্বেই যাঁহার বুদ্ধি অনুরঞ্জিত হয়, উহাতেই যাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তি হয় এবং যিনি তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হন, তাঁহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ ধুইয়া যায় এবং তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না।

[এই প্রকারে যাঁহার অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সেই কর্ম্মযোগীর (সন্ন্যাসীর নহে) ব্রহ্মভূত বা জীবন্মুক্ত অবস্থা এক্ষণে আরও বর্ণন করিতেছেন—]

§§ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

(১৮) পণ্ডিতদিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, সেইপ্রকারই কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে। (১৯) এই প্রকার যাঁহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়া যায়, তিনি এখানেই, অর্থাৎ মরণের প্রতীক্ষা না করিয়া, মৃত্যুলোককে জয় করেন। কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম, অতএব এই (সাম্যবুদ্ধিবিশিষ্ট) পুরুষ (সর্ব্বদাই) ব্রহ্মেতে স্থিত, অর্থাৎ এখানেই ব্রহ্মভূত হইয়া যান।

[যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া লইয়াছেন যে, 'আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর অকর্ত্তা এবং সমস্ত খেলা প্রকৃতির,' তিনি 'ব্রহ্মসংস্থ' হইয়া যান এবং তাঁহারই মোক্ষলাভ হয়—'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' (ছা. ২. ২৩. ১), উক্ত বর্ণন উপনিষদে আছে এবং উহারই অনুবাদ উপরের শ্লোকে করা হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের ১—১২ শ্লোক হইতে গীতার এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই অবস্থাতেও কর্ম্ম দূর হয় না। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে জানা যাইবে যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' হইবার পরেও তিন আশ্রমের কর্ম্ম-কর্ত্তার বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়া থাকিবে এবং এই উপনিষদের শেষে এই অর্থই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে (ছা. ৮. ১৫. ১)। জ্ঞান হইয়া গেলে এই অবস্থা জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বলে (গীতার. পৃঃ ৩০১-৩০৩)। অধ্যাত্ম-বিদ্যার ইহাই পরাকাষ্ঠা। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগসাধনের দ্বারা এই অবস্থা পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সবিস্তার বর্ণন পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে এখন কেবল এই অবস্থারই অধিক বর্ণন হইয়াছে।]

(২০) যিনি প্রিয় অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু পাইয়া প্রসন্ন হইবেন না, এবং অপ্রিয় পাইয়া খিন্নও হইবেন না, (এই প্রকার) যাঁহার বুদ্ধি স্থির এবং যিনি মোহে আবদ্ধ না হন, সেই ব্রহ্মবেত্তাকেই ব্রহ্মে অবস্থিত জানিবে। (২১) বাহ্য পদার্থের (ইন্দ্রিয়সম্ভূত) সংযোগে অর্থাৎ বিষয়োপভোগে যাঁহার মন আসক্ত নহে, তাঁহার (ই) আত্মসুখ লাভ হয়; এবং সেই ব্রহ্মযুক্ত পুরুষ অক্ষয় সুখ অনুভব করেন। (২২) (বহিঃপদার্থের) সংযোগ হইতেই উৎপন্ন ভোগসমূহের আদি ও অন্ত আছে, অতএব তাহা দুঃখেরই কারণ; হে কৌন্তেয়! উহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি রত হন না। (২৩) শরীর যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আমরণ কামক্রোধবেগ ইহলোকেই সহ্য করিতে (ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা) যিনি সমর্থ হন, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই (প্রকৃত) সুখী।

[গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, তোমার সুখদুঃখ সহ্য করা উচিত (গী. ২. ১৪)। ইহা উহারই বিস্তার ও নিরূপণ। গীতা ২. ১৪তে সুখদুঃখের 'আগমাপায়িনঃ' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২২শ শ্লোকে উহাকে 'আদ্যন্তবন্তঃ' বলা হইয়াছে এবং 'মাত্রা' শব্দের বদলে 'বাহ্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাকেই 'যুক্ত' শব্দের ব্যাখ্যাও আসিয়া গিয়াছে। সুখদুঃখ ত্যাগ না করিয়া সমবুদ্ধিতে উহা সহিতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ। গীতা ২. ৬১র উপর টিপ্পনী দেখ।]

§§ যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং॥ ২৬॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮॥

(২৪) এই প্রকারে (বাহ্য) সুখদুঃখের অপেক্ষা না করিয়া যিনি অন্তঃসুখী অর্থাৎ অন্তঃকরণেই সুখী হইয়া

বান, যিনি স্বয়ং আপনাতেই আরাম পাইতে থাকেন, এবং এইরূপেই যাঁহার (এই) অন্তঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই (কর্ম্ম-) যোগী ব্রহ্মরূপ হইয়া যান এবং তিনিই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। (২৫) যে ঋষিদের দ্বন্দ্ববুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়াছেন যে, সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা আত্মসংযমের দ্বারা সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। (২৬) কামক্রোধবিরহিত, আত্মসংযমী ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যতিদিগের অভিতঃ অর্থাৎ আশেপাশে বা সম্মুখে রক্ষিত ভাবে (বসিয়া বসিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়। (২৭) বাহ্য পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখপ্রদ) সংযোগ হইতে পৃথক থাকিয়া উভয় ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া এবং নাক হইতে চলনশীল প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া (২৮) যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, এবং যাঁহার ভয়, ইচ্ছা ও ক্রোধ ছুটিয়া গিয়াছে, সেই মোক্ষপরায়ণ মুনি সদাসর্ব্বদা মুক্তই আছেন।

[গীতারহস্যের নবম (পৃ ২৩৬, ২৫২) এবং দশম (পৃ ৩০২) প্রকরণ হইতে জ্ঞাত হইবে যে, এই বর্ণনা জীবন্মুক্তাবস্থার। কিন্তু আমার মতে টীকাকারদের এই উক্তি ঠিক নহে যে, এই বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গী পুরুষসম্বন্ধীয়। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, উভয় মার্গে শান্তি তো একই প্রকার থাকে, এবং ঐটুকুর জন্য এই বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গের উপযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায়ের আরম্ভে কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫ম শ্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্ন থাকেন, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই সমস্ত বর্ণনা কর্ম্মযোগী জীবন্মুক্তেরই—সন্ন্যাসীর নহে (গী. র. পৃ ৩৭৬)। কর্ম্মমার্গেও সর্ব্বভূতান্তর্গত পরমেশ্বরকে জানাই পরম সাধ্য, অতএব ভগবান শেষে বলিতেছেন যে—]

§§ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সন্ন্যাসযোগ নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

(২৯) যে আমাকে (সমস্ত) যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, (স্বর্গ আদি) সমস্ত লোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু, এবং সকল প্রাণীর মিত্র জানে, সে-ই শান্তি লাভ করে।

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বাদে সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

—— ——

প্রচারবিবরণ।

(প্রচারক—শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত)

ভাদ্র মাস ঃ—

হরিদ্বারে তিরাই মহারাজের বাড়ীতে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার গৃহে প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা ও অপরাহ্নে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ হইতেছে। পাতিয়ালার ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী মহাশয়া তাঁহার পিতৃ-সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনা ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করেন; আমিও তাঁহার পিতা ৺নবীন বাবুর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। একদিন হরিদ্বার কনখল আর্য্যসমাজের ধর্ম্মশালা পরিদর্শন করিতে যাই; তথাকার অধ্যক্ষ আমাকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আদিসমাজের অনেক সংবাদ জানিতে চান। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইল। গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় আলোচনা করিলাম, গঙ্গার প্রবল স্রোত নিবন্ধন তথায় যাইতে পারিলাম না। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিদর্শন করিলাম; তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাদি বিনামূল্যে পাইতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে আবেদন করিতে বলিয়া আসিয়াছি। সেবাশ্রম রোগীসেবা বিষয়ে খুব যত্ন লইতেছেন। একদিন ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিশেষরূপে পরিদর্শন করিলাম; প্রায় একশত বালক তথায় আশ্রয় পাইয়াছে; সকলের আহার বস্ত্র ও শয্যার এবং অসুস্থ হইলে চিকিৎসারও সুব্যবস্থা আছে দেখিলাম। তথায় মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত এক যজ্ঞশালা আছে; মধ্যস্থানে যজ্ঞকুণ্ডে অহোরাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে। একধারে, শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে দেখিলাম। আশ্রমের তত্ত্বাবধানে এক প্রকাণ্ড আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ঋষিকুল আশ্রম হইতে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

হরিদ্বারে বহু ধর্ম্মশালা আছে। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে এখানে বহু লোক ধর্ম্ম কার্য্য করিবার জন্য এবং গঙ্গাস্নানার্থে আগমন করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ আলাপ করিয়াছি,

সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যখন অপরাহ্ণে কীর্ত্তন করিতে বসিতাম তখন কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া বসিতেন। একদিন হৃষীকেশে গমন করি। পথে বদরিকাশ্রমযাত্রী একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক আলাপ হয়; ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে কাতর হইয়া গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বদরিকাশ্রম যাইতেছেন। হৃষিকেশে গিয়া কালীকমলিওয়ালা বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম; বেশ আদর যত্ন পাইলাম, আহারান্তে লছমনঝোলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে চন্দ্রভাগা নদী পার হইতে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমনি প্রবল স্রোত যে, যে বালকটী আমাকে ধরিয়া পার করিতেছিল, সে ও আমি উভয়েই স্রোতবেগে জলে পড়িয়া যাই; পরে সেই আর্দ্রবস্ত্রেই লছমনঝোলায় গিয়া উপস্থিত হই। পথে মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যদেবের সমাধিস্থান কৈলাস দর্শন করি। মহাত্মার আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, কোন লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হইল না। পথ চলিতে চলিতে কয়েকটী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা "স্বর্গাশ্রম" নামক গঙ্গার তীরবর্ত্তী আশ্রম-কুটীরের অনুসন্ধানে যাইতেছেন। লছমনঝোলা পৌঁছিয়া গঙ্গার বক্ষোপরি সেতুর উপর আরোহণ করিলাম; সেতুটী বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এইখানে গঙ্গার ভীষণ বেগ দেখিয়া খুব চমকিত হইতে হয়। বহুলোক একটা পাষাণের উপর বসিয়া গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। হৃষীকেশ ফিরিবার কথা মনে করিয়া নদী পার হওয়ার জন্য কিছু আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিহরাইয়ের মহারাজার হাতী আসিয়া তিনবারে প্রায় ৪০।৪৫ জন লোককে নদী পার করিয়া দিল। ইতিপুর্ব্বে এক পাহাড়ী একটী বৃদ্ধা স্ত্রীকে ধরিয়া পার করিতেছিল; স্ত্রীলোকটী স্রোতের বেগ সামলাইতে না পারিয়া জলে পড়িয়া যায়, পাহাড়ীও তাঁহাকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখে; তাহার পর বহুলোক গিয়া যদি উহাকে উদ্ধার না করিত তবে সে গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইত।

হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরি নামক এক অতি প্রাচীন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ইনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু ইঁহার মত অতি উদার। অনেক দিন ইঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ হইয়াছে। আমি আমার পরিচয় দিলে ইনি বলিলেন "বেশ বেশ এই তো আসল কাজ"। ইনি বলিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলাতে ইনি বলিলেন "ওঃ তাঁরা মহাপুরুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।" ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া এই বুঝিলাম যদিও তিনি বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী তবু ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন। আমি ধর্ম্মবিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি অতি সুন্দর ভাবে তাহার উত্তর দিলেন। তিনি একাহারী, সমস্ত দিনরাতে একবারমাত্র আহার করেন; তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দেহ দেখিয়া আমার তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। অনেকে বলেন তাঁহার বয়স দুইশত বৎসরের উপর, কিন্তু দুইশত না হইলেও শতবর্ষের কম হইবে না। হরিদ্বার হইতে পাতিয়ালা চলিয়া আসি। দেশীয় রাজন্য বর্গের রাজ্যে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ তাই জানিবার জন্য আমার একটা বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। এখানে আসিয়া মিঃ জে, এন, চক্রবর্ত্তীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী ভিন্ন এখানে আর কোন ব্রাহ্ম পরিবার নাই। মিঃ চক্রবর্ত্তীর গৃহে রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনা করি আর প্রতিদিনই নানা প্রসঙ্গ হয়। রাজ্যের নৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয়। পরে লাহোর চলিয়া আসি।

আশ্বিন মাস :—

লাহোর আসিয়া শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্ত সেন মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হই। তড়িৎবাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক; যদিও ইনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহেন তবু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; ইঁহার গৃহে একদিন উপাসনা হইল। রেলের একটী বাবু খুব ভক্তিভরে উপাসনায় যোগ দিলেন, পরে বৈকালে আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন "অদ্য উপাসনার পর ভগবানের বিশেষ করুণা অনুভব করিয়াছিলাম, তারপর আফিস যাইয়া যাহা লাভ করিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।" তিনি রেলের তার-বিভাগে কাজ করেন। বলিলেন "একটা জিনিসের অভাবে আমাদের বড়ই অসুবিধা হইতেছিল, সেটী বিলাত হইতে আসিবার কথা। জিজ্ঞাসা করিলাম সেই জিনিষটী আসিয়াছে কিনা, আফিসের লোকেরা বলিল এখনও আমরা পাই নাই আজ বিলাত হইতে নাকি অনেক জিনিষ আসিয়াছে। যদি সেটীও আসিয়া থাকে তবে অবশ্য পাইবেন, উহা এখনও খোলা হয় নাই। আমি এক প্রকার নিরাশ মনে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল 'বাবু আসুন আসুন আপনার সেই দরকারী জিনিষটী আজ আসিয়াছে লইয়া যান'। একথা শুনিয়া আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হইল, বলিতে পারি না; আমি বিশেষরূপে ভগবৎকৃপা অনুভব করিলাম। লোকেরা ইহাকে একটী আকস্মিক ব্যাপার মনে করিবেন, কিন্তু

আমি এখানে ভগবানের কৃপা অনুভব করিয়াছিলাম। প্রাতে উপাসনার পরই আমার মনে তাঁহার (ভগবানের) করুণার অনুভূতি হইয়াছিল।” লাহোর অবস্থান কালে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা করি, বহু নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা করি। শ্রীকুমুদবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রার্থনা করি। পঞ্জাব বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের গৃহে কয়েকদিন অনেক বিষয়ের প্রসঙ্গ হয়, তিনি অতি সজ্জন ও সর্ব্বজনপ্রিয় লোক। তিন সপ্তাহ তড়িৎ বাবুর গৃহে অবস্থান করিয়া পরে, ব্রাহ্মসাধনাশ্রমে যাই। তথায় অবস্থানকালে প্রতিদিন আশ্রমধারী ভাই রামকিষণজীর সঙ্গে একত্র প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ব্রহ্মোপাসনা করি সমস্ত দিন পাঠ আলোচনা ও কীর্ত্তন করিয়া অতি আনন্দে সময়াতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরভগবানজীর গৃহে উপাসনা ও আহার করি। তাঁহারা পতি-পত্নী আমাকে খুব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাকার স্থানীয় প্রচারক ভাই সীতারাম অতি প্রেমিক লোক। এতদিন তিনি সিমালয়ে কার্য্যিয়াং ছিলেন সেখান হইতে আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে আসিয়া দুদিনের মধ্যেই তিনি আমাকে এমনি করিয়া আপনার করিয়া ফেলিলেন যে, আমি অবাক হইয়া গেলাম, আজকালের দিনে ব্রাহ্মসমাজে এই শ্রেণীর লোক একবারেই দেখিতে পাই না। প্রতিদিনই প্রায় তাঁর সঙ্গে দেখা হইত। দেখা হইলেই প্রার্থনা ও সঙ্গীত করা হইত। তাঁহার প্রেমের তুলনা আমি দিতে পারি না। তারপর কলিকাতা আসিবার সংকল্প করিলাম কিন্তু পাথেয় নাই, কয়েকদিন পরে কতক জুটিল, তারপর তাঁহার দয়া না হইলে আমার কলিকাতা আসা অসম্ভব হইত।

কার্ত্তিক মাস :—

কলিকাতা আসিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম, যেমন বরাবর থাকি। এখানে আসিয়া আমরা একটী মণ্ডলী প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকি, তাহাতে খুবই আনন্দ পাই ও বিশেষ উপকার লাভ করি। মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাইয়া প্রার্থনাদি করিয়া ও আশ্রমবাসীদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে প্রতিদিনই সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে নানা আলাপ করিতেছি। সমাজমন্দিরে অন্যতম উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্ম্মের দিক দিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করার কথা মধ্যে মধ্যে আলাপ হয়। মোটের উপর একটা নব জাগরণ অনুভব করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক ভাবটা যেন আবার সরস হইবে, এরূপ আশা পাইতেছি। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একটা সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। যদিও ধর্ম্মের প্রতি দেশব্যাপী একটা উদাসীনভাব, তথাপি কতকগুলি লোক অগ্রসর হইয়া যাহাতে দেশে নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ রমণীর মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন দেখিয়া আসিয়াছি; সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলাম, তাঁহাদিগের মতে স্ত্রীলোকের কোন্ বয়সে বিবাহ প্রশস্ত অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকাশের সহায়।

এখন আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়া আসিয়াছি, মনু স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এমন কি সামান্য বিদ্যাশিক্ষার সম্বন্ধেও কোনই উল্লেখ করেন নাই, তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী বক্তব্য প্রকাশ করিব এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আলোচনা করিব।

আমাদের অনুমান হয় যে, মনুসংহিতার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন, অথবা কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় নাই, তাই মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া অবধি বৈদিক কালের পরেই মনুসংহিতা রচনার কাল ধরিয়া লইব। এই কালনির্দ্দেশেই আমরা মনুসংহিতার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। যেটা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত তাহার বিষয়ে বিশেষ কারণ বিনা উল্লেখ বা আন্দোলন না হওয়াই স্বাভাবিক। মনুসংহিতায় যে স্ত্রীশিক্ষার (বর্ত্তমানে যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে) কোনই উল্লেখ নাই, এবং অত্রিসংহিতায় একস্থলে ব্যতিরেকীভাবে উক্ত হইয়াছে যে অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পাতিত্যের কারণ, এই দুইটাই কি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে না যে সংহিতারচনাকালের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল—বিশেষ যখন বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষার ভূরি অনুশাসন ও নিদর্শন দেখা যায়? আর

বাস্তবিক, যে ঋষিরা নারীজাতির মাতৃত্ব সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাঁহারা রমণীর কমনীয় মূর্ত্তিতে দেবতা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অধিকার থাকা কর্ত্তব্য এই সামান্য কথাটী বুঝেন নাই? তাহা নহে। তাঁহারা জানিতেন যে এই অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চিত থাকা কর্ত্তব্য নহে; সেই কারণে মহর্ষি মনু এ বিষয়ে কোন নিষেধবিধি প্রচারিত করেন নাই। তাহার পরে যদি কতকগুলি স্ত্রীলোকের বিদ্যাগর্ব্ব দেখিয়া কোন সংহিতাকার স্ত্রীলোকমাত্রেরই বিদ্যাশিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়েন, তবে তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, এমন কি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিও বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের মাতৃত্ববিকাশই যদি মুখ্য লক্ষ্য হওয়া বিবেচিত হয়, তবে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের কুরুচিপূর্ণ বটতলার নাটক নভেল হইতে বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সদ্বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য—বিদ্যাশিক্ষা না করিলে মাতৃত্ববিকাশের পথে অন্তরায় আনয়ন করা হয়, সুতরাং কর্ত্তব্যের হানি হয়। স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরের এই বৈচিত্র্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করিবে অথচ সেই জগতের দিকে অন্ধভাবে তাকাইয়া থাকিবে; ঈশ্বরের বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, অথচ তাহার তৃপ্তিকারণের দিকে মুক্তপ্রাণে চাহিতেও পারিবে না, এরূপ আশা করা কি ভয়ানক বিড়ম্বনা ও কি দারুণ অধঃপতনের কারণ!

স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়নের কথা বলাতে হয়তো অনেক গতানুগতিক ব্যক্তি চমকাইয়া উঠিবেন। এই গতানুগতিক সম্প্রদায় বড়ই শান্তিপ্রয়াসী; ইঁহারা নূতনের নামে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। ইঁহারা কোন বিষয়েই বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এতটুকুও আলোড়িত করিতে চাহেন না—সর্ব্বদাই ভয়, পাছে সমস্ত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সমাজশরীরে যে ক্ষত আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পাছে সেই ক্ষত আরাম করিবার জন্য কোন অজ্ঞাতফল প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই ক্ষত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমাজ-শরীরকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিয়া তুলে। এইরূপ আশঙ্কা কিছু অস্বাভাবিক নহে। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগমূলক এই আশঙ্কার ভাব বিদ্যমান না থাকিলে সমাজের সুদৃঢ় (solid) উন্নতি হইতেই পারিত না। এবং এই প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির রূপান্তর মাত্র। অনার্য্য জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতির মধ্যে এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই আর্য্যজাতির এত উন্নতি হইয়াছিল বোধ হয়। আবার অনার্য্যদিগের মধ্যে চীনজাতির মধ্যে এই ভাব থাকাতে তাহারাও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল দেখা যায়। সামাজিক শান্তিলাভের প্রত্যাশা করিলে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগমূলক এইরূপ আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিবেই এবং এইরূপ আশঙ্কা জাগ্রত থাকিলে শান্তিলাভের চেষ্টাও কিছু বেশীমাত্রায় আসিয়া পড়ে। শান্তির প্রত্যাশা এবং নূতনের প্রতি আশঙ্কা পরস্পরসম্বদ্ধ। ভারতবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে উভয়েরই কার্য্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই ফলে ভারতীয় আর্য্যগণ একদিকে অতিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়, অপরদিকে নূতনের প্রতি অতিরিক্ত আশঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পতনের ইহা অন্যতর প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রাচীনের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাত এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনার ইষ্টানিষ্টবিষয়ে অতিমাত্র আশঙ্কা বশতঃ নূতন নূতন সময়, নূতন নূতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদাসীন থাকিয়া আপনাদের অবনতির পথ আপনারাই প্রস্তুত করিলেন।

এই পক্ষপাত ও আশঙ্কা আর্য্যদের যেমন অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ইহারই ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিবাদকলহজনিত অশান্তিও আসিয়াছিল। সমাজ সংগঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেই প্রধানত দুই শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় দেখা যায়—এক, গতানুগতিক বা রক্ষণশীল এবং দ্বিতীয় উন্নতিশীল। সমাজে স্বভাবতই রক্ষণশীল লোকেরই সংখ্যা অধিক হয়। অধিকাংশ লোকেরই প্রাচীনের উপর কেমন একপ্রকার মমতা পড়িয়া যায়, সহজে নূতন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে না। সমাজগঠনের প্রারম্ভে এই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য অনেকটা স্বভাবতই রক্ষিত হয় বলিয়া শিশু সমাজগুলি শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির পথে ধাবমান হইতে সক্ষম হয়। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার গতি বিভিন্ন মুখে। রক্ষণশীলতা আপ্তবাক্যের দিকে অসহায় ভাবে বড়ই বেশী চাহিতে থাকে; উন্নতিশীলতা গর্ব্বিতভাবে আপনার বুদ্ধির উপর, যুক্তিতর্কের উপর বড়ই বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। রক্ষণশীলতার মস্তক অতিরিক্ত দুর্ব্বল; উন্নতিশীলতার নির্ভরপদ বড়ই দুর্ব্বল। রক্ষণশীলতার জীবন সামাজিক পরাধীনতা; উন্নতিশীলতার জীবন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সচরাচর দেখা যায় যে উন্নতিশীল ব্যক্তির হৃদয়ে রক্ষণশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রাচীন প্রথার ভাল অংশটুকুরও প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি নাই; আবার রক্ষণশীল ব্যক্তির হৃদয়ে উন্নতিশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ

তাঁহার মৃতপ্রায় হৃদয়ে উৎসাহের মৃতসঞ্জীবনী শক্তির বড়ই অভাব, তিনি নূতনের ভাল অংশ, সময় ও অবস্থার উপযোগী অংশটুকুও গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা সমান আসন লাভ করিয়াছে; সামাজিক পরাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছে; যাঁহারা আপ্তবাক্যকে যুক্তির সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই সমাজের রক্ষক এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক। সমাজে রক্ষণশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া উঠে; সমাজে উন্নতিশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার ফল সমাজের জড়তা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে উত্তম উপলব্ধ হয়; অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফল বৈপ্লবিক অশান্তি ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সমাজেই অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহুপূর্ব্বে ভারতের এরূপ দুর্ভাগ্য ছিল না। যখন এখানে ঋষিমুনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহারা রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে কেমন এক সামঞ্জস্যধারা স্থাপন করিতেন। তখন যথাকালে ইন্দ্রদেব বারিধারা বর্ষণ করিতেন, বনদেবতারা ফুল ফুটাইয়া চারিদিক হাস্যময় করিয়া তুলিতেন; তাহার সৌগন্ধে দিগঙ্গনা প্রসন্নতা লাভ করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই। আর্য্যেরা যখন রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন অনেক আর্য্যই কতকগুলি নেতার অধীনে থাকিয়া রাজ্য রক্ষা ও বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কতকগুলি আর্য্য ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিরসপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে কর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল। শান্তিরসাবলম্বী বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধিবলে প্রাধান্য লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা অতিমাত্র রক্ষণশীলতা বশতঃ তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে গুণজন্য ব্রাহ্মণ্যের উপযুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ইহারই প্রতিযোগিতায় বিশ্বামিত্রপ্রমুখ উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল। বিশ্বামিত্র তাঁহার বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যগ্রহণের প্রথম উদ্যমে পুরাতনের সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ বিবাদকলহ চলিয়াছিল। অবশেষে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রাচীনের সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে স্বীকৃত হইলেন এবং শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ্যতেজঃপূর্ণ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যের গুণজন্যতা স্বীকারপূর্ব্বক মানবহৃদয়ের স্বাধীনতার এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন; তখনই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার এক নূতনতর সামঞ্জস্যধারা সংগঠিত হইল এবং তখন হইতেই তাঁহারা ভারতের প্রকৃত নেতা হইলেন। এই কারণে তাঁহাদেরই নাম সমগ্র ভারতে অধিকতর প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ ও তজ্জন্য অশান্তির আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগ বিরোধ ও অশান্তির আধার হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি নানাপ্রকার আন্দোলন ভারতকে, কেবল ভারত নহে সমগ্র ভূমণ্ডলকে, আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে—এখন আন্দোলনের কাল পড়িয়াছে। এই আন্দোলনসূত্রে শান্তিরসাস্পদ এই ভারতভূমিতে কেমন এক ঘোরতর মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিলেন তখন হইতেই এই বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সামাজিক বিষয়ে নিতান্তই নীরব হইয়া দর্শকমাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; অপরদিকে উন্নতিশীল খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উন্নত ভাবসকল আমাদের নির্জীব সমাজদেহে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতে সহসা অত্যুন্নতি আনয়ন করিতে গিয়া সমাজবিপ্লব যে কতক পরিমাণে আনয়ন করেন নাই, তাহা নহে। এইরূপে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু মহাত্মাগণ শান্তিপতাকা হস্তে লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ নেতা হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য বিবাদকলহ নির্ব্বাপিত করিয়া সমগ্র ভারতের হৃদয়ে শান্তিজল প্রদান করিল। কিন্তু কিছুকাল পরে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সেই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহার এক প্রধান ভিত্তি মৈত্রীকে শিথিলমূল করিয়া দিল এবং এখনও দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যে মহান্ আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। আশ্চর্য্য এই যে আজও কেহ এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে উত্থিত হইলেন না। ইহাতেই বোধ হয় যে বিরোধ মীমাংসার জন্য বাহ্যিক শতসহস্র চেষ্টা হইলেও প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে এই বিরোধমীমাংসার ইচ্ছা জাগ্রত নাই; সকলের মনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে তাহা

প্রকাশ করিবার জন্য কোন না কোন মহাপ্রাণ উত্থিত হইবেনই। এ বিষয়ে কাহারই নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে; সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী, বিশেষত ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই সচেষ্ট হইতে হইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে উন্নতির পথপ্রদর্শন করিয়া জাগ্রত করিতে পারিয়াছিল, এবং যে ব্রাহ্মসমাজে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অন্যতম অগ্রণীগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্ত নেতা পাইলে এবং সামঞ্জস্যের পথে চলিলে তাহা যে ভারতের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে কাহারই সংশয় হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমি কাহাকেও বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়া সামঞ্জস্যের পথে চলিতে অনুরোধ করিতেছি না। আমি বলি পক্ষপাতশূন্য হইয়া কোন বিষয় বিচার করিলে সম্মুখে যে সামঞ্জস্যের পথ দৃষ্ট হইবে, তাহাই সকলের অবলম্বন করা উচিত এবং তাহাতে ধর্ম্মহানি হইতেই পারেনা।

ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাহাদিগের অন্যতম। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন, সমস্ত বঙ্গদেশেও বিবাদকলহের এবং সুতরাং ঘোরতর অশান্তির বীজ বপন করিয়াছে। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যবহার করেন আমিও সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই বিষয়ে সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে অপক্ষপাতে উভয় পক্ষেরই বক্তব্য বিচার করিতে হইবে। উন্নতিশীল ব্যক্তিরা প্রায়ই দেখা যায় যে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া কিছু বেশীদূরে অগ্রসর হইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল সম্প্রদায় বহু পুরাকালের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া একপদও অগ্রসর হইতে চাহেন না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি; এখন দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি। আমাদিগের দেখিতে হইবে সত্যসত্যই শাস্ত্রসকল স্ত্রীশিক্ষা, রমণীর উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নিষেধবিধি দিয়াছেন কি না। আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য অপক্ষপাতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে উভয়পক্ষই ভ্রমবশতঃ এরূপ বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শোক-সংবাদ।

৺ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গত ১১ই কার্ত্তিক শনিবার রাত্রি ২টা ২০ মিনিটের সময় ৮৩ বৎসর বয়সে ভূতপূর্ব্ব ক্যানিং লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র ও চারি কন্যা এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক। ৺ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষিদেবের একজন ভক্ত ও আদি ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য ৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। বঙ্গদেশে পুস্তকের দোকান করিয়া লেখক ও পাঠকদিগের সুবিধা করিয়া দিবার তিনি অন্যতর পথপ্রদর্শক ছিলেন। ৺ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থী ক্রিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীসুরমা দেবী (আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু চট্টগ্রামপ্রবাসী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী) আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিধাতা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রাণে শান্তিবিধান করুন।
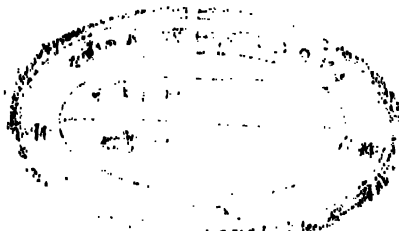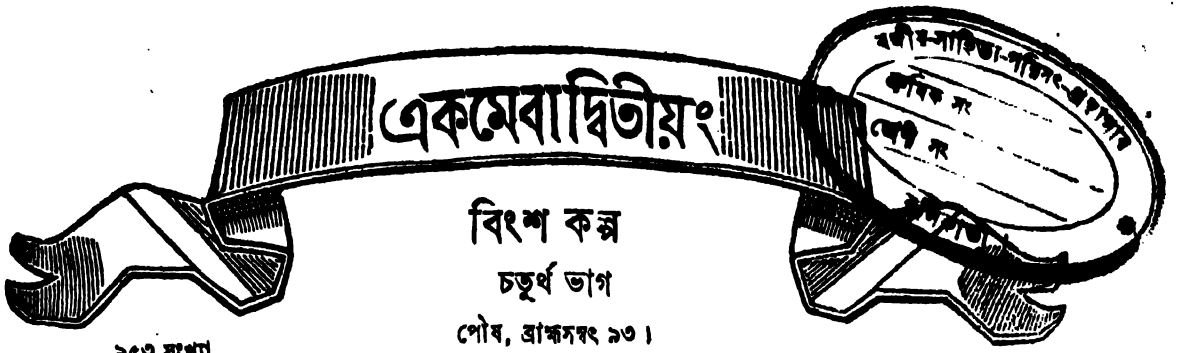
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যধর্ম্ম ও তাহার প্রসার।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

আমাদের দেশে এই প্রসঙ্গটি এক্ষণে অতীব সময়োপযোগী। ধর্ম্মবিচারের প্রবাহ এখানে সততই বহমান রহিয়াছে। তথাপি পূর্ব্বকাল হইতে ঐক্যের অভাবে, ভিন্ন ভিন্ন পন্থা বাহির হইবার দিক একটা প্রবণতা লক্ষিত হয়; এবং এই ভিন্ন পন্থায় মুখ্য বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও, লক্ষ্য ভেদের দিকে থাকায়, ঐ ঐক্যের পরিণাম বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্য লোকের সমাগমযোগে ধর্ম্মসম্বন্ধে এই অদ্ভুত অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে। কাহারও-কাহারও ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করে না। আমাদের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ আছে—এরূপ তারা মনে করে না বলিয়া, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের উপর কোনপ্রকার দায়িত্ব আছে, ইহাও তাহারা মনে করিতে পারে না। কাহারও-কাহারও মাথায় যোগের পাগলামি কল্পনা প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ স্থূলকোষ, দিব্যশরীর, তারাদিগের স্বরূপদর্শন প্রভৃতির সম্বন্ধে বাতুলবৎ বিচার চালাইয়া আপন শরীরকে বিজন-প্রদেশে স্থাপন করাতেই আপনাকে ধন্য মনে করে! কেহবা, পাশ্চাত্যেরা যাহা বলে তাহাই সর্ব্বাংশে সত্য মনে করে; আবার কেহ কেহ আর-এক প্রান্তে আসিয়াছে; তাহারা আগ্রহের সহিত বলিয়া থাকে যে, আমাদের যাহা কিছু—তাহাই সত্য। পূর্ব্বকালে যাহা কিছু আমাদের ছিল, সমস্তই পুনরুজ্জীবিত করিলে তবেই আমাদের উদ্ধারের উপায় হইবে। কেহ-কেহ সমস্ত পুনরুজ্জীবিত করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করে না; সারাসার বিচার করিয়া, বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং পাশ্চাত্যদিগের সহবাস হইতে যতটা সম্ভব লাভ উদ্ধার করা আবশ্যক বলিয়া মনে করে। মোট কথা, আজকাল চারিদিকে খুবই গোলমাল ও গণ্ডগোল থাকায়, লোকেরা কোন প্রকার ধর্ম্মেরই আশ্রয় না করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং কতকগুলা অসার বিচার-আচার লইয়াই জীবনযাপন করিতেছে। এই গোলমালের দিনে লোকের দৃষ্টিকে আঁকা-বাঁকা দিকে লইয়া না গিয়া, একেবারে সরল পথে আনা আবশ্যক, হিমালয়ের গুহায় গিয়া কোন যোগী তপস্বীর সন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। বিজন প্রদেশে থাকিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। আজকালের এই গণ্ডগোলের অবস্থায় আমাদের বাস্তবিক কি দরকার, তাহা কেহ বিচার করিয়া দেখেন নাই। বিজনে থাকিয়া যাদুগিরি করিবার কি আবশ্যকতা আছে? এইরূপে মনের শান্তি ও সন্তোষ পাওয়া যাইবে কি? শরীরকে ক্লেশ দিলে

এবং অন্তরালে ভূমি হইতে এত ফুট উপরে থাকিলেই কি আত্মার উন্নতি হয় ?

কিন্তু এই প্রকার বৃথা কল্পনার আশ্রয় না লইয়া প্রার্থনাসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ সাধুসন্তদিগের উপদিষ্ট এই সত্যমার্গকে ধরিয়াছেন। তুকারাম-বাবা এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—

"কৃপাবন্ত ঐশা সোড়ুনী নিদানা।
কাণী আডবানা কায় করূঁ" ॥

সেই পরমেশ্বরই মূল কারণ। সংসারে শান্তি-সন্তোষদাতা একমাত্র সেই পরমদেব পরমেশ্বরই। তাই এইরূপ লোকদিগকে তুকারাম—

"আঠবন দেতাঁ ঐকে জরী কোণী।
স্বরা কৃপাদানী মায়বাপ ॥ ১ ॥
আবডীনেঁ গাতাঁ নাম জ্যাচে এক।
জন্মাচে সার্থক হোয় তেণেঁ" ॥ ২ ॥

এইরূপ খুব আস্থার সহিত উপদেশ করিতে-ছেন। তিনিই মা-বাপ। তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে নিয়ত নিমগ্ন থাকিতে হইবে। ইহাই সরল পথ। বাকী আর সব বক্র পথ। তুকারাম ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করায় তিনি—

"তুকা হ্মণে আলেঁ প্রচীতত্বে দেখা।
তৈঁচি পুটেঁ লোকাঁ সাংগতসে" ॥ ২ ॥

এই চরণে বলিয়াছেন। তাঁহাকেই প্রমাণ মানিয়া আমরাও লোকদিগকে পুনঃপুনঃ বলিতেছি যে,—শুদ্ধ ভাব, শুদ্ধ চিত্ত ও বিবেক—ইহাই অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। ভিন্ন সাধনার অনুসরণ করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না। ইহা বক্র পথ। ভিন্ন ভিন্ন সাধনা যাদুকর্ম্মের সদৃশ। তাহা আশ্রয় করিলে অন্তঃকরণে কোনও শান্তি ও সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষতা তাহা উপরোক্ত সাধনার দ্বারাই সাধিত হইবে। ঈশ্বরের ভজনপূজনে যাহারা সর্ব্বদা নিমগ্ন তাহারাই অপূর্ব্ব গভীর শান্তি প্রাপ্ত হয়। বিজনপ্রদেশে যাহারা অবস্থিতি করে, অথবা যোগাভ্যাসে ব্যাপৃত থাকে তাহারা ইহা প্রাপ্ত হয় না। উল্টা, যোগী-বৈরাগীরা অধিক ক্রোধী, অধিক তামসিক হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। এবং এইজন্য তুকারামের ন্যায় সাধুরা

তীর্থ আলিলে তাণ্ডুল।
কামক্রোধ তৈ-সেচি খল ॥ ১ ॥
তপ করুনি তীর্থাটন।
বাঢ়বিলা অভিমান ॥ ২ ॥

এইরূপ উচ্ছ্বাস-বাক্য বলিয়া,—তপ, তীর্থভ্রমণ—ইহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না, দেখাইয়াছেন। গ্রন্থপঠন, পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন, বাদবিবাদপ্রাচুর্য্য—এই সকলের দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

এ সমস্ত আড়-পথ। এই সমস্ত মার্গ অনুসরণে জন্মের সার্থকতা সম্পাদনের আশা নাই। অস্মদ্দেশীয় ও পরদেশীয় সাধুসন্তদিগের যে উপদিষ্ট মার্গ—অর্থাৎ শুদ্ধভাবে, শুদ্ধচিত্তে, বিবেকযোগে পরমেশ্বরের ভজনপূজন করিতে হইবে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার ইচ্ছা,—শুধু তাহা নহে, তাঁহার ইচ্ছার বাহিরে আমার ইচ্ছা নাই, এইরূপ মনে করিয়া চলা—ইহাই রাজমার্গ। এই মার্গই সকল স্থানের সাধুসন্তদিগের ভক্তদিগের মান্য। এবং আমাদের প্রার্থনাসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ এই মার্গই অবলম্বন করিয়াছেন, অন্য মার্গ অবলম্বন করিবার তাঁহাদের আগ্রহ নাই।

এবং আমাদের স্বীকৃত এই ভক্তিমার্গ [illegible] সাধুজনেরই মান্য, তাই ইহা রাজমার্গ। বা[illegible] দেখিতে গেলে এই প্রকারে পরমেশ্বরের [illegible] ও তাঁহার সত্তা স্বীকার করিবার দিকে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই জগতে যে সমস্ত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমার নহে। ঐ সমস্ত শক্তি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরেরই। সর্ব্বাংশেই আমি তাঁহার অধীন; তিনি সকল হইতে উচ্চ, সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে অনুসরণ করা—এই বিশ্বাসই সত্য। সমস্ত ভগবদ্ভক্তেরই এই বিশ্বাস। এই প্রকার দিব্য বিশ্বাস তুকারামের ছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে—

হরীচি যা ভক্তাঁ নাহীঁ ভয় চিন্তা।
দুঃখ নিবারিতা নারায়ণ ॥ ১ ॥
নলগে বাহঁনে সংসার উদ্বেগ।
জড়ো নেদী পাঙ দেবরায ॥ ২ ॥

অসো ত্যাবা ধীর সদা সমাধান।
আহে নারায়ণ জবলী চ ॥ ৩ ॥
তুকা ম্হণে আম্ঝা সখা দেবরাজ।
ব্যাপিয়েলে বিসব তেণে এক ॥ ৪ ॥

ইহার অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যে হরির ভক্ত তাহার কোন উপাধি নাই, তাহার উপর কোন বিপদই আসিতে পারে না। তবে, তাহার পরমেশ্বরের উপর এইরূপ বিশ্বাস যে, যে কোন প্রকার বিপদই আসুক না, তাহা নিবারণের জন্য যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়াও, যদি তাহার কোন কিনারা না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর আমার সহায় ও রক্ষক এইরূপ চিন্তা করে, এবং এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তদিগের সমাধান হইয়া থাকে এবং তাহারা এই সময় সমস্ত ভার তাঁহার উপর স্থাপন করিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তিতে থাকে। তখন পরমেশ্বরের উপর যাহার একান্ত বিশ্বাস আছে, তাহার ভবব্যথা চলিয়া যায় এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাহার নিকট তাঁহার ইচ্ছা ও যোজনা সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। তিনি যেমন অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন;—ইহা ভক্ত স্বানুভূতির দ্বারা জানিতে পারেন। খুব ঝড় উঠিলেও, আমাদের গৃহের সমস্তই বিনষ্ট হইলেও তাঁহার মনের শান্তি টলে না এবং পরমেশ্বরের উপর তাঁহার অনুপমের বিশ্বাস তিলমাত্র হ্রাস হয় না। অতএব, যদি অন্তরে এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভব হয়, এবং এই মার্গ অবলম্বনে, অর্থাৎ উপরি-উক্ত প্রকার ভজনপূজনের মার্গের অনুসরণে যদি অন্তঃকরণে গভীর শান্তি পাওয়া যায়, সমাধান পাওয়া যায়, সঙ্কট উপস্থিত হইলেও সঙ্কট বলিয়া মনে না হয় তাহা হইলে এই রাজমার্গ ছাড়িয়া আড়পথে আমাদের ইচ্ছাকে কেন ধাবিত করিব? আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্য-দেশের যে সকল সাধু এইরূপ প্রকারে ভক্তিমার্গে চলিয়াছেন তাহাদের সকলেরই এই অনুভব হয়—

হরীচিয়া ভক্তাঁ নাহীঁ ভয় চিন্তা।
দুঃখনিবারিতা নারায়ণ ॥ ১ ॥

ইহা হইতে এইরূপ দেখা যায় যে, এই ধর্ম্ম প্রত্যেকের সাক্ষাৎ অনুভবের ধর্ম্ম, প্রথা-প্রচলিত ধর্ম্ম নয়। এই মার্গ সম্বন্ধে তুকারাম এক জায়গায় বলিয়াছেন "ফোডিলে হেঁ ভাণ্ডার ধনাচা হা মাল"। তিনি এই মার্গ অবলম্বন করায়, তাঁহার অনেক প্রকার কষ্ট সহিবার সামর্থ্য হইয়াছে।

অতএব, এই প্রকারের এই যে সত্যধর্ম্ম এবং আমাদের স্বীকৃত সত্যমার্গ—এই সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, আমরা প্রথমে অন্তরে ইহার সাক্ষাৎ অনুভব করিব। "অন্নাচা পরিমলে জরী জায় ভূক। তরী কাঁ হে পাক ধবোধরী ॥" শাকসব্জি ব্যঞ্জনের সুগন্ধ বাহির হইয়াছে, পৃথক্‌ভাবে পক্বান্ন প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিতেছি; কিন্তু তাহার সেই রুচিকর সুগন্ধে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় কি? তাহা যদি হইত তবে এই রন্ধনের কষ্ট স্বীকার কে করিত? অতএব, যেমন অন্ন সেবন ব্যতীত ক্ষুধা শান্ত হয় না মনের সন্তোষ হয় না, এবং ঐ অন্নের গুণ জানা যায় না, সেইরূপ এই ধর্ম্মসম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। নচেৎ, এই ধর্ম্ম উত্তম, এইরূপ বলার কোন অর্থ নাই। অতএব প্রথমে "সেবিতোঁ হা রস"—এই রস নিজে সেবন করা চাই, তাহার পর "বাটি তোঁ আণিকাঁ"—অন্যকে ইহা বণ্টন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আমরা নিজে পক্বান্নের মধুর আস্বাদ জানিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত অন্যকে ইহা পরিবেশন করিবার আবশ্যকতা আমাদের মনে আসিতেই পারে না। কিন্তু তুকারাম-বাবার এই অনুভব হইয়াছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে—

তুকা ম্হণে মজ ঘাডিলে নিরোপা।
মারগ হা সোপা সুখরূপ ॥

এই মার্গ সহজ মার্গ; এই মার্গ ধরিয়া সুখে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—ইহাই তুকারামের প্রত্যক্ষ অনুভব, এবং এইরূপ আমাদের প্রত্যেকেরই এই অনুভব হওয়া চাই। অতএব আজ এই ধর্ম্ম সর্ব্বসমাজে প্রচার করিবার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, এই বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই। এইরূপ যদি হয় তবে "সেবিতো হা রস" এইরূপ বলিবার যে অধিকার আছে, প্রথমে তাহা আমাদের মধ্যে আনা চাই। এই রস আস্বাদনের জন্য, পূর্ণমাত্রায় পান করিবার জন্য, আমাদের নিজের যে চেষ্টা আবশ্যক তাহা হয় না। এই রস কত মধুর, অমৃততুল্য, এই অন্ন কত রুচিকর, ইহার অনুভব আমরা সতত

করি নাই। ঐ অনুভূতি ব্যতীত, লোকদিগকে উহা পরিবেশনে আমাদের অধিকার হয় না। তাই, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই রসপান নিজে করা, তাহার পর অন্যকে উহা বণ্টন করা। এই কথা দিবারাত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকা চাই। এইরূপভাবে যখন আমরা আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তখনি অন্যকে উহা বণ্টন করিবার যোগ্যতা আমাদের হইবে।

আরও এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন ধর্ম্মের প্রচার, শুধু ধর্ম্ম উত্তম হইলেই হয় না। তাহা প্রচার করিবার জন্য যোগ্য লোক চাই। বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা ইহাই দেখিতে পাই। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আত্মত্যাগশীল ভিক্ষুরা যখন বাহির হইল তখনই ঐ ধর্ম্মের প্রসার হইল। সেণ্ট্‌-পাউল যদি না থাকিতেন তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার হইত না। পরে, খৃষ্টানেরা আপন বিশ্বাস-অনুসারে সত্যধর্ম্মের জন্য সিংহের সম্মুখে যাইতে ভয় পাইত না, সমরভূমিতে আপন প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। বৌদ্ধেরা বিরোধ করিত না, পরন্তু বিনম্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল। কিন্তু আপন প্রাণের পরোয়া করে নাই। এবং মহম্মদী ধর্ম্মের ইতিহাস ত জগদ্বিখ্যাত। অতএব, এই ব্রাহ্ম ও প্রার্থনাসমাজের দ্বারা সমস্ত ভরতখণ্ডের উন্নতিসাধন করিতে হইবে; সমস্ত ভরতখণ্ডকে এই পরম রসের আস্বাদনে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। কিন্তু ঐ উদ্দেশে সেইরূপ প্রযত্নও করা কি উচিত নহে? আজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের দুই প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে; এই দুই প্রবাহেরই আমাদের আবশ্যকতা আছে—এই দুই প্রবাহকে সম্মিলিত করিবার ভার উক্ত সমাজদ্বয় আপন স্কন্ধে লইয়াছেন। যদি শুধু ধর্ম্মের কথা ধরা যায়—জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না। অস্মদ্দেশীয় ও পরদেশীয় জ্ঞানের প্রবাহ সমান প্রবাহিত হইতেছে। উহা হইতে যথাযোগ্য উপকার আমাদের লাভ করা উচিত। কিন্তু ইহা শুধু জ্ঞানের দ্বারা হইবার নহে—বর্ত্তমান কাল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। জ্ঞানের যতই বিকাশ হউক না কেন, তাহাতে সত্যধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না; বরং সাহায্যই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহাই হইতেছে। বিজ্ঞানের যতই নব নব আবিষ্কার হোক না কেহ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পিছনে তাকাইতে হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃষ্টি সম্মুখ দিকেই থাকিবে। সত্যজ্ঞানের দ্বারা, পূর্ব্বোক্তঅনুসারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যই হইয়া থাকে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই সত্যধর্ম্ম এইপ্রকারের এবং সর্ব্বত্র ইহার প্রচার করা আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রচার করিবার যোগ্যতা আমাদের হইয়াছে বলিয়া যদি আমাদের মনে হয়; এই ধর্ম্মের কাজে আমাদের কোন সাংসারিক হানি হইলেও ক্ষতি নাই, যদি আমাদের এইরূপ ধারণা হয়, তাহা হইলে প্রথমত আমাদের নিজের এই সুরস পক্কান্নের আস্বাদন করিতে হইবে। এই আস্বাদের সুখ প্রথমত আমাদের নিজের অনুভবে আনিতে হইবে। সেইরূপ অনুভব হইলে তাহার পর, আমরা অনেক বাধা, অনেক পীড়ন, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, উহা প্রচার না করিয়া, অথবা উহা প্রচারের জন্য প্রযত্ন না করিয়া থাকিতে পারিব না।

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, দেশাচার বশতঃ যাঁহাদের ধারণা হইয়া আছে যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষত বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে অনেকেই স্ত্রীকন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ীতে পত্রলেখা প্রভৃতি নিতান্ত অপরিহার্য্য কার্য্যে যতটুকু, আবশ্যক ততটুকুই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় বন্ধুবর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সামান্য সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যাপন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভ-

য়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর আমার সহিত আলোচনায় যখন বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, বরঞ্চ শাস্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহস্র লোকাপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের বংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশ; সেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেষ্ট আছে, তাই তাঁহাকে জ্ঞাতি-বিরোধ এবং তদানুষঙ্গিক লোকাপবাদও সহ্য করিতে হয় নাই।

শাস্ত্রাদি আলোচনা যতদূর করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, সুতরাং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদি শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্যা যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রযত্ন করেন, তবে তিনি যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পতি লাভ করিবেন; তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষত বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতিস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুত পৃথক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদিগের যখন ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা ছিল না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের কোনও বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাই গোভিলগৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিতেছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।" ১ গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোভিল দর্শ-পৌর্ণমাস যজ্ঞবিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে, গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই যজ্ঞের পূর্ব্বদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্জ্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস-দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্ম হ বা ইদমেকমগ্রআসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে; গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে তৎসমুদায়, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" ২ ইহার উপর অন্য স্পষ্টতর কোন প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহকালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যখন দেখি যে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কোন কোন নবীন আচার্য্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "বেদ" শব্দের অর্থে "কুশ" অর্থ করিয়া বলিয়াছেন যে কন্যার হস্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু অসঙ্গত বলিয়া কি বোধ হয় না?

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার

১ পুরুষার্থপ্রকাশ গ্রন্থে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—"পত্নীমধ্যাপয়েৎ কস্মাৎ পত্নী জুহুয়াদিতি বচনাৎ নহি খল্বনধীতা শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।" পৃঃ ৬৭

২ বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ।

উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (ভাবীপতি) নিজাভিমুখ করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।"৩ ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা অসামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরণী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পরাশর স্মৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে-সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য।৪ ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে-সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ভাষ্যকারদিগের মতামতের জ্বালায় এত সম্প্রদায়ের এবং এত বিবাদকলহের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটী নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সম্বাদ। এই দুইটি সম্বাদ এত প্রচলিত যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করি না। যাই হোক্, আমরা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের যেরূপ শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই হউক, বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখশান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

এইবারে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি যে মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিনিষেধ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মনুসংহিতা যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পারে সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যে গৃহের সুখশান্তির অধিকতর অনুকূল, মহর্ষি মনু তাহা বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া। ২ অ, ৬৭

স্ত্রীলোকদিগের বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা গুরুকুলে বাস, এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্মৃত হয়। এই শ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের উপনয়ন নিষেধ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন।৫ এই শ্লোকটী আমাদের যেন কতকটা অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের বোধ হয়, মনুর মতে গুরুকুলে বাস করিয়া একটা লোকদেখান ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তির সমূহ চর্চ্চা এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা হয়—পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হয়। মনু স্ত্রীজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।" অন্যান্য সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিককালে যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা প্রথা ছিল, তাহাও যে মনুর সময়ে অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহা নহে; মনুর সময়েও এই প্রথা সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকে জাতকর্ম্ম

---

৩ প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ *** বাচয়েৎ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি।

৪ "দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

৫ মনুসংহিতার ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[৬] আমরা যখন দেখিতেছি যে গৃহ্যসূত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই[৭] এবং বিষ্ণুসংহিতার ন্যায় প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়া উক্ত হইয়াছে,[৮] তখন মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত orthodox লোকদিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটী শ্লোককে[৯] অমানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকেও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাই হোক, যদি বা উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলেও আমরা সেই শ্লোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতার সময়েও সমন্ত্রকই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, স্ত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও অবলম্বনীয় ছিল। কেবল একমাত্র অত্রিসংহিতায় দেখি যে, স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন প্রভৃতি পাতিত্যজনক। হইতে পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল; হয়তো তিনি কোন বিশেষ কারণে ঐরূপ মত স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে ঐ মতকে সর্ব্বগ্রাহ্য বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

সংহিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি পুরাণের মধ্যে অবগাহন করি, সেখানেও দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধারণের সহজবোধগম্য নহে বলিয়া ব্যাসদেব অতি বিদ্বান্ হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্রসমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয়সকল এই মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গল্পচ্ছলে শিক্ষার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই; কিন্তু ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিকস্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র মহাভারতের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্মজনক, তাহা ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া অনেকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মনিপুণা হইতে হইবে। মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকেরা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার দিকেই সর্ব্বসাধারণের স্বভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল দৃষ্ট হয়।

আমরা বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং দু'একটি স্মৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরঞ্চ সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও সেই অধিকার সুব্যক্ত হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন, কন্যাকে তদপেক্ষা এতটুকু ন্যূন করিয়া শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে "পিতা চারি বৎসর

---

৬ অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ২অ, ৬৬

৭ গোভিলগৃহ্যসূত্রে কন্যার চূড়াকার্য্য অমন্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। ২প্র, ১অ, ২২-২৩

৮ এইখানে বিষ্ণুসংহিতায় একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুঋষি চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন "এতাএব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্য্যগুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে; এতাএব অর্থাৎ এইগুলিই) অমন্ত্রক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরেই তিনিই স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে বলিলেন "তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ সমন্ত্রক। ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারণভাবে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৯ ৯অ, ৯৩

পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিখাইবে। বিংশতি বৎসরাদিক বয়স্ক পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।" * ইহার পরেই সেই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের কিছু পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাই তন্ত্রকারগণ তাহার সপক্ষে এই অনুশাসন করিয়া দিলেন। তন্ত্রের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা কারণে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্ত্রীশিক্ষার যে অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। পাণিনি কৃত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আছে "কাশকৃৎস্নি কর্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশকৃৎস্নী বলা যায় এবং যে ব্রাহ্মণী তাহা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী বলা যায়।" আরও "যে স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া লোকে অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া বলা যায়"। হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে আছে "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবেক না।"

* ৮ উ, ৪৫—৪৬

বঙ্গীয় পল্লীসমাজের জীবন-মরণ সমস্যা।

(শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস)

[বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস্, মহাশয় বঙ্গীয় সমবায়-মণ্ডলী-গঠন-সমিতি কর্ত্তৃক আহূত সভায় গত ৩রা শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা ওভারটুন হলে "বঙ্গীয় পল্লীসমাজের জীবন-মরণ সমস্যা" বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে সুন্দর বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুবাদ একখণ্ড উপহার পাইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বঙ্গ পল্লীসমূহের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার চিত্র অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিকারেরও উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। মিঃ দত্তের বক্তৃতা শুধু ফাঁকা কথার আওয়াজ নয়—তিনি নিজে একজন প্রকৃষ্ট কর্ম্মী এবং স্বহস্তে কর্ম্ম করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাই তিনি বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন। সেই বঙ্গানুবাদ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুমতি পাইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য আমরা তাহা সানন্দে পত্রস্থ করিলাম। তং সং]

বাংলাদেশের একটী বিশেষ জেলার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিয়া, বর্ত্তমানে দেশের পল্লীজীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির মীমাংসার উপায় নির্দ্দেশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী জাতিকে "মরণোন্মুখ জাতি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, যে, কি প্রকারে আমরা মরণোন্মুখ? এখন, এই সকল বাদানুবাদের মধ্যে সত্য মিথ্যা যাহাই থাকুক, বাঙ্গালীজাতির অধিকাংশ লোকের আবাসস্থান পল্লীসমূহের অবস্থা যে আদৌ সন্তোষজনক নহে, ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করেন। পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ও সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেশব্যাপী দারিদ্র্য, জড়তা ও ধ্বংসের ভীষণ মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

আদমসুমারীতে দেখা যায়, যে সমগ্র বাংলাদেশের জন্মের হার অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের যে মন্তব্য কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশ ছারখার না হইলে, বাংলার জনসংখ্যা বর্ত্তমান অপেক্ষা এককোটী বিশ লক্ষ বেশী হইত। অবিশ্বাস্য হইলেও, ইহা সত্য যে, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের স্থানে স্থানে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার শতকরা ২০০ করিয়া বেশী, অর্থাৎ যত লোক জন্মিয়াছে তাহার তিনগুণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; ইহার ফলে, এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বর্দ্ধমান জেলায় শতকরা ৬ হইতে বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ১০॥০ পর্য্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। তবেই দেখা যায়, যে গত দশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা বড়ই ভীতিপ্রদ। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা স্বতন্ত্র বলিয়া, সেখানে এখনও এরূপ অবস্থা ঘটে নাই বটে; কিন্তু যে সকল আর্থিক ও নৈতিক কারণে পশ্চিম বঙ্গে পল্লীজীবনের অধোগতি হইতেছে, তাহার শক্তি পূর্ব্ববঙ্গে কতদিন প্রতিহত থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে?

আজ আমি বাংলার বিশেষ একটী জেলার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত অবনতির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। তিনটী কারণে আমি বাঁকুড়া জেলাকেই এই আলোচনার জন্য নির্ব্বাচন করিতেছি। প্রথমতঃ, সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে গত ৯ মাস যাবৎ তথাকার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান আলোচনার জন্য এই জেলাই বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়, কারণ এখানে পল্লীর অবনতি ও ধ্বংসের কারণগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা মতভেদ থাকিতে পারে না। অন্য জেলায় অনেক সময় আকস্মিক ও আনুষঙ্গিক কারণে ধ্বংস ও মৃত্যুর হার বাড়িতে পারে; এবং সেই সকল আনুষঙ্গিক কারণগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকৃত ও প্রধান কারণ নির্ণয় করা কঠিন হইতে পারে। বাঁকুড়ার পল্লীগ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়, কিন্তু এখানে কোনও আনুষঙ্গিক কারণ সমস্যাটিকে জটিল করিয়া ফেলে নাই, সুতরাং কারণ নির্ণয় করা সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ সন্ধান করিতে গিয়া যে সকল শিক্ষা লাভ হয়, তাহা বাঁকুড়াবাসী উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কাজ করিতেছে; সুতরাং দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদিগকেও নিঃসঙ্কোচে তদনুসারে কাজ করিতে বলা যাইতে পারে।

আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বাঁকুড়া বলিতে বুঝায়, মজ্জাগত ব্যাধি, মজ্জাগত দারিদ্র্য ও বারংবার দুর্ভিক্ষের আক্রমণ।

বাঁকুড়ার ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষের অধ্যায়টী ঠিক কোন্ সময় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ বিধ্বস্ত হইবার পর, ১৭৭০ সালে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন বোধ হয় ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯১৫-১৬ ও ১৯১৯ সালে, এই হতভাগ্য জেলা দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়াছে। বারংবার দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্বেও, আদমসুমারীতে দেখা যায় ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত জেলার জনসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে লোকের জীবনীশক্তি ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের নিকট অভিভূত হইল, এবং গত দশ বৎসরের মধ্যে দুইবার ভীষণ দুর্ভিক্ষের পীড়নে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ বৎসরে জেলার জনসংখ্যা যাহা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা সমস্তই লোপ পাইয়াছে এবং এই হিসাবে জেলাকে ১৮৮১ সালের পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছে। বিগত আদমসুমারীতে জানা গিয়াছে যে, দশ বৎসরে বাঁকুড়া জেলার জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ উনিশ হাজার কমিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও দারিদ্র্য ও ব্যাধির কঠোর পীড়নে নিষ্পেষিত হইতেছে।

কি কি কারণে এই ভয়াবহ অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ ব্যাধির কথা বলি। বাংলা দেশের সকল প্রকার পীড়াই এখানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য স্থানের মত ম্যালেরিয়াই তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। রোগের এবংবিধ বিস্তারের দুইটী প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, একটী আর্থিক অসচ্ছলতা, অপরটী স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনবধানতা। বারংবার দুর্ভিক্ষের পীড়নে, শারীরিক পুষ্টিসাধনের অভাবে, লোকের জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে। দ্বিতীয় কারণটির বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঁকুড়ার পীড়ার বিস্তৃতি অনেক পরিমাণে লোকের স্বকৃত কর্ম্মের ফল। প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে, এই জেলা বাংলা দেশের স্বাস্থ্যনিবাস হওয়া উচিত ছিল। জেলার অধিকাংশ স্থানই উচ্চ ও অসমতল, এবং সহজেই জলনিকাশ হইয়া যায়। জল আবদ্ধ হইয়া মশককুলের উৎপত্তি হইবে এমন সম্ভাবনা নাই, এবং এখানে কোন নদী নালা মজিয়া যায় নাই। কোনও বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর রেলপথ স্থাপনের জন্য জলপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিরোধ হইয়াছে, এমন স্থান নাই; জেলার অধিকাংশ স্থানে কোনও রেলপথ নাই; যাহা আছে তাহা সাধারণতঃ সর্ব্বোচ্চ ভূমির সমতল স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই ভূমির অসমতলতার ফলে জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়। সুতরাং লোকের আয়ত্তের অতীত, স্বাভাবিক বা কৃত্রিম, কোনও কারণে বাঁকুড়া জেলায় স্বাস্থ্যহানি সংঘটিত হইতেছে না। বরঞ্চ, পল্লীবাসীদের স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। এই মনোরম স্থানের যে অংশেই মানব একত্রিত হইয়া স্বীয় আবাস স্থাপন করিয়া গ্রাম বা নগর প্রস্তুত করিয়াছে, সেই স্থানকেই তাহারা নরককুণ্ডে পরিণত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপরিষ্কৃত ও অসংস্কৃত পুকুর আগাছায় পরিপূর্ণ, তাহার পাড়ে জঙ্গল জন্মিয়া বায়ু ও আলোকের গতি রোধ করিয়াছে, সেই দূষিত জল তাহারা পান করে ও তথাকার দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ুতে তাহারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। এই আচরণ কেবল যে অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; শিক্ষিত জন-সম্প্রদায়ও এবিষয়ে

এতই উদাসীন যে, নিজেরাই স্বাস্থ্যের নিয়মসমূহ পালন করেন না, অপরকে শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা।

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, আমরা এমন দুইটী বিষয়ে উপনীত হই, যাহা কেবল বাঁকুড়া বা বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের পল্লীজীবনে যাবতীয় উন্নতির মূলে নিয়ত কুঠারাঘাত করিতেছে। ইহাদের একটী অদৃষ্টবাদ, যাহা সমগ্র পল্লী-সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে; অপরটী একতার একান্ত অভাব। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও, জনসাধারণের ন্যায়, দূষিত জল পান করেন ও প্রত্যহই স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে, অদৃষ্টে যে দিন মৃত্যু অবধারিত আছে তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই মরণ আসিতে পারে না, অথবা তাঁহারা ভাবেন যে, দেবমন্দিরে পূজা দিলেই বা মসজিদে প্রার্থনা করিলেই যাবতীয় অমঙ্গল দূর হইবে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ভুলিয়া যান যে, নৈতিক জগতের ন্যায় জড় জগতেও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যাহা পালন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও যাহা লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হয়। আমাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক মঙ্গলের জন্য জগদীশ্বর তাহার বিধান করিয়াছেন। যে দার্শনিক মত অনুসারে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অপেক্ষা কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গ্রাহ্য হয়, সেই মতবাদ হইতে এই অদৃষ্টবাদের উৎপত্তি কি না তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যেমন একদিকে এই অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা আমাদের পল্লীজীবনকে গ্রাস করিয়া আছে, তেমনই দলাদলি ও বিবাদ বিসম্বাদে আমাদের গ্রামগুলি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিন চারটী বিভিন্ন দল আছে এমন গ্রাম ত সচরাচর দেখিতে পাই; কিন্তু এমন গ্রামও আমি দেখিয়াছি যেখানে ১০।১২টী পরস্পরবিরোধী দল বর্ত্তমান। কোনও এক দলের লোক কিছু ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে উচিত বা অনুচিত, যে কোন উপায়েই হউক, বাধা দেওয়াই অপর সকল দলের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালের ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজে যে একতা ছিল বলিয়া শুনা যায়, তাহা সম্পূর্ণ-ভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ফলে, সকলে একত্র হইয়া সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। সুতরাং বাঁকুড়ার মত স্বাস্থ্যকর জেলায় গ্রাম্য জলাশয়গুলি বহু বর্ষের অবহেলায়, আজ আগাছা ও পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া, ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলকে আমন্ত্রণ করিতেছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, গত দুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিনিয়তই দেশের এই অবস্থা মনে জাগিয়াছে এবং এই প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে এই সকল জাতির সহিত আমাদের জাতির প্রভেদ কোথায়? ইহার উত্তরে আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টবাদ, এবং মানুষের সহিত মানুষের, একদলের সহিত অপর দলের, এই যে অবিশ্রান্ত আত্মঘাতী শত্রুতা এবং দলাদলি:ইহাই আমাদের জাতির প্রধান বিশেষত্ব।

বাঁকুড়ার ব্যাধির বিস্তার ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণগুলি নির্ণয় করিয়া এখন সেই জেলার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। দেখা যাইবে যে, ইহার মূলেও পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টবাদ ও দলাদলি সর্ব্বপ্রধান কারণস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাঁকুড়ায় দারিদ্র্যের কারণ প্রধানতঃ চারিটী—(১) মামলা মোকদ্দমায় একান্ত অনুরক্তি, (২) সংঘবদ্ধতার অভাব, (৩) ভ্রান্তিমূলক কৃষিপ্রণালী, এবং (৪) অনাবৃষ্টি ও অজন্মা। একথা বলিলে বোধ হয় কেহ প্রতিবাদ করিবেন না যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁকুড়ার পল্লীবাসিগণও মামলা মোকদ্দমার নেশাতে ভোর হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। যাঁহারা পল্লীর অবস্থা কিয়ৎপরিমাণেও অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে না যে, দুর্ভাগ্যক্রমে বিচারালয়গুলিই আমাদের দেবালয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং ইহাদেরই বেদীমূলে আমাদের দেশবাসিগণ আপন আপন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যাবতীয় অর্থসম্বল উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। দেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে বহু পরিবার মামলা মোকদ্দমায় উৎসন্ন যায় নাই; এবং বোধ করি এমন পরিবারও অতি বিরল যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও মোকদ্দমায় লিপ্ত নহে। দুইটী কপর্দ্দকহীন পরিবার তাহাদের জমির সীমানায় সামান্য একটা গাছ লইয়া বিবাদ বাধাইয়াছে; তাহার মীমাংসার জন্য ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমার সৃষ্টি হইল, এবং নিম্ন আদালত, আপিল আদালত প্রভৃতি যত আদালত আছে, সর্ব্বত্র বিচার হইয়া যে পর্য্যন্ত তাহাদের সেই সামান্য কলহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, ততক্ষণ আর নিবৃত্ত হয় না। মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে তাহাদের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয় অথবা মহাজনের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ঋণপাশে বদ্ধ করিতে হয়। অথচ এই সর্ব্বনাশের কারণ সেই গাছটীর মূল্য হয়ত ৫৲ টাকার অধিক হইবে না। হাইকোর্ট বা প্রিভি-কাউন্সিল অবধি মামলা চালাইয়া, নিজের ও বিপক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, একজন বাঙ্গালী পল্লীবাসী যে গৌরব

অনুভব করে, বোধ করি জার্ম্মানদিগকে পরাজিত করিয়া মার্শাল ফশ্‌ও ততটা শ্লাঘা অনুভব করেন নাই। আপনারা হয় ত বিশ্বাস করিবেন না, আমি ইতিপূর্ব্বে যে জেলায় ছিলাম, সেখানে ৭০ বৎসরের একটী বৃদ্ধা আজীবন নিজের আত্মীয়গণের সহিত মোকদ্দমা চালাইতেছিল; একটার পর একটী করিয়া, সব মোকদ্দমাগুলিতেই তার হার হইয়াছিল, তথাপি অদম্য উৎসাহের সহিত, মোকদ্দমার নথীর পুঁটুলি লইয়া সে, দশ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রমপূর্ব্বক রেল ধরিয়া, প্রায় প্রতিমাসেই আমার কাছে নালিশ করিতে আসিত। আমি তাহার বিবাদ আপোষে মীমাংসা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা, আমার নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের, প্রেসিডেন্ট, পঞ্চাইতের, এমন কি বৃদ্ধার পক্ষীয় উকীল মহাশয়ের চেষ্টাও বিফল হইয়াছিল। বৃদ্ধার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বিচারালয়ে এমন একটী যাদু-মন্ত্র আছে, যাহার বলে সে তাহার ঐহিক সম্পত্তি ত ফিরিয়া পাইবেই, পরন্তু তাহার পারত্রিক কল্যাণও সাধিত হইবে; এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে "আপিল" করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ভদ্রমহোদয়গণ, জগতে সভ্য বা অসভ্য কোন জাতির মধ্যেই আমাদের হতভাগ্য দেশের মত এমন অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না, যেখানে বিচারালয়গুলি জাতীয় দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে এবং আত্মঘাতী মামলার নেশা এমন করিয়া একটী সমগ্র জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু বাঁকুড়া জেলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের পল্লীবাসীদের দারিদ্র্যের আর একটী কারণ হইতেছে, সংঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে কাজ করিবার অভাব। বহির্জগতের বাণিজ্যসংঘসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষের পল্লীবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের সমষ্টি মাত্র। পূর্ব্বে বাণিজ্যজগতের সঙ্গে ভারতের পল্লীগুলির সংযোগ না থাকায় তাহার কতকগুলি আনুষঙ্গিক সুবিধা ছিল; সেগুলি তাহারা এখন হারাইয়াছে। জগতের আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে তাহারা হঠাৎ বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহাদের কৃষি ও বাণিজ্যপদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সুতরাং আজ ভারতের কি কৃষিজীবী, কি শ্রমজীবী তন্তুবায় অথবা শিল্পিগণ সকলেই বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগতভাবে এই জীবন-সংগ্রামে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, অথচ কিছু কিনিবার প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে। কোনও দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে, দালালগণই লাভ করে, তাহাতে যাহারা সে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে বা ক্রয় করে তাহাদের কোনই সুবিধা হয় না। এই অসম প্রতিযোগিতা হইতে আমাদের পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, কি কৃষিজীবী কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা, প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে এমনভাবে সমবায় সমিতিতে গঠিত করিতে হইবে যেন তাহারাই বাজার দর ঠিক রাখিতে পারে এবং দালালদিগের অন্যায় লাভ করিবার সুযোগ কমিয়া যায়।

তৃতীয় কথা এই যে, অর্থশাস্ত্র ও কৃষিবিভাগের নিয়মের ব্যতিক্রমই বাঁকুড়ার দারিদ্র্যবৃদ্ধির আর একটী কারণ। এখানে এমন অনেক উচ্চ ভূমি আছে যাহা ধানের উপযোগী নহে, কিন্তু সেখানে স্বভাবতঃই জঙ্গল হইয়া থাকে। এই সকল জঙ্গলে অসংখ্য শাল, পলাশ কুসুম ইত্যাদি গাছ জন্মে। এই সকল জঙ্গল রীতিমত আবাদ করিলে, তাহা হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যাইবেই, তাহা ছাড়া অনেক গাছ হইতে লাক্ষা ও তসর সংগ্রহ করা যাইতে পারে। লাক্ষা ও তসরের আবাদে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল ব্যবসায় নিরক্ষর বাউরী ও সাঁওতালদিগের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরা হয় ত সামান্য বেতনের কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত হইতেছেন, নতুবা যৌথ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অপরের গলগ্রহরূপে অন্নধ্বংস করিতেছেন। এদিকে দেশের স্থায়ী ও অধিকতর মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, লোকে এই সকল মূল্যবান গাছ ফেলিয়া কৃষির অনুপযোগী উচ্চ ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

একটী কুল অথবা পলাশ গাছে লাক্ষার আবাদ করিলে ন্যূনকল্পে প্রতিবৎসর ৬ ছয় টাকা আমদানী হইতে পারে। সুতরাং ১০০ গাছ লইয়া সামান্য একখণ্ড উচ্চ ভূমিতে লাক্ষার আবাদ করিলে, মাসিক ৩০ টাকা বেতনের পদপ্রার্থী একজন গ্রাজুয়েট অপেক্ষা অধিক আয় সহজেই হইতে পারে। বর্ত্তমানে বাঁকুড়া কৃষি ও হিতকরী সমিতির উদ্যোগে, উচ্চ ভূমিতে ধান চাষ না করিয়া এই সকল মূল্যবান বৃক্ষের প্রকৃত ব্যবহার করার উপকারিতা জেলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকারে জঙ্গল কাটিয়া ফেলাতে নানাবিধ মূল্যবান বৃক্ষ নষ্ট হওয়া ব্যতীত আরও অনেক কুফল ঘটিতেছে। অনাবৃত ভূমিতে জলস্রোতের আধিক্য বশতঃ চাষের জমি অধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইতেছে, ভূনিম্নস্থ জলের অবস্থান আরও নামিয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণও হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য দেশে অরণ্যবিজ্ঞান (Forestry) কৃষিবিদ্যার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষেও কৃষির উন্নতিকল্পে ইহার প্রয়োগ হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়;

এবং যাহাতে অনাবৃত স্থান সকল পুনরায় জঙ্গলাকীর্ণ হয় এবং জমিদারগণের অধিকৃত বর্ত্তমান জঙ্গলসমূহ যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য রীতিমত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, সময়োপযোগী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এবং জলসেচনের উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাবে প্রায়ই ক্ষেত্রস্থ ফসল নষ্ট হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ধান পাকিতে পারে না বলিয়াই বাঁকুড়ায় সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ হয়। এই জেলার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ৫৫ ইঞ্চি মাত্র। দেশের অন্যান্য অংশের সহিত তুলনায় এই বৃষ্টিপাত কম হইলেও, প্রয়োজন অনুসারে বর্ষণ হইলে শস্যহানির সম্ভাবনা থাকিত না। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন অনুসারে বৃষ্টিপাত হয় না, এবং বর্ষার প্রারম্ভে অধিক বৃষ্টি হইয়া শরৎকালে যখন ধান পাকিবার জন্য জলের আবশ্যক হয়, তখন প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অনাবৃষ্টির ফলে ক্ষেত্রস্থ শস্য মরিয়া যায় এবং পরিণামে দেশ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হয় ও দেশবাসীর কষ্টের অবধি থাকে না। প্রতিবারেই গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্রদেশের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। গত দুইবারের দুর্ভিক্ষে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসমেত ১৪ লক্ষ টাকার অধিক এই বাবতে ব্যয় করিয়াছেন।

কিন্তু প্রথম বর্ষার যে অনাবশ্যক জল নদী নালা হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়, যদি সেই জল ধরিয়া রাখা যায়, তবে অনাবৃষ্টির সময়ে এই জলের সাহায্যে দেশের অন্নসমস্যার অনায়াসে সমাধান হইতে পারে। এই প্রকার জলের ব্যবস্থা করিলে কেবল যে ধান চাষের সুবিধা হইবে তাহা নহে, বর্ত্তমানে জলের অভাবে যে মূল্যবান রবিশস্য জন্মিতে পারে না তাহার চাষও সম্ভবপর হইবে।

— —

সান্ত্বনা।

(৺ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

পলে পলে এত দুখের এত আঘাত সয়ে
কেমন করে বল্‌ব হরি, একটী বারো জনম ধরি'
ডাকিনি তোমা ডাকের মত দীন হৃদয় লয়ে!
কেমন করে বল্‌ব নাথ, বৃথাই গেছে দিবস-রাত,
ভবের হাটে লীলার নাটে ভাবের মানুষ হয়ে!
এত যে মোর অশ্রুরাশি গানের সুরে উঠ্‌ল ভাসি'
ঝরে নি তার একটী কণা রাতুল চরণদ্বয়ে!
এত যে তমঃ চারিটী ধার ঘিরেছে মোর দুনির্ব্বার,
কেমন করে বল্‌ব পথে দেখিনি জ্যোতির্ম্ময়ে!
আজকে তবে যাত্রাশেষে, কেনরে রব দীনের বেশে,
কেন রে রব মলিন মুখে ব্যাকুল ভয়ে ভয়ে!
আঘাত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, গলালে প্রভু, পাষাণ হিয়ে
সে আশ্বাসে আজকে সুখী, সকল ব্যথা দুঃখ সয়ে!

———

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ভগ্নাংশ।

[আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

প্রাচীনত্ব—সিলেট অতি প্রাচীন দেশ। খৃষ্টিয় ১ম শতাব্দীর টলেমির ভূগোলে "সলট" নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় (মেক্‌রিণ্ডেলের অনুবাদ, ২২৫পৃষ্ঠা)। এই দেশ প্রথমে অল্লায়তন ও পর্ব্বতময় এবং কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রাচীন সুহ্ম দেশ বর্ত্তমান শ্রীহট্টদেশ লইয়া গঠিত ছিল। তান্ত্রিক পীঠস্থানসমূহের স্থাপন কালে শ্রীহট্টে "গ্রীবা পীঠ" স্থাপিত হইয়াছিল। বায়ুপুরাণ, অর্থচিন্তামণি, লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকা প্রভৃতিতে শ্রীহট্টের নদ-নদী ও তীর্থাদির উল্লেখ আছে। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে :—

"পূর্ব্বে স্বর্ণনদীচৈব দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
লৌহিত্যঃ পশ্চিমে ভাগে উত্তরেচ নীলাচলঃ।
এতন্মধ্যে মহাদেবী! শ্রীহট্টোনামতঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বে স্বর্ণনদী (সুনাইনদী), দক্ষিণে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রনদ, উত্তরে নীলাচল (কামরূপের পর্ব্বত), ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম শ্রীহট্ট।

মুসলমানবিজয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও শ্রীহট্ট দেশ "গৌড়, লাউড় এবং জয়ন্তিয়া" নামে তিনটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। গৌড় রাজ্যের কথা আমরা পরে বলিব। লাউড় অঞ্চল পূর্ব্বে সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্টের উত্তরাংশ জয়ন্তিয়া নামে কথিত। "জাতিতত্ব বারিধি" গ্রন্থে লিখিত (২৬০পৃষ্ঠা) আছে যে, মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রাগজ্যোতিষ দেশের এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি কিরাত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে এসকল স্থান পূর্ব্ববঙ্গ নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মণ—

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জাদি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মুসলমানদিগের আক্রমণে ভীত হইয়া এ দেশে আসিয়া সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করিবার পর বঙ্গদেশ হইতে অল্পসংখ্যক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীহট্টের এই বৈদিক সমাজে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। রাজনগরের রাজা সুবিদনারায়ণ সমাজপতি ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক সমাজ বন্ধন করেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসমাজ পাঁচটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা—গৌড়-গোবিন্দী, সাম্প্রদায়িক বৈদিক, অসাম্প্রদায়িক বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বৈদিক। কামরূপী ব্রাহ্মণগণের সংস্পর্শ হেতু গৌড়-গোবিন্দীয়গণের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা— ১। বৎস, ২। বাৎস্য, ৩। ভরদ্বাজ, ৪। কৃষ্ণাত্রেয়, ৫। পরাশর, ৬। কাত্যায়ন, ৭। কাশ্যপ, ৮। মৌদগল্য, ৯। স্বর্ণকৌশি ও ১০। গৌতম।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম—শ্রীহট্টে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ম ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ বিজয় পুরী শ্রীহট্টে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও প্রচার করেন। যে অদ্বৈত দিবাবতার বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে কীর্ত্তিত, তিনিও শ্রীহট্টবাসী। তাঁহার আহ্বানে শ্রীহট্টস্থ লাউড় দেশের নৃপতি দিব্য সিংহ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বনে কৃষ্ণদাস নামে আখ্যাত হন। কৃষ্ণদাস কৃত সংস্কৃত "সূত্র" ও বাঙ্গালা "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী" বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইঁহার পুত্রও বৈষ্ণব ছিলেন জানা যায়। ইঁহাদের প্রভাবে শ্রীহট্টে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস, শ্রীরাম প্রভৃতি এবং মুরারি গুপ্ত ও বাসদেব প্রভৃতিও শ্রীহট্টের লোক।

এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী অদ্বৈতের অন্তর্দ্ধানের পর নিজ শিষ্য ঈশান দাসকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। গুরুপত্নীর আদেশে তিনি শ্রীহট্টে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ঈশান অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি স্বয়ং একথা সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও চণ্ডীদাসের গান শ্রুত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পুরুষ "মধুকর" উৎকলাধিপতি ভ্রমরের উৎপীড়নে শ্রীহট্টে পলাইয়া আসেন। শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনঃসন্তোষিণী ও চৈতন্যদয়াবলী গ্রন্থানুসারে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টবাসী হইয়াছিলেন। ইনি "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" ছিলেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে" আছে :—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পলইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥
সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তার নাম।
পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তার ঘরে
করিলা বিশ্রাম॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃজন্মস্থানও শ্রীহট্টে, শ্রীহট্টেই তাঁহার মাতামহের গৃহ ছিল। তাঁহার মেসো, তাঁহার শ্বশুর বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রণীত "শব্দার্থমঞ্জরী" অভিধানে লিখিত আছে, "জয়ন্তীয়াপতি আদিত্য সিন্ধু আর্য্যাবর্ত্ত হইতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণসন্ততিগণ শ্রীহট্টে বৈদিক নামে খ্যাত; সেই বৈদিককুলজাত উপেন্দ্রনাথ মিশ্র (শ্রীচৈতন্যের পিতামহ)।" এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, জয়ন্তীয়ারাজ কর্ত্তৃক (?) একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে আনীত হইয়াছিল।

জগন্মোহন গোসাঞি—

ইনি শ্রীহট্টের বাঘাসুরা গ্রামের সুন্দরানন্দের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম কমলা। জগন্মোহন জাতিতে কায়স্থ (?) ছিলেন। সুন্দরানন্দ বাল্য কাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যভাব দর্শন করিয়া সংসারী হইবার জন্য গঙ্গানাম্নী জনৈক রূপবতী কুমারীর সহিত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ দেন। গোপীনাথ নামক জনৈক বৈষ্ণব ঘটনাক্রমে বাঘাসুরা গ্রামে আসিয়া পড়েন। জগন্মোহন তাঁহার নিকট

উপদেশ ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে তিনি ক্রমে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। পত্নীর গর্ভাবস্থায় অজ্ঞাতসারে তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত তুলসী-দাসের জনৈক শিষ্য মুরারি জীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। এদিকে জগন্মোহনের যথাকালে যমজ পুত্র সন্তান হয়। তাহাদের নাম শ্যাম ও সুন্দর।

জগন্মোহনের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। গুরুর আদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। কিন্তু সংসারে প্রবেশ না করিয়া মাছুলিয়ার গহন বনে ভগবচ্চিন্তায় নিরত হন। মাছুলিয়ায় জগন্মোহনের আখড়া আছে। এই আখড়াতে তাঁহার সমাধি প্রধান দর্শনীয় স্থান। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। যাঁহার মধ্যে দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, পার্থিব বিদ্যা তাঁহার নিকট অকি-ঞ্চিৎকর। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবও নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু কত প্রথিতনামা পণ্ডিত তাঁহার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য আকুল প্রাণে দেশদেশান্তর হইতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেন। যাহা হউক প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তি তাঁহার নূতনবিধানমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম জগন্মোহনীসম্প্রদায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সহিত ইহাঁদের সম্পর্ক অল্প। ইঁহারা ব্রহ্মবাদী ও প্রতিমাপূজায় স্পৃহাহীন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহত্যাগী ও বৈরাগীবেশ-ধারী। ইঁহারা তুলসীপত্র ও গোময় ব্যবহার করেন না।

জগন্মোহনের আদি শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি। ইনি রাঢ়িশালবাসী ও শাহাবংশীয় ছিলেন। গোবি-ন্দের শিষ্য শান্ত গোসাঞি। ইনি জগন্মোহনের পুত্র। জগন্মোহন সংসারবৈরাগ্যহেতু স্ত্রীপুত্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না রাখায় শান্ত বহুদিন ধরিয়া তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা লাভে চেষ্টিত হইয়াও সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। অবশেষে গোবিন্দের একান্ত অনুরোধে 'শান্ত' পিতার সান্নিধ্যে গমনাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। জগ-ন্মোহনের আদেশে তিনি গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হন। এই শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গোবিন্দ গুরুদেবের অভিপ্রায়ানুসারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রিত অভিনব মত সম্বলিত "নির্ব্বাণসঙ্গীত"-সমূহ রচনা করেন। এই সকল নির্ব্বাণসঙ্গীত জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া থাকে। নিম্নে একটী নির্ব্বাণসঙ্গীত উদ্ধৃত হইল :—

রাগিণী সারঙ্গ।

সাধুরে ভাই, পূর্ণব্রহ্ম গুরু কেমন ভাবে পাই।
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া।
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি
হেলায় তরিবা ভব, পাইবা মুকতি
হীন রামদাসে বলে আমি হেলায় বড় হীন
কৃপা করি রাখ পদে না বাসিও ভিন।

খাজা ওসমান—

ইনি কৎলুখাঁর প্রধান মন্ত্রী ইসাখাঁ লোহানী মিয়ানখেলের পুত্র। কৎলুখাঁর মৃত্যুর পর ওসমানের পিতা পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইসাখাঁর পাঁচ পুত্র মধ্যে খাজা সুলেমান জ্যেষ্ঠ এবং খাজা ওসমান মধ্যম। সুলেমান অল্পদিন রাজত্ব করিয়া ১০০২ হিজারীতে দেহত্যাগ করেন। ওসমানের বিষয় "মখজন্-ই-আফাখানা" নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ প্রকা-শিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন ও চার্লস ষ্টুয়ার্ট ইঁহাকে "ওসমান খাঁ" নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মিষ্টার বি, সি, এলেন ইঁহার "খোয়াজ ওসমান" নামেই পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীহট্টদেশ শাসনকালে খাজা ওসমান মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিকূলাচরণ করায় জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তৎকালে ওসমান শ্রীহট্টে পূর্ণ তিন বৎসর রাজত্ব করেন নাই। একদল মোগল সৈন্য ওসমানের দুর্গের ন্যূনাধিক তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে "লাখাটা তীরে" কেওলা বিলের প্রান্তভাগে শিবির স্থাপন করে। ওসমান সসৈন্যে সেখানে মোগলদিগের সম্মুখীন হইলেন। মোগল সেনাপতি মির্জা সহান স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুবাদার ইসলাম খাঁ * ঢাকা

* ইসলাম খাঁ—ইনি ১৬১৫ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া-ছিলেন।

হইতে ওসমানের বিরুদ্ধে কয়েক দল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

জনৈক মোগল সৈন্যের তীর ওসমানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করায় তিনি রণ-ক্ষেত্রে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মোগল সৈন্যের বন্দুকের গুলিতে তাঁহার প্রধান সেনাপতি তাতার খাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। ওসমানের মৃত্যুর পর সুবিদনারায়ণের রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ওসমানের তৃতীয় ভ্রাতা খাজাওলী সম্রাটের অনুগ্রহে কিছুদিনের জন্য শ্রীহট্টের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে খাজা ওসমানের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

ইসাখাঁ লোহানী মিয়ান্-খেল

খাজাসুলেমান | খাজাওসমান | খাজাওলী | খাজামহলী | খাজাইব্রাহিম

খাজাসুলেমান → খাজাদাউদ

খাজাওসমান → সুমরেজ, ইয়াকুব
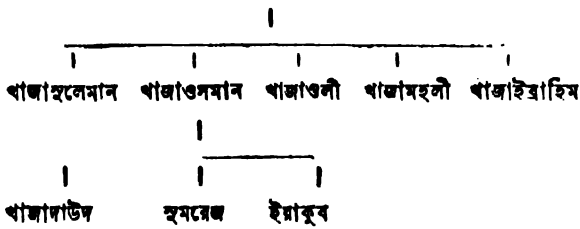
শ্রীহট্টের উল্লেখযোগ্য কয়েকটী স্থান।

পঞ্চখণ্ড—

এইস্থান পর্ব্বতাকীর্ণ। পূর্ব্বে এখানে অনার্য্য ও পার্ব্বত্য জাতিরা বসবাস করিত। মুসলমান রাজত্বকালে কায়স্থ জমিদারগণ পঞ্চখণ্ডের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া জনপদ স্থাপন করেন। মিথিলা-ধিপতি বলভদ্রের সময়ে মিথিলাবাসী শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম নামক পঞ্চ ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপলক্ষে ত্রিপুরায় আগমন করেন। ত্রিপুরাধিপতি আদিধর্ম্ম ফা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র জমি দিয়া এই স্থানে বাস করিবার প্রস্তাব করিলে পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণচতুষ্টয় মিথিলায় প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তাঁহারা বঙ্গদেশে গিয়া পতিত হইয়াছেন, মিথিলাবাসীগণ তাঁহাদের নামে এই অপবাদ রটনা করায় রাজা তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রসহ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ত্রিপুরাধিপতির নিকট হইতে "পঞ্চখণ্ড" নামক স্থান গ্রহণ করেন। মোগলকুলতিলক আকবরের রাজস্বসচিব "তোডর মল্ল" পঞ্চখণ্ডকে মহলরূপে পরিগণিত করিয়া ৩৭০০০০ দাম * রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত "দিঘীর পাড়" গ্রামবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চখণ্ড-নিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী জ্যোতিষে দ্বিতীয়া "খনা" ছিলেন।

বাণিয়াচুয়াঙ্গ—

আইন-ই আকবরী মতে এই মহালের রাজস্ব ছিল ১৬৭২০৮০ দাম। শ্রীহট্টের কাত্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারা ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ। বঙ্গের শেষ পাঠান দলপতি ওসমানের শাসনকালে বাণিয়াচুয়াঙ্গে "আনওয়ার খাঁ" নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার ছিলেন। ওসমানের বিরুদ্ধে ঢাকার সুবেদার "ইসলাম খাঁ"র অভিযান-কালে "আনওয়ার" তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করত ওসমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রতি-শ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কার্য্যকালে বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহাকে ভীষণ বিপদগ্রস্ত করেন।

রাজনগর—

৭৫৪ খৃঃ অব্দে (১৬৪ ত্রৈপুরাব্দে) ত্রিপুরা-ধিপতি সুধর্ম্মপাল বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ নিধিপ-তিকে বর্ত্তমান মৌলভিবাজারের অধিকাংশ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। নিধিপতি সেখানে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজনগর হইয়াছিল তাহার রাজধানী। রাজনগরের পূর্ব্বদিকে "বাড়ুয়া পাহাড়ে" পাঠান সর্দ্দার ওসমান একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লাউড়—

এই রাজ্য বর্ত্তমান সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্ত-র্গত ছিল। লাউড় অঞ্চল যে একসময়ে প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত (!) ও রাজা ভগদত্তের অধীন ছিল তাহা স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে অবগত হওয়া যায়। লাউড় পাহাড়ের উপর একটী উচ্চ স্থান দেখাইয়া অদ্যাবধি লোকে রাজা ভগদত্তের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। খৃষ্টীয়

* দাম=ইহা আধুনিক ডবল পয়সার মত একপ্রকার তাম্রমুদ্রা। ৪০ দামে সেরসাহী এক টাকা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ নামক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। আকবর সাহের সময়ে লাউড় (লাড়ু) রাজ্য হইতে ২৪৬২০৬ দাম রাজস্ব সংগৃহীত হইত। লাউড়ের রাজবংশ বাণিয়ানচুয়াংয়ের জমিদার বংশ হইতে উদ্ভূত। লাউড় রাজ্য রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নড়িয়াল ও ভরদ্বাজগোত্রীয় কুবের পণ্ডিতের পুত্র মহাপুরুষ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লাউড়রাজ দিব্য সিংহ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কাত্যায়নবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুবের পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কনৌজবাসী কাত্যায়নগোত্রজ ব্রাহ্মণ কেশব মিশ্রের বংশধর পদ্মনাভ —যিনি দিল্লী হইতে "কর্ণখাঁ" উপাধি লাভ করেন তিনি—বাণিয়ানচঙ্গে বাস করিতেন। তৎপুত্র রাজা গোবিন্দ দেব লাউড় রাজ্য আক্রমণ করায় দিল্লী হইতে তাঁহার তলব হয়। সেখানে তিনি বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় "হাবিচ খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর লাউড়ে তদীয় বংশধরগণ রাজার পরিবর্ত্তে "রেজা" আখ্যা ধারণ করেন।

মৌলভিবাজার—

আসাম বেঙ্গল রেলের শ্রীমঙ্গল ষ্টেসন হইতে হাঁটা-পথে এইস্থানের দূরত্ব ১৪মাইল। নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টিমারে (C. S. D. Service) মনুমুখ নামক স্থানে আসিয়া সেখান হইতে নৌকাযোগে অথবা হাঁটা-পথে মৌলাভিবাজার যাওয়া যায়।

শ্রীহট্টে মুসলমান প্রভাব।

গোবিন্দদেব—

মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে শ্রীহট্টদেশ গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দ নামক জনৈক হিন্দু সামন্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলের গৌড় রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। তিনি গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত। শান্তরাণী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার মত সহস্র সহস্র দীনদুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। গোবিন্দদেবের তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় ইনি নারায়ণদেবের পুত্র, গোকুলদেবের পৌত্র ও খরবানদেবের প্রপৌত্র। রাজা গোবিন্দদেব ভট্টপাঠক (ভাটপাড়া) গ্রামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "শ্রীহট্টনাথ" নামক শিবমূর্ত্তি স্থাপন করত সেই দেবতার সেবা-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৫ খানি ভদ্রাসন দান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টসহরের উত্তরে "মজুমদারি" নামক স্থানের সন্নিকটে গড়দুয়ার নামে যে স্থান আছে সেখানে গৌড়গোবিন্দের গড় ও দুর্গ ছিল। শাহজালাল নামক জনৈক দরবেশ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া গৌড়গোবিন্দকে পরাজয় করিতে যাত্রা করেন। এইরূপ জনপ্রবাদ "গৌড়-গোবিন্দ তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধে পেচাগড়ের জঙ্গলে নিরুদ্দিষ্ট হইলে শ্রীহট্টে মুসলমানদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।"

শাহজালাল—

মুসলমানের ইতিহাসে চারিজন শাহজালালের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম শাহজালালের নিবাস ছিল বুখারাদেশে; দ্বিতীয় শাহজালাল তাব্রিজের অধিবাসী ছিলেন; তৃতীয় শাহজালাল আরবদেশের য়েমেন নগরে মহম্মদ নামে এক বিখ্যাত ফকিরের ঔরসে ও সাদিয়া বিবির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মপরিগ্রহের তিন মাস পরে মাতৃবিয়োগ ঘটে। শাহজালালের পিতা সৈকুশ—সুউক উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এই তৃতীয় শাহজালাল শ্রীহট্ট দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। চতুর্থ শাহজালাল গঞ্জেয়ার অধিবাসী ছিলেন। শাহজালাল যখন শ্রীহট্ট জয় করেন প্রায় সেই সময়ের কিছু পরে দিনাজপুরের রাজা গণেশ (মতান্তরে কংস) গৌড়াধিপতি শামসুদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের (প্রাচীন বঙ্গের) রাজা হন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়াধিপতি ১৩৮৫ খৃঃ অব্দে নিহত হইয়াছিলেন।

সেগ বুহরন্দীর গোহত্যা—

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন গোবিন্দ গৌড় রাজ্যের (১) রাজা হইয়া তদীয় রাজ্যস্থ মুসলমান অধিবাসীদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার

(১) এই রাজ্য উত্তর-শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল।

করিতে থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হন। তদীয় শাসনকালে সেখ বুহরন্দী নামক জনৈক মুসলমান পুত্র প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া খোদার নিকট মানসিক করেন যে, তদীয় অনুকম্পায় একটী পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার উদ্দেশে একটী গোবধ করিবেন। খোদায় কৃপায় যথাকালে ঐ মুসলমানের একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বুহরন্দীর ইহাতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ তখন তিনি একটী গোবধ করেন। ঘটনাক্রমে সেখানে একটী চিল সহসা উড়িয়া আসিয়া চঞ্চুপুটে একখণ্ড মাংস লইয়া শূন্যপথ দিয়া যাইবার কালে গৌড়গোবিন্দের সম্মুখে উহা পতিত হয়। ঐ পতিত মাংসখণ্ড দৃষ্টে গোমাংস বলিয়া বুঝিতে পারিবামাত্র তিনি ক্রোধে অগ্নিপ্রায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং এই হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী গোহত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিবার অনতিকাল মধ্যে সংবাদ পাইলেন, সেখ বুহরন্দী নামক জনৈক মুসলমান তদীয় রাজ্যে একটী গোহত্যা করিয়াছে। একে রাজা গোঁড়া হিন্দু, তাহার উপর তাঁহারই রাজ্যে গোহত্যা। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে তলব করিলেন। ঐ ব্যক্তি তদীয় সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে রোষকষায়িত লোচনে এই গোহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুহরন্দী তখন ভীত ত্রস্ত ও কম্পিত কলেবরে তদীয় উদ্দেশ্য রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার হৃদয়ে ঐ মুসলমানের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়ার উদয় হইল না। ঘাতক দ্বারা তিনি বুহরন্দীর নবপ্রসূত তনয়ের প্রাণনাশ ও তাহার দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করাইলেন। পুত্রশোকাকুল নির্য্যাতিত বুহরন্দী তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে দিল্লীতে গমন করেন। তৎকালে দিল্লীর মসনদ আলাউদ্দীন সাহের হস্তগত ছিল।

আলাউদ্দীন সাহ—

সম্রাট তাঁহার এই দুঃখের কাহিনী অবগত হইয়া গৌড়গোবিন্দকে সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ তদীয় ভাগিনেয় সেকেন্দর সাহকে বিপুল বাহিনীসহ গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করেন। এই সেকেন্দরসাহ একজন অসমসাহসিক ও বীর পুরুষ বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি মাতুলের আদেশে শীঘ্রই হতভাগ্য বুহরন্দী ও অসংখ্য সৈন্যসহ বাঙ্গালার প্রান্তভাগস্থ শ্রীহট্টের গৌড়রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা বর্ত্তমান ঢাকা জেলার মধ্যে উপস্থিত হইলেন ও সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটে তাঁহাদিগের শিবির সংস্থাপন করিলেন। বিশ্রামার্থ কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থানের পর তাঁহারা সদলবলে শ্রীহট্টাভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে ব্রহ্মপুত্রের তটভূমে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সেকেন্দরের পরাভব—

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "গৌড়গোবিন্দ একজন বিখ্যাত যাদুকর ছিলেন। ভূতপ্রেত দানবদৈত্যগণ তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিত। শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধকালে তিনি 'অগ্নিবাণ' নামক এক প্রকার প্রাণান্তক অস্ত্র ব্যবহার করিতেন।" গৌড়গোবিন্দ সেকেন্দরের রাজ্য আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভূতপ্রেত দানবদৈত্য প্রভৃতি সৈন্যগণ (২) সহ মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের অধিকাংশকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। সেকেন্দর কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া শোকসন্তপ্ত বুহরন্দী ও কতিপয় অনুচরবর্গসহ ভগ্নহৃদয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি শাহজালাল নামক জনৈক দরবেশের সাক্ষাৎ পান।

শাহজালালের আগমন—

সম্রাট আলাউদ্দীন শ্রীহট্টে সেকেন্দরের এই পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তৎকালে দিল্লীতে নাজামদি নামক জনৈক ধার্ম্মিক মুসলমান ফকির বাস করিতেন। তিনি শাহজালালের ঐশী শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে আবশ্যকীয় সৈন্যগণসহ শাহজালালকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। শাহজালাল শ্রীহট্ট দেশ জয় করিয়া সম্রাটের ভাগিনেয় সেকেন্দরকে উহার শাসনভার অর্পণ করেন। সেকেন্দরের মৃত্যুর পর হায়দরগাজী নামক তদীয় অনুচর উক্ত দেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

(২) গৌড়গোবিন্দের সৈন্যদল সম্ভবতঃ অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি লইয়া গঠিত ছিল।

শেষ-ডাকে।

(শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ)

রুদ্র তালে চল্‌বি কারা
এই গানে আজ গান মিলা
আগুন লয়ে' খেল্‌বি কারা
মরণ-দোলার দোললীলা !
কাঁটা-বনের যাত্রী কারা
হবিরে আজ মোর সাথে
ঝঞ্ঝা দেখে করিস্‌নে ভয়
বেরিয়ে আয় এই রাতে।
বজ্র বুকে ধরবি কারা
হাস্য-মুখে আনন্দে
মরে গিয়ে বাঁচবি কারা
মরা-বাঁচার এ দ্বন্দ্বে ?
ঢেউ দেখেরে ঢেউয়ের মত
পড়্‌বি কারা ঝাঁপিয়ে
দেয়াল ভেঙ্গে দল্‌বি কারা
জীর্ণতারে পা দিয়ে ?
বাঁধন-ছেঁড়া লক্ষ্মী-ছাড়া
সব-হারাদের এই দলে
ভিড়্‌বি কারা দিনের শেষে
শেষের ডাকে আয় চলে।

আর্ট ও প্রকৃতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান যেমন আর্টের কেন্দ্র, প্রকৃতি তেমনি আর্টের ভিত্তি, ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি। সেই একই কেন্দ্র হইতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ যে অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহা তো দর্শনশাস্ত্র স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া বসিয়াছে। একথা বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদসম্মত বলিলেও বলিতে পারি। ভগবানের একই মঙ্গল ইচ্ছা ফলে ফুলে একভাবে বিকশিত হইতেছে, নদীতে সাগরে আর একভাবে পরিস্ফুট হইতেছে; আবার সূর্য্যচন্দ্রে গ্রহনক্ষত্রে উহা আর এক নবীনতর আকারে প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতি যখন সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার ছাপ লইয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃতির ভিত্তিতে রচিত আর্টেরও সর্ব্বাঙ্গে মঙ্গলভাবের ছাপ যে ফেলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

কিন্তু যাঁহারা আর্টের খাতিরে আর্ট বা প্রত্যক্ষ-দ্যোতক আর্ট প্রভৃতি ধুয়ার দোহাই দেন, তাঁহারা উপরোক্ত কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন জানি যে, প্রকৃতিতে অমঙ্গলেরও তো ছাপ দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থলে অমঙ্গলকেই বা আর্টের ভিত্তি করিতে আপত্তি কি ? আপত্তি যথেষ্টই আছে। প্রকৃতিরাজ্যে আপাতত যাহা অমঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভগবৎবিধানে তাহাও অদূর ভবিষ্যতে পরিণামে মঙ্গলপ্রসূ হয় দেখা যায়। কিন্তু মানুষ আর্টের দোহাই দিয়া তাহার ভিত্তিস্বরূপে যে অমঙ্গলের ভাবকে স্থায়িত্বপ্রদানে অগ্রসর হয়েন, ভগবৎবিধানে তাহাও অবশ্য পরিণামে মঙ্গলপ্রসূ হইবেই—কিন্তু এক তো তাহা অধিকাংশস্থলেই সুদূর ভবিষ্যতে হয়; দ্বিতীয়তঃ মঙ্গল-প্রসূ হইবার পূর্ব্বে তাহা মানবসমাজের অঙ্গ অনেকটা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

নিছক্ আর্টের দোহাই যাঁহারা দেন, তাঁহারাও যখন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না—প্রকৃতির সঙ্গে আর্টের যখন একতানে ঝঙ্কার দিতেই হইবে, তখন দেখা যাক্, প্রকৃতিই বা কি ভাবে আমাদের অন্তরে আর্ট জাগাইয়া তুলেন। একজন যদি Jack the Ripperএর ন্যায় অপর কাহাকেও সুনিপুণভাবে হত্যা করে, তাহার ভিতর বধসাধনের আর্ট বা অস্ত্রাঘাতের কলাকৌশল যে কিছুমাত্র পাওয়া যাইবে না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই আর্টের ধারা এত ক্ষীণ ও নিম্নস্তরের যে, তাহাকে কেহই প্রকৃত আর্ট বলিতে পারে না এবং বলেও না। সেই অস্ত্রাঘাতের বর্ণনাও যতই কেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হউক না, তাহা প্রকৃত আর্টের পদবীতে কিছুতেই উঠিতে পারে বলিয়া মনে করি না। কোন চিত্রকর যদি বমনের ন্যক্কারজনক চিত্র সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধারণ করেন, তাহাকে নিশ্চয়ই কেহই একটা মস্ত আর্টের বস্তু, উপভোগের বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে না। এই সকল চিত্রে আর্টের ছায়া থাকিলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত আর্টের যে গৌরব বৃদ্ধি হয় না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এই সকল ঘটনার মধ্যে বাস্তবিকই আর্টের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ, এই কারণেই প্রকৃতিতে অন্যান্য মঙ্গলজনক ও জগতের উন্নতিসাধক ঘটনার তুলনায় এই সকল ঘটনা অনেক বিরল। আবার প্রকৃতির ব্যবস্থাও এমন যে, প্রকৃতি স্বয়ং ঐপ্রকার আর্টের বহির্ভূত উপভোগের অযোগ্য ঘটনাসমূহ হইতে আমাদের দূরে সরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি দেন। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই প্রকার অমঙ্গলজনক ও ঘৃণ্য ঘটনায় আমরা আর্টের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই, প্রকৃতি তাহা ইচ্ছা করেন না, সেই আর্টসন্ধানের যেন অবসরই দিতে চাহেন না। চেষ্টা করিলে মৃত্যু হইতেও যে আর্ট পাওয়া যায় না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণত মৃত্যু হইতে আর্ট বাহির করিবার অবসর দেওয়া প্রকৃতির ইচ্ছা নয় বলিয়াই মনে হয়। তাই মৃত্যুকালে দর্শকের মন অবসাদে এত অভিভূত হইয়া পড়ে; তদ্ব্যতীত, সমস্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যু মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত হয়, এবং তাহার তুলনায় প্রকৃতি জীবনের খেলা খেলিবার জন্য আমাদিগকে অনেক দীর্ঘ অবসর প্রদান করেন। যে জীবন উন্নতির অভিমুখে চলিতে চলিতে বিচিত্র ভঙ্গীতে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে সেই জীবনসম্বন্ধীয় আর্টই প্রকৃত আর্টরূপে আমাদের সম্মুখে ধারণ করা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া সেই আর্টই আমাদের বড়ই প্রাণস্পর্শী হয়।

প্রকৃতি আমাদের কল্পনাকে, আমাদের চিন্তা প্রভৃতিকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া চলিবার জন্য যে সকল বিষয় আমাদের সম্মুখে নিয়ত উন্মুক্ত রাখিয়া তাহাদের মধ্য হইতে আর্ট উপভোগের প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে সর্ব্বদাই জাগ্রত করিয়া তুলেন, তাহা হইতেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আর্টের জন্য কোন্ প্রকার বিষয় আমাদের আদর্শ গ্রহণ করা প্রকৃতির অভিপ্রেত। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ভেদ করিয়াও যখন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাকালে সুবিমল আকাশে তারাগুলি একে-একে ফুটিয়া উঠে এবং আকাশের চন্দ্রাতপকে যখন মলয়বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে ধীর-বিকম্পিত করিতে থাকে,—প্রকৃতির সেই আর্ট যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও বীভৎস অশ্লীল বিষয়ের আর্ট উপভোগ করিতে পারেন? "ভরা বাদলের" সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে পূর্ব্বদিকে বারিবিন্দুসকল যখন বিচিত্র ইন্দ্রধনু অঙ্কিত করে; বারিবিন্দুগুলি যখন আকাশে বাতাসে ঝিকিমিকি কাঁপিতে থাকে, সেই সময়ে প্রকৃতির আর্ট দেখিয়া মানবহৃদয় যে কোথায়—কোন্ সুরপুরে চলিয়া যায়, তাহা কে জানে? শরতের পৌর্ণমাসীতে চাঁদের মুখের উপর দিয়া একখণ্ড সাদা মেঘ যখন হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যায়, চাঁদেতে মেঘেতে যখন ক্রমাগত লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে, তখন সমস্ত ধরণীর বুকের ভিতরে কি এক আশ্চর্য্য পুলকই না জাগিয়া উঠে! যখন সমুদ্রের সুস্থির-তরঙ্গিত জলের ভিতর একদিকে অস্তাচলে ঢলিয়া-পড়া সান্ধ্যতপন, আর অপরদিকে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র মানবকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষা করিতে থাকে, সে আর্টের তুলনা কোথায়? সন্ধ্যাকালে পল্লী-গ্রামে ঝিঁঝিঁ পোকার মুখরিত রসনচৌকী-বাদ্য যিনি শুনিয়াছেন এবং অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ভিতর জোনাকিপোকার ঝিকিমিকি খেলা যিনি দেখিয়াছেন, প্রকৃতি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণের ভিতর নিজের অপূর্ব্ব আর্টের লীলা চিরকালের জন্য জাগাইয়া রাখিবেন।

প্রকৃতি যখন সাধারণত এই ভাবেই মানুষকে উন্নতভাবের প্রতি আকর্ষণ করিয়া, উন্নতির দিকে লইয়া গিয়া প্রতিনিয়তই নিজের উন্নত ও মঙ্গল-সাধক আর্টই শিক্ষা দিতে উদ্যুক্ত, তখন উন্নতিসাধক আর্টই যে প্রকৃত আর্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। বীভৎস, অশ্লীল প্রভৃতি বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে আমাদের ন্যক্কার আসিতে পারে, আমাদের কাম-ভাব জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃত আর্টের তত্ত্ব কিছুতেই আমাদের উপলব্ধিতে আসিতে পারে না। প্রকৃত আর্ট হইতে যে ধীর স্থির উপভোগের ভাব আসে, সে উপভোগ এবং সে শান্তি আমরা ঐ সকল ন্যক্কারজনক বা কামো-দ্দীপক বিষয় হইতে পাই না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সকল বিষয় আমাদের অন্তরে অস্বাস্থ্যের ভাব লইয়া আসে, অথবা আমা-দিগকে অমঙ্গল ও অশান্তির পথে লইয়া যায়, সেই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত আর্টের অস্তিত্ব থাকে না, আর থাকিলেও তাহা খুব নিম্নস্তরের।

উন্নতিসাধক বিষয়ের মধ্যে আর্টের সন্ধান করিবে, অথবা অবনতিসাধক বিষয়ের মধ্যে করিবে, তাহা আর্টিষ্টের বা শিল্পীর মনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। প্রকৃতিতে স্বর্গীয় দৃশ্যও আকাশে বিছানো আছে, আবার এই পৃথিবীতে বীভৎস ও অশ্লীল দৃশ্যও অনেক আছে। তাহার মধ্যে আর্টিষ্ট নিজের আর্ট প্রকাশ করিবার জন্য কোন্ দৃশ্য গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহার নিজের মনের উপরেই নির্ভর করিবে। হীরকের ক্ষেত্রে গিয়া আমি যদি হীরকের পরিবর্ত্তে কয়লাই তুলিয়া লই, অথবা একটা সামান্য স্ফটিক পাথরকেই হীরকভ্রমে তুলিয়া লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকি, তাহাতে হীরকের দোষ হইবে না, তাহাতে আমারই বুদ্ধির দোষ ধরা পড়িবে। আমি যদি ভাল জহুরি হই, তবেই আমি ভাল "জলের" হীরক বাছিয়া লইয়া তাহাই কাটিয়া ঘষিয়া তাহার "জল" বাহির করিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে পারিব। সদারঙ্গের ধ্রুপদ বা তেলেনাও গান, আবার গ্রামোফোনের "চিংড়িতে কপিতে যদি মিতে হয়" ইহাও একটা গান। কিন্তু কোন্ গান আমার ভাল লাগিবে, কোন্ গানে আমি বাহাদুরী দেখাইব, তাহা আমার প্রকৃতির উপর, আমার রসবোধের উপর সম্পূর্ণই নির্ভর করিবে। সেই প্রকার উপন্যাসে এবং সাহিত্যের অন্যান্য অনুরূপ ক্ষেত্রে তুমি ব্যভিচার লাম্পট্য প্রভৃতির ভিতরে আর্ট খুঁজিবে, ঐ সকলের ভিতর দিয়া আর্ট ব্যক্ত করিবে; অথবা যে সতীত্ব ভারতললনাকে জহরব্রত আলিঙ্গনে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, যে বীরত্ব যে ধর্ম্মপ্রাণতা প্রাচীন ভারতকে আজও জগতের নমস্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতরে আর্ট খুঁজিবে, সেই সকলের ভিতর দিয়া আর্ট ব্যক্ত করিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিবে।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ইমন-ভূপালী—দাদ্‌রা।

মানব-জনম পেলিই যদি
ফুলে ফুলে
ভরিয়ে দিয়ে চল্!
জীবন-নদী সুধায় ভরা
দুইধারে তুই
ছিটিয়ে যারে জল!
আন্‌রে আলো আন্‌রে হাসি
চল্‌রে ভুবন ভালবাসি
দুঃখ-সুখের আশীষ তাঁহার
হাসি মুখেই
বুকেই নিয়ে চল্!
কখন যে কা'র ফুরায় বেলা
সন্ধ্যা নামে আঁধার করা
করিস্‌নে ভয় আঁধারে তুই
রাত্রিও যে
তারা জলজল!
বিদায় বেলার বাজলে বাঁশী
যাস্‌রে চলে হাসি হাসি
জাগবি যেথায় ভালবাসি
বরণ করিস্
মধুর স্থল জল্!

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

(পঞ্চম অঙ্ক)

(১৮৪৪ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার অনুবৃত্তি)

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন)

ঋষিদের বলা শেষ হইয়া গেলে রাজা দুষ্মন্ত এক মহা সমস্যায় পতিত হইলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শকুন্তলার বৃত্তান্তটী তাঁহার কিছুই স্মরণ ছিল না। ঋষিরা যে কখনও মিথ্যা কথা বলিবেন না, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা। কিন্তু ঋষিবাক্য সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়াও তিনি বর্ত্তমান বিষয় অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না; কেননা তাঁহার আন্তরিক বৃত্তি ইহার বিরোধী। যে ঘটনা স্মরণ নাই তাহা কেবল ঋষিদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন? যুক্তি-যুক্ত হইলেও সত্য হইলেও মনে তাহা স্থান পায় না, ঋষিদিগের নিকট শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি তাহা করিতে পারেন না। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশম্পাত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশও হইতে পারে, ইহা তিনি জানিতেন; ঋষিবাক্য—বিশেষতঃ মহর্ষি কণ্বের বাক্য লঙ্ঘন করা

মহাপাপ, ইহাও তাঁহার জানা ছিল। এই মুহূর্ত্তে তাঁহার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া যাইতে পারে, এ চিন্তাও যে তাঁহার মনে আসে নাই তাহা নহে, কারণ উগ্রতপা ঋষিদের প্রবল তপোবলের কথা তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। অন্য দিকে দেখুন, ঋষিরা তাঁহার নিকট কি চাহিতেছেন? তাঁহারা কোন বস্তুর প্রার্থী হইয়া আসেন নাই। একটী ত্রিভুবনললামভূতা রমণীরত্নকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ না থাকিলেও মহর্ষি কণ্বের বাক্যই যথেষ্ট। তিনি সেই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে এই রমণীরত্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার মন যতক্ষণ না বিশুদ্ধ হইয়াছিল, যতক্ষণ না শকুন্তলার বৃত্তান্ত তাঁহার স্মরণপথে আসিয়াছিল, ততক্ষণ তিনি শত-সহস্র অনিষ্টপাত স্বীকার করিয়াও ঋষিবাক্যপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

রাজা ঋষিদের কথার কি উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন—"ইহা কি উপস্থিত হইল!" শকুন্তলা একথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; যেন জ্বলন্ত পাবকশিখা রাজার মুখ হইতে নির্গত হইয়া শকুন্তলার সমুদয় অঙ্গ দগ্ধ করিল। তিনি আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন—"কথাগুলি যেন অগ্নি"।

পাঠক, এইস্থানে শকুন্তলার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অমানুষিক ধৈর্য্যের পরিচয় পাইলেন, উত্তরোত্তর আরও পাইবেন। এই বাক্য শুনিবার পর তাঁহার আর থাকিল কি? অন্য ব্যক্তি হইলে এই কথা শুনিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। যদিও শকুন্তলার আপাদমস্তক নৈরাশ্যের দাবানলে দগ্ধ হইতেছিল, হৃদয়ে নানাজাতীয় ভাবের সংমিশ্রণে এক তুমুল তুফান উঠিয়াছিল, বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, শরীর অবসন্ন হইতেছিল,—তবুও কি অসাধারণ ধৈর্য্য! শকুন্তলা এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়াও দাঁড়াইয়া রহিলেন। "কথাগুলি যেন অগ্নি," এই বাক্যটী একবার উচ্চারণ ভিন্ন দ্বিতীয় উক্তি নাই; রাজার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার কিছুমাত্র হ্রাস নাই; যেন একটী বৈদ্যুতিক প্রবাহ তাঁহাকে বিষম জোরে আঘাত করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, তিনি একবার উঃ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শার্ঙ্গরবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। তেজস্বী ঋষিকুমার ধর্ম্মশাস্ত্রে নূতন শিক্ষিত। অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা, মিথ্যা অসরলতা কাহাকে বলে কখনও জানেন না, জগতের ভাল যাহা তাহাই দেখিয়াছেন—মন্দ কখনও দেখেন নাই, মন্দ কাহাকে বলে জানেন না, এই ব্যক্তির পক্ষে রাজার ঐরূপ ঔদাসীন্যযুক্ত বাক্য সহনীয় হইবে কেন?

রাজা শকুন্তলাকে ধর্ম্মশাস্ত্রমত বিবাহ করিয়াছেন। শকুন্তলা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এখন রাজার কর্ত্তব্য তাঁহাকে গ্রহণ করা। ইহাতে আবার বিচেবনা বা ইতস্ততভাব কেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না; তাই বলিয়া উঠিলেন—"এ আবার কি? লোকাচার আপনারাই ভালরূপ জানেন। পরিণীতা রমণী সতীসাধ্বী হইলেও কেবল জ্ঞাতিকুলে থাকিলেই লোকে অন্য প্রকার আশঙ্কা করে এবং সেই জন্যই রমণী স্বামীর প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক তাহার জ্ঞাতিকুল ইচ্ছা করে যে সে সর্ব্বদা স্বামীর নিকটে থাকে।"

রাজা ইতিপূর্ব্বে ঋষিবাক্যগুলির মর্ম্ম ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। বৃত্তান্ত স্মরণ না থাকিলে বুঝা সহজ নহে। এবারে কতকটা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে বিবাহও করিয়াছি?"

রাজার প্রথম বাক্যটী শকুন্তলা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। উহা অগ্নির ন্যায় তীব্রভাবে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল এবং রাজা কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন এরূপ একটা গুরুতর আশঙ্কাও হইয়াছিল; এই দ্বিতীয় বাক্যে তাঁহার সেই আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দুঃখে অভিভূতা হইলেন, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। এই গুরুতর বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন না, চঞ্চলা হইলেন না; শরীর অবসন্ন হইতে গিয়াও অবসন্ন হইতে পারিল না, নয়নাশ্রু বিগলিত হইবার উপক্রম করিয়াও অক্ষিকোটর পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ইহাকেই বলে নির্ভরভাব—আমাকে তোমাতে ডুবাইয়া দেওয়া!

শকুন্তলা এ তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়া অতি ধীরভাবে বলিলেন—

হৃদয়! তুমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলে তাহা ঠিকই করিয়াছিলে, কিছু অন্যায় কর নাই।

শার্ঙ্গরবের সে ধৈর্য্য নাই। রাজার এই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বাক্য গুরুতররূপে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। রাজোচিত সম্মানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন—পূর্ব্বে যে কার্য্যটী করা হইয়াছে সংপ্রতি তাহা প্রিয় নয় বলিয়া কি অধর্ম্মাচরণ রাজার উচিত?

শার্ঙ্গরবের এই অগ্নিময় বাক্যবাণ রাজার গায়ে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল—অঙ্গ ভেদ করিতে পারিল না। এ দেহ অনেক সহ্য করিতে পারে। সহ্য করিবার জন্যই এই দেহ।

রাজা অতি ধীরভাবে শার্ঙ্গরবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—

এরূপ একটা অসৎ কল্পনা কোথা হইতে আসিল?

রাজার অভিপ্রায় এই যে, আমি শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার ঐ কার্য্যটী অনভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, ঋষিকুমার এরূপ একটা মিথ্যা কল্পনা কেন করিতেছেন?

শার্ঙ্গরব ইহার উত্তরে কি বলিলেন? তাঁহার ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রাজা সত্য-সত্যই শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন, অথচ বলিতেছেন এ অসৎ কল্পনা কোথা হইতে আসিল? রাজা মিথ্যা কথা বলিতেছেন; অন্যায়াচরণ করিতেছেন অথচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না; এমন ভাবে বলিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। মনে যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, বাহিরে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তিকে একজন ঋষিপুত্র কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। শার্ঙ্গরব এবারে রাজসম্মানের সীমা অতিক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন—"ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিদের এরূপ চিত্তবিকৃতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে"। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি অভিমানবশতঃ অন্যায় কার্য্য করিয়াও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে।

যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, সকলের শাসন-কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে একজন ভিক্ষুকের ঐরূপ ধৃষ্টতা-পূর্ণ বাক্য সহ্য করা বড় সহজ কথা ছিল না। 'ঐশ্বর্য্যমত্ত', 'বিকারপ্রাপ্ত'—কি-ই না বলা হইল? এততেও ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ঋষির মান রক্ষা করা বড় কঠিন কথা ছিল, কিন্তু দুষ্মন্ত তাহা পারিয়াছিলেন। আজ তিনি বড় কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন তিনি সেই পরীক্ষায় কেমন সুন্দর ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঋষিপুত্রের ঐ কঠোর উক্তি শুনিয়া তিনি ধীরতাসহকারে ও অতি নম্রভাবে বলিলেন:—

"বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি"।

তাৎপর্য্য এই যে, আমার যদি কোন অপরাধ থাকে তজ্জন্য আমি যথেষ্টরূপে ভৎ‍র্সিত হইয়াছি। ঠিক যেন প্রভু ভৃত্যকে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিতেছেন এবং ভৃত্যের যখন উহা নিতান্তই অসহনীয় হইল তখন সে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল—আর কত বলিবেন যথেষ্ট বলা হইয়াছে। রাজার বাক্যটীও সেই সুরের।

ছোট হউন বড় হউন—তিনি ঋষি, সর্ব্বথা মাননীয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক; রাজার পক্ষে তাঁহার সম্মান রক্ষা করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য। ঋষি-কুমার না বুঝিয়া রাজাকে ভৎর্সনা করিতেছেন, এস্থলে রাজার ধৈর্য্যাবলম্বন নিতান্তই কর্ত্তব্য।

প্রবীণা গৌতমী দেখিলেন, রাজা সত্য-সত্যই ভুলিয়া গিয়াছেন। বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। শার্ঙ্গরব যে পথে চলিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হইবে না—কলহই হইবে; তাই তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন—মা! তুমি একটু লজ্জা সম্বরণ করিয়া থাক। আমি তোমার ঘোমটাটী খুলিয়া দেই। তোমার মুখ দেখিলে স্বামী তোমাকে চিনিবেন।

তাহাই হইল। গৌতমী প্রবীণার কার্য্যই করিলেন। পাঠক! এখন আসুন, দেখুন রাজা দুষ্মন্তের মনের ভাব কি। তাঁহার পরিণীতা পত্নী ঘোমটা খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। অতুলনীয় রূপ। ঋষিগণ বলিতেছেন, ইনি আপনার ধর্ম্মপত্নী। গৌতমী বলিতেছেন, মা! তোমার মুখ দেখিলে স্বামী তোমাকে চিনিবেন; এসব কথা কি মিথ্যা? যে মিথ্যা বলিতে আইসে সে কি কখনও মুখ দেখায়? তাহার সাহসে কি তাহা কুলায়? সে

মুখ ঢাকিবে। ঋষিকুমার, ঋষিকন্যারা কখনও কি মিথ্যা কথা কহেন? ঋষিকুলে কি মিথ্যা বঞ্চনা, ব্যভিচার এ সকল আছে? রাজা শকুন্তলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

এই অক্লিষ্টকান্তি রূপ, এইভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি কি না ঠিক করিতে না পারিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নিশান্তে অন্তরে শিশির-পরিপূর্ণ কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন ভোগও করিতে পারে না এবং উহাকে ছাড়িয়াও যাইতে পারে না আমারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

রাজা একথাগুলি মনে মনে বলিয়া বিচার করিতেছেন, কিছু বলিতে পারিতেছেন না—চুপ করিয়া আছেন। প্রতীহারী রাজার অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার কথা ভাবিতেছে আর বলিতেছে—আহা! প্রভু কি ধার্ম্মিক! এরূপ স্থলে কে এত বিচার করে?

শার্ঙ্গরব বলিলেন রাজন্! চুপচাপ রহিলেন কেন? রাজা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন—

তপোধন, ইঁহাকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি ইহা চিন্তা করিয়াও আমার স্মরণ হইতেছে না। আমি কি প্রকারে ইঁহাকে গ্রহণ করিব? ইনি অন্তঃসত্বা অবস্থায় আছেন। আমি কি পরদারগ্রাহী হইব?

রাজার এই বাক্য শকুন্তলার পক্ষে অশনি-নিপাত। ইহা শুনিয়াও যিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহার তুল্য ধৈর্য্যশালিনী আর কে আছে? সম্মুখে গুরুজন, রাজদরবার, রাজা বলিতেছেন ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। কি আশ্চর্য্য কথা! শকুন্তলা কি অনৃতবাদিনী? তিনি কি ব্যভিচারিণী? কি লজ্জার কথা! কি দুঃখের কথা! কে ইহা সহ্য করিতে পারে? অন্যে পারুক আর নাই পারুক, শকুন্তলা পারেন। এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তিনি স্থির ছিলেন। রাজার প্রতি তাঁহার যে ভক্তি তাহারও কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। রাজার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ না করিয়া, কণামাত্রও ক্ষুণ্ণ না হইয়া আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া জনান্তিকে বলিতেছেন—

আর্য্যপুত্রের পরিণয়েই সন্দেহ—আমার অন্য আশা তো এখন দূরের কথা।

শঙ্করদেব সম্বন্ধে প্রতিবাদ-পত্র।

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা-সম্পাদকমহাশয়-

সমীপেষু।

কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বিজয়-ভূষণ ঘোষ চৌধুরী সঙ্কলিত "শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। আসামে শঙ্করদেব ও তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব-প্রচারিত মহাপুরুষীয় বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী একদল লোক আছেন, যদিও তাঁহাদের সম্বল শঙ্কর-মাধবপ্রচারিত ধর্ম্মই; কিন্তু উক্ত দুই মহাপুরুষ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; এইজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবকে তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। পূর্ব্বে এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মৎপ্রণীত পুস্তক "শঙ্করদেব", "মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব" এবং "বাঁহী" নামক মাসিক পত্রের কলেবর এই সকল আলোচনায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জনকয়েক স্বদেশগৌরবাভিমানী আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালী লেখকের সহানুভূতি ও সাহায্য উপরোক্ত আসামীয়দল খুবই লাভ করেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ঘোষ-চৌধুরী মহাশয় ইঁহাদের কবলে পড়িয়াছিলেন ও তাঁহার প্রবন্ধ ইঁহদের প্রভাবরঞ্জিত। সত্যের অপলাপে সত্যের ক্ষতি হয় না; ফল—অপলাপকারীর আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঘোষ-চৌধুরী মহাশয় যে বিষয় লিখিতে যাইতেছেন, সে বিষয়টির তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপ অবগত না হইয়া যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করেন তো এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি বিস্তারিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে তাহার স্থান হইতে পারে কি না জানি না। * ইতি—

সম্বলপুর।
২৫।১১।২২

শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া।

---

* বিজয় বাবু কোন্ কোন্ যুক্তিতে ভুল করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার একটাও প্রতিবাদক মহাশয় প্রদর্শন করিলে ভাল করিতেন। আশা করি তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শক প্রবন্ধ শীঘ্রই আমাদের হস্তগত হইবে। তঃ সঃ

মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।

(ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি)

ইমন পূরবী—দাদ্‌রা।

শান্ত সন্ধ্যা এল আকাশ জুড়ে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।
প্রাণ ভরে গো ডাক তাঁরে সেই অকূলের কূলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
প্রাণের কথা যত কিছু বল তাঁরে বল খুলে
বেড়ায়ো না হেথা-হোথা মরি' বৃথা ঘুরে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
ভক্তিসিক্ত হয়ে তাঁরি দাঁড়াও চরণমূলে
গন্ধে বর্ণে ফুটুক চিত্ত প্রেমের হাওয়ায় দুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
প্রিয়তম সখা তোমার নাইকো জেনো তিলেক দূরে
দেখবে তিনি আছেন হৃদে অশ্রুজলে ধুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
এমন মধুর সন্ধ্যা বেলা—প্রেমভক্তি নানা ফুলে
চিত্ত-সাজি সাজাইয়া দাও গো তাঁরি পায়ে তুলে।
ডাকবার মত ডাক তাঁরে ব্যাকুল-করুণ স্বরে—
দেখা দেবেন প্রাণের মাঝে আপনারেও ভুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ • ১´ •
II {সা -া রা। গসা -পা পা I পা ক্ষপা ধনা। না ধপা -পক্ষা I
শা • ন্ত স• • ন্ধ্যা এ ল• •• আ কা• •শ্

১´ • ১´ • ১´
I গমা গা -া। -া সা রা I গা -রপা ক্ষপা। ক্ষা গা -া I গা রা গা।
জু ড়ে • • ম ন যা •ও রে এ বা র্ অ • ন্তঃ

• ১´ • ১´ •
। রা সা -া } I পা -া গা। পা ধা -পা I র্সা র্সাঃ নঃ। র্রা র্সা -া I
পু রে • প্রা ণ্ ভ রে গো • ডা ক • তাঁ রে •

১´ • ১´ • ১´
I র্সা -া না। ধা ধা -না I পধা না নধা। পা সা রা I গা -রপা ক্ষপা।
সে ই অ কূ লের্ • কূ•• লে• • ম ন যা •ও রে

• ১´ •
। ক্ষা গা -া I গা -রা গা। রা সা -া II
এ বা র্ অ • ন্তঃ পু রে •

১´ ০ ১´ ০ ১´
II { পা পা -পা | পা ধা -পা I র্সা র্সাঃ -নঃ | র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -না |
প্রা ণে র্ ক থা ০ য ত ০ কি ছু ০ ব ল ০

০ ১´ ০ ১´ ০
| ধা ধা -না I পা পধা -না | না ধপা -া } I র্সা র্সা -র্গর্রা | র্গা র্গা র্মা I
তাঁ রে ০ ব ল০ ০ খু লে ০ বে ড়া ০০ নো না ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I র্গা র্গর্রা -র্গা | র্রা র্সা -া I র্সা র্নর্সা র্গা | র্রা র্সা -না I ধনা ধা -া |
হে থা০ ০ হো থা ০ ম রি০ ০ রু থা ০ ঘু রে ০

০ ১´ ০ ১´ ০
| -া সা রা I গা রপা মপা | মা গা -া I গা -রা গা | রা সা -া II
০ ম ন যা ০ও রে এ বা র্ অ ০ ন্তঃ পু রে ০

১´ ১ ১´ ০ ১´
II { গা -া মা | গা -া রা I সা ধা -সা | রা গা -া I পা পাঃ পঃ |
ভ ০ক্তি সি ০ন্ধু হ য়ে ০ তাঁ রি ০ দাঁ ড়া ও

০ ১´ ০ ১´ ০
| পা পমা -পা I ধা পমা -গা | -া -া -া I র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা I
চ র০ ণ্ মূ লে০ ০ ০ ০ ০ গ ০ন্ধে ব ০ র্ণে

১´ ০ ১´ ০ ১´
I র্রা র্সা -া | না -া ধা I পা পা -না | ধা পা -মা I গমা গা -া I
ফু টু ক্ চি ০ত্ত প্রে মে র্ হা ওয়া র্ দু লে ০

০ ১´ ০ ১´ ০
| -া সা রা I গা -রপা মপা | মা গা -া I গা -রা গা | রা সা -া II
০ ম ন যা ০ও রে এ বা র্ অ ০ ন্তঃ পু রে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I { পা গা -া | পা ধা -পা I র্সা র্সাঃ -নঃ | র্রা র্সা -া I র্সা -া না |
প্রি য় ০ ত ম ০ স খা ০ তো মা র্ না ই ক

০ ১´ ০ ১´ ০
| ধা ধা -না I পা পধা -না | না ধপা -া } I র্সা র্গা র্রা | র্গা র্গা র্মা I
জে নো ০ ভি লে০ ক্ দূ রে ০ দে খ্ বে তি নি ০

I র্গা র্গর্রা র্গা । র্রা র্সা -া I র্সর্সা -র্গা র্রা । র্সা র্সা -না I ধনা ধা -া ।
আ ছে০ ন্ হৃ দে ০ অ০ ০ শ্রু জ লে ০ ধু লে ০

। -া সা রা I গা -রপা ক্ষপা । জ্ঞা গা -া I গা -রা গা । রা গা -া II
০ ম ন্ যা ০ও রে এ বা র্ অ ০ ন্তঃ পু রে ০

II { গা গা -মা । গা রা -া । সা -ধ্া সা । রা গা -া I গা -পা পা । পা -জ্ঞা পা I
এ ম ন্ ম ধু র্ স ০ জ্জা বে না ০ প্রে ০ ম ভ ০ ক্তি

I পা পা -জ্ঞা । ধা পা -জ্ঞা I গা -া -া । -া -া -া I গা -া জ্ঞা । ধা পা -জ্ঞা I
না না ০ ফু লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ চি ০ত্ত সা জি ০

I গা গা -মা । গা রা -া I সা -া ধ্া । সা সা -রা I সা সা -রা । রা গা -া I -া -া -া ।
সা জা ০ ই য়া ০ দা ও গো তাঁ রি ০ পা য়ে ০ তু লে ০ ০ ০ ০

। -া -া -া } I { পা -া গা । পা ধা -পা I র্সা র্সাঃ -নঃ । র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -না ।
০ ০ ০ ডা ক্ বার ম ত ০ ডা ক ০ তাঁ রে ০ ব্যা কু ল্

। ধা ধা না I পধা -না নধা । -পা -া -া } I র্সা র্সা -র্গর্রা । র্গা র্গা -র্মা I
ক রু ণ্ সু০ ০রে০ ০ ০ ০ দে খা ০০ দে বে ন্

I র্গা র্গর্রা -র্গা । র্রা র্সা -া I র্সা র্সর্সা -র্গা । র্রা র্সাঃ -নঃ I ধনা ধা -া ।
প্রা ণে০ র্ মা ঝে ০ আ প০ ০ না রেও ০ তু লে ০

। -া সা রা I গা -রপা ক্ষপা । জ্ঞা গা -া I গা -রা গা । রা সা -া II II
০ ম ন যা ০ও রে এ বা র্ অ ০ ন্তঃ পু রে ০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(লোকমান্য ৺ বালগঙ্গাধর টিলকের টিপ্পনীর
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদ)

[এই পর্য্যন্ত তো সিদ্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা না থাকিলেও লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরেও কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত; কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া তিনি সমবুদ্ধিতে এইজন্য করিবেন যে, সেগুলি বন্ধক হইবে না, ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলে এবং কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা ইহা অধিক শ্রেয়স্কর। তথাপি এইটুকু হইতেই কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন সমাপ্ত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়েই ভগবান অর্জ্জুনকে কামক্রোধ প্রভৃতির বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, এই শত্রু মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ে, মনে ও বুদ্ধিতে বাসা বাঁধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ধ্বংসসাধন করে (৩. ৪০); অতএব তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা ইহাকে প্রথমে জয় কর। এই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই দুই প্রশ্ন খোলসা করা আবশ্যক ছিল যে, (১) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিবে, এবং (২) জ্ঞানবিজ্ঞান কাহাকে বলে; কিন্তু মধ্যেই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইয়াছে যে, কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্ মার্গ বেশী ভাল; আবার এই দুই মার্গের যথাসম্ভব একবাক্যতা করিয়া ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ কর্ম্মযোগেও উক্ত অনাসক্ত বা ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই সকলের নিরূপণ আরম্ভ করা হইল। তথাপি মনে থাকে যেন, এই নিরূপণও কোন স্বতন্ত্র প্রণালীতে পাতঞ্জল যোগের উপদেশ করিবার জন্য করা হয় নাই। এবং এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দৃষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহই প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তিকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী জানিতে হইবে—কর্ম্মত্যাগীকে নহে (৫. ৩) ইত্যাদি।]

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

(১) কর্ম্মফলের আশ্রয় না করিয়া (অর্থাৎ মনে ফলাশা থাকিতে না দিয়া) যিনি (শাস্ত্রানুসারে নিজের বিহিত) কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই কর্ম্মযোগী। নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগী অথবা অক্রিয় অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম না করিয়া উপবিষ্ট (প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী) নহে। (২) হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই (কর্ম্ম-) যোগ জানিও। কারণ সংকল্প অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরূপ ফলাশার সন্ন্যাস (ত্যাগ) করা ব্যতীত কেহই (কর্ম্ম-) যোগী হয় না।

[পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে যে, "একং সাংখ্যঞ্চ যোগং চ" (৫. ৫) বা "যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না" (৫. ৬), অথবা জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" (৫. ৩), উহারই ইহা অনুবাদ এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২) সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে অগ্নিহোত্র রাখিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হয়; কিন্তু যে সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া গিয়া থাকিবে, তাহার জন্য মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, উহার এইপ্রকার অগ্নি রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে সে 'নিরগ্নি' হইয়া যায় এবং অরণ্যে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিবে—জগতের ব্যবহারে পড়িবে না (মনু ৬. ২৫ ইত্যাদি)। প্রথম শ্লোকে মনুর এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইহার উপর ভগবানের উক্তি এই যে, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে। কাম্যবুদ্ধি বা ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস বুদ্ধিতে; অগ্নিত্যাগ অথবা কর্ম্মত্যাগের বাহ্য ক্রিয়াতে নহে। অতএব ফলাশা অথবা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলা উচিত। গীতার এই সিদ্ধান্ত স্মৃতিকারদিগের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক। গীতারহস্যের ১১ম প্রকরণে (পৃ. ৩৪৯-৩৫২) স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গীতা স্মৃতিমার্গে ইহার সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিয়াছেন। এইপ্রকারে প্রকৃত সন্ন্যাস ব্যাখ্যা করিয়া এখন বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা, এবং জ্ঞানোত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাতে ফলাশা ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি।]

§§ আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥

(৩) (কর্ম্ম-) যোগারূঢ় হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্ম্মকে (শমের) কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন; এবং সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণ যোগী হইয়া গেলে তাঁহার পক্ষে (পরে) শম (কর্ম্মের) কারণ হয়।

[টীকাকারেরা এই শ্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়া

দিয়াছেন। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যোগ=কর্ম্মযোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য যে উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্ম্মই কারণ হয়। কিন্তু "যোগারূঢ় হইবার পর উহারই জন্য শম কারণ হইয়া যায়" ইহার অর্থ টীকাকারেরা সন্ন্যাসমূলক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এস্থলে "শম"=কর্ম্মের 'উপশম'; এবং যাঁহার যোগ সিদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত! কারণ তাঁহাদের মতে কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের অঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্বসাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, ইহা ঠিক নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ভগবান বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' যে ব্যক্তি করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ়—কর্ম্ম যিনি না করেন (অক্রিয়), তিনি প্রকৃত যোগী নহেন; তখন ইহা স্বীকার করা সর্ব্বথা অন্যায় যে, তৃতীয় শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তিকে কর্ম্মের শম করিবার জন্য বা কর্ম্ম ছাড়িবার জন্য ভগবান বলিবেন। শান্তিলাভের পর যোগারূঢ় পুরুষ কর্ম্ম করিবে না, সন্ন্যাসমার্গের এই মত হউক ভালই, কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীতার অনেকস্থলে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগী সিদ্ধাবস্থাতেও যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিতে থাকিবে (গী. ২.৭১; ৩. ৭ ও ১৯; ৪. ১৯-২১; ৫. ৭-১২; ১২. ১২; ১৮. ৫৬-৫৭; এবং গীতার. প্র ১১ ও ১২)। (২) দ্বিতীয় কারণ এই যে, 'শম' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মের শম' কোথা হইতে আসিল? ভগবদ্গীতাতে 'শম' শব্দ দুই চারিবার আসিয়াছে (গী. ১০. ৪; ১৮. ৪২), সেস্থলে এবং ব্যবহারেও উহার অর্থ 'মনের শান্তি'। তবে এই শ্লোকেই 'কর্ম্মের শান্তি' অর্থ কেন লইবে? এই সমস্যা দূর করিবার জন্য গীতার পৈশাচ ভাষ্যে 'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব' ইহার 'তস্যৈব' এই দর্শক-সর্ব্বনামের সম্বন্ধ 'যোগারূঢ়স্য' শব্দের সহিত না লাগাইয়া 'তস্য'কে নপুংসক লিঙ্গের ষষ্ঠী বিভক্তি স্থির করিয়া অর্থ করিয়াছে যে "তস্যৈব কর্ম্মণঃ শমঃ" (তস্য অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধের কর্ম্মের শম)! কিন্তু এই অন্বয়ও সরল নহে। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যোগাভ্যাসকারী যে পুরুষের বর্ণন এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে করা হইয়াছে, তাঁহার যে অবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর, হয় তাহা বলিবার জন্য উত্তরার্দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব 'তস্যৈব' পদ হইতে 'কর্ম্মণঃ এব' এই অর্থ লওয়া যাইতে পারে না; অথবা যদি লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 'শমঃ'র সহিত না জুড়িয়া "কারণমুচ্যতে"র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বয় লাগে, "শমঃ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ কারণমুচ্যতে", এবং গীতার সম্পূর্ণ উপদেশ অনুসারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগিবে যে, "এখন যোগারূঢ়ের কর্ম্মেরই শম কারণ হইতেছে"। (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাজ্য বলিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ় পুরুষের কিছুই করিবার আবশ্যকতা থাকে না; উহার সকল কর্ম্মের শেষ শমেতেই হয়; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'যোগারূঢ়ের শম কারণ হয়' এই বাক্যের 'কারণ' শব্দ সম্পূর্ণই নিরর্থক হইয়া যায়। 'কারণ' শব্দ সর্ব্বদাই সাপেক্ষ। 'কারণ' বলিলে উহার কোন-না-কোন 'কার্য্য' অবশ্য থাকিবে, এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ়ের তো কোনই 'কার্য্য' বাকী থাকে না। যদি শমকে মোক্ষের 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বল, তবে তাহা খাপ খাইবে না। কারণ মোক্ষের সাধন জ্ঞান, শম নহে। আচ্ছা, শমকে জ্ঞানপ্রাপ্তির 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বলিবে, তবে এই বর্ণনা যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণাবস্থাতে উপনীত পুরুষেরই, এই জন্য তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্তি তো কর্ম্মের সাধনের পূর্ব্বেই হইয়া যায়। তবে এই শম কাহারই বা 'কারণ'? সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্নের কোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু উহাদিগের এই অর্থ ছাড়িয়া বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্দ্ধের অর্থ করণে পূর্ব্বার্দ্ধের 'কর্ম্ম' পদ সান্নিধ্য-সামর্থ্য-বলে সহজেই মনে আসে; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগারূঢ় পুরুষের লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম করিবার জন্য এক্ষণে 'শম' 'কারণ' বা সাধন হয়, কারণ যদিও তাঁহার কোন স্বার্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যায় নাই, তথাপি লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম কাহারও দূর হইতে পারে না (গী. ৩. ১৭-১৯)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই যে বচন আছে যে, "যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং" (গী. ৫. ১২)—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া যোগী পূর্ণ শান্তি লাভ করেন—ইহা হইতেও এই অর্থই সিদ্ধ হইতেছে। কারণ উহাতে শান্তির সম্বন্ধ কর্ম্মযোগে যুক্ত না করিয়া কেবল ফলাশাত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে; সেস্থলেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যোগী যে কর্ম্মসন্ন্যাস করিবে তাহা 'মনসা' অর্থাৎ মনের দ্বারা করিবে (গী. ৫. ১৩) শরীরের দ্বারা বা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার কর্ম্ম করাই চাই। আমার এই মত যে, অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যোন্যালঙ্কারের সদৃশ অর্থ-চমৎকার বা সৌরস্য এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বার্দ্ধে 'শম'এর কারণ কর্ম্ম কখন্ হয় তাহা বলিয়া উত্তরার্দ্ধে ইহার বিপরীতে বর্ণিত হইয়াছে যে 'কর্ম্মের' কারণ 'শম' কখন্ হয়। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম

। সাধনাবস্থাতে 'কর্ম্ম'ই শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির কারণ। । ভাব এই যে, যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই । চিত্ত শান্ত হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগসিদ্ধি হয়। । কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থাতে পৌঁছিলে পর । কর্ম্ম ও শমের উক্ত কার্য্যকারণভাব বদলাইয়া যায় অর্থাৎ । কর্ম্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু শমই কর্ম্মের কারণ হইয়া । যায়, অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে । কর্ত্তব্য বুঝিয়া, ফলের আশা না রাখিয়া, শান্তচিত্তে । করিয়া যান। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা । নহে যে, সিদ্ধাবস্থাতে কর্ম্ম দূর হয়; গীতার কথা এই । যে, সাধনাবস্থাতে 'কর্ম্ম' ও 'শম' দুয়ের মধ্যে যে কার্য্য- । কারণভাব হয়, কেবল তাহাই সিদ্ধাবস্থাতে বদলাইয়া । যায় (গীতা র. পৃ. ৩২৫, ৩২৬)। গীতার কোথাও । উক্ত হয় নাই যে, কর্ম্মযোগীর শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে । হইবে, এবং এরূপ বলিবার উদ্দেশও নাই। অতএব । অবসর পাইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোনও । শ্লোকেরই সন্ন্যাসমূলক অর্থ লাগানো উচিত নহে। । আজকাল গীতা অনেকের দুর্ব্বোধ্য হইয়া গিয়াছে, । তাহার কারণও ইহাই। পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যাতে । এই অর্থই ব্যক্ত হয় যে, যোগারূঢ় পুরুষের কর্ম্ম করা । উচিত। সেই শ্লোক এই—]

(৪) কারণ যখন তিনি ইন্দ্রিয়সমূহের (শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়ে এবং কর্ম্মে আসক্ত হন না এবং সমস্ত সঙ্কল্প অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরূপ ফলাশার (প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নহে) সন্ন্যাস করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

। [বলিতে পারা যায় যে, এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের । সঙ্গে এবং প্রথম তিন শ্লোকের সঙ্গেও মিলিয়া গিয়াছে, । ইহা হইতে গীতার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট দেখা যায় যে, । যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলাশা । বা কাম্যবুদ্ধি ছাড়িয়া শান্তচিত্তে নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত। । 'সংকল্পের সন্ন্যাস' এই শব্দ উপরে দ্বিতীয় শ্লোকে । আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে উহাই এই । শ্লোকেও লইতে হইবে। কর্ম্মযোগেই ফলাশাত্যাগ- । রূপ সন্ন্যাসের সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম- । কর্ত্তা পুরুষকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ় । বলা উচিত। এখন ইহা বলিতেছেন যে, এই প্রকার । নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ফলাশাসন্ন্যাসের সিদ্ধি লাভ করা । প্রত্যেক মনুষ্যের অধিকারে আছে। যে স্বয়ং প্রযত্ন । করিবে তাহারই ইহা লাভ করা কিছু অসম্ভব নহে—]

§§ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬॥

(৫) (মনুষ্য) নিজের উদ্ধার নিজেই করিবে। নিজে নিজেকে (কখনও) পড়িতে দিবে না। কারণ (প্রত্যেক মনুষ্য) স্বয়ংই নিজের বন্ধু (অর্থাৎ সহায়), বা স্বয়ং নিজের শত্রু। (৬) যে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে স্বয়ং নিজের বন্ধু; কিন্তু যে নিজে নিজেকে জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে শত্রুর ন্যায় বৈরতা সাধন করে।

। [এই দুই শ্লোকে আত্ম-স্বতন্ত্রতা বর্ণিত হইয়াছে । এবং এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রত্যেককে । নিজের উদ্ধার নিজেরই করা উচিত; এবং প্রকৃতি যতই । বলবান হউক না কেন, উহাকে জয় করিয়া আত্মোন্নতি । করা প্রত্যেকের স্বায়ত্ত (গীতার পৃ ২৭৭-২৮৪)। । মনে এই তত্ত্ব ভালরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্যই এক- । বার অন্বয়ভাবে আর একবার ব্যতিরেকভাবে—দুই । রীতিতে—বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা নিজেরই বন্ধু কখন্ । হয় এবং আত্মা নিজের শত্রু কখন্ হয়, এবং এই তত্ত্বই । আবার ১৩. ২৮ শ্লোকেও আসিয়াছে। সংস্কৃতে 'আত্মা' । শব্দের এই তিন অর্থ হয় (১) অন্তরাত্মা, (২) আমি । স্বয়ং, এবং (৩) অন্তঃকরণ বা মন। এই কারণে এই । আত্মা শব্দ ইহাতে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অনেকবার । আসিয়াছে। এখন বলিতেছেন যে আত্মাকে নিজের । অধীন রাখিলে কি ফল হয়—]

§§ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯॥

(৭) যিনি নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছেন, এবং যিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার 'পরমাত্মা' শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে।

। [এই শ্লোকে 'পরমাত্মা' শব্দ আত্মার জন্যই প্রযুক্ত। । দেহের আত্মা সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের উপাধিতে মগ্ন । থাকে; কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা উপাধিসকলকে জয় । করিলে এই আত্মাই প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মরূপ বা পর- । মেশ্বর রূপ হইয়া যায়। পরমাত্মা কিছু আত্মা হইতে । বিভিন্ন-স্বরূপ পদার্থ নহেন, পরে গীতাতেই (গী: । ১৩. ২২ ও ৩১) উক্ত হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত । আত্মাই তত্ত্বত পরমাত্মা। মহাভারতেও বর্ণিত । হইয়াছে—

। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
। তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

"প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে (সুখ-দুঃখ প্রভৃতির বিকারে) বদ্ধ থাকিবার কারণে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাত্মা বলে; এবং এই গুণ হইতে মুক্ত হইলে উহাই পরমাত্মা হইয়া যায়" (মভা. শা. ১৮৭. ২৪)। গীতারহস্যের ৯ম প্রকরণ হইতে জানা যাইবে যে, অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তও ইহাই। যিনি বলেন যে, গীতাতে অদ্বৈতমত প্রতিপাদিত হয় নাই, বিশিষ্টা-দ্বৈত বা শুদ্ধ দ্বৈতই গীতার গ্রাহ্য, তিনি 'পরমাত্মা'কে এক পদ না মানিয়া 'পরং' এবং 'আত্মা' এইরূপ দুই করিয়া 'পরং'কে 'সমাহিতঃ'র ক্রিয়াবিশেষণ মনে করেন! এই অর্থ ক্লিষ্ট; কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনো করেন।

(৮) যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়, যিনি নিজের ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়াছেন, যিনি কূটস্থ অর্থাৎ মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং মাটি, পাথর ও সোনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকেন, সেই (কর্ম্ম) যোগীকেই 'যুক্ত' অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত বলে। (৯) সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের যোগ্য, বান্ধব, সাধু ও দুষ্ট লোকের বিষয়েও যাঁহার বুদ্ধি সম হইয়া গিয়াছে, সেই (পুরুষ)ই বিশেষ যোগ্য।

[প্রত্যুপকারের ইচ্ছা না রাখিয়া সাহায্যকারী স্নেহশীল ব্যক্তিকে সুহৃৎ বলে; যখন দুই দল হইয়া যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে না চায় তাহাকে উদাসীন বলে; দুই দলের ভাল যে চায় তাকে মধ্যস্থ বলে; এবং সম্বন্ধীকে বন্ধু বলে। টীকাকারেরা এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ হইতে কিছু ভিন্ন অর্থও করা যাইতে পারে। কারণ এই শব্দগুলির প্রয়োগ প্রত্যেকেতে কিছু ভিন্ন অর্থ দেখাইবার জন্যই করা হয় নাই, কিন্তু অনেক শব্দের এই যোজনা কেবল এইজন্য করা হইয়াছে যাহাতে সকলগুলি একত্র করিয়া একটা ব্যাপক অর্থ বোধ হয়—উহাতে কোনও ন্যূনতা না থাকিতে পায়। এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যোগী যোগারূঢ় বা যুক্ত কাহাকে বলে (গী. ২. ৬১; ৪. ১৮ ও ৫. ২৩)। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কর্ম্মযোগের সিদ্ধিলাভ বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র; তাহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত সাধন নিরূপণ করিতেছেন—]

§§ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭॥

(১০) যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ও আত্মাকে সংযত করিবে, কোন বিষয়ের কামা বাসনা না রাখিয়া, পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ ছাড়িয়া নিরন্তর নিজের যোগাভ্যাসে রত থাকিবে।

[পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, এস্থলে 'যুঞ্জীত' পদে পাতঞ্জলসূত্রের যোগ বিবক্ষিত। তথাপি ইহার এই অর্থ নহে যে, কর্ম্মযোগপ্রাপ্তির অভিলাষী পুরুষ নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জল যোগে অতিবাহিত করিবে। কর্ম্মযোগের জন্য আবশ্যক সাম্যবুদ্ধি লাভ করিবার সাধনরূপে পাতঞ্জলযোগ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এইটুকুরই জন্য একান্তবাসও আবশ্যক। প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে ইহা সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্জলযোগে সমাধি একই জন্মে সিদ্ধ হইবে। এই অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির সমাধি সিদ্ধ হয় নাই, সে ব্যক্তি নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগেই কাটাইয়া দিবে না; কিন্তু যতদূর সম্ভব ততটা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে থাকিবে, ইহা দ্বারাই অনেক জন্মে তাহার শেষে সিদ্ধি-লাভ হইবে। গীতা র পৃঃ ২৮৫-২৮৭ দেখ।]

কুড়ানো গান।

দিন ফুরালো সময়ে চল
ইহকাল পরকাল হারায়ো না।
শরীর মাঝারে জীবন-বিহঙ্গ
চিরদিন বসে কভু থাকবে না।
পিতামাতা সহোদর দারাসুত পরিবার
আপনে আপন মিছে ভেবো না।
একাকী এসেছ একা যেতে হবে
কেউ তো সঙ্গে যাবে না।

জপতপ কর কি—মরণে হুঁসিয়ার
যমদূতবন্ধন তাড়না
কেশে ধরে লয়ে যাবে
মিনতি কাহিনী শুনবে না ॥

(পঞ্চানন ক্ষেপা রচিত)

কবে যেতে হবে এ সব ফেলে
হরি বলে কাল কাটাও মন হেসেখেলে,
তোমার কোথা রবে কোঠা কোথা রবে বেটা
রবির বেটা যখন ধরবে চুলে,
তখন ভাই বন্ধু সুত যত অনুগত
চাঁদমুখে দেবে আগুন
তোমার কোথা রবে দেহ দারাপুত্র-স্নেহ
কেহ না ডাকিবে আপন বলে ;
তখন বিদায় করে মড়া দেবে গোময়-ছড়া
বলবে ছোঁড়া মল' অল্পকালে,
তোমার কোথায় রবে ধন এ রূপ যৌবন
প্রাণপ্রিয় তোমার মরণকালে,
ও তাই কহে পঞ্চানন ওরে অবোধ মন
কেন আছ আসল তত্ত্ব ভুলে।

(মহেন্দ্র ক্ষেপা রচিত)

ভৈরবী।

আমার মন কররে কেন মিছে ভাবনা
মরণকালে সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চেটা বিছানা
গয়া যাও আর কাশী যাও
মথুরাতে পাবি না—
দেখ তোর হৃদ্‌মাঝারে বিরাজ করে
তারেও চিনতে পার না
একতারেতে তার মিশায়ে
তারেও কেন ডাক না
পাঁচ তারেতে তার মিশালে
হরির দর্শন পাবে না ;
যারে বল আপন আপন
সঙ্গেতে কেহ যাবে না
মরণকালে তোমাকে কেউ
এক গণ্ডুষ জল দিবে না ॥

ধর্ম্মসমাজের আদর্শ।

(পরলোকগত ডব্লিউ, টি, স্টীড্).

অভিব্যক্তির নিয়ম ভগবানের ইচ্ছার ব্যক্ত আকারে প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নিয়ম জড় পদার্থকে মানবে দাঁড় করায় এবং মানবকে ভগবানের নিকট উপনীত করে। প্রকৃতির এই মহান কার্য্যে আমরা সকলেই সহকর্ম্মী ; আমরা সকলেই বরিষ্ঠ অংশীদারের সহিত কনিষ্ঠ অংশীদার।

উন্নতির অর্থই হইল আত্মবলি। বিনা আত্মবলি উন্নতি হইতেই পারে না। আত্মবলির মূলমন্ত্র হইল প্রেম। মাতার আত্মভোলা প্রেম ব্যতীত এই ধরণীতে প্রাণের অস্তিত্বই থাকিত না। মাতৃত্বেই ভগবানের প্রকৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরিব্যক্ত হয়।

ঈশ্বর হইলেন প্রেমের নিষ্কর্ষ—রসস্বরূপ।

প্রেম হইল দ্রবীভূত ঈশ্বর (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের আকারেই প্রকৃতিতে ব্যক্ত হন)। আমরা যতই প্রেমের সাধনা করিব, আমরা ততই ঈশ্বরে অবস্থিতি করিব এবং ঈশ্বরও ততই আমাদের অন্তরে প্রকাশ পাইবেন। আমরা যতই প্রেমের সাধনা হইতে দূরে থাকিব, ততই আমরা কি ইহলোকে, কি পরলোকে, ঈশ্বর হইতেও দূরে পড়িয়া থাকিব।

সকল ধর্ম্মের মতে, সকল দর্শনের মতে ধর্ম্মসমাজের আদর্শ একই। পাপতাপে প্রপীড়িত যাহারা, তাহাদের সেবায় যাঁহারা প্রেমের সাধনা করেন, তাঁহাদের সাহচর্য্যই সেই আদর্শ। *

গ্রন্থপরিচয়।

চন্দ্রহাস—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

'চন্দ্রহাস' পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত একখানি বালপাঠ্য গল্প পুস্তিকা। ইহার লেখকও স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র মাত্র। কিন্তু আমরা ইহার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলাম, আমাদের এই বালক-গ্রন্থকারের ভাষার উপর বেশ অধিকার আছে এবং রচনাকৌশলও অতি সুন্দর। শুধু যে বালসুলভ ভাবের আবেগে শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া রচনা করা হইয়াছে, তাহা নহে ; আগাগোড়া অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সাধু ভাষায় রচিত, অথচ বেশ প্রাঞ্জল। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-কথা—সান্য প্রেস হইতে প্রকাশিত ; মূল্য ১৷০ টাকা।

আমরা স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের জীবন-কথা একখণ্ড উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্তজায়া উক্ত গ্রন্থের লেখিকা ও প্রকা-

---

* "হেগনগর হইতে মন্তব্য" নবেম্বর ১৯০৭।

শিকা। এমনই সুনিপুণ ভাবে পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে যে উহা একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ মহোদয়গণের সঙ্গে তিনি একই দিনে কেশব বাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং আজীবন ধরিয়া দত্ত-মহাশয় সে ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পালন সত্যসত্যই অনুকরণীয়। পরিণত বয়সে তাঁহার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যোগ ঘনীভূত হইয়াছিল। ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ভবানীপুরের আবাস-নিকেতনেই ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিনি অনেক দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় তাঁহার চিন্তাশীলতা-পূর্ণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি হইতে দত্তজায়া শ্রীমতী হরসুন্দরীর যেটুকু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে আদর্শ পত্নী ও আদর্শ গৃহিণী না বলিয়া থাকা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের উপরে দত্ত-মহাশয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। প্রায় ৯ বৎসর হইতে চলিল ১৮৩৫ শকের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রাতে তিনি শ্রদ্ধেয় বিহারিলাল সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেহালার স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত। পূর্ব্ব হইতেই বেচারাম বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। সে দিন সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছিল। তাঁহাদের অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনাথ বাবু বলিলেন—"বাল্যকাল হইতে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া আসিতেছি, এবং বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনেকবার পাঠ করিয়াছি, অথচ বেহালা ব্রাহ্মসমাজ দেখি নাই। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হইল তাই দুই বন্ধুতে চলিয়া আসিলাম—বেহালা ব্রাহ্মসমাজ দেখিয়া যাইব"। বেচারাম বাবুর পুত্রেরা বিস্মিত হইয়া সানন্দে তাঁহাদিগকে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ দেখাইয়া আনিলেন। তাঁহারাও সন্তুষ্টচিত্তে বেলা ১০টার পরে বিদায় লইয়া ভবানীপুরে চলিয়া গেলেন। ইহা হইতে তাঁহার নিষ্ঠার কতক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শোক-সংবাদ।

শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্গচন্দ্র রায়—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু সুপ্রাচীন বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে এতই শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মমত এতই প্রগাঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন যে, কেশব বাবু তাঁহাকে "অনুসরণ" এই আখ্যা প্রদান করেন। তিনি কেশব বাবুর আদর্শ লইয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার মত একজন নিষ্ঠাবান একনিষ্ঠ ভক্তকে হারাইয়া আমরা সত্যসত্যই ব্যথিত হইয়াছি। পরমাত্মা তাঁহাকে আপনার শীতল ছায়ায় আনিয়া তাঁহার চিরশান্তি বিধান করুন।

ত্রিনবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষি-দেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
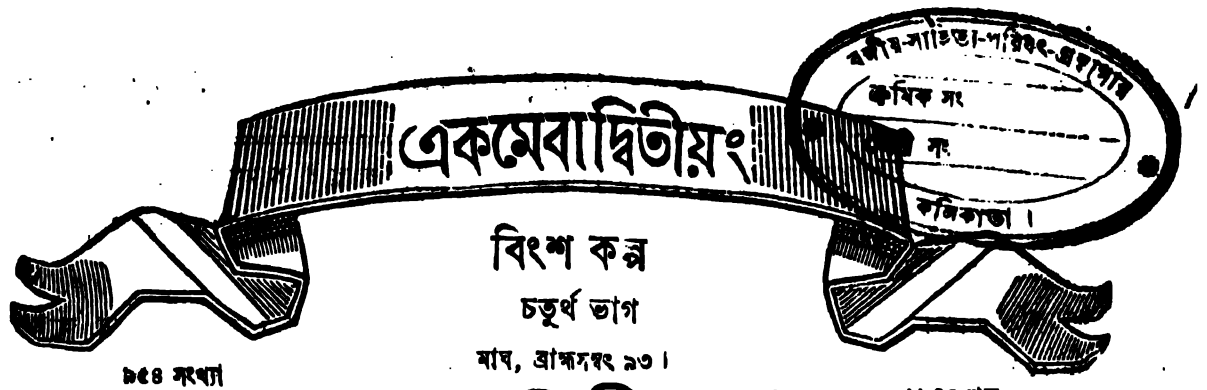
সম্পাদক।

বিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩।
৯৫৪ সংখ্যা
১৮৪৪ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রহ্মবিদ্যা সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। যে ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা-ভূমি; যে পরব্রহ্মের জ্ঞান সকল জ্ঞানের মূল পত্তনভূমি; যাঁহাকে জানিলে সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়, সেই পরব্রহ্মের উপাসনাকালে অন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রকৃতই ধারণ করিয়া থাকিলে, বিশ্বাধিপতি আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রকৃতই হৃদয়সিংহাসনে বসাইলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিতেই হইবে—ব্রহ্মোপাসক কিছুতেই জনসাধারণের পশ্চাতে নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকিতে পারেন না। যে ব্রহ্মোপাসক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না, আমরা নিঃসংশয়ে বলিব যে, আজও তিনি ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্তরে উপলব্ধি করেন নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আজও অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে, তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিলে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার অবসর কোথায়? সেই বিশ্বপতি পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক নিশ্বসিত এই প্রকৃতিই যে স্বতই সেই সাধককে জোর করিয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখর-ভূমির অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতেছে—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, নিরবয়ব, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দময়, অমৃতময়, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপ উদারতম ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকৃতই অন্তরে গ্রহণ করিলে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কেন অবশ্যম্ভাবী। যে পরমাত্মা সমস্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যে পরমাত্মা আবার আমাদের অন্তরাত্মারও অন্তরাত্মা; আবার যে পরমাত্মা বিশ্বজগতের সমস্ত উন্নতির মূল নিয়ন্তা; যাঁহার অনুশাসন একটী নিমেষও অতিক্রম করিতে পারে না, সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করিলে আমাদের আত্মাতে যে বল আসিবে, উন্নতির যে বন্যা প্রবাহিত হইবে, তাহার তুলনা কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্ম পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সেই অবিচ্ছেদ্য যোগের বিষয়ই শিক্ষা দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলের সহিত ঘোষণা করেন যে, আত্মা নিরাশ্রয় নহে—পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; আত্মা শূন্যে নাই, পরমাত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে; পরমাত্মাই আত্মার পত্তনভূমি; পরমাত্মা ও আত্মার মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই।

পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগের কথা বলিলাম —কিন্তু আত্মা কি? আমরা প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ আত্মাকে অল্পাধিক পরিমাণে জানিবার অধিকার রাখি। কাজেই তাহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে হয় না; আর আবশ্যক হইলেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। এই যে স্থূল শরীরকে আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহারই কি যথার্থ পরিচয় আমরা দিতে পারি? আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, শরীরের কোন্ অঙ্গের সাহায্যে কোন্ কাজ করিতে পারি। নিতান্ত পক্ষে না হয় আমরা এটুকুও বলিতে পারি যে, আমাদের শরীরটা কোন্ কোন্ উপকরণের সাহায্যে সংগঠিত। কিন্তু তাহা দ্বারা শরীরের প্রকৃত পরিচয় কিছুই দেওয়া হইল না। ভগবানের বিধানই দেখি যে, তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুরই প্রকৃত স্বরূপ-পরিচয় আমরা পাইতে পারি না।

আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, তাহারও যথার্থ পরিচয় যেমন আমরা পাই না, সেইরূপ আমরা যাহাকে মন বলি—যে মনের সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি, আবার যে মন সময়ে সময়ে প্রবৃত্তির বশে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়ায় —সেই মনেরও স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। মনেরই স্বরূপ যখন আমরা জানিতে না পারিলাম, তখন সেই মনেরও নিয়ন্তা আত্মা বলিয়া যে পদার্থ আমাদের অন্তরে আছে—যে অনেক সময় মনকে, এবং মনের ভিতর দিয়া শরীরকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সুপথে পরিচালিত করে—সেই আত্মারও প্রকৃত স্বরূপ জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? কার্য্যের দ্বারাই যেমন শরীরের পরিচয় পাই, কার্য্যের দ্বারাই সেইরূপ মনেরও পরিচয় পাই, আবার কার্য্যের দ্বারাই সেইরূপ আত্মারও পরিচয় পাই। প্রত্যক্ষদর্শী ঋষিরাও এই কার্য্যের ভিতর দিয়াই আত্মার পরিচয় দিয়াছেন—"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ"—এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বোধ করে এবং কর্ম্ম করে। "বিজ্ঞানাত্মা" বিশেষণ দেওয়াতে ঋষিপ্রোক্ত মন্ত্রের এই ভাবই সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আত্মা স্থূলভাবে ঐ সকল কার্য্য করে না, কিন্তু ঐ আত্মাই আমাদের শরীর ও মনের সকল কার্য্যই জানে এবং আমাদের সকল কার্য্যেরই নিয়ামক।

এই প্রকারে আমি যেমন জানি যে আমার আত্মা আছে—যাহা দেখি, শুনি, তাহার দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া আমার আত্মাকে আমি যেমন খুব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, তেমনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করি যে, অন্য সকল মনুষ্যেরও আত্মা আছে, কারণ তাহাদিগকেও আমি আমারই মত দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে, স্পর্শ করিতে, বোধ করিতে এবং কর্ম্ম করিতে দেখি।

আবার, আমাদের শরীরকে যেমন আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বভাবতই জানিতে পারি, সেইরূপ আমরা ইহাও সহজেই উপলব্ধি করি যে, আমাদের সকলেরই আত্মা শূন্যে শূন্যে ঝুলিয়া নাই, কিন্তু এক ভূমা মহান্ আত্মা পরমাত্মাতে অধিশ্রিত হইয়া আছে। সুখসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে অনেক সময়ে আমরা এই সত্য স্পষ্ট দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু দুঃখশোক বিপদ-আপদের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া একটা কোন আশ্রয় পাইবার জন্য আমরা যখন ব্যাকুল হইয়া উঠি, তখনই অন্তরে এই মহান্ আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই যে, একটী আত্মাও নিরাশ্রয় নহে, প্রত্যেক আত্মাই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। বিশ্বজগতেরও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আমাদের নিজ নিজ কার্য্যের সহিত সেই সমস্ত কার্য্যের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া খুবই স্পষ্ট জানিতে পারি যে, এই বিশ্বজগতেরও আত্মা সেই পরমাত্মা; তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এইরূপে এক আত্মাকে জানিলেই স্পষ্ট জানা যায় যে, এই বিশ্বসংসার কেমন সুন্দররূপে সেই সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মার আশ্রয়ে রহিয়াছে। এইজন্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে, নিজের আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, নিজের আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে স্পর্শ করিলে, সকল সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

পরমাত্মাকে কেবলমাত্র আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি বলিয়া জানিলে কিছুই জানা হইল না। আত্মা যেমন আমাদের শরীর ও মনের আশ্রয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, সেইরূপ পরমাত্মাকেও আত্মার একমাত্র

আশ্রয়, আত্মার প্রাণ বলিয়া জানিতে হইবে; পরমাত্মাকে আমাদের পিতা-মাতা, সখা-সুহৃৎ জানিয়া সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মানবের যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার এই ভাবে যোগসাধন করিলেই তাহা লাভ করা সম্ভব হইবে। পরমাত্মাকে সকল জ্ঞানের মূল সুতরাং সকল উন্নতির মূল নিয়ন্তা জানিয়া, সমস্ত হৃদয়ের প্রীতির সহিত আমাদের সকল কার্য্যে, সকল চিন্তায়, সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিতে হইবে; পরমাত্মার সহিত আত্মার সংস্পর্শ ঘনীভূত করিয়া তুলিতে হইবে।

পরমাত্মার সহিত আত্মার এই যোগের ফল সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হইলেও কেবল যে সেই উদ্দেশ্যে এই যোগ অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নহে। এই যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে আত্মা মধুময় হয়; বিশ্বজগত সেই আত্মার নিকট মধুময় হয়। তাহার নিকটে ঈশ্বরের মঙ্গলকিরণে জগতসংসার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যে পুণ্যবান পুরুষ পরমাত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রীতির যোগে একান্ত যুক্ত থাকেন, তাঁহার আত্মা শান্তিসমুদ্রে অটলভাবে স্থির থাকে; তিনি মৃত্যুর অতীত সেই মৃতসঞ্জীবনী শক্তিকে সর্ব্বদাই অন্তরে অনুভব করেন বলিয়া অনেক সময়ে চতুর্দ্দিকে রোগশোক পাপতাপের প্রসার দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও সেই মঙ্গলস্বরূপের উপর তাঁহার বিশ্বাস এতটুকুও টলে না। ঈশ্বরকে আত্মস্থ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়; মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না; বিপদ তখন তাঁহার নিকটে সম্পদ হয়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী এবং প্রকৃতই অমর। তখন তিনি তাঁহার জ্ঞানোজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখেন যে ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় পিতামাতা, তাঁহার অন্তরতম সখা ও পরম সুহৃৎ; তিনি তাঁহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও উন্নতির বিধাতা। এই নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন পূর্ব্বক পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ নিবদ্ধ করিলে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, ভগবৎপ্রেম বিকশিত হইবে এবং ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইবে। এই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা হইল নিরবয়ব অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন দ্বারা ব্রহ্মোপাসককে উপাসনা করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবার অবসরই নাই। সৃষ্ট বস্তুকে পরব্রহ্মের সিংহাসনে বসাইয়া পরব্রহ্মের প্রাপ্য ভক্তিপ্রীতির নৈবেদ্য কিরূপে অর্পিত হইতে পারে, ব্রহ্মোপাসকের তাহা উপলব্ধিতেই আসিতে পারে না। ভূমা পরমেশ্বর হইলেন সৃষ্টির অতীত, সুতরাং স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত; তিনি জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর অন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন, প্রত্যেক অণুপরমাণুতে আছেন। কিন্তু হস্তগঠিতই হউক, কল্পনারচিতই হউক অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকৃত কোন মনুষ্যই হউক, সৃষ্টবস্তু মাত্রই স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবেই; একস্থলে তাহার অধিষ্ঠান হইলে অপর স্থলে হইতে পারিবে না; এককালে আবির্ভাব হইলে অপরকালে তাহার আবির্ভাব নাও হইতে পারে। কাজেই সর্ব্ববিধ সীমার অতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরব্রহ্মের প্রতি আমাদের ক্রমোন্নতিশীল শ্রদ্ধাভক্তিপ্রেম প্রভৃতি যাহা অর্পিত হইবে, ক্ষুদ্র স্থানের বা ক্ষুদ্র কালের সীমা দ্বারা আবদ্ধ কোনও সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সে শ্রদ্ধাভক্তিপ্রেম কখনই যাইতে পারে না।

মূর্ত্তিপূজা, অবতারপূজা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্ম দূরে ফেলিয়া অনন্তমঙ্গল পরব্রহ্মের উপাসনায় আমাদিগের কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সমুদ্রতীরবাসী লোকেরা যেমন শৈশব অবধি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খেলা করিতে করিতে সমুদ্রকে ভালবাসিতে শেখে, আমাদের সেইপ্রকার আমাদের পরম পিতামাতার ক্রোড়ে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সেই পরম সুহৃৎ পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনার পথে কতকগুলি বৃথা কুটতর্কের পর্ব্বতসমান বাধা উঠাইয়া আমরা নিজেকে প্রবোধ দিতে যাই যে, ব্রহ্মো-

পাসনা আমাদের শক্তির অতীত, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা হইতে নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। এই প্রকার কূটতর্কের আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনা হইতে নিরস্ত থাকিবার প্রকৃত কারণ আলস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য যে জ্ঞানের আলোচনা চাই, যে প্রীতির আয়োজন চাই, যে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই, সেই সকল আয়ত্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইলেই ব্রহ্মোপাসনাতেও পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ি। উপধর্ম্মের বিধান অনুসারে অনেকস্থলেই নিজের কর্ত্তব্যসকল পুরোহিত প্রভৃতির স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে থাকি।

কিন্তু ইহা স্থির যে এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মলাভ হইবে না, মুক্তিলাভ হইবে না। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলি কূটতর্ক ও বাঁধি কথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অপরের নিকটে তো নহেই, আপনার নিকটেও আপনাকে ক্রমাগত দুর্ব্বল বলিয়া ঘোষণা করিও না। উপনিষদের অভ্রান্ত সত্যকে অবলম্বন কর—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—ভগবানকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দাও কূটতর্কের যত কিছু বাধা। সজোরে সরল পথে পিতামাতা পরমেশ্বরের ক্রোড়ে চলিয়া যাও—কাহার সাধ্য, সে পথে কেহ বাধা প্রদান করে? রূপকল্পনার ভিতর দিয়া যখন ব্রহ্মোপাসনারই সাফল্যলাভের কথা কীর্ত্তিত হইতেছে, তখন তাহাই তো প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসনাকেই অধিকতর সমর্থন করিতেছে।

মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে যেমন ব্রহ্মের রূপকল্পনার কথা তোলা হয়, সেইরূপ মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির সমর্থনে আর একটা বাঁধি কূটতর্ক প্রায়ই উপস্থিত করা হয় এই যে, ঈশ্বরই যখন এই সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়াছেন, তখন ভক্তিসহকারে যাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি না কেন, তাহাতে তাঁহারই পূজা করা হইবে। ইহা কতদূর সঙ্গত কথা বলিতে পারি না। আমরা জানিই না—জানিতে পারিই না যে, ঈশ্বর এই সমস্ত হইয়াছেন, অথবা ঈশ্বর নিজের মায়া বা স্বাভাবিক জ্ঞান-বলক্রিয়া বা সৃষ্টিশক্তি দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতে আমরা যে ভাবে সৃষ্ট পদার্থসকল পাইয়াছি, সেই ভাবেই তাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে; তাহার বিপরীতে ব্যবহার করিলে আমাদেরই অনিষ্ট হয় দেখা যায়। কাজেই সৃষ্টবস্তুসমূহের যথাযথ ব্যবহারই ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাই পায়ে ক্ষত হইলে মস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা করা চলে না; পুস্তক আলমারিতে থাকে বলিয়া তাহাদের আধারাধেয় সম্বন্ধ ঘুচাইয়া পুস্তককে আলমারিরূপে অথবা আলমারিকে পুস্তকরূপে ব্যবহার করিলে জ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত বৃদ্ধি হইবে না; পাত্রকে আহার্য্যরূপে এবং আহার্য্যকে পাত্ররূপে ব্যবহার করিলে জীবনযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জগতসংসারকে অন্ধকার মনে করিলে জগতসংসারের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাহাতে আমাদের নিজেদের যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবের উপর দাঁড়াইবার ফলেই অভ্রান্ত গুরুবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আমাদের মনের উপর পরাধীনতার উত্তুঙ্গ প্রস্তর চাপাইয়া দেয়, উন্নতির অভিমুখে আমাদের উত্থানশক্তি হরণ করিয়া লয়। এইরূপে অজ্ঞানের দ্বারা মানবের মনশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া গেলে, তখন যে মানুষ কত নিম্নে নামিয়া যাইতে পারে, এদেশে কাপালিক প্রভৃতি শত শত সম্প্রদায়ই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মোপাসক যেমন সৃষ্ট কোন জড়পদার্থকেও পরব্রহ্মের সহিত একাসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারেন না, সেইরূপ কোন মনুষ্যকেও পরব্রহ্মের প্রাপ্য ভক্তিপ্রীতি অর্পণ করিতে পারেন না। ব্রহ্মোপাসকের উপাস্য দেবতা যিনি, সেই পরব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম ও অদ্বিতীয়। মনুষ্য জ্ঞানে ধর্ম্মে যতই কেন উন্নত হউন না, ব্রহ্মোপাসক তাঁহার চরণে শতবার মস্তক অবনত করিলেও তাঁহাকে—এমন কি, কোন দেবতাকেও পরব্রহ্মের সহিত একাসনে কিছুতেই বসাইতে পারেন না। যাঁহাকেই আমরা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত হইব, তিনিই তো অন্তত স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ হইবেনই। সুতরাং তিনি

সত্যাই ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার হইলে সৃষ্টি রক্ষা পাইবে কি প্রকারে ? কাজেই আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে, কোনও মনুষ্য বা দেবতা অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের পূর্ণাবতার কিরূপে হইতে পারেন। তবে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের মহাশক্তির অভিব্যক্তিতে এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক কণাটী পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ; সেই হিসাবে ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু অবধি শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ ও দেবতা পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁহার আংশিক শক্তি লইয়া অবতীর্ণ বলা যাইতে পারে।

মূর্ত্তিপূজা বল, অবতারবাদ বল, কোন প্রকার উপধর্ম্মই মানবের পক্ষে পরিণামে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হয় না। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রকৃতিকে যথাযথ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার শক্তি অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয় বলিয়া, অনেকস্থলে পশুবলি নরবলি পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ভীষণ অনিষ্টকর প্রথাও উহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ধ্বংসপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কারণে কূটতর্ক ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যেক মানবকে সরলপথে নিজ নিজ আত্মার ভিতর দিয়া আত্মার আত্মা পরম পিতামাতা পরমাত্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবার উপদেশ দেন।

ব্রহ্মোপাসককে একদিকে উপধর্ম্ম হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইবে, অপরদিকে নাস্তিকতা হইতেও আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। উপধর্ম্ম মন্দ, অতএব উপধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে চলিবে না। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এবং নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে যে নাস্তিকতার কোনই ভিত্তি নাই। আমাদিগকে ব্রাহ্মোপাসানই অবলম্বন করিতে হইবে। উদারতম ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে উপধর্ম্ম এবং নাস্তিকতা, এই উভয়সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার প্রত্যক্ষ সত্যের উপর দাঁড়াইয়া বলেন যে, আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। আত্মাকে না জানিলে সকলই শূন্য। আত্মাই পরমাত্মজ্ঞানের মূল। আত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মাকে পাইবে না। আত্মা সুস্থ থাকিলেই আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানা সহজ হয়। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মারও স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করা আবশ্যক। যেমন মাটীর নীচে যথেষ্ট জল থাকিলেও গাছে নিয়মিত জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়, সেইরূপ ভগবান আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও নিয়মিত পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন করিয়া আত্মাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হয়। এইরূপ যোগসাধনই হইল আত্মার অন্ন। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যোগযুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি এবং তাহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ত।

পরমাত্মার সহিত আত্মার এই অক্ষয় যোগ সহজ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন একদিকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেইরূপ রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিন শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মাসমাধান করিবার বিধানও দিয়াছেন। যে স্থানে এবং যে সময়ে যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আসিবে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই অবস্থাতেই পরমাত্মাতে আত্মা সমাধান করিবে। অমুক স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে বা অমুক সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পরমাত্মাতে আত্মাসমাধান হইতে পারিবে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন কথা বলেন না। কিন্তু ইহা দেখা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই যোগসাধনের ব্যবস্থা করিলে সেই স্থানের বায়ু যেন সাধুভাবের তড়িৎ-শক্তিসমন্বিত হইয়া উঠে। সেই প্রকার নিয়মিত সময়ে আত্মাসমাধানের অভ্যাস করিলে যথাসময়ে পরমাত্মার আশীর্ব্বাদ যেন মস্তকে নামিয়া আসিয়া আত্মাসমাধানে বলপূর্ব্বক প্রেরণ করে। এই কারণে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই

পরমাত্মাতে আত্মাসমাধানের জন্য স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিবার বিধিব্যবস্থা আছে। এই কারণেই হিন্দুজাতির মধ্যে অগ্নিগৃহ বা পূজার ঘর এবং ত্রিসন্ধ্যা আত্মা সমাধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং সেই পূজার ঘর ধূপধুনা প্রভৃতির সুগন্ধে কত না আমোদিত রাখা হয়, কত না পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা হয়।

পরমাত্মাতে আত্মা সমাধান করিবার জন্য যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা নির্দ্দিষ্ট কাল একান্ত আবশ্যক নহে, সেইরূপ কোন বিশেষ পদ্ধতিও অবলম্বন করিবার একান্ত প্রয়োজন নাই। ওঁকারের অর্থধ্যান বা গায়ত্রীর অর্থধ্যান বা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থধ্যান অথবা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি হইবে, যাহাতে আত্মার একাগ্রতা আসিয়া পরব্রহ্মে আত্মা-সমাধান সহজসাধ্য হইবে, তাহাই অবলম্বন করিবে। মূল লক্ষ্য রাখিতে হইবে এই যে, পরমাত্মাতে আত্মাকে একাগ্রভাবে এপ্রকার সমাধান করিবার অভ্যাস করিতে হইবে, যাহাতে সহজেই আত্মাতে ঈশ্বরপ্রীতির উদ্রেক হয় এবং যাহাতে সেই ঈশ্বরপ্রীতি ক্রমিকই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। রোগে শোকে বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে সজনে নির্জ্জনে সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই অনবরত তাঁহাকে ডাকিবার যে অধিকার আমাদের আছে, সেই অধিকারকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। পরমাত্মাতে আত্মাসমাধান অভ্যস্ত হইলে, আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারি; বিপদের সময় তাঁহাকে বিপদের কাণ্ডারী বলিয়া বুঝিতে পারি এবং সুখদুঃখে তাঁহাকে আমাদের সখা ও সুহৃৎ বলিয়া চিনিতে পারি। পাপে পতিত হইলে তিনি আমাদের পতিতপাবন; মুক্তির জন্য শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদের মুক্তিদাতা।

পরমাত্মাতে এই প্রকারে আত্মাসমাধান করিবার ফলে ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পিত হইলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন তো সহজ হইয়া পড়ে। পিতামাতাকে ভক্তিপ্রীতি করিলে তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য মন তো আপনিই ছুটিয়া যায়। সন্তান প্রতিপদে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে দৌড়ায় না যে কোন্ কার্য্য তাঁহাদের প্রিয় এবং কোন্ কার্য্য তাঁহাদের অপ্রিয়। অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারাই সন্তান তাহা বুঝিতে পারে। সেইরূপ আত্মা পরমাত্মার সহিত একাত্মভাবে সমাহিত থাকিলে স্বতই বুঝিতে পারে যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয় এবং পাপকর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়। সেই কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেও পাই যে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ, এবং পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি। তাই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিবার কথা এবং পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইবার কথা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের মধ্যে একটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই মুখে ঈশ্বরকে প্রীতিভক্তি প্রদর্শন করিয়া কার্য্যে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে গুরুতর অধর্ম্ম করা হইবে—ইহাতে ভগবানকে একপ্রকার উপহাস করা হয় বলা যাইতে পারে।

পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত ঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষেরা তাঁহার প্রিয়কার্য্য এবং অপ্রিয়কার্য্য সম্বন্ধে অন্তরে বাণী প্রাপ্ত হইয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, 'সত্য কথা কহিবে, সত্য ব্যবহার করিবে, ক্ষমা অভ্যাস করিবে, ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে; বিনয়ী হইবে, নম্র হইবে, গুরুজনকে ভক্তি করিবে, সকলকে আত্মবৎ দেখিবে। পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট হইবে; মদ্যপান করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, পরনিন্দা করিবে না, পরুষ বাক্য কহিবে না; অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবে না; ব্রতভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাব্রতী হইবে না'। আমাদের আত্মাতেও প্রবেশ করিয়া দেখি যে, আমাদের আত্মাও এই সকল অনুশাসন সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করে। পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইলেও সীমাবদ্ধ মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু অনন্তমঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক থাকিতে পারে না। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে নিয়তই এই আশ্বাসবাণী দিতেছেন যে, মোহবশত কখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেও তন্নিমিত্ত

অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইলে, প্রাণের জ্বালায় জর্জরিত হৃদয়ে অনুতাপের রক্তে সেই পরমপিতামাতা পরমেশ্বরের চরণ ধৌত করিলে তিনি সমস্ত জ্বালা মুছিয়া দিয়া আদরপূর্ব্বক তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। এই সকল উপায়ে যে বিদ্বান ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা না করিলে আমরা যে কৃতঘ্ন হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শক ও মোক্ষপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, আর কোন্ ধর্ম্ম তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবেন জানি না। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশের গৃহে গৃহে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা চাই-ই। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করা। প্রত্যেকের পক্ষে এই দান যতদূর সম্ভব সহজ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ-সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে এই একটী প্রতিজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—"ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব"। দান সম্বন্ধে এত সহজ প্রতিজ্ঞা থাকিলেও যদি আমরা তাহা রক্ষা না করি, তবে আমাদের সে কৃতঘ্নতা রাখিবার স্থান কোথায়? ঋষিদের এই অভিশাপ আমাদের যেন স্মরণ থাকে—"কৃতঘ্নস্য নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। প্রকৃতই আমাদের কৃতঘ্নতার জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যধর্ম্ম প্রচারে সক্ষম না হন, তবে দেশের মঙ্গল কোথায়? বর্ষে বর্ষে যথাশক্তি দান করিলেও ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণের পরিশোধ হইতে পারে না। আমাদের কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঈশ্বর ও সংসারের বিরোধ উপস্থিত হইলে শত প্রলোভন সত্বেও সহস্র বাধার মধ্যেও সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়জয়কার হইবে। এই প্রকারে সর্ব্ববিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সচেষ্ট থাকিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইলে চলিবে না।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরমাত্মার সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমরা গোপনে অন্তরে গ্রহণ করিয়া মাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। পিতাকে যেমন অন্তরে বাহিরে, গৃহের ভিতরে এবং গৃহের বাহিরে স্বীকার করিলেই সর্ব্বতোভাবে শোভন হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে তাহা প্রকাশ্যে গ্রহণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করিতে, নিজেদের সর্ব্ববিধ কার্য্যে, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎপদ, তাঁহাদের পশ্চাৎপদ হইবার মূলকারণ লোকভয়, সমাজভয়। ভয় ও প্রীতি, প্রীতিরই এপিঠ ওপিঠ। লোকভয় ও সমাজভয়ের অর্থই হইল লোককে সমাজকে ঈশ্বর অপেক্ষা বেশী ভালবাসা। ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়া আমাদের সেই লোকভয় ও সমাজভয়ই তো ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার ফলে সৎসাহসও কতদূর আসে! প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ্যে গ্রহণ করিলে তাহার বল যে কত, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শত শত সাধু মহাত্মার জীবনে তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইরূপ বল আসে বলিয়াই উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সময়েও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের সমক্ষে নানা শুভ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের আর একটী ফল লোকসংগ্রহ। তোমার একাকীর সৎসাহস দেখিয়া যখন সমাজের অপর পাঁচজনের অন্তরে সৎসাহস জাগিয়া উঠিবে, এবং অপর পাঁচজনে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য অগ্রসর হইবে, সে দৃশ্য কি সুন্দর, কি মনোহর!

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস থাকে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি পরমাত্মার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধক বলিয়া মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি প্রকৃতই

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধক বলিয়া মনে হয়, তবে আমাদিগকে প্রকাশ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার ফলও সদ্য সদ্য প্রত্যক্ষ হইবে। প্রতিজ্ঞার স্মৃতি আপনা হইতেই আমাদিগকে পাপাচরণ হইতে নিরস্ত থাকিবার বল প্রদান করিবে এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিবে। স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যুক্ত হইলে চলিবে না। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে ধর্ম্মসাধনের জন্য, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি কি না। তাহা যদি আসি, তবেই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ সার্থক হইবে। তখন আমরা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। তখন আমরাও কবির সঙ্গে একহৃদয়ে বলিব—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন মনের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।

* * * *

কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত-রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।

* * * *

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ভৈরবী—কাহারবা।

আকাশ বাতাস পূর্ণ করে'
এই যে তিনি, এই যে তিনি!
পায়ের নীচের ঘাসের তলায়
নীলাকাশের তারার মালায়
স্থলে জলে ফুলে ফলে
এই যে তিনি, এই যে তিনি!
এই যে তিনি দুঃখে সুখে
বাঁশী বাজান্ আমার বুকে
স্নেহে প্রেমে ভালবাসায়
আশা-তৃষায়—এই যে তিনি!
ভুবন জুড়ে কাছে দূরে
এই যে তিনি, এই যে তিনি।

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষার বিরোধ খণ্ডন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষ শাস্ত্রমত আলোচনা করিয়া আসিলাম। ইহাতেও হিন্দুসাধারণ যে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। স্ত্রীশিক্ষার কথা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দিগকে বেদবেদান্তাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দিবার কথা উত্থাপিত হইলেই বিরোধী পক্ষ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার অর্থ করেন যে, স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদিগের বেদ-পাঠে অধিকার নাই। উপরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের * অর্দ্ধাংশ মাত্র। আপাতত আমরা ধরিয়া লইলাম যে এই শ্লোকাংশের তাঁহারা যেরূপ অর্থ করেন তাহাই ঠিক। এখন, ভাগবত যে আমাদের অতি মান্য ও আদৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তাহা স্বীকার করিলেও নানা কারণে ইহার আর্ষত্ব বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। ভাগবত যদি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে মহাভারতের সহিত ইহার বিষম বিরোধ দেখা যাইত না। আমরা বিরোধের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

সর্ব্বসাধারণের মতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিজেরও মতে ইহা মহাভারতের পরে রচিত। এই বিষয়ে একেবারে কাহারও দ্বিধা নাই। এই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে † লিখিত আছে যে, যখন ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান, তখন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মোপদেশ লাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম তাঁহার জন্মাবধি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন যে "পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এবং মহাযোগী ব্যাসদেব কথাপ্রসঙ্গবশত এই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" ইহার পর যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর ‡ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া তক্ষকদংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে, ভাগবতে উল্লিখিত হইতেছে যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্ব হইতে শুকদেব এই ভাগবতাখ্যান বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—এই সময়ে শুকদেবের

---

* ১ স্ক, ৪ অ, ২৫

† ৩৩৩-৩৪ অধ্যায়

‡ কাহার কাহার মতে ৩৬ বৎসর

বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্তত ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে শুকদেব ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন, কিন্তু ভাগবতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে শুকদেবের বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর! ইহার উপর আরও একটু গোলযোগ আছে। ইতিপূর্ব্বেই দেখিলাম যে মহাভারতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের পূর্ব্বেই শুকদেবের দেহান্তর ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভাগবতে উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের মৃত্যুকালে শুকদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। একই ব্যক্তি, বিশেষতঃ একই ঋষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইলে এরূপ গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা থাকিত না বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে অন্যান্য পুরাণমাত্রে যেখানে মহাভারত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখ আছে, সেইখানেই তাহা ঋষি ব্যাসদেবকৃত বলিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে এই ভাগবতপুরাণ অতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত উক্ত হইয়াছে দেখা যায়। দেবীভাগবতেরও টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ভাগবত বোপদেবলিখিত। বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে ভোজপ্রবন্ধ নামক একখানি পুস্তকের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবত যে বোপদেবকৃত, তাহা এই ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থেও লিখিত আছে। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আরও একটী বিরোধ দেখিতে পাই। ভাগবতে পরীক্ষিৎ এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে আছে যে, "এই প্রভাবশীল বালক, মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্যকে সম্মুখে দর্শন করিতেন, তাহাকেই 'এই ব্যক্তি কি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ' এই প্রকার পরীক্ষা করিতেন বলিয়া প্রথম হইতেই পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" * কিন্তু মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে (১৬ অ.) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে পরিক্ষীণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই জাত বালকের নাম পরীক্ষিৎ হইল। প্রকৃতই যদি ভাগবত বোপদেবকৃত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তাহাতে বোপদেবের হাত দেখিতে পাই। মুগ্ধবোধে বোপদেব যেমন কারণের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, ভাগবতেও সেইরূপ কারণশৃঙ্খলা রক্ষিত দেখিতে পাই। অনেক স্থলেই এটা কেন হইল, ওটা কেন হইল, এইরূপ প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

যাই হোক্ এই সকল কারণে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি যথেষ্ট আদর ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিলেও ইহার আর্ষত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহার আর্ষত্ব অস্বীকৃত হইলে আমরা ইহাকে পুরাণের আদর্শে রচিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া ধরিতে পারি, কিন্তু ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ইহাকে ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং যদিবা ইহাতে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাদি পঠনপাঠনে অধিকার অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও ঘোর শাস্ত্রবাদীও তাহা ঋষিবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না।

এখন, ভাগবত আর্ষের গ্রন্থ হউক বা না হউক, ইহা যখন সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আর্ষের গ্রন্থ এবং কার্য্যত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ভাগবতের প্রকৃত মতই বা কি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষ যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে প্রয়াস পান, সেই শ্লোকটী সম্পূর্ণ এই :—

> "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
> কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
> ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥

এই শ্লোকটীর প্রথম দুই চরণের অর্থে তাঁহারা যে স্ত্রী শূদ্র ও অধম দ্বিজদিগকে বেদাদির পঠনপাঠনে অনধিকারী বলেন, তাহা আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার বিপরীতে আমাদিগের এই বোধ হয় যে গ্রন্থকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে, 'পূর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রাদি বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার সুশোভন সাজে সজ্জিত হইত, কিন্তু হায়! এখন তাহারা বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে!' সমস্ত শ্লোকটীর অর্থ আমাদের এইরূপ মনে হয়—কর্ম্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ বিবেচনাবিমূঢ় স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের বেদত্রয় (ঋক্, যজু এবং সাম) শ্রুতিগোচর হয় না; এই মহাভারতের দ্বারা ইহাদিগেরও মঙ্গল হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মুনি (ব্যাসদেব) কর্ত্তৃক কৃপাবশত এই মহাভারত বিরচিত হইয়াছে। সম্ভবত রাজনৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণে ভাগবত রচনার কালে অধিকাংশ দ্বিজ, (স্ত্রী ও শূদ্রদিগের তো কথাই নাই) বৈষয়িক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগের মনোযোগের অভাবেই বেদাদি শ্রুতিগোচর হইবার অভাব হইয়াছিল। ভাগবতকার সেই কারণেই দুঃখের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন এবং সেই কারণেই সম্ভবত মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকন্যাদিগকে নির্ব্বিশেষে ভালরকম শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভাগবতের উপরোদ্ধৃত শ্লোকে বেদাদিতে স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিকার বিষয়ে কোনও উল্লেখ নাই; তবে যে সকল স্ত্রীলোক বা শূদ্র অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন দ্বিজ কর্ম-

---

* ১ স্ক ১২ অ ৩০।

কাজে বিরূঢ় হইয়া বেদাদি পঠনপাঠন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ঘোর বিষয়াসক্ত ও স্বর্গাদিকামী কর্ম্মনিরত, তাহাদিগেরও মঙ্গল যে ব্যাসদেবের অন্তরে মহাভারতরচনাকালে নিহিত ছিল, তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। এখানে বরঞ্চ পরোক্ষভাবে যেমন দ্বিজদিগের, তেমনি স্ত্রীশূদ্রেরও বেদাদি পঠনপাঠনে চির অধিকারই ব্যক্ত হইতেছে। ভাগবতকারের যদি স্ত্রীশূদ্রাদিকে বেদাদিতে অধিকার না দেওয়াই অভিমত হইত, তাহা হইলে তিনি চতুর্ব্বেদের কথা না বলিয়া ত্রয়ী অথবা তিনবেদের কথা উল্লেখ করিবেন কেন? উপরোক্ত শ্লোকের দুই তিনটি শ্লোকের পূর্ব্বেই তিনি চতুর্ব্বেদ এবং পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাসপুরাণাদির উদ্ধারের বিষয়, এবং কোন্ কোন্ বেদে কোন্ কোন্ ঋষি পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখি, "দারুণ" সুমন্ত মুনি অভিচারাদি কর্ম্মপ্রধান অথর্ব্ববেদে এবং রোমহর্ষণ ইতিহাস পুরাণাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার পরে, যাহাতে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাও সেই চতুর্ব্বেদ ধারণা করিতে পারে, তাহাই বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদবিভাগের কারণ, ভাগবতকার ইহা উল্লেখ করিয়া পরেই বলিলেন যে 'এত সুবিধা করিয়া দিবার পরেও যে সকল কর্ম্মমূঢ় স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজ উত্তম বেদত্রয় শিক্ষা করে না, তাহাদিগকে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার এবং সাধুশিক্ষা প্রদান করিবার কারণেই মহাভারত রচিত হইয়াছে।' এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভাগবত রচনার কালে স্ত্রীশূদ্রাদি অথর্ব্ববেদ অথবা ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে নাই, সুতরাং সে বিষয়ে ভাগবতকারের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজকাল যেমন অনেকেই সহস্র বিষয়কর্ম্মের মধ্যেও নাটক নবেল পড়িবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন, ভাগবতের সময়েও সেইরূপ অধিকাংশ লোকেই মনোরঞ্জক ইতিহাস, পৌরাণিক গল্প পড়িবার অবকাশ পাইতেন বলিয়া বোধ হয়। তাই বলিয়া তখন যে কোনই স্ত্রীলোক বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন না তাহা নহে। এই ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে এক স্ত্রীলোক অপরের নিকটে বলিতেছেন যে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী অথচ তদ্বিষয়ে অনাসক্ত যে সনাতন ঈশ্বরের বিষয় বেদ এবং গভীর তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে উক্ত হয়, ইনিই তিনি।" ইহাতে বোধ হয় যে তখন স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, যে ভাগবতের শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বলবৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া সদাসর্ব্বদা উদ্ধৃত হয়, সেই ভাগবত আর্ষের গ্রন্থ হউক বা না হউক, তাহাতেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কথা নাই এবং উপরোক্ত শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পরিবর্ত্তে সপক্ষেই সাক্ষ্য দিতেছে। সংস্কৃত কাব্য নাটক আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তদুল্লিখিত অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই কোন না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকলেতেই দেখা যায় যে গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি স্ত্রীলোকের মাতৃভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। সংস্কৃত কাব্য নাটকের, বোধ করি, সকল স্ত্রীচরিত্রেই গার্হস্থ্য সুখশান্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় স্ত্রীলোকের ভীষণ চরিত্র দুর্ল্লভ—বোধ হয় একেবারেই নাই।

আমরা এত বিস্তৃতরূপে আর্য্যরমণীর প্রাচীন অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, ভারতের ঋষিমুনিরা অতি উদারহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের সদুপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়াই আমরা এত হীন অবস্থায় নিপতিত হইতেছি। আশা হইতেছে যে, ভারতের হিন্দুজাতির উন্নতি সম্মুখে—হিন্দুজাতির দৃষ্টি প্রাচীনের প্রতি অল্পে অল্পে পড়িতেছে। সচরাচর দেখা যায় যে, যে জাতি অবনত হইয়া প্রাচীনের প্রতি যথাযোগ্য অনুরাগের সহিত দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, সেই জাতির উন্নতি ঘটিতে অধিক বিলম্ব ঘটে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন "যে জাতি তাহাদিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গৌরব করে না সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটী প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মনিদেশ যখন রাজ্য সম্বন্ধে অবনতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন তাহা তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং পুরাকাল আলোচনা করিয়া ভাবীকাল সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইয়াছে।"

এক্ষণেই যে ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে—ভারতে চিরকালই প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি চলিয়াছে, তাই হিন্দু ভারত আজ পর্য্যন্ত নানা অত্যাচার, নানা নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও নিজের জীবনীশক্তি হারাইতে পারে নাই; আজ পর্য্যন্ত ভারতের হিন্দুজাতি জগতের ইতিহাসে নিজ নাম অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রুতির কালের পর যখন ভারতের অবনতি ঘটিল, অমনি স্মৃতিসমূহ অভ্যুদিত হইয়া আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রাচীন শ্রুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল; স্মৃতির পর যখন অবনতির কাল আসিল, পুরাণ সকল অভ্যুদিত হইয়া শ্রুতিস্মৃতির দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল; তাহার পরে তন্ত্রশাস্ত্র যদিও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে

বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাল শ্রুতিস্মৃতির দিকে আর্য্যপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরে অবার অবনতির কাল আসিল, আমরা এখন শ্রুতিস্মৃতি পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসকলের দিকে, তৎ-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন পন্থাসকলের অনুসন্ধানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। হিন্দুজাতির এইরূপ প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টির কারণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রসকলেই যথার্থত উন্নততর আর্য্য সভ্যতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং আধুনিক শাস্ত্রসকলে সেই সভ্যতার সহিত অনার্য্যদিগের অনুন্নত আচার ব্যবহারের সম্মিলন দেখা যায়; এই কারণে ভারতের সমাজসংস্কারক যে প্রত্যেক সংস্কারচেষ্টায় প্রাচীন প্রথা ও শাস্ত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে।" * হণ্টার সাহেব এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; বৈদিক কালে যে উচ্চতর আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, এ কথা একেবারে মিথ্যা নহে। বেদবেদান্তে যে সকল কথা আছে, সেই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেই সময়ে ভারতে একটা গভীর উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এইটুকু বুঝেন যে বৈদিককাল কেবল কতকগুলি পার্ব্বত্য কৃষকদিগের ভারতাক্রমণের কাল ছিল না, ঋকসমূহও তাহাদিগের "কৃষাণসঙ্গীত" ছিল না এবং স্মৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ কেবল মাত্র লক্ষ টাকার ধূলিরাশি নহে, এবং যদি তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে কিঞ্চিৎ কর্ণপাত করেন তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বোধ করিব।

* The reformer in India has to say, the existidg law is unjust or no longer suitable, therefore we shall (not make a new law, but) go back to an older law. And there is historical reasonableness in this curious method. The most ancient scriptures of India represent the higher Aryan civilization, the more recent ones embody the compromises with lower types to which that higher civilization had to submit. The orthodox Hindu, indeed, rests the superiority of the ancient law on a different ground. He believes the oldest of his sacred rexts to have been directly inspired by God, and that this inspiration was only vouchsafed in a diminishing degree to subsequent scriptures." The Hindu Child-Widow by Sir W. W, Hunter Asiatic Quarterly Review, October 1886.

সবরমতি আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সবরমতী আশ্রম পরিদর্শন করিতে যান। আশ্রমের অধিবাসীগণের অনুরোধে তিনি নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

"মহাত্মাজী যখন দুই বৎসর পূর্ব্বে এই আমেদাবাদে আপনাদের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন আমি একবার এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। তদবধি দিনের পর দিন ধরিয়া আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম যে, কবে আবার মহাত্মার পদরজঃপূত আশ্রম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। এতদিনে আমার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। আজ মহাত্মাজী আপনাদের মধ্যে নাই, আপনারা তাঁহার অনুপস্থিতির অভাব বৃশ্চিক-দংশনের মত অনুভব করিতেছেন ইহা জানি এবং তাহা জানি বলিয়াই আমি সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিব।

আপনারা সকলে এই আশ্রমে স্বার্থবলিদান করিয়া বাস করিতেছেন। আপনারা 'সত্য' কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রবৃত্তিতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক, এই 'সত্য' আপনারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

ত্যাগ।

ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগের অর্থ এই যে, মানুষের দেহটাই প্রকৃত জীবন নহে, আত্মাই প্রকৃত জীবন। পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা যাপন করি, এই জড় জগতই কেবল জগত নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে জীবন লুক্কায়িত আছে, সেই জীবনের জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের সেই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর—অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি এই জড়জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই-ই সেই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে "দ্বিজ" হইতে হইবে, একবার দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সত্যের আলোক লইয়া অমর জীবনের সন্ধান পাইয়া নূতন জন্ম লাভ করিতে হইবে। যাহারা আপনার মধ্যে অসীমকে উপভোগ করিতে পারে তাহারাই অমর হয়। তাহারাই জানে যে, জীবনের কখনও ধ্বংস হয় না। মুরগীর ছানা যেমন ডিম ভাঙ্গিয়া আলোক আনে, মানুষ তেমনি আলোকে আনিতে পারে—যদি সে স্বার্থের

ভিত্ত ভাঙ্গিতে পারে,—মানুষ যতদিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই জড় জগতই চরম জগত নহে, সেইদিন হইতেই মানুষ এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নূতন জগতের সন্ধানে ফিরিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই এই অমর জগতে লোককে লইবার জন্য নানাভাবে আলোক প্রদর্শন করিতেছে। সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য কিন্তু অমর জগতের সন্ধান দেওয়া। সকল ধর্ম্মই বলে ত্যাগের দ্বারা সেই অমর জগতে পৌঁছান যায়। ত্যাগ যদি সত্য সত্য অবলম্বন করা হয় তবে তাহা অমর জগতে মানুষকে লইয়া যায়। এই ত্যাগ অবলম্বন করিতে গেলে কঠোর তপস্যা চাই। এই আশ্রমে আপনারা সেই তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অমৃতলোকের অধিকারী হইবেন।

মহাত্মাজী।

মহাত্মাজী আজ আপনাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা আপনাদের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। মহাত্মাজী আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই আত্মশুদ্ধিতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত। মহাত্মাজীর বাণী শুধু আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মহাত্মাকে "বিশ্বকর্ম্মা" বলা যাইতে পারে। তিনিই অসীম, তাঁহার জ্যোতিঃ আজ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বিশ্বমানবের হৃদয়ে মহাত্মার জন্য রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অসীমময়, সে অসীমকে পায়। উপনিষদের ইহাই বাণী। তাঁহাকে মনে ও বাক্যে জানিতে পারিলে বিশ্বকর্ম্মাকে জানা হয়। জীবনটিকে বিশ্বের হিতের জন্য উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বিশ্বাত্মাকে ধরা যায়। আপনাদের আশ্রমশিক্ষাও এই আলোকদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা স্বয়ং ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্যাগের দ্বারাই সৃষ্টি হয়—কখনও ধ্বংস হয় না। আমরা এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মহাত্মার হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় এক যোগসূত্রে বাঁধিতে পারিব এবং তখনই প্রকৃত মহাত্মার কর্ম্মের অংশী বলিয়া গণ্য হইব। *

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব।

(৺ সুখবিন্দু সেন বি এ)

আমাদের স্বাভাবিক ইতিহাস-বিতৃষ্ণার ফলে আমরা বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি এবং বিক্রমপুরের অতীত সম্বন্ধে নানারূপ ভৌতিক ধারণা আমাদের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমাদের প্রাণে যদি বাস্তবিক একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগাইয়া ভূমি এবং পুরাতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আলোচনা করি, তবে আমাদের ভ্রমধারণা বিদূরিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষু বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কালের প্রভাবে সমৃদ্ধিশালী বিক্রমপুর আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেই অতীত গৌরবের সুখময় স্মৃতি নানারূপ কীর্ত্তি-চিহ্নের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। একখানি বিধ্বস্ত ইষ্টক, একটী ভগ্ন দেবমূর্ত্তি, একখানি প্রস্তরখণ্ড অতীতের কত সুখময় কাহিনী আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে। আমরা অন্ধ, তাই আমরা চাহিয়া দেখি না।

বিক্রমপুর যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান এবং এই প্রদেশ যে একদিন সন্তানবৃন্দের বিক্রমের লীলাভূমি ছিল তাহার এখনও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিক্রমপুরের নামকরণ সম্বন্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছি সেই সব দৃষ্টে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে অন্যূন এগারশত বৎসর হইল, এই প্রদেশ "বিক্রমপুর" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে এই প্রদেশ "সমতট" নামে আখ্যাত হইত। নানারূপ আনুষঙ্গিক কারণাদিও আমাদের এই মন্তব্য সমর্থন করে।

তাম্রফলক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের নানাস্থানে সেনরাজগণের কয়েকখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত তাম্রফলক দ্বারা বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব সংস্থাপিত হয়। এপর্য্যন্ত যে কয়খানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে সকলের মধ্যেই বিক্রমপুরের নাম জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান। এই প্রদেশ যে সেনরাজগণের সহিত বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট ছিল তাহা আমরা তাম্রলিপি পাঠে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বিক্রমপুরের নামসংযুক্ত তাম্রশাসনের পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্য সমর্থন করিতেছি—

---

* হিন্দুস্থান ১লা জানুয়ারি ১৯২৩।

১। লক্ষণসেনের তাম্রশাসন।

এ যাবৎ মহারাজ লক্ষণসেনের চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সব কয়খানির মধ্যে তাঁহাকে "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত" অর্থাৎ বিক্রমপুরের অধিবাসী (resident of Bickrampore) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) তপনদীঘি তাম্রলিপি। *

ইহা দিনাজপুরের অন্তর্গত তপনদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া যায়—ওয়েষ্টমেকট সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ইহার বিবরণ প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখিত আছে—

"—স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেন-দেবপাদানুধ্যায়ত পরমেশ্বর-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ-শ্রীমল্লক্ষণসেনদেবঃ কুশলী", ইত্যাদি।

(খ) সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। †

ইহা ডায়মণ্ডহারবরের নিকট সুন্দরবনে মজিলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয়ের জমিদারীতে প্রাপ্ত। স্বর্গগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখিত আছে :—

"স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারাৎ মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেন-পাদানুধ্যায়াৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহপরমসুস্তাবক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমল্লক্ষণসেনদেবঃ—" ইত্যাদি।

(গ) মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। ‡

ইহার বিবরণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। ইহার প্রতিলিপি প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির বর্ণনা ব্যতীত ঠিক তপনদীঘি তাম্রশাসনের অনুরূপ।

(ঘ) সিরাজগঞ্জে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

ইহা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও ষ্টেসন রায়গঞ্জের অধীন আটাইনগর গ্রামে পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সেন মহাশয়ের দ্বারা পাঠোদ্ধার করিয়া সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে মুদ্রিত করেন এবং তাম্রশাসনখানি পাবনার কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ র‍্যাডিচি সাহেবের নিকট প্রদান করেন। ইহাতে দুই স্থানে বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে।

"—ভূশূরঃ প্রজ্ঞঃ কক্ষ প্রাণৈঃ সমৈর্বর্ম্মৈঃ প্রাণিনাং স্বকৈর্ম্মৈর্ধর্ম্মং রক্ষতি, প্রাজ্ঞসনে বিক্রমপুরে বসন্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে" ইত্যাদি।

—"অর্থাৎ বিক্রমপুরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া মহারাজ বল্লাল স্বীয় অস্ত্রধর্ম্ম দ্বারা প্রাণতুল্য জ্ঞানে প্রাণীগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন।"

"—লক্ষ্মীশো বসুনাথো বিষয়সত্তমো ভূশূরো রঘুশ্রীলক্ষ্মণো বিরাজশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনঃ সেনয়া যো বিজয়ীলক্ষসমুদ্রঃ। রাজ্ঞঃ ক্ষুধা ধরাস্থরাসঃ বিশালাক্ষো বাণসংসক্তশ্মশ্রু, বিজ্ঞমুখ্যঃ স সুধীবরোন্নি ব্রাহ্মণধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সত্যসন্ধঃ, প্রবিশ্য বিক্রমপুরং সেনামস্তিমর্দনৈর্ব্বাতিকৃতং স্বপুরং লক্ষ্মণধন্যো বিক্রমসিন্ধুর্ব্বপথি কামযজ্ঞেরতীব প্রবৃত্তঃ"।

অর্থাৎ মহাবীর লক্ষণ রঘুবংশীয় লক্ষণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রুসকল বাণসংসক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। লক্ষণ সেন পণ্ডিত ও সুধীশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণধর্ম্মাধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করতঃ মত্ত ও পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহাসমারোহের সহিত যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২। * কেশবসেনের তাম্রশাসন।

ইহা ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত একটী নদীর চড়ায় কানাইলাল ঠাকুর নামক জনৈক ভদ্রলোক প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত জেমস্ প্রিন্সেপস্ মহোদয় ইহা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে প্রদত্ত ভূমির সংস্থানের বিষয় লিখিত আছে :—

* See J. A. S. B. 1875. pp4-5—"a Copper plate grant by Lakshan Sena"

† See "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" by Ramgati Nyayaratna.

‡ J. A. S. A. 1900. Pt 1. pp 61-62. "A copper plate of Lakshan Sena"

* See J. A. S. B. Vol VII, 1838.

"বিদিতমস্তু ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্ত-ঘড়া-ঘটকপূর্ব্বে সত্রকাধিগ্রামসীমা—"ইত্যাদি।

৩। * বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন।

ইহার বিবরণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ইহাতেও প্রদত্ত ভূমির সংস্থানের বিষয় লিখিত আছে,—

'বিদিতমস্তু ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অস্টপালগ্রামে জঙ্গাল-ভূসীমা দক্ষিণে ইত্যাদি।

তাম্রশাসনের উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রমপুর সেনরাজগণের অধিকৃত প্রদেশ ছিল এবং উহা সেই সময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই কয়খানির মধ্যে লক্ষণ-সেনের তাম্রশাসনই প্রাচীন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। সিরাজগঞ্জের তাম্রফলকে বিক্রমপুর তাঁহার পিতৃরাজধানী বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও বিক্রমপুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বিক্রমপুরের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া থাকিবেন। তখন বিক্রমপুর বীর্য্য ও বিদ্যার গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে অনুমান অসঙ্গত নয় যে অনেক পূর্ব্বেই বিক্রমপুরের খ্যাতি জগতময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। সুতরাং এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বিক্রমপুরের প্রভায় সমস্ত বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রাচীন দেব-দেবী মূর্ত্তি :—

বিক্রমপুরে অনেক প্রাচীন প্রস্তরখোদিত দেবদেবীমূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইয়া বিক্রমপুরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। যে সমুদয় গ্রাম কালের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে লইয়া আজিও বিদ্যমান আছে, প্রায় সকল গ্রামেই খোদিত দেব-দেবীমূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সব দেবমূর্ত্তি দৃষ্টে স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, বিক্রমপুর একদিন বহু দেবালয় ও সৌধমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া লোকসম্পদে বঙ্গদেশে অতুলনীয় ছিল। কোথায় আজ সেই গগনস্পর্শী দেবালয়-রাজি, কোথায় বা সেই উন্নতকিরীট সৌধশ্রেণী? সব অনন্ত কালসাগরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে;—অতীতের দগ্ধ স্মৃতি বুকে লইয়া যে সব অবশিষ্ট আছে তাহারাও ক্রমে ধ্বংসের পথে পদার্পণ করিতেছে। আমাদের অতীতের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা নাই, তাই আজ সেই দেবালয়শোভিত দেবমূর্ত্তি কোথায়ও ভগ্ন অবস্থায় কোথায়ও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় অযত্নরক্ষিত হইয়া রাস্তার ধারে কিম্বা বৃক্ষতলে নীরবে কালের শাসনের অপেক্ষায় পড়িয়া আছে। ইহাদের শিল্পচাতুর্য্য ও গঠনপারিপাট্য দর্শন করিলে প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। দেবমূর্ত্তিগুলি প্রায় সকলই মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত। বর্ত্তমানেও কোন প্রাচীন গ্রামে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার সময় ভূগর্ভে প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহারা যে বিক্রমপুরের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহারা কত প্রাচীন তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সব দেবদেবীমূর্ত্তির উপর নিপতিত হইলে অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু দেবদেবীমূর্ত্তি;—কোনটী বা বনমালাবিভূষিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেবের মূর্ত্তি, কোনটী বা মূষিকবাহন গণেশ, কোনটী বা জগদ্ধাত্রী, কোনটী বা সপ্তাশ্বযোজিত রথারূঢ় সূর্য্য-দেবের প্রতিমূর্ত্তি, কোন্‌টী কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা স্থির করা যায় না। ইহাদের মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধানে মধ্যে মধ্যে শান্তসমাহিত বুদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সব হিন্দু দেবদেবীমূর্ত্তি হইলেও উহাতে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অনুমিত হয়, এই সমস্ত হিন্দু-দেবদেবীমূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম তিরোধান এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সময় বিক্রমপুরে আনীত হইয়াছিল। বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি পালরাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই মূর্ত্তিগুলি যে ঊর্দ্ধ সাত শত বৎসরের পুরাতন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের বিবরণ একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশের ইতিহাসে অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। সোনারঙ নিবাসী ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় অনেকগুলি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটীতে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি ঢাকার

* See J. A. S. B. Vol LXV, 1896 p. 7.

ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর লায়নসাহেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন; ঐ মূর্ত্তিগুলি ঢাকা কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল; তিনটী মূর্ত্তি আজিও তথায় অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। বৈকুণ্ঠ বাবুর বাটীতে বর্ত্তমানে একটীও দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিম্নলিখিত গ্রামে প্রস্তরমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়:—

১। দেবভোগ।

এই গ্রামে দুইটী মূর্ত্তি আছে; ইহাদের মধ্যে একটী নিঃসন্দেহ বৌদ্ধমূর্ত্তি।

২। পঞ্চসার। ৩। ফিরিঙ্গি বাজার।

এই গ্রামে একটী উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি আছে। ইহা সম্প্রতি বাজারের নিকট একটী বৃক্ষতলে স্থাপিত আছে। ইহা সপ্তাশ্বযোজিত রথারূঢ় সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী তিন বৎসর হইল একটী ডোবা কাটিবার সময় মৃত্তিকানিম্নে পাওয়া যায়; তদবধি ঐ স্থানেই উহা রক্ষিত আছে। ইহা উচ্চে ৬ ফুট এবং প্রস্থে ২ ফুট। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি প্রীতিপ্রদ, আজও যেন মূর্ত্তিটী নূতন বলিয়া বোধ হয়।

৪। বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া।

ইহাদের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক গ্রামেই দুই একটী করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

৫। চূড়াইন।

এই গ্রামে তিনটী মূর্ত্তি আছে, একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া শুনা গিয়াছে।

৬। বাইনপড়া।

এই গ্রামে একটী মূর্ত্তি আছে। তাহা দেখিলে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

৭। সোনারঙ।

এই গ্রামে পূর্ব্বে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল। অধিকাংশ পূর্ব্বোক্ত ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের সংগৃহীত। অদ্যাপি এই গ্রামে ছয়টী মূর্ত্তি আছে। গোঁসাইবাড়ীতে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি আছে, তাহা অতি মনোরম। মুন্সীবাড়ীর মাঠের নিকট তিনটী মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। উক্ত তিনটীই বাসুদেবমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটী মূর্ত্তির "চালি" দৃষ্টে উহা বৌদ্ধ পৌত্তলিক মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতিমায় চালির উপর যোগাসনে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে।*

৮। আউটসাহী।

এই গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে পাঁচটী দেবমূর্ত্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটী কোন্ মূর্ত্তি কেহই স্থির করিতে পারেন না। মূর্ত্তিগুলি গুপ্তমহাশয়ের বহির্ব্বাটীস্থ দীঘির চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত কুঠরীতে রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিগুলি এই বাটীতে অন্যূন দুই শত বৎসর যাবৎ রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীনাথ বাড়ুরী মহাশয়ের বাড়ীতে দুইটী দেবমূর্ত্তি আছে।

৯। কামারখাড়া।

এই গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে তিনটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি তিনটী দৃষ্টে বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

১০। মূলচর।

এই গ্রামে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।

১১। বজট।

এই গ্রাম আউটসাহীর নিকটে অবস্থিত। সম্প্রতি ইহা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। কিন্তু এই গ্রামে নানা স্থানে ভগ্ন দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় গ্রামটী একদিন সমৃদ্ধিশালী হিন্দুগণের আবাসভূমি ছিল। শুনা যায় এই গ্রাম হইতেই নাকি আউটসাহী গুপ্ত বাড়ার দেবমূর্ত্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই গ্রামস্থ পুকুরে একটী সুবৃহৎ দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পুকুরপাড়েই রক্ষিত ছিল। সম্প্রতি ইহা মুসলমান অধিবাসীর অত্যাচারে হস্তপদাদি চ্যুত হইয়া জলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

১২। জপসা (নগর)।

এই গ্রামে নানা স্থানে দেবমূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পুরাতন জপসা গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে, তত্রত্য অধিবাসী বর্ত্তমান গ্রামে চলিয়া আসেন এবং পুরাতন গ্রামের অনুকরণে এই গ্রামের নামকরণ করেন। উক্ত গ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইবার সময় সে স্থানে যাহা দর্শনীয় জিনিস ছিল তাহার কিছু কিছু সঙ্গে আনয়ন করেন। পুরাতন গ্রামের দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি সম্প্রতি নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। এই গ্রামে উন্মুক্ত প্রান্তরে একটী সুবৃহৎ প্রস্তর-

* এই সোনারঙ গ্রাম হইতেই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ" মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটী এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও একটী বৃষ পতিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গটী ১৭ ফুট দীর্ঘ; ইহার উপরিভাগের বেষ্টন ৬ ফুট এবং নিম্নভাগের বেস্টন ১২ ফুট হইবে। এরূপ অস্বাভাবিকরূপ দীর্ঘ শিবলিঙ্গ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এখনও প্রস্তর পূর্ব্বের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং মসৃণ। এতদ্ব্যতীত বেজগাঁও, রাউৎভোগ প্রভৃতি অনেক গ্রামে দেবমূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।

প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ধাতুমূর্ত্তিও পরিলক্ষিত হয়। গত সাত বৎসরের মধ্যে দুইটী ধাতুনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি বিক্রমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী রজতনির্ম্মিত, অপরটী অষ্টধাতুনির্ম্মিত। ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমটী চূড়াইন গ্রামে বারুইগণ ভূমি খনন করিবার সময় মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক উহা মান্দ্রাজশিল্প বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। শেষোক্তটী কামারখাড়া গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ মূর্ত্তি লইয়া মূর্ত্তির আবিষ্কর্ত্তা, জমিদার ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয়। উহা এখনও ঢাকা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে।
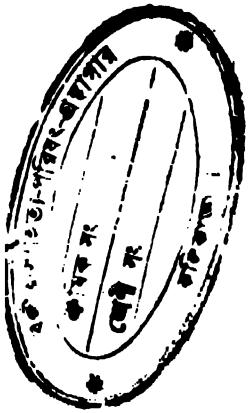
নিবেদন।

(৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

তব মুখ পানে চেয়ে
তব মধু নাম গেয়ে
চলিব একাকী;—
রোগ-শোক-দীনতায়
নিরাশা-বেদনা-ঘায়
যদি ঝরে আঁখি
তোমারি চরণতলে
লুটাব মা! 'মা' 'মা' বলে
দ্বিগুণ আবেগে;—
জীবনে মরণে মোর
প্রসারিয়ে স্নেহ-ক্রোড়
তুমি আছ জেগে!
কি ভয় আমার আর
কিবা আছে ভাবনার—
হাস মাগো! প্রাণে,
সে হাসির সুরটুকু
যেন ভরি' দেয় বুক
হাসি আর গানে!

আর্ট ও তাহার অঙ্গত্রয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়া আর্ট সম্বন্ধীয় তিনটী মূল মন্ত্রকে আর্টের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি—(১) আর্টের ভিত্তি সত্য প্রকৃতি এবং স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ; (২) মঙ্গলভাব আর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ভগবান আর্টের কেন্দ্র; এবং (৩) সৌন্দর্য্য আর্টের বহিঃপরিচ্ছদ। আমরা এই কয়টী অঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে ঐ তিনটী অঙ্গের বিষয় একত্রভাবে আলোচনা করিব—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হৃদয়ে ধারণা করিবার সুবিধা হইবে। ঐ তিনটী অঙ্গকে আমরা মূলতত্ত্ব বা মূলমন্ত্ররূপে উল্লেখ করিব, কারণ উহারা প্রকৃতই আর্টের মূল তত্ত্ব বা মূলমন্ত্র।

এই তিনটী অঙ্গ প্রত্যেক আর্টের বস্তুতে পাইতেই হইবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া আলোচনা না করিলে চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, এমন কি সঙ্গীত প্রভৃতিতেও এই অঙ্গত্রয়ের অস্তিত্ব সহজে সম্যকরূপে উপলব্ধ হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রের কয়েকটী বিভাগে, বিশেষত উপন্যাসবিভাগে আর্টের এই মূলতত্ত্ব কয়টী সহজে ও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাওয়া যায়। তাই আমরা আর্টের এই অঙ্গত্রয়ের আলোচনাসূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রের উপন্যাসবিভাগ লইয়াই কিছু নাড়াচাড়া করিব স্থির করিয়াছি। উপন্যাস অবলম্বনে আমাদের বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও এবং চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতিতেও ঐ মূলতত্ত্বগুলির উপযোগ করা সহজ হইবে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে বা চিত্রাদিতে ঐ অঙ্গত্রয়ের উপযোগ পৃথকভাবে

আলোচনা করিবার অবসর ও স্থানের অত্যন্ত অভাব।

আর্টের উপরোক্ত অঙ্গত্রয়কে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, বাহিরের সহিত যেগুলির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, যেগুলির অভাবে আর্টের বাহিরে ব্যক্ত হওয়া বা আপনাকে প্রকাশ করা অসম্ভব, সেইগুলিকে আমরা আর্টের বহিরঙ্গ বলিয়া ধরিব, এবং অবশিষ্ট-গুলিকে আর্টের অন্তরঙ্গ বলিয়া ধরিব।

উপরোক্ত অঙ্গত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়, এই দুইটী অঙ্গকে আর্টের বহিরঙ্গ বলিয়া ধরিতে পারি, কারণ ঐ দুইটী অঙ্গ না থাকিলে আর্ট বাহিরে ব্যক্তই হইতে পারে না। কাজেই আমরা দ্বিতীয় অঙ্গটীকেই আর্টের অন্তরঙ্গ বলিয়া ধরিব। প্রথমে আমরা এই অন্তরঙ্গের সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতিপূর্ব্বে এই মন্ত্রসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া আসিলেও এখানে আরও দুই একটা কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই অন্তরঙ্গ মন্ত্রটী দুই অনুমন্ত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) ভগবান আর্টের কেন্দ্র এবং (খ) মঙ্গলভাব আর্টের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। উভয়েই পরস্পরসাপেক্ষ, পরস্পর পরস্পরের উপর বলিতে গেলে অবলম্বিত।

আমরা গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে, বিশেষতঃ সর্ব্ব-প্রথম "আর্ট ও সত্য" প্রবন্ধে যাহা বলিয়া আসি-য়াছি, তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, কোন আর্ট ভগবানকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারে না। সত্য যখন আর্টের ভিত্তি, প্রকৃতি যখন আর্টের আশ্রয়, তখন সেই সত্যের মূল, সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানকে সম্পূর্ণ ছাড়িলে আর্ট কি প্রকারে দাঁড়াইতে পারে? প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে আর্ট-মাত্রেরই কেন্দ্রে ভগবানকে রাখিতে হইবেই।

ভগবানকে আর্টের কেন্দ্রে রাখিলেই, স্বভাবত মঙ্গলভাবকেও আর্টের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিতেই হইবে। কোন আর্টই, তাহা দ্বারা জগতের কেবল অমঙ্গলই হউক, এই ভাব লইয়া নামিতেই পারে না। আর্টিষ্টমাত্রেরই উদ্দেশ্য থাকে যে, তাঁহার আর্টের দ্বারা লোকদিগের আর কিছু হউক বা না হউক, অন্তত আনন্দটুকু হউক—তাঁহার আর্ট দেখিয়া একটু সুখও হউক। এই সুখই মঙ্গল-ভাবের একটা দিক। কাজেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, কোন আর্ট মঙ্গলভাবকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া দাঁড়াইতে পারে না—যেমন আর্টের কেন্দ্রে ভগ-বানকে রাখিতে হইবে, সেইরূপ সম্পূর্ণভাবে হউক বা আংশিকভাবে হউক, প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক, স্পষ্টরূপে হউক বা অস্পষ্ট-রূপে হউক, মঙ্গলভাবকেও আর্টমাত্রেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রাখিতে হইবেই। তবে আমরা যখন বলি যে, মঙ্গলভাবকে আর্টের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রাখা উচিত, তাহার অর্থ এই যে, আমরা চাহি যে, প্রত্যক্ষভাবে, সম্ভবমত সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে মঙ্গল-ভাবকে আর্টের উদ্দেশ্য রাখিতে হইবে।

আর্টের অন্তরঙ্গ এই মন্ত্রটাকে আর্টের মধ্যে স্পষ্টভাবে উপস্থিত না করিলেও আর্ট ব্যক্ত হইবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন কোন একটা মূর্ত্তির ভিতরটা ফাঁপা করিয়াই গঠিত হউক অথবা বিভিন্ন বস্তু দ্বারা পূর্ণ করিয়া নীরেট-ভাবেই গঠিত হউক, তাহাতে সেই মূর্ত্তির বহিঃ-প্রকাশের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটে না—কেবল সেই মূর্ত্তির অন্তর পরীক্ষা করিতে যে চাহিবে, সে-ই জানিতে পারিবে যে, মূর্ত্তিটী ফাঁপা অথবা নীরেট; সেইরূপ ভগবানকে কোন আর্টের কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে কি না, এবং জগতের উন্নতি ও মঙ্গল তাহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করা হইয়াছে কিনা, যে সেই আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা অনুসন্ধান করিবে, সে-ই তাহা বুঝিতে পারিবে—কিন্তু এই দুইটী অন্তরঙ্গ অনুমন্ত্রের ন্যূনাধিক অভাব ঘটিলেও আর্টের ব্যক্ত আকারে বহিঃপ্রকাশের পক্ষে কোনই ব্যাঘাত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই অন্ত-রঙ্গের অভাবের মাত্রা অনুসারে আর্টও তদনুপাতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত অঙ্গত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টীই আর্টের বহিঃপ্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ—এই দুইটীর সঙ্গে আর্টের ব্যক্ত আকার ধারণ করিবার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গ বা মন্ত্রেও আমরা দুই অনুমন্ত্রের সমাবেশ করিতে পারি—

(ক) প্রকৃতিই আর্টের ভিত্তি এবং (খ) স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ। এই দুইটী অনুমন্ত্রও এতই পরস্পরসাপেক্ষ যে, একটীকে ছাড়িলে অপরটীর কোনই সার্থকতা থাকে না। তাই আমরা ঐ দুইটী অনুমন্ত্রকে একটী মন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি। আমরা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সত্য-প্রকৃতির ভিত্তি ব্যতীত আর্ট দাঁড়াইতেই পারে না অর্থাৎ আত্মপ্রকাশই করিতে পারে না। প্রকৃতির বাহিরে গিয়া আর্ট ব্যক্ত আকার ধারণ করিবে কি প্রকারে? আর্টিষ্ট নিজেই যে প্রকৃতির ভিতরে—একমাত্র প্রকৃতির অধীশ্বর ও নিয়ন্তা ভগবানই প্রকৃতির অতীত হইতে পারেন। আর্টিষ্টকে প্রকৃতির ভিতর হইতেই, প্রকৃতিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াই আর্টের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সেই উপকরণের সাহায্যেই তাঁহার আর্টকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই যদি আর্টকে দাঁড়াইতে হয়, তবে স্বাভাবিকতা যে আর্টের প্রাণ, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধরূপেই দাঁড়ায়। সাধারণতঃ প্রকৃতির আনুগত্যকেই তো, প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়া তাহার সপক্ষে চলাকেই তো আমরা স্বাভাবিকতা বলি। সুতরাং প্রকৃতিকে আর্টের ভিত্তিরূপে রাখিতে হইলে প্রকৃতিসিদ্ধ যাহা, স্বভাবসিদ্ধ বা স্বাভাবিক যাহা, তাহাকেই যে আর্টের প্রাণরূপে রাখিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এখন, প্রকৃতির, বিভিন্নদেশে ও বিভিন্নকালে, বিভিন্নভাবে বিকাশ দেখা যায়। কাজেই আর্টের প্রাণ বজায় রাখিতে চাহিলে, আর্টকে স্বাভাবিক করিতে চাহিলে সেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের প্রাকৃতিক ভাবই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। স্থান কাল ও অবস্থা অনুযায়ী যথাযোগ্য ভাব ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে চিত্র অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর্টের প্রাণেরই অভাব হইবে—বালির বাঁধের উপর গৃহনির্ম্মাণ হইবে; তাহাতে মঙ্গলভাব, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইবে। যে পরিমাণে আর্টকে স্বাভাবিক ভাব ও অবস্থার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইবে, সেই পরিমাণেই তাহার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে; তদ্বিপরীতে অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা নিশ্চিত।

আর্টের তৃতীয় অপরিহার্য্য অঙ্গ হইল সৌন্দর্য্য। যেমন উৎসবে যোগদানের জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে গেলে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিতে হয়, সেইরূপ আর্টেরও বহিঃপ্রকাশের বা আপনাকে ব্যক্ত করিবার অন্যতর অপরিহার্য্য উপায় হইল তাহার সৌন্দর্য্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, আর্টের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, জনসাধারণের অনেকেই এই বহিঃসৌন্দর্য্যমাত্রকেই অনেক সময়ে আর্ট মনে করিয়া ভুল করে। পশ্চিমাঞ্চলে একপ্রকার কাপড়ের পুতুল নির্ম্মিত হয়—তাহার মাথাটুকুই বাহিরে থাকে আর সেই মাথা হইতে একটা রংচঙ্গা কাপড় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ক্রেতারা সেই কাপড়ের ভাঁজভঙ্গী দেখিয়া কল্পনায় তাহাকে সমগ্র পুতুল বলিয়াই গ্রহণ করে; তাহারা দেখে না যে, কাপড়ের ভিতরে আসলে কিছুই নাই। সেইপ্রকার আজকাল সাহিত্যে অস্বাভাবিকতার উপরে দাঁড়-করানো প্রাণহীন আর্টকে শব্দের আড়ম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বহিঃ-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া প্রকৃত আর্ট বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত আর্টের জহুরি, পাকা আর্টিষ্ট তাহাতে প্রতারিত হন না। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আর্টের বস্তুতে আর্টের অন্যান্য অঙ্গের সমাবেশ থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অভাব হইলে তাহার আর্ট সহজে জনসাধারণের উপলব্ধিতে আসে না।

এই সৌন্দর্য্যবিকাশের ধারা বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার মূলভাবগুলি সকল দেশে, সকল কালে ও সকল অবস্থায় সমান। যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত আর্টিষ্ট এক পদও চলিতে পারেন না, এবং যে প্রকৃতিরই সৌন্দর্য্য প্রকৃতিরই অনুসরণে একটু হের-ফের করিয়া আর্টিষ্ট নিজের আর্টকে সুব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাহেন, সেই প্রকৃতিরও মূল তত্ত্বগুলি অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও যখন মূলত সর্ব্বত্রই এক, তখন সৌন্দর্য্যও অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন আকারে

আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার মূলভাবগুলি অবস্থা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই এক ও সমভাবে দণ্ডায়মান। সৌন্দর্য্য-বিকাশের মূলভাবগুলি যে কি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে মোটামুটি এইটুকু বলিতে পারি যে, প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য প্রাণেতে উপলব্ধি করিব, স্বাধীনভাবে ও সরলভাবে, ঘোর-পেঁচালো কায়দা-কারদানি ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে অন্তরের উপলব্ধির সহিত মিলাইয়া ব্যক্ত করাই হইল সৌন্দর্য্যবিকাশের সর্ব্বপ্রধান মূলভাব। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অন্তরে উপলব্ধি না করিলে কিছুতেই সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে পারা যায় না। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য হইল ছন্দ প্রভৃতি। তাই সাহিত্যে সৌন্দর্য্যসাধন করিতে গেলে প্রকৃতির ছন্দ প্রভৃতি অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতির ছন্দ প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের উপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা সাহিত্যে বা চিত্রে বা কোন কিছুতেই সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদ দিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না।

আজকাল নিজের বক্তব্যকে আর্টের নামে খুব ঘোরালো-পেঁচালো করিয়া ব্যক্ত করিবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, বলিবার প্রণালী এতই বক্রভাব ধারণ করে যে, আর্টিষ্ট কিছুদিন বাদে নিজেই খুঁজিয়া পান না যে, তিনি কি ভাবে কি অর্থে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন। এইভাবে বাঁকাইয়া কথা বলাকে যাঁহার ইচ্ছা তিনি আর্ট বলিতে পারেন বা সুন্দর বলিতে পারেন, কিন্তু প্রসঙ্গবিশেষ ভিন্ন সাধারণতঃ আমরা তাহাকে কিছুতেই আর্টও বলিতে পারি না, সুন্দরও বলিতে পারি না। আমি সভামাঝে উপবিষ্ট, এমন সময়ে আমার নাসাগ্রে একটী মক্ষিকা বসিল। আমি সহজভাবে শোভনভাবে সেই মক্ষিকাটী যদি তাড়াইয়া দিই, তাহা সুন্দর হইবে? না, আমি যদি সেই মক্ষিকাটী তাড়াইবার জন্য পৃষ্ঠের উপর দিয়া, মস্তকের পশ্চাৎ হইতে হাত ঘুরাইয়া আনিয়া শরীরটাকে দুমড়াইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলি, তাহা সুন্দর হইবে? প্রকৃত আর্ট যাহা, প্রকৃত সুন্দর যাহা, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণকে মুগ্ধ করিবে, সকলেরই প্রাণে সাড়া পাইবে, ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোথায় কোন্ যুগে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ অসভ্য মানব দুইটী হরিণের লড়াই আঁকিয়াছিল, আজ লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার আর্ট আমরাও শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। যাহা সহজে বুঝা যাইবে না তাহাকেই যদি আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রকারান্তরে ধিক্কার দেওয়া হয়।

স্বভাবকে বিকৃত না করিলে প্রকৃতির মধ্যে ভাল যাহা, সুন্দর যাহা, তাহা আমাদেরও অন্তরে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়া তুলে, প্রকৃত আর্ট উপভোগ করিবার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। শরতের প্রভাতের শত দীপ্ত বর্ণে অনুরঞ্জিত আকাশ এবং মৃদু মন্দ বায়ু কাহার না প্রাণে আর্ট ও সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে? কাহার প্রাণ তখন রুদ্ধ গৃহে আবদ্ধ থাকিতে চায়? কিন্তু এমন আকাশ, এমন বাতাসও ম্যালেরিয়া রোগীর নিকটে যে নরকসদৃশ অনুভূত হয়, তাহা সকলেই জানে। টাটকা ফল টাটকা খাদ্য কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু যাহারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলে, তাহাদেরই নিকটে অনেক সময়ে টাটকা ফল প্রভৃতি অপেক্ষা সুঁটকি মাছ, জাতকীট পচা মাংস ও পনির, এমন কি, খাদ্য পচাইয়া যে কীট নির্গত হয়, সেই কীটও উপাদেয় বোধ হয়! সেইরূপ রুচির বিকৃতি না ঘটিলে, সাহিত্যে বা উপন্যাসে যে সকল বিষয় আমাদের উন্নত ভাবকে পরিপুষ্ট করিতে পারে, আমাদের সাধুভাবের সঙ্গে সায় পায়, সেই সকল বিষয়েরই ভিতরে প্রকৃত আর্ট ও সৌন্দর্য্য পাইবার কথা। সেই সকল ভাবের উপর দাঁড়াইলেই আমাদের বক্তব্যে সৌন্দর্য্য স্বতই ফুটিয়া উঠিতে চাহে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিষয়নির্ব্বাচনের উপর এবং নির্ব্বাচিত বিষয়কে উপযুক্ত ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার উপরে অনেক সময়ে আর্ট ও সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। আবার এই বিষয়নির্ব্বাচন ও বিষয়টাকে ফুটাইয়া তোলা অনেক সময়েই আর্টিষ্টের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রকারান্তরে বলা যায় যে, আর্টিষ্টেরই ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপরে

আর্ট ও সৌন্দর্য্য ভালরূপ ব্যক্ত হওয়া না-হওয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

আর্ট ও সৌন্দর্য্যের এই ভিতরকার কথা না বুঝিয়া অনেক সাহিত্যিক, মানুষের মনের আস্তাকুঁড় হইতে কতকগুলি অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক মনোবৃত্তি বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরে শব্দালঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি ঝকঝকে পরিচ্ছদ চাপাইয়া সেইগুলিকে তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত আশ্চর্য্য মনস্তত্ত্বের চিত্ররূপে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে চাহেন; এবং জনসাধারণকে কিনা জানি না, অন্তত শিক্ষিত-সমাজকে বুঝাইতে চাহেন যে, সেই সকল শব্দালঙ্কারে আবৃত মনোবৃত্তির ভিতর দিয়া আর্ট ও সৌন্দর্য্য একেবারে ঝলকে ঝলকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। জনসাধারণ বা শিক্ষিতসমাজ তাহার মধ্যে আর্টের বিন্দুকণাও দেখিতে পান বা না-ই পান, যখন তাঁহারা দেখেন যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা ধনে মানে জ্ঞানে খ্যাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা নিজেই এইরূপ অশ্লীল ও বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, এবং তাঁহারাই এই প্রকার রচনাকে আর্ট ও সৌন্দর্য্যে ঢলঢল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন তাঁহারাই বা তাহা অস্বীকার করেন কিরূপে? তাঁহারা ঐ সকল চিত্রে ও রচনায় আর্ট ও সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না, পাছে তাঁহারা আর্টে অনভিজ্ঞ বলিয়া চিহ্নিত হইয়া পড়েন; ইহার বিপরীতে, তাঁহারাও যে আর্ট উপভোগ করিতে সক্ষম, তাঁহাদেরও যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার রসবোধ আছে, তাহাই জানাইবার জন্য ঐ সকল আর্টরহিত চিত্রাদিকে আর্টের আদর্শ বলিয়া ঢাক পিটাইতে পরাঙ্মুখ হন না। কেবল তাহাই নহে, তখন তাঁহারা আর্টের সমঝদার নাম পাইবার প্রত্যাশায় তোতাপাখীর ন্যায় ঐ সকল রচনা সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধিবুলি সাগ্রহে গিলিতে থাকেন, এবং মনে করেন যে, তাঁহারা সত্যই ঐ সকল রচনায় আর্ট দেখিতে পাইতেছেন। এই প্রকারে ধীরে ধীরে ঐ সকল অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক বীভৎস ভাব জনসাধারণের অস্থিমজ্জাগত, প্রকৃতিগত হইয়া জনসমাজকে মিথ্যার পথে সর্ব্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লোকমান্য ৺ বালগঙ্গাধর তিলকের টিপ্পনীর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদ)

(১১) যোগাভ্যাসী পুরুষ বিশুদ্ধ স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করিবে; তাহা অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু হইবে না; উহার উপর প্রথমে দর্ভ, পরে মৃগচর্ম্ম এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে; (১২) সেখানে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার রুদ্ধ করিয়া এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য আসনে বসিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। (১৩) কায় অর্থাৎ পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা সম করিয়া অর্থাৎ সোজা-দাঁড়ানো রেখাতে নিশ্চল করিয়া, স্থির হইত, দিকসকল অর্থাৎ এদিক-ওদিক দেখিবে না; এবং নিজের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, (১৪) ভয়হীন হইয়া, শান্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া ও মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত লাগাইয়া মৎপরায়ণ হইয়া যুক্ত হইয়া যাও।

['শুদ্ধ স্থানে' এবং 'শরীর, গ্রীবা ও শির সমান করিয়া' এই শব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (শ্বে. ২. ৮ ও ১০); এবং উপরের সমুদয় বর্ণনাও হঠযোগের নহে, প্রত্যুত প্রাচীন উপনিষদে যে যোগের বর্ণনা আছে তাহারই সঙ্গে বেশী মিল আছে। হঠযোগে ইন্দ্রিয়-সমূহের নিগ্রহ বলপূর্ব্বক করা হয়; কিন্তু পরে এই অধ্যায়েরই ২৪এর শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এরূপ না করিয়া "মনসৈব ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য" মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-সকলকে রোধ করিবে। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতাতে হঠযোগ বিবক্ষিত নহে। এইরূপই এই অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই বর্ণনার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, কেহ নিজের সমস্ত জীবন যোগাভ্যাসেই কাটাইয়া দিবে। এখন এই যোগাভ্যাসেরই ফলের অধিক নিরূপণ করিতেছেন—]

(১৫) এই প্রকারে সর্ব্বদা নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখিলে মন সংযত হইয়া (কর্ম্ম-) যোগীর আমাতে স্থিতিশীল এবং শেষে নির্ব্বাণপ্রদ অর্থাৎ আমার স্বরূপে লয়প্রদ শান্তি লাভ হয়।

[এই শ্লোকে 'সদা' পদের দ্বারা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বলা উদ্দেশ্য নহে; এইটুকু অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন যথাশক্তি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ইহা অভ্যাস করিবে (১০ শ্লোকের টিপ্পনী দেখ)। বলিয়াছেন যে, এই প্রকার যোগাভ্যাস করিতে থাকিয়া 'মচ্চিত্ত' ও 'মৎপরায়ণ' হও।

ইহার কারণ এই যে, পাতঞ্জল যোগ মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি বা ক্রিয়া ; এই কসরতের দ্বারা যদি মন স্বাধীন হইয়া গেল তো ঐ একাগ্র মন ভগবানে না লাগাইয়া অন্য কোন বিষয়েও লাগান যায়। কিন্তু গীতার কথা এই যে, চিত্তের একাগ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়া, এই একাগ্রতা বা সমাধির যোগ পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানপ্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইরূপ হইলেই এই যোগ সুখকর হয়, অন্যথা ইহা নিছক ক্লেশপ্রদ হয়। এই অর্থই পরে ২৯ম, ৩০ম এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭ম শ্লোকে আবার আসিয়াছে। পরমেশ্বরে নিষ্ঠা না রাখিয়া যে লোক কেবল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের যোগ, বা ইন্দ্রিয়ের কসরত করে, সেই সব লোকেরা ক্লেশপ্রদ জারণ, মারণ বা বশীকরণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতেই প্রবীণ হইয়া যায়। এই অবস্থা কেবল গীতারই নহে, প্রত্যুত কোন মোক্ষমার্গেরই ইষ্ট নহে। এক্ষণে আবার এই যোগক্রিয়াই অধিক খুলিয়া বলিতেছেন—]

(১৬) হে অর্জ্জুন! অতিশয় পেটুক বা অনাহারী এবং অত্যন্ত নিদ্রালু অথবা জাগরণশীলের (এই) যোগ সিদ্ধ হয় না। (১৭) যাহার আহার-বিহার পরিমিত, কর্ম্মের আচরণ মাপা-জোঁকা এবং শোওয়া-জাগা পরিমিত তাহার (এই) যোগ দুঃখঘাতক অর্থাৎ সুখাবহ হয়।

[এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দের পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া এবং 'যুক্ত' শব্দের নিয়মিত মাপা-জোঁকা অথবা পরিমিত অর্থ। পরেও দুই-এক স্থানে যোগ শব্দের পাতঞ্জলযোগই অর্থ হইতেছে। তথাপি এইটুকু হইতেই এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলযোগই স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে। পূর্ব্বে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং উহার সাধনটুকুরই জন্য পাতঞ্জল-যোগের এই বর্ণনা। এই শ্লোকের "কর্ম্মের উচিত আচরণ" এই শব্দ হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্ম করিতে থাকিয়া এই যোগ অভ্যাস করা চাই। এখন যোগীর অল্প কিছু বর্ণনা করিয়া সমাধিসুখের স্বরূপ বলিতেছেন—]

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

(১৮) যখন সংযত মন আত্মাতেই স্থির হইয়া যায়, এবং কিছুরই উপভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে না, তখন বলিতেছেন যে, উহা 'যুক্ত' হইয়া গিয়াছে। (১৯) বায়ু-রহিত স্থানে রক্ষিত দীপের জ্যোতি যেরূপ নিশ্চল হয়, সেই উপমাই চিত্ত সংযত করিয়া যোগাভ্যাসকারী যোগীকে দেওয়া যায়।

[এই উপমার অতিরিক্ত মহাভারতে (শান্তি ৩০০. ৩২, ৩৪) এই দৃষ্টান্ত আছে—, "তৈলপূর্ণ পাত্র সিঁড়িতে লইয়া যাইবার কালে অথবা তুফানের সময় নৌকা রক্ষার জন্য মানুষ যেরূপ 'যুক্ত' অথবা একাগ্র হয়, যোগীর মন সেইরূপই একাগ্র থাকে। কঠোপনিষদের সারথী ও রথের অশ্বসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত তো প্রসিদ্ধই আছে ; আর যদিও ঐ দৃষ্টান্ত গীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬৮ এবং এই অধ্যায়েরই ২৫ শ্লোক এ সব দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়াই উক্ত হইয়াছে। যদিও গীতোক্ত যোগের পারিভাষিক অর্থ কর্ম্মযোগ, তথাপি ঐ শব্দের অন্য অর্থও গীতাতে আসিয়াছে। উদাহরণ যথা, ৯. ৫ এবং ১০. ৭ শ্লোকে যোগের অর্থ "অলৌকিক অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার শক্তি"। ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যোগ শব্দের অনেক অর্থ হওয়ার কারণেই গীতায় পাতঞ্জল-যোগ এবং সাংখ্য মার্গকে প্রতিপাদ্য বলিবার সুবিধা ঐ-ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা পাইয়াছে। ১৯ম শ্লোকে বর্ণিত চিত্ত-নিরোধরূপ পাতঞ্জল-যোগের সমাধির স্বরূপই এখন সবিস্তার বলিতেছেন—]

(২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে স্থানে রত হইয়া যায়, এবং যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, (২১) যেখানে (কেবল) বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অত্যন্ত সুখ উহা অনুভব করে, এবং যেখানে উহা (একবার) স্থির হইয়া তত্ত্ব হইতে কখনও টলে না, (২২) এইরূপ যে স্থিতি পাইলেই উহা অপেক্ষা অন্য কোন লাভই সে অধিক ভাবে না, এবং যেখানে স্থির হইলে কোনও গুরুতর দুঃখ (উহাকে) সেখান হইতে বিচলিত করিতে পারে না, (২৩) তাহাকে দুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ 'যোগ' নামক স্থিতি বলা হয় ; এবং এই 'যোগ'-এর আচরণ মনকে ব্যস্ত হইতে না দিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক করা চাই।

[এই চারি শ্লোকের একই বাক্য। ২৩ম শ্লোকের আরম্ভের 'উহার' (তং) এই দর্শক সর্ব্বনাম হইতে প্রথম তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিষ্ট ; এবং চারি শ্লোকে 'সমাধি'র বর্ণনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগ-

সূত্রে যোগের এই লক্ষণ আছে যে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। ইহারই সদৃশ ২০ম শ্লোকের আরম্ভের শব্দ। এখন এই 'যোগ' শব্দের নূতন লক্ষণ জানিয়া বুঝিয়া দিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের পূর্ণাবস্থা এবং ইহাকেই 'যোগ' বলে। উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, নিগ্রহকর্ত্তা এবং উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছয় মাসে সিদ্ধ হয়, (মৈত্র্যু. ৬. ২৮; অমৃতনাদ. ২৯; মভা. অশ্ব. অনুগীতা ১৯. ৬৬)। কিন্তু প্রথমে ২০ম ও ২৮ম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জল যোগের সমাধিপ্রাপ্ত সুখ কেবল চিত্তনিরোধের দ্বারা হয় না, প্রত্যুত চিত্তনিরোধের দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই দুঃখরহিত স্থিতিকেই 'ব্রহ্মানন্দ' বা 'আত্মপ্রসাদজ সুখ' অথবা 'আত্মানন্দ' বলে (গী. ১৮. ৩৭ ও গীতার. পৃ. ২৩৪ দেখ)। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমতা এক পাতঞ্জলযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির সেই পরিণাম জ্ঞান ও ভক্তি হইতেও হয়। এই মার্গই অধিক প্রশস্ত ও সুলভ মনে হয়। সমাধির লক্ষণ বলা হইল; এখন বলিতেছেন যে, উহাকে কি প্রকারে লাগানো চাই—]

§§ সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

(২৪) সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংযত করিয়া (২৫) ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে শান্ত হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থির করিয়া মনে কোনও বিচার আনিতে দিবে না। (২৬) (এই রীতিতে চিত্তকে একাগ্র করিতে করিতে) চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই সেই স্থান হইতে রোধ করিয়া উহাকে আত্মারই অধীন করিবে।

[মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপনিষদে প্রদত্ত রথের উপমা দ্বারা (কঠ ১. ৩. ৩) সুন্দর ব্যক্ত হয়। যেরূপ উত্তম সারথি রথের ঘোড়াকে এধারে-ওধারে যাইতে না দিয়া সোজা রাস্তায় লইয়া যায়, সেইরূপ প্রযত্নই মনুষ্যকে সমাধির জন্য করিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন মনকে স্থির করিবার অভ্যাস করিয়াছে, উপরের শ্লোকের মর্ম্ম শীঘ্রই তাহার বোধগম্য হইবে। মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রযত্ন করিতে লাগ তো সে অন্য দিকে সরিয়া যায়; এবং এই স্বভাব না রোধ করিলে সমাধি লাভ হয় না। এখন, যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত স্থির হওয়ার যে ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা করিতেছেন—]

§§ প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

(২৭) এই প্রকার শান্তচিত্ত রজোগুণরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত (কর্ম্ম-) যোগীর উত্তম সুখপ্রাপ্তি হয়। (২৮) এই রীতিতে নিরন্তর নিজের যোগাভ্যাসকারী (কর্ম্ম-) যোগী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসংযোগ হইতে প্রাপ্ত অত্যন্ত সুখের আনন্দ উপভোগ করেন।

[এই দুই শ্লোকে আমি কর্ম্মযোগী অর্থ করিয়াছি। কারণ কর্ম্মযোগের সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণনা করা হইয়াছে; অতএব পাতঞ্জলযোগের অভ্যাসকারী উক্ত পুরুষের দ্বারা কর্ম্মযোগীই বিবক্ষিত হইয়াছে। তথাপি যোগীর অর্থ 'সমাধি লাগাইয়া উপবিষ্ট পুরুষ'ও করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহা হইতেও ভিন্ন। এই নিয়মই পরবর্ত্তী দুই-তিন শ্লোকেও লাগিবে। এই প্রকার নির্ব্বাণ ব্রহ্মসুখের অনুভব হইলে পর সকল প্রাণীর বিষয়ে যে আত্মৌপম্য-দৃষ্টি হয়, এখন তাহার বর্ণনা করিতেছেন—]

§§ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

(২৯) (এই প্রকার) যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত হইয়াছে তাঁহার দৃষ্টি সম হইয়া যায় এবং তিনি সর্ব্বত্র দেখেন যে, আমি সকল প্রাণীর মধ্যে আছি এবং সকল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। (৩০) যে আমাকে (পরমেশ্বর পরমাত্মাকে) সব স্থানে এবং সকলকে আমাতে দেখে তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন হই না এবং সেও আমা হইতে কখনও দূরে যায় না।

[এই দুই শ্লোকে প্রথম বর্ণনা 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অব্যক্ত অর্থাৎ আত্মদৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা প্রথমপুরুষ-দর্শক 'আমি' পদের প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ ভক্তিদৃষ্টিতে করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থ দুইয়ের একই (গীতার, পৃ ৪২৬-৪৩২)। মোক্ষ ও কর্ম্মযোগ

এই দুয়েরই আধার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য-দৃষ্টিই। ২৯ম শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধাংশ কিছু পৃথক আকারে মনুস্মৃতি (১২. ৯১), মহাভারত (শা. ২৩৮. ২১ ও ২৬৮. ২২) এবং উপনিষদেও (কৈব. ১. ১০; ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি গীতারহস্যের ১২ম প্রকরণে সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম ও কর্ম্মযোগের মূল (পৃ. ৩৯০ প্রভৃতি)। এই জ্ঞান না হইলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সিদ্ধ হওয়াও ব্যর্থ এবং এইজন্যই পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে পরমেশ্বরের জ্ঞান বলা আরম্ভ করিয়াছেন।]

(৩১) যে একত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-বুদ্ধিকে মনে রাখিয়া সকল প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে (পরমেশ্বরকে) ভজনা করে, সেই (কর্ম্ম-) যোগী সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহার করিয়াও আমাতে থাকে। (৩২) হে অর্জ্জুন! সুখ হোক্ বা দুঃখ হোক্ যার নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার (আত্মৌপম্য) দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র দেখিতে থাকে, সেই কর্ম্ম-) যোগীকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলা হয়।

['প্রাণীমাত্রে একই আত্মা' এই দৃষ্টি সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগ দুই মার্গে একই প্রকার। এইরূপেই পাতঞ্জল-যোগেও সমাধি লাগাইয়া পরমেশ্বরকে জানিলে পর এই সাম্যাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগী উভয়েরই সকল কর্ম্মের ত্যাগ ইষ্ট, অতএব তাহারা ব্যবহারে এই সাম্যবুদ্ধির উপযোগ করিবার অবসরই আসিতে দেয় না এবং গীতার কর্ম্মযোগী এরূপ না করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রাপ্ত এই সাম্যবুদ্ধির ব্যবহারেও নিত্য উপযোগ করিয়া, জগতের সকল কার্য্যই লোকসংগ্রহের জন্য করে; এই দুয়েতে ইহাই বড় গুরুতর প্রভেদ। এবং ইহা হইতে এই অধ্যায়ের শেষে (শ্লোক ৪৬) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, তপস্বী অর্থাৎ পাতঞ্জলযোগী ও জ্ঞানী অর্থাৎ সাংখ্যমার্গী, এই দুইয়ের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা শুনিয়া এখন অর্জ্জুন এই সংশয় করিতেছেন—]

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥
অসংযতাত্মনা যোগ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬॥

অর্জ্জুন কহিলেন—(৩৩) হে মধুসূদন! সাম্য অথবা সাম্যবুদ্ধিতে প্রাপ্ত এই যে (কর্ম্ম-) যোগ তোমাকে বলিয়াছি, আমি দেখিতেছি না যে (মনের) চঞ্চলতার কারণে উহা স্থির রহিবে। (৩৪) কারণ হে কৃষ্ণ! এই মন চঞ্চল, জেদালো, বলবান ও দৃঢ়। বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাওয়ার পুঁটলি বাঁধিবার ন্যায়, ইহার নিগ্রহ করা আমি অত্যন্ত দুষ্কর দেখিতেছি।

[৩৩ম শ্লোকের 'সাম্য' অথবা 'সাম্যবুদ্ধি' হইতে প্রাপ্ত, এই বিশেষণ হইতে এস্থলে যোগশব্দের কর্ম্মযোগই অর্থ হইতেছে। যদিও প্রথমে পাতঞ্জলযোগের সমাধির বর্ণনা আসিয়াছে, তথাপি এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দে পাতঞ্জলযোগ বিবক্ষিত নহে। কারণ ভগবানই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (২. ৪৮)—"বুদ্ধির সমতা বা সমত্বকেই যোগ বলে"। অর্জ্জুনের সমস্যা স্বীকার করিয়া ভগবান কহিতেছেন—]

শ্রীভগবান কহিলেন—(৩৫) হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মন চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন; কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে স্বায়ত্ত করা যায়। (৩৬) আমার মতে, যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত নহে, তাহার (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; কিন্তু অন্তঃকরণকে বশে রাখিয়া প্রযত্ন করিতে থাকিলে উপায়ের দ্বারা (এই যোগের) প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব।

[তাৎপর্য্য, প্রথমে যে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে সিদ্ধ হইয়া যায়। কোনও কার্য্য বারবার করাকে 'অভ্যাস' বলা হয় এবং 'বৈরাগ্য'এর অভিপ্রায় রাগ বা প্রীতি না রাখা অর্থাৎ ইচ্ছা-বিহীনতা। পাতঞ্জল-যোগসূত্রে আরম্ভেই যোগের লক্ষণ বলা হইয়াছে এই যে,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে (এই অধ্যায়েরই ২০ম শ্লোক দেখ) এবং ফের পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে যে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই শব্দই গীতাতে আসিয়াছে এবং অভিপ্রায়ও ইহাই; কিন্তু ইহা হইতেই বলা যায় না যে, গীতাতে এই শব্দ পাতঞ্জলযোগসূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে (গীতার. পৃ ৫৩৮ দেখ)। এই প্রকার যদি মন নিগ্রহ করিয়া সমাধি লাগানো সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের অভ্যাসে যদি এই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন এই আর একটী সংশয় আসে যে, প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে অনেক লোক দুই-এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে পৌঁছিতে পারে না—ফের এই প্রকার লোক এই সিদ্ধি কি করিয়া পাইবে? কারণ এক জন্মে, যতটা সম্ভব ততটা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অভ্যাস করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে লাগিলে তো তাহা মৃত্যুকালে অর্দ্ধেকই থাকিয়া যাইবে, এবং পর জন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলে তো আবার পরবর্ত্তী জন্মেও ঐ অবস্থা হইবে। অতএব অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই প্রকারের পুরুষ কি করে—]

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

বাহির হওরে কাজের স্রোতে।

(মিশ্র রামকেলী—দাদরা)

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুর—শ্রীবাণী দেবী
স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্ত রবি উঠল গগন ভরে
বাহির হও রে এবার কাজের স্রোতে ॥
ঘুমের ঘোর সব ভেঙ্গে দিয়ে
তাঁরি পুণ্য নামটি নিয়ে
বাহির হও রে এবার কাজের স্রোতে ॥
ভরসা আশা যত কিছু
তাঁরি পায়ে নিবেদিয়ে,
এক মনে তাঁর চরণ ধরে
ভক্তিজলে ধৌত হিয়ে—
বাহির হও রে এবার কাজের স্রোতে ॥
গাছে গাছে পাখী যত
গীত শত উঠছে গেয়ে ;
তাদের গানে পুষ্প শত
গাছে গাছে ফুটছে ছেয়ে।
এমন বিমল সকালবেলা
কাটায়োনা অবহেলে—
ফুলের পাখীর আনন্দেতে
আপন প্রাণে মিশাইয়ে,
বাহির হও রে এবার কাজের স্রোতে ॥

১´ • ১´ ॥ • ১´
II পদা -া দা। -পা মা গা I মা -া পা। -া পা পা I পা -মা পদা।
র • ক্ত • র বি উ ঠ্ ল • গ গন্ ভ • রে

• ১´ • ১´ •
। -া -পপা -া I -া -মগা -মা। -া সা সা I সা রা গা। গা মা -া I
• •• • • •• • • বা হির্ হ ও রে এ বা র্

১´ • ১´ •
I মা মা -গা। মা -া -পা I পদা -া -পপা। -া -মগা -মা II
কা জে র্ স্রো • • তে • •• • •• •

• ১´ • ১´ •
II -া -া -া I { দা দা -া। না -া র্সা I র্রা র্রা -র্সা। না র্সা -া I
• • • ঘু মের • ঘো র্ সব্ ভে ঙ্গে • দি য়ে •

১´ • ১´ • ১´
I দা দা -া। না -া র্সা I র্সনা -র্রা র্রা। র্সর্সা না -দা } I -পা -া -া।
তাঁ রি • পু • ণ্য নাম্ • টি নি• য়ে • • • •

• ১´ • ১´ •
। -া সা সা I সা -রা গা। গা মা -া I মা মা -গা। মা -া -পা I
• বা হির্ হ ও রে এ বা র্ কা জে র্ স্রো • •

১´ •
I পদা া -পপা। -া -মগা -মা II
তে • •• • •• •

• ১´ • ১´ •
II -া -া -া I { দা -া দা | না র্সা -া I র্ঋা র্ঋাঃ -র্সঃ | না র্সা -া I
• • • ত র্ সা আ শা • য ত • কি ছু •

১´ • ১´ • ১´
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া I র্মা র্জ্ঞা -া | র্ঋা র্সা -া } I দা -র্সনা র্সা |
তাঁ রি • পা• য়ে • নি বে • দি য়ে • এ •ক্ ম

• ১´ • ১´ •
| র্ঋা র্সা -া I র্ঋা র্ঋা -র্সা | ণা দা -পা I পা -া পা | পা পা -মা I
নে তাঁ র্ চ র ণ্ ধ রে • ভ • ক্তি জ লে •

১´ • ১´ • ১´
I পা -ণা ণা | দা পা -া I -া -া -া | -া সা সা I সা -রা গা |
ধৌ • ত হি য়ে • • • • • বা হির্ হ ও রে

• ১´ • ১´ •
| গা মা -া I মা মা -গা | মা -া -পা I পদা -া -পপা | -া -মগা -মা II
এ বা র্ কা জে র্ স্রো • • তে • •• • •• •

• ১´ • ১´ •
II -া -া -া I { সা সা -রা | গা মা -া I মা মা -গা | মগা মা -া I
• • • গা ছে • গা ছে • পা খী • য• ত •

১´ • ১´ • ১´
I মা মা -গা | মা পা -া I পা -ণা ণা | দা পা -া } I র্সা র্সা -না |
গী ত • শ ত • উ ঠ্ ছে গে য়ে • তা দে র্

• ১´ • ১´ •
| র্সা র্সা -র্ঋা I র্সা -া ণা | দা পা -া I পা পা -া | পমা পা -া I
গা নে • পু • ষ্প শ ত • গা ছে • গা• ছে •

১´ • ১´ • ১´
I পা -ণা ণা | দা পা -া I { দা দা -া | না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা -র্সা |
ফু ট্ ছে ছে য়ে • এ ম ন্ বি ম ল্ স কা ল্

• ১´ • ১´ •
| না র্সা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া I র্মা র্জ্ঞা -া | র্ঋা র্সা -া } I
বে লা • কা টা • য়ো• না • অ ব • হে লে •

১´ • ১´ • ১´
I দা দা -র্সনা | র্সা র্সা -র্ঋা I র্সা র্সা -ণা | দা পা -া I পা পা -া |
ফু লে •র্ পা খী র্ আ ন • ন্দে তে • আ প ন্

• ১´ • ১´ •
| পমা পা -া I ণা ণা -দা | দা পা -া I -া -া -া | -া সা সা I
প্রা• ণে • মি শা • ই য়ে • • • • • বা হির্

১´ • ১´ • ১´
I সা -রা গা | গা মা -া I মা মা -গা | মা -া -পা I পদা -া -পপা |
হ ও রে এ বা র্ কা জে র্ স্রো • • তে • ••

•
| -া -মগা -মা II II
• •• •

৭

৺প্রতিভা দেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।

গত ২৩শে পৌষ কৃষ্ণপঞ্চমীর প্রাতঃকালে ৺প্রতিভা দেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আর্য্যকুমার চৌধুরী কর্তৃক একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যোড়শোপচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় শতাধিক আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। ভোজ্য যথাবিধি উৎসর্গ করা হইলে পর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী অর্চনাগীত "দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান" গান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনার শেষভাগে ক্ষিতীন্দ্র বাবু অশ্রুসিক্ত নয়নে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন :—

দিদির এই শ্রাদ্ধবাসরে আমি আর কি বলিব? আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে দিদির শ্রাদ্ধবাসরে আমাকে বেদীর কাজ করিতে হইবে। ভগবান তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাকে এ রাজ্য হইতে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য যেন আমরা তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্যে সন্দিহান না হই। দিদি যে রকম ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন, সে রকম ভক্তিমতী রমণী সত্যই জগতে দুর্লভ। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখিয়া আসিয়াছি—আমাদের মনে কত সময়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব আসিলে দিদি ও দাদা আমাদের সংশয় দূর করিয়া ভগবানে ভক্তি ফিরাইয়া আনিতেন।

তাঁহার মত সতী-সাধ্বীও সংসারে বিরল। স্বামীর কষ্টের নিকট নিজের শত কষ্টও গ্রাহ্য করিতেন না। বিবাহের পর পাছে তাঁহার স্বামীর কোর্টে যাইতে বিলম্ব হয়, পাছে তাঁহার কোর্টে আহারের কষ্ট হয়, সেইজন্য আমরা জানি যে তিনি নিজের হাতে সকালের রান্না ও কোর্টের খাবার ঠিক করিতেন। মেয়েদের এবং বউমাদের বলি যে, তাঁহারা এ বিষয়ে দিদির জীবনকে আদর্শ স্থানে রাখিয়া কাজ করুন—করিলে তাঁহারা জীবনে সুখী হইতে পারিবেন এবং গৃহে সুখ শান্তি আনিতে পারিবেন।

আজ আর একটী কথা মনে আসিতেছে। সেটী দিদির নির্ব্বিরোধী ভাব। সংসারে থাকিতে গেলেই বিরোধ-বিবাদের ছোট-বড় কথা এমন কত আসে আর কত যায়। কিন্তু ঘরের গৃহিণী যদি সেই বিরোধ বিবাদের অগ্নিতে ইন্ধন দেন, তবেই সেই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া গৃহকে অল্প সময়ের মধ্যে ছারখার করিয়া দেয়। কিন্তু ঘরের গৃহিণী যদি নির্ব্বিরোধ হন, তবেই তিনি সেই আগুনে জল দিয়া নিভাইয়া দিতে পারেন এবং তাহলেই ঘরের শ্রী বজায় থাকে। আমরা জানি, এমন অনেক স্থল আসিয়াছিল যখন আমাদের মধ্যে হয়তো সামান্য কথা কাটাকাটি হইতে একটা গুরুতর মনান্তর ঘটবার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু দিদির নির্ব্বিরোধ ভাবের জন্য সেই বিরোধবিবাদের সম্ভাবনায় শান্তিজল পড়িয়া অঙ্কুরেই সেই আগুনের ফিনকি নিভিয়া গেল। ছেলেমেয়েদের এবং বউমাদের সকলকেই এই ভাবটি মনেতে পোষণ করিয়া দিদির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

তদনন্তর ঋতেন্দ্র বাবু প্রেমসিক্ত হৃদয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

ছেলেবেলায় যাঁহার কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায়, তাঁহার কথা হৃদয়ে চিরদিন গ্রথিত হইয়া থাকে। দিদির কাছ থেকে আমরা সেই স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি বলিয়া দিদি আমাদের মনের মধ্যে চিরজাগরূক হইয়া আছেন। সংসারে মানুষ যায় মানুষ আসে—যোগবিয়োগ নিত্য চলিয়াছে। এই যোগ-বিয়োগের মধ্যে স্মৃতিটুকুই একমাত্র মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায় সকলকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। স্মৃতি আসে কোথা হইতে? স্মৃতির উৎপত্তি ভালবাসা হইতে। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে আমরা স্মরণে রাখি—ভুলিতে পারি না। স্মৃতির মূলে ভালবাসা। এই যে বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গেছেন, তাঁহাদের তিরোভাবের পর তাঁহাদের স্মরণ করে শত শত লোক যে অশ্রু ফেলিতে থাকে, সেও ত কেবল ভালবাসার জন্য। কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজও ভালবাসার বলে শত সহস্র লোক রামনাম স্মরণ করিয়া থাকে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টের আবির্ভাব হইলেও আজ যে শত শত প্রাণী খৃষ্টনাম স্মরণ করে, তাহা তাঁহার প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগ বশতই করিয়া থাকে। আমরা দিদিকে ভালবাসতাম ও দিদি আমাদের ভালবাসতেন, তাই দিদির ছেলেবেলাকার কথা আজও আমাদের মনে গ্রথিত হইয়া আছে। ছেলেবেলা থেকে আমরা দেখিতে পাই, দিদি সুরভি ফুলের মত সুন্দর ছিলেন। কাহাকেও কটু কথা বলিতে তাঁহাকে শুনি নাই। পিতৃদেব তাঁহাকে যেমন বিদ্যায় ও চরিত্রে অলঙ্কৃত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রতিভা দেবী জীবনে তাহার সার্থকতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছেলেবেলায় যখন তিনি প্রথম "বিদ্বজ্জন সমাগমে" শা সদারঙ্গের প্রসিদ্ধ খেয়াল "চতুরঙ্গরঙ্গসন" গান করেন, তখন সেই বালিকার মুখে তান-লয়সমন্বিত সুমিষ্ট গান শুনিয়া সঙ্গীতনায়ক ৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এত মুগ্ধ ও চমকিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার নিজের রচিত একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ উপহার না দিয়া যান নাই। দিদির পর থেকেই আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিদ্যার যে একটা চমক আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্র ও বিনয়-সৌরভ না থাকে ত তাহা গন্ধহীন ফুলের মত শোভা পায় না। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা দেবীর যেরূপ চরিত্রবল ও স্বাভাবিক বিনয় ছিল, তাহাতে তিনি আদর্শরমণীরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

বস্তুতই প্রতিভা নাম তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সেকালে বিদ্বজ্জনসমাগমে যখন "বাল্মীকিপ্রতিভা" গীতিনাট্য অভিনীত হইত তখন প্রতিভা দেবী সরস্বতীর অভিনয় করিয়া নিমন্ত্রিত জনসঙ্ঘকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। সঙ্গীতেই প্রতিভার প্রতিভা ফুটিয়াছিল, তাই আজ দেখি সঙ্গীতসঙ্ঘ প্রতিভার প্রাণের জিনিষ।

বাল্যজীবনে যাহা প্রতিভাত হয়, শেষ জীবনে তাহারই প্রতিচ্ছায়া পড়ে। তাই দেখি, প্রতিভার বাল্যজীবনে যে সঙ্গীত মুকুলিত, শেষ বয়সে তাহাই সঙ্গীতসঙ্ঘে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মোটের উপরে দেখিতে পাই

সঙ্গীতেই তাঁহার জীবনের আনন্দ ছিল, সেইজন্য তাঁহার হৃদয়ে কঠোরতা স্থান পায় নাই।

এখানে তাঁর জীবনের নানা গুণের বিষয় আলোচনা করিবার সময় এখন অল্প। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি তাঁহার কথা আমাদিগকে ভুলিতে দেয় না। তিনি একবৎসর কাল পরলোকে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রাণের সৌরভ এখনও সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আজ একবৎসর কাল পরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি। তিনি স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন, আমরা কেবল তাঁর স্মৃতিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিব। সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু সুগতি দুর্গতি সকলই ভগবানের হস্তে। ভগবান তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার কল্যাণ হস্ত তাঁহার প্রতি রাখুন এই আমাদের প্রার্থনা।

পরিশেষে শ্রীমান আর্য্যকুমার পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য ভাবগদ্গদকণ্ঠে প্রার্থনা করিলে পর শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীবিরচিত নিম্নলিখিত সময়োপযোগী গানটী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক গীত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়—

বর্ষান্তে।

তুমি ত গিয়াছ চলি'
কোন কথা নাহি বলি'
কারে দিয়া গেছ তব সোনার সংসার,
পতি পুত্র পরিজনে
কাঁদাইয়া জনে জনে
চলে গেছ সুরপুরে পথ চেনা ভার ;
দিয়া গেছ অশ্রু-স্মৃতি
নিয়ে গেছ সুখ-প্রীতি
এত স্নেহ ভালবাসা ভুলা নাহি যায়,
বিস্মৃতি মুছিতে নারে
জীবনের পরপারে
অমর আত্মার প্রেম লোকান্তরে হায় ;
এক বর্ষ পূর্ণ আজি
শ্রদ্ধার কুসুম রাজি
এনেছি হৃদয় ভরি' দিতে উপহার
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি
অন্তরে জাগিবে নিতি
ঝরিবে তোমারে স্মরি' নয়ন-আসার।

উপস্থিত সকলকেই জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করা হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে দীনদরিদ্রদিগকে অনেক বস্ত্র বিতরিত হইয়া ছল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকে।

বিগত ২৭শে পৌষ রাত্রি ৩টার সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল মহর্ষিপরিবার একটি মহামূল্য রত্ন হারাইলেন তাহা নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের একটি বিরাট স্তম্ভ খসিয়া গেল, আদিব্রাহ্মসমাজের ত কথাই নাই। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনে যে উৎসাহের সহিত তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যেও তাঁহার সে জলন্ত উৎসাহ ম্লান হয় নাই। মাঘোৎসব নিকটে আসিতেছে বুঝিয়া তিনি তাঁহার আবাস-নিকেতন রাঁচি হইতে কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সহিত বালিগঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসব-দিবসে প্রাতে বেদীর আসন গ্রহণ করিবেন মনস্থ করিয়া উৎসবের উপযোগী সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সোমবার অপরাহ্নে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার কথোপকথন হয়। পরদিন রবীন্দ্র বাবুকে বালিগঞ্জে আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রি ১১টার পর হইতে তাঁহার যে সামান্য হৃদ্‌রোগ সঞ্চাত হইয়াছিল তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিকিৎসাসত্ত্বেও তাহার প্রতিবিধান হইল না। রাত্রি ৩টার সময় প্রাণবায়ু বিদায় গ্রহণ করিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে শেষবার গমন করেন তাহার সমসময়ে মহর্ষিদেবের তিন পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী দ্বারকানাথ নিজের অভিজ্ঞতায় ও রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে বুঝিয়াছিলেন যে বিলাতে গিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে না পারিলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ সুদূরপরাহত। তাই তিনি বিলাত যাইবার সময় দুই তিনটি ছাত্রকে এবং আপন কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। উঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী একজন। নগেন্দ্রনাথও বিলাতে থাকিয়া ইংরাজি সাহিত্যে সমধিক অধিকার লাভ করেন এবং বিলাতে অবস্থানকালে লর্ড ডেলহউসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ডেলহউসী গবর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশ আসিলে "এসিষ্টাণ্ট কালেক্টার অফ কষ্টমস" এই পদ সৃষ্টি করিয়া দেড় হাজার টাকা বেতনে ঐ পদে নগেন্দ্রনাথকে নিয়োগ করেন। নগেন্দ্রনাথ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হন। মহর্ষি পূর্ণ উদ্যমে যখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মিলিত হন। কেশব বাবুর সহিত সত্যেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। উভয়েই প্রাণমন ঢালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষিদেব এই দুজনকে লইয়া সিংহলযাত্রা করিয়াছিলেন। ভ্রমণের দৈনিক বৃত্তান্ত সত্যেন্দ্র বাবু লিপিবদ্ধ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তৎসময়ে বাহির করেন। শ্রদ্ধেয় মনমোহন ঘোষও সত্যেন্দ্র বাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে বিলাতে গিয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিলে মহর্ষিদেব আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। তখন ভারতের কোন স্থান হইতে কেহই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উপযোগীতা মনেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। দুই বন্ধুই বিলাতে গিয়া অধ্যয়নান্তে উক্ত পরীক্ষা দিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রুগ্ন ও ক্ষীণ দেহে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মনমোহন উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিয়া কলি-

কাতায় ফিরিয়া আসিয়া যথেষ্ট খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—

সুরপুরে সশরীরে শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি' পুণ্যবলে,
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি' এবে ভারতমণ্ডলে—
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে।

সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপের বহুল অংশ পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে জেলার জজ ও সেসন জজ রূপে বহুদিন ধরিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম সেসন জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই পদপ্রাপ্তিতে বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজমহলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র রাজকার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় নাই। তিনি বোম্বাইএর প্রার্থনাসমাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছেন। পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসিবার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজের পবিত্র উপাসনা কার্য্য ধারাবাহিকরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিনিকেতনের উৎসবে ও মাঘোৎসবে বেদীর আসন গ্রহণ করিতেন এবং বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পর্য্যন্ত যোগ দিতেন এবং নিজ বাগ্মিতাশক্তিগুণে বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোহরণ করিতেন। ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি রাঁচিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপন সহোদর শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকরূপে বহু বৎসর ধরিয়া অনেক মূল্যবান প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু অবধি সত্যেন্দ্র বাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন।

মহর্ষিপরিবার বহুকাল ধরিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু এক মুহূর্ত্তও বিফলে ক্ষেপন করেন নাই। "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" তাঁহারই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। মহর্ষির নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া তিনিই উহা প্রকাশ করান। "বোম্বাই-চিত্র" তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জজিয়তী অবস্থায় তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে তিনি গীতা ও তাহার পদ্যানুবাদ তাঁহার গবেষণা সহ বাহির করেন। "নবরত্নমালা"ও "বৌদ্ধধর্ম্ম" তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা। তিনি তাঁহার এই রোগশয্যায় শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার সাহায্যে গীতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুইখানি গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন। গীতা ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার কর্ম্মে উৎসাহ উপলব্ধি হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা, বৈদিকযুগের সমালোচনা ও বি[illegible]বিধ বিষয়ের আলোচনা, যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং নিজ হস্তাক্ষরে লিখিয়া পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাহার কলেবর এত বড় যে উহা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই লিখনপঠনে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি যেসকল ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ব্রাহ্ম সমাজের অক্ষয় ও অমূল্য সম্পত্তি। এমন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত অল্পই আছে। এতদ্ব্যতীত মনমোহন বাবুর সহিত তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকতা করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সত্যেন্দ্র বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে প্রকৃত জ্ঞান ও সবল চরিত্রের উপরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্ত্রীস্বাধীনতার উপকার বুঝিয়াছিলেন বলিয়া অকুতোভয়ে নিজের সহধর্ম্মিণীকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া গিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কতকাল পূর্ব্বে তিনি কালিদাসের কাব্যাদি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও অতি সুন্দর ভাবে তাহার আমূল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সেক্সপিয়ারের বহুল অংশও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন কোন সভায় সুনিপুণভাবে উহার আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহার কৃত মেঘদূতের অনুবাদ অতি অপূর্ব্ব।

তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান ছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক ধরিয়া বর্ত্তমানে অনেকে ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। সত্যেন্দ্র বাবু যে সময়ে বিলাত হইতে এদেশে আসেন, তাহার পরবর্ত্তী সময়ে যাঁহারা বিলাত হইতে কৃতবিদ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহারা দেশের সহিত, জাতির সহিত, দেশপ্রচলিত রীতিনীতির সহিত সর্ব্ববিধ বন্ধন ছেদন করিতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু জাতীয়ভাব হইতে কিছুমাত্র পরিভ্রষ্ট হন নাই। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য অন্যতর সহায় হইয়াছিল। এই হিন্দুমেলা উপলক্ষে তাঁহার রচিত "মিলে সবে ভারতসন্তান" জাতীয় সঙ্গীতটী কোন্ বঙ্গবাসী না জানেন? সর্ব্বোপরি অমায়িকতা নিরহঙ্কার, বালকসুলভ সারল্য, সর্ব্বাবস্থায় সাম্য ও ধীরতা এবং স্নেহপ্রবণতা এতই যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহাতে বিরাজিত ছিল যে, অন্যত্র তাহার সমাবেশ বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত দুর্ল্লভ। তিনি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজিত ছিলেন, তাঁহার বিয়োগে অনুরূপ আর একটি আদর্শ মিলিবে কি না সন্দেহ। পরমপিতা তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাকে স্থানদান করুন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা দেবীর অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ত্রিনবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
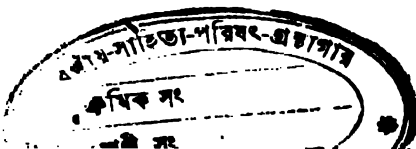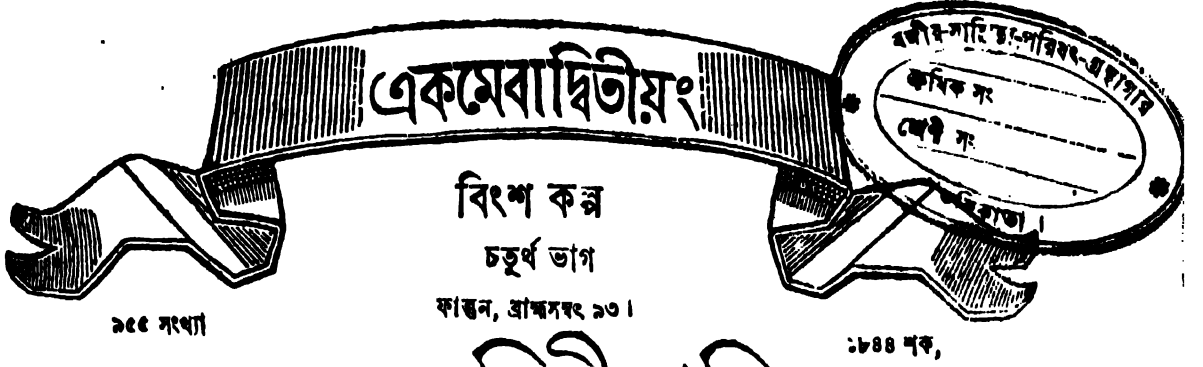
বিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩।
৯৫৫ সংখ্যা ১৮৪৪ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মোৎসবে আহ্বান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ)

ভগবানের চরণতলে সবান্ধবে সমবেত হইবার জন্য যে শুভ অবসরের জন্য সম্বৎসরকাল ধরিয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই শুভ-অবসর সম্মুখে সমুপস্থিত। জীবনের ভিতর দিয়া, এবং মরণেরও ভিতর দিয়া আমরা সকলে আজ তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। আজ তাঁহাকে সর্বত্র সন্দর্শন কর। মৃত্যুরও ভিতরে সেই অমৃত পুরুষকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর এবং অমর হও।

যে আকাশে শত কোটী সূর্য্য স্বীয় স্বীয় কক্ষে যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই অনন্ত আকাশে যে দেবতা ধ্রুবজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে অনিমেষ মঙ্গলনয়নে জাগ্রত রহিয়াছেন, এবং আমাদের প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনমরণের ভিতর দিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, আজ এই শুভদিনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর।

সূর্য্যের অন্তরে, অসীম অনন্ত আকাশে, ওষধিতে, বনস্পতিতে সমগ্র বহির্জ্জগতে আজ যেমন তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তেমনি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মারূপে জানিয়া তাঁহার অভয়মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর। একদিকে তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা অনন্তশক্তি পরমপুরুষরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান; আবার তিনিই আমাদের রোগে আরোগ্য, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে আমাদের জীবনসর্বস্ব, মঙ্গলবিধাতা, আত্মার অন্তরাত্মা পিতা-মাতারূপে আমাদের শোকদগ্ধ প্রাণে শান্তি বিধান করেন। আজ তাঁহাকে উর্দ্ধেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, অন্তরে বাহিরে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।

যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার ফলেই আমরা ভগবানকে আমাদের পিতামাতা বলিয়া, সখা ও সুহৃৎ বলিয়া জানিয়াছি, সেই ধর্ম্ম নবীনতর আকারে ১১ই মাঘে ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের মাঘোৎসবের এই আয়োজন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহার স্থিতি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরপুরাতন হইয়াও চির-নূতন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই চিরপুরাতন পরমেশ্বর আমাদের এই ব্রহ্মোৎসবের চিরনূতনত্ব বিধান করেন। তাঁহারই প্রেমপূর্ণ আহ্বানে আজ আমরা এই উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছি। এসো, এই উৎসবের দিনে সকলে মিলিত হইয়া একহৃদয়ে সেই উৎসবদেবতা পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

যাঁহার উদার সদাব্রতে আমরা জন্ম অবধি সমস্ত রোগশোক, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া

এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি; চক্ষু উন্মীলিত করিলে যাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় জগতের প্রতি রেণুকণায় দেখিতে পাই; চক্ষু নিমীলিত করিলেও আত্মার প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক চিন্তায় যাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রতিভাত দেখি, আজ এই পবিত্র স্থানে তাঁহার চরণে হৃদয়ের সমস্ত পূজা, সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হও। নিরাশা ও নিরানন্দ আজ যেন আমাদের হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্থান অধিকার করিতে না পারে।

জীবনে অনেক সময়েই তো আমাদের আঘাত পাইতে হইবে—ইহা তো জানা কথা। কিন্তু সেই আঘাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িলে চলিবে না। নিরাশা তো চায় আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া রাখিতে; নিরাশা তো চায় আমাদিগকে ভগবান হইতে দূরে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতি সংশয়ের অন্ধকারে, নিরানন্দের মলিন পঙ্কে ডুবাইয়া রাখিতে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বকে সার্থক করিতে চাহিলে শত আঘাতেও ভগবানের মঙ্গলভাবে সন্দিহান হইয়া নিরাশা ও নিরানন্দের অন্ধকারে ডুবিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইলে চলিবে না। আমাদের জানিতে হইবে যে, জীবনের একএকটী আঘাত আমাদিগকে জীবনের পথে অগ্রসর করিবার একএকটী সোপান। আত্মার অভিমুখে চক্ষু ফিরাইলেই আমাদের প্রত্যক্ষ হইবে যে, আশা ও নিরাশা উভয়ই আশারই বিভিন্ন মূর্ত্তি; জীবন ও মরণ, জীবনেরই এপিঠ ও ওপিঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিয়া দেখিলেই আমাদের সমস্ত জীবনই আশার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, এমন কি শেষ মুহূর্ত্ত মৃত্যুও জীবনে চলচল হইয়া উঠে। আর তাঁহাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ না করিলে আশার ভিতরেও নিরাশারই অন্ধকার দেখি, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠি।

আজ এই উৎসবের দিনে নিরাশা নিরানন্দকে অন্তর হইতে বিদূরিত কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহান পুরুষের অনন্ত মঙ্গলভাব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই মহান পুরুষ দেবাধিদেব কেবল আজ নহে, তিনি চিরকালই আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদের এই উৎসবেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহা স্থির জানিও যে, তিনি মৃত দেবতা নহেন, তিনি আমাদের জাগ্রত দেবতা। ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, সেই মঙ্গলময় জাগ্রত পরমেশ্বর আমাদের নিত্য সহচর। তখন আমাদের নিরানন্দই বা কিসের, নিরাশারই বা অবসর কোথায়? সমস্ত প্রাণ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহার ইঙ্গিতে অহর্নিশি প্রকৃতিতে জীবনের এই বিচিত্র লীলা চলিতেছে, যাঁহার আদেশে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই জ্ঞানধর্ম্মের রাজ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন যখন আমাদের পিতামাতা হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই তাঁহার স্নেহের রক্ষাকবচে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন নিরাশা নিরানন্দ দূরে থাক, মৃত্যুও আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না।

এই ব্রহ্মোৎসবই আজ আমাদের হৃদয়ে কত না আশার সঞ্চার করিতেছে; কত-না আনন্দ বিধান করিতেছে। এই ব্রহ্মোৎসবই সেই অভয়দাতা মৃত্যুরও নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অভয়বাণী শতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মূর্ত্তিপূজা ও উপধর্ম্মের আড়ম্বর-কোলাহলে দেশ বৃথাই প্রতিধ্বনিত হইত; আর আজ তাহার পরিবর্ত্তে শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে চলিয়াছে! ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কে বা জানিত যে, এই কলিকাতা নগরীর দিকে দিকে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া শত শত দেশবাসীর অন্তরে নবজাগরণ আনিতে থাকিবে?

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, এই ব্রহ্মোৎসবের ভিতর দিয়া আমাদের আত্মাতে এই সুমঙ্গল আশাবাণী নিত্যই শুনিতেছি যে, যতই সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে সবলে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিব, ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যতই প্রতিপালন করিতে থাকিব, আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, ভাব ও চিন্তা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ অপ্রতিম পরব্রহ্মের উপাসনা জগতে যতই প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিব, ততই জগতে মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, জগতে মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হওয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হওয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাতে নিজেদের ইচ্ছা মিলিত করিয়া সকল ব্রহ্মোপাসকের সহিত একহৃদয়ে অপ্রতিহত বলে জগতের মঙ্গলসাধনে নিরত হও এবং ব্রহ্মোপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জয়জয়কার হৌক। ব্রাহ্মধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রাহ্মসমাজ অতুল প্রভাবান্বিত হইলে, প্রত্যক্ষ করিবে যে, কেবল আমাদের নহে, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিরও মঙ্গল স্থিরনিশ্চিত; কেবল ঐহিক নহে, অনন্ত কালের জন্য পারত্রিক মঙ্গলও সংসাধিত হইবে।

ঈশ্বর ও মানব। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ)

আজ ব্রহ্মোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে এসো, আমরা জাগ্রত হই—জাগিয়া উঠি। আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন। বৎসরের প্রথম অবধি কত ঝড়-ঝটিকা, কত দুঃখশোক কত বিপদ-আপদ আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু আজ আমাদের সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হইবে। কান পাতিয়া শোন—আজ এই ব্রহ্মোৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য সেই বিশ্বপতি পরম পিতার সাদর নিমন্ত্রণের আহ্বান আসিয়াছে। আজ ভুলিয়া যাও দুঃখশোকের ব্যথা, ভুলিয়া যাও বিপদ-আপদের কথা। এই ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক করিবার জন্য, উৎসবের আনন্দধারায় আমাদের সকল ব্যথা সকল যন্ত্রণা ধৌত করিবার জন্য, ভগবান স্বয়ং আমাদের এই উৎসবমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আজ প্রত্যক্ষ কর—তোমাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণা সকল দুঃখশোক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউক।

এই উৎসব কিসের উৎসব? এই উৎসব ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার উৎসব; সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল উৎস সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার উৎসব। যে স্বাধীনতার অভাবে মানুষ বাঁচিতে পারে না; যে স্বাধীনতা মানুষের জীবন; যে স্বাধীনতা মানবের মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ, ভগবানের আদেশে ব্রাহ্মসমাজ এই ১১ই মাঘে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল উৎস সত্যধর্ম্মের আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিয়াছিল, মানবসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিল বলিয়াই এই পুণ্যস্মৃতি ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব। আজ আমাদের হৃদয়কে দুঃখশোক নিরানন্দে ঢাকিয়া ফেলিবার অবসরই নাই।

যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, আজ দেখিতেছি যে, সেই উদ্দেশ্য সাফল্যলাভের অভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আজ যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি যে, মহামারী, দুর্ভিক্ষ অত্যাচার, মৃত্যু প্রভৃতির হাহাকার, মহাসমরের ঝনঝনা ভেদ করিয়াও জগতবাসীর অন্তরে এক সরল, সবল সত্যধর্ম্মের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। নাস্তিকতা, উপধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আর মানুষকে শান্তি দিতে পারিতেছে না। সমগ্র জগতের অধিবাসী আজ উপলব্ধি করিয়াছে যে, মানুষ সরল সবল প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিলে বিগত মহাসমর ধরণীকে রক্তপ্লাবিত করিতে পারিত না, এবং কি এদেশে, কি বিদেশে কোথাও অত্যাচার অবিচারের সম্ভাবনা থাকিত না।

নাস্তিকতার যে কোন ভিত্তি নাই, এবং নাস্তিকতা যে আমাদিগকে শান্তি দিতে পারে না, তাহা সর্ব্ববাদসম্মত। সেই প্রকার সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মও মানুষকে শান্তির ছায়া দিতে পারিলেও প্রকৃত সুনির্ম্মল শান্তি দিতে পারে না; অনেক সময়ে তাহা ভীষণ অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানুষ যে কি প্রকার আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে, কি প্রকার নানাবিধ বিভীষিকা ও অশান্তির জালে আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্বে সেই বিভীষিকা ও অশান্তি কি প্রকার বিকীর্ণ করিতে থাকে, এদেশে কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নরবলি প্রভৃতি ভীষণ অনাচার এবং ইউরোপে রুষিয়ার সম্রাটপরিবারের এক ধর্ম্মযাজককে ঈশ্বরপ্রেরিত মানব-বোধে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেদের মস্তকে বধদণ্ড আনয়ন করা তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সর্ব্বত্রই এক সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম চাই বলিয়া আকুল প্রাণের ধ্বনি দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম দ্বিতীয় কোন ধর্ম্ম আছে বলিয়া জানি না। ইহার মূলমন্ত্র হইতেছে—অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। এই মূলমন্ত্র অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র অধিকতর সরল ও সবল হইতে পারে না। এই মূলমন্ত্রে দার্শনিকতার মারপেঁচ নাই, সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনও নাই, আর বিভিন্ন মতামতের বাদবিসম্বাদেরও সমাবেশ নাই। এই মূলমন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের চিরন্তন কথা। এপর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যত মতবাদ উঠিয়াছে, সকলেরই মূল কথা হইতেছে ঈশ্বর মানবের উপাস্য এবং মানব তাঁহার উপাসক। কিন্তু প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে স্পষ্ট কোন-না-কোন বিশেষ একটী পদার্থকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া তাহারই অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের উপদেশ আছে। কিন্তু

* ত্রিনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘ সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে বিবৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সেই মূল কথাকে সরল ও সবল আকারে প্রকাশ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তারস্বরে ঘোষণা করেন যে, সৃষ্ট বিশ্বের কোন একটী পদার্থকে ভগবানের আসনে বসাইয়া তাহার অবলম্বনে ভগবানের নিকট যাইতে হইবে না। ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা সখা ও সুহৃৎ; তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ ও নিত্য যোগ। সেই কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের প্রবল দ্বন্দ্ববিক্ষোভিত কালে এই সত্য নবতর আকারে প্রচারিত হইয়াছিল; আবার ভারতের নবযুগের নানা সংঘর্ষবিক্ষোভিত প্রারম্ভভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মও এই সত্যই নূতন ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, অবলম্বন করা যদি আবশ্যক হয়, তবে ভগবানের সৃষ্ট প্রকৃতিকে অবলম্বন কর—প্রকৃতি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রকৃতিকে যিনি নিয়মিত করিতেছেন, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না, সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ কর; অবলম্বন করা যদি আবশ্যক হয়, তবে ঋষিমুনিদের সাধুসন্তদের উপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মার ভিতর দিয়া আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মাকে দর্শন কর। এই ভাবে পরমাত্মাতে প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমাধান করিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়। এই প্রত্যক্ষ যোগের উপদেশ দেন বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম। যতই কেন নব নব ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হউক না, কোন ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলমন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না—তাহার অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সত্য তত্ত্বকে ধরিয়া রাখিতেই হইবে।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতম যোগ। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছেন—ঈশ্বর মহান অগ্নি, মানুষ সেই অগ্নি হইতে নিঃসৃত এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। ভগবান শিল্পী, মানুষ তাঁহার হস্তের শ্রেষ্ঠতম শিল্প। ভগবানের স্ব-ভাবই হইল-মানবাত্মার অন্তর্নিহিত হোমাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া সেখানে সেই অগ্নির সাহায্যে তাঁহার মঙ্গলভাব খুদিয়া বসাইয়া দেওয়া। আমরা হৃদয়কে কঠিন করিয়া রাখিলে তিনি বজ্রাগ্নিতে তাহা বিদীর্ণ করিয়াও তাঁহার মঙ্গলভাব খোদিত করিবেন। হৃদয়কে পাথর করিয়া বৃথা তাঁহার বজ্রবেদন আকর্ষণ করিও না। হৃদয়কে এমন কোমল রাখিবে—তিনি যেন তাঁহার সুকোমল হস্তে সেই মঙ্গলভাব আত্মাতে অঙ্কিত করিতে পারেন। সমস্ত প্রাণিজগত যেমন ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তেমনি আমাদের অন্তর্জগতও তাঁহার মঙ্গলহস্তের স্পর্শে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের যোগ এতই ঘনিষ্ঠ যে, অনেকে এই ঘনিষ্ঠ ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া মানবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করেন। মানবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন কি না, সে বিচারে আমাদের এখন প্রয়োজন নাই কিন্তু একথা নির্ব্বিবাদ সত্য যে, যেমন তাঁহাকে ছাড়িয়া মানুষের অস্তিত্বই সম্ভব নহে, তাঁহাকে ছাড়িয়া মানুষ থাকিতেই পারে না, তেমনি তিনিও মানুষকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—মানুষকে ছাড়িলে, মানবের ইতিহাসে তাঁহার সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপের যে বিকাশ দেখা দিয়াছে, তাহার সম্ভাবনা থাকিত কোথায়?

পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার এই ঘনিষ্ঠতম যোগের সাফল্য সাধন করিতে গেলে, ভগবানের মানবসৃষ্টিকে সার্থক করিতে চাহিলে আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইতে হইবে। আমাদের প্রাণের ভিতর স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমরা তাঁহার পরিবারভুক্ত, তাঁহার পরিবারের বহির্ভূত নহি—তাঁহার জগতের মঙ্গলামঙ্গল এবং আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরসম্বদ্ধ। আমরা তাঁহার রাজ্যে দুই দিনের জন্য অতিথি হইয়া আসি নাই। তাঁহার রাজ্যের পর রাজ্য চলিয়াছে—যেখানে তিনি আমাদিগকে যাইবার আদেশ করিবেন, সেইখানেই আমরা হাসিমুখে নির্ভয়ে চলিয়া যাইব। বরঞ্চ এই যে পৃথিবীতে আসিয়াছি, এখানে অতিথির মত দুদিনের জন্য আসিয়াছি। ইহা জানা কথা যে, এখানকার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একদিন-না-একদিন ছাড়াছাড়ি হইবেই। কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের অনন্তকালের ঘনিষ্ঠতম যোগ। তাই ভগবানের রাজ্যে বাস করিয়া এখানকার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরহবিচ্ছেদের ভয় করিলে চলিবে না।

এই জগতে ভগবানের মঙ্গলভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে আমাদের নীরব দর্শকের মত বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। জগতসংসারকে তাঁহার অভিমুখে অভিব্যক্ত হইবার কার্য্যে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিতে হইবে। জগতকে যে তিনি উন্নতির অভিমুখে, তাঁহার অমৃত-ধামের যাত্রী হইবার উপযোগীরূপে অভিব্যক্ত হইবার পথে পরিচালিত করিতেছেন, আমরাই তো তাঁহার সেই কার্য্যের যন্ত্র তিনি তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যে জয়যুক্ত হইবেন, আমরাই তো তাঁহার সেই কার্য্যের সৈন্য। কাজেই তাঁহার মঙ্গলকার্য্যে যোগ দিতে আমরা যতটুকু পশ্চাৎপদ হইব, ততটুকুই তাঁহার কার্য্যে আমাদের বাধা দেওয়া হইবে। হয় আমাদিগকে আমাদের প্রেরয়িতা ঈশ্বরের আদিষ্ট মঙ্গল কার্য্যে নিরত হইতে হইবে, অথবা অ-মঙ্গল কার্য্যে যোগ দিতে হইবে—মধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় কোন পথ নাই। এই ভাবটী অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধনরূপ তাঁহার উপাসনা করিতে থাকিলেই অচিরে ধরাধামে সত্যযুগের নিশ্চয় পুনরাবির্ভাব হইবে।

ভগবান যখন আমাদের পিতামাতা, সেই বিশ্বপতি যখন আমাদের আত্মার নিয়ন্তা, তখন আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। মনে করিও না যে, সংসারে তুমি বিঘ্নকণ্টকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—সংসারের অর্গলরূপে বিপদমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছ। স্থির জানিও যে, মানবাত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ বলিয়া নিজে ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহাশক্তিরই শক্তিবলে ত্রিভুবন জয় করিবার শক্তি ধারণ করে। নিশ্চয় জানিও যে, প্রত্যেক মানবেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে—একটা ধূলিকণারও যে কর্ম্মক্ষেত্র অনির্দ্দিষ্ট নাই। মানুষ যখন ভগবানের অবহেলার বস্তু নহে, মানুষে যখন ভগবানের প্রয়োজন আছে, প্রত্যেক মানবকে যখন ভগবান চাহেন, তখন মানুষ ক্ষুদ্র কিসে? ভগবানের আহ্বানবাণী শুনাইবে—কে? মানুষ; ভগবানের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে, অসাধুতার বিনাশ করিবে—কে? মানুষ; ভগবানের জ্ঞান বিতরণ করিবে—কে? মানুষ; পাপতাপে তাপিত দুঃখীজনের অশ্রু মোচন করিয়া তাহাকে শান্তি দিতে হইবে—দিবে কে? মানুষ। ঈশ্বরের এই ধরণী, এই আকাশ, সমস্তই থাকিলেও যদি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ না করিতেন, মহামুনি বাল্মীকির আবির্ভাব যদি না হইত, তবে ভগবানের মাহাত্ম্য আমাদের উপলব্ধিতে আসিত কি প্রকারে? এই প্রকারে দেখি যে, ভগবান মানুষের দ্বারাই জগতে তাঁহার মঙ্গলভাবের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। তখন মানুষ ক্ষুদ্র কিসে? তবে ভগবান যে আমাদের প্রত্যেকের জন্য কোন্ কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কোন্ বিশেষ কাজের জন্য আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অন্তশ্চক্ষু নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বুঝিতে পারিলে, আমাদের অন্তরে ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিলে তাহা অবহেলা করা আমাদের সাধ্যাতীত হইবে। সেই প্রেরণার সম্মুখে আপনাকে ভুলিতেই হইবে, বিশ্বের প্রাণ সেই মহাপ্রাণে আপনাকে মিশাইয়া দিতেই হইবে। আর, নিজের ক্ষুদ্রতাকে বিদূরিত করিলেই অন্তরের দেবতা স্বয়ং স্বপ্রকাশরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিবেন এবং তখন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মহাপুরুষত্ব উপলব্ধি করিব। এইজন্য উচ্চ আদর্শের এত গৌরব, এত মাহাত্ম্য।

বর্ত্তমানে সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের জন্য যে প্রকার আকাঙ্ক্ষা সকলের অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচার করিবার ইহাই তো উপযুক্ত অবসর। মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলবাণী অন্তরে উপলব্ধি কর, অমঙ্গলের বিভীষিকা পরাহত হউক। সেই অভয়দাতার মাভৈরবের ভেরীধ্বনি শুনিয়া সত্যধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হও—সত্যধর্ম্মের প্রবল বলে উপধর্ম্মজনিত মানসিক শক্তিহীনতা বিদূরিত হউক। অন্তরাত্মাতে চেতনা সঞ্চারিত কর, জাগরণ আনয়ন কর। জাগিয়া উঠ—জাগিয়া উঠ—নিদ্রাতে নিমগ্ন থাকিবার অবসর নাই; আলস্যকে পদদলিত করিয়া দাও। সত্যধর্ম্মকে ভুলিয়া, ঈশ্বরের প্রিয় কল্যাণকর কর্ম্মসকল ভুলিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে আপনাকে আর অন্ধ রাখিও না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সর্ব্বত্র সকল সমাজেরই মধ্যে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে দেখি; কেবল কি সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উপাসক, সত্যধর্ম্মের উপাসক, ভগবানের প্রত্যক্ষ উপাসক, আমাদেরই মধ্যে জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইবে না? ব্রহ্মোপাসকের অজ্ঞানে আলস্যে আপনাকে নিমগ্ন রাখিবার যে অধিকারই নাই।

মঙ্গল চাই, শান্তি চাই, ইহা মনে করিলেই মঙ্গলও আসিবে না, শান্তিও আসিবে না। ভগবানের মঙ্গলবিধানই এই যে, আমরা যতই সত্যকে ধরিয়া থাকিব, অন্তরে ভগবৎনিহিত সত্যধর্ম্মকে যতই পোষণ করিব, ততই আমরা মঙ্গল ও শান্তি নিজেরাও লাভ করিব এবং ততই জগতেও তাহা বিকীর্ণ করিতে পারিব। ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির মুখের দিকে চাহিয়া সুখদুঃখ ভালমন্দ ফলাফল সমস্তই ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া, সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ধর্ম্ম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে কায়মনোবাক্যে সেবা করিলে তবে না সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আমাদের হস্তগত হইবে? ইহার বিপরীতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অন্তরে রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মসমাজের পতন যে অনিবার্য্য। চক্ষু খুলিয়া দেখ—সমস্ত জগৎসংসার অমৃতধামের পথে কি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের সেই সকল যাত্রীকে ছাড়াইয়া চলিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসকেরা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।

ইহা জানা কথা যে, অতীতে আমরা অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি; ইহা জানা কথা যে, সংসারে নানা বিষয়ে নানা ভুলভ্রান্তি করিয়া অনেক অনর্থও আনিয়াছি। কিন্তু সে সকল কথা এখন আর মনে করিলে চলিবে না। সে সমস্ত ভুলভ্রান্তির জন্য হাহুতাশ করা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের যদি ভুলভ্রান্তিই না হইত, তবে তো আমরা পূর্ণপুরুষ পরমেশ্বরই হইতাম। আমরা যখন

পূর্ণপুরুষ নহি, তখন আমাদের তো পদে পদে ভুলভ্রান্তি আছেই। সেই ভুলভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা শতবার করিব, কিন্তু তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া কোনই লাভ নাই। হাহুতাশ ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিষ্কাম চিত্তে শুভকর্ম্ম সাধনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে হইবে। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে যদি তোমাদের অটল আস্থা থাকে, তবে তাঁহার হস্তে কলাফলের ভার নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া চল। তাঁহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সম্মুখে সোজা পথে চলিয়া যাও। পশ্চাতে কি ফেলিয়া গিয়াছ, কি পড়িয়া রহিল, সে দিকে লুব্ধ বা ক্ষুব্ধ কোনও প্রকার দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া নিষ্কামচিত্তে শুভকর্ম্ম করিতে থাকিলে ভগবৎবিধানেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পদ্মপত্র হইতে জলের মত ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

যে অপরাজিত পরমপুরুষের শক্তিবলে আমাদের আত্মা ত্রিভুবন-বিজয়ের শক্তি ধারণ করে, সেই ভগবান আজ স্বয়ং অমৃতধামের দ্বারে তাঁহার অপরাজেয় সত্য-ধর্ম্মের মঙ্গলপতাকা উড্ডীন করিয়া আমাদিগকে সেই পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এসো, নির্ভয়ে আমরা তাঁহার সেই পতাকার তলে সমবেত হই। প্রাণের অন্তরে সেই মহাসত্যের বিমল জ্যোতি প্রবেশ করিতে দাও—অন্তরের সমস্ত অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাউক। জগতের জীবনসংগ্রামে সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যদি বাঁচিতে চাও, তবে বৃথা আলাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। নির্ভয়ে তাঁহার পুণ্য নামকে সম্বল করিয়া অজ্ঞান অন্ধকারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার মাভৈঃ-রবের দুন্দুভিধ্বনি প্রতিক্ষণেই তো আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। সেই অজেয়শক্তি মহান পুরুষের পতাকা-তলে যখন আমরা সমবেত হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে অধর্ম্ম অমঙ্গলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন তো আমাদের জয় সুনিশ্চিত—পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই, ভয়ের কোন কারণই নাই। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান মহাশক্তি। তাঁহার ইচ্ছা কেহই প্রতিহত করিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত ও অপরাজিত। প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক নিমেষ তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনি আমাদের পিতা-মাতা; আবার তিনিই আমাদের অমৃতধামে যাত্রার পথে সর্ব্বপ্রধান নেতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে অজ্ঞানের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তানসন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে সেই ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, সত্যেতে একনিষ্ঠ হইয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ কর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রচারে যত্নবান হও এবং ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার অমৃত-ধামের যাত্রী হও, আর অমর হইয়া যাও।

পরলোকবাসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(গত ১৪ই জানুয়ারির সুবোধ-পত্রিকা হইতে
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

সম্পদ বিষসম তোমা বিহীনে জীবন মৃত্যু-সমান।
বিপদ সম্পদ তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃতসোপান॥

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গত সোমবারে দেহান্ত হইয়াছে। বোম্বাই এলাকার সহিত, বিশেষতঃ হেথাকার প্রার্থনাসমাজের আন্দোলনের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের নিকট-সম্বন্ধ ছিল। আমরা আজ তাঁহার চরিত্রগত স্থূল-স্থূল বিষয় জানিবার জন্য প্রযত্ন করিব।

সত্যেন্দ্রনাথ—প্রথম হিন্দু আই-সি-এস্। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও হিন্দুগৃহস্থই এই যশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁর নিয়োগ বোম্বাই এলাকায় হয় এবং চাকরীর সমস্ত কাল এই এলাকাতেই তিনি অতিবাহিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই শান্তপ্রকৃতি সরলচিত্ত ও উদারচরিত্রের লোক ছিলেন। চাকরীর উপ-লক্ষে তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই শীলতার দ্বারা, সরলতার দ্বারা লোকদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সরকারের চাকরী খুব ভালরকমই করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে বলে, সরকার, তিনি প্রথম হিন্দু সিভিলি-য়ান—এই দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার সরলতা, তাঁহার শীলতা, তাঁহার ন্যায়প্রীতি একেবারে আমলে আনেন নাই; তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদে মনোনীত করেন নাই। কালা-গোরার মধ্যে

এই পার্থক্য-বুদ্ধি ভাল না লাগায় তিনি ১৮৯৭ অব্দে পেন্সান্ লইয়াছিলেন, আমরা এইরূপ শুনিয়াছি।

সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া বোম্বাই-এলাকায় আসিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে বিস্মৃত হন নাই। শুধু তাহাই নহে, চাকরীর উপলক্ষে তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মসমাজ থাকিলে, সেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত একপ্রাণ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেন। বিশেষতঃ, সাতারায় থাকিতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে প্রভূত সেবা করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে। একে তো ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার প্রখর নিষ্ঠা, তাহাতে আবার সীতারাম-পন্ত জহবরে ও রাওজী রামচন্দ্র কালের ন্যায় সহকারী পাইয়া তিনি ঐ সমাজকে উত্তম অবস্থায় আনিয়াছিলেন। সাতারার সমাজ একটা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল; শহরের বিদ্বান ও সুবুদ্ধি লোকদিগের দৃষ্টি প্রার্থনাসমাজের উপর পড়িতে লাগিল। ঐ সমাজের ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের ভীড় হইতে লাগিল। এবং সবশুদ্ধ ধরিতে গেলে, সাতারার সমাজ লোকজাগৃতির কাজ সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথই এই সমস্তের মূল। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বাঙ্গলাভাষার কতকগুলি উত্তম গান, মূলের ধরণ বজায় রাখিয়া তিনি মারাঠীভাষায় রচনা করিবার জন্য রা-জহবরেকে সাহায্য করেন। তৎপ্রযুক্ত কতকগুলি বাঙ্গলা গান—"সোডী মহি-বরী শান্তিচে বারি" (বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত "দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান" প্রভৃতি গানের সহিত অনেকেই বেশ পরিচিত আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই এলাকা ছাড়িয়া যাইবার পর, চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না;— ইহা আমাদের মহারাষ্ট্রীয় পেন্সন-গ্রহীতাদের মনে রাখা উচিত। ১৯০৮ অব্দ পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর এক আত্মচরিত লিখিয়াছেন—এইরূপ মহারাষ্ট্রীয় লোকেরা বাহিরে বাহিরে শুনিয়াছিল। যাঁহাদের বাঙ্গলাভাষার জ্ঞান অল্পবিস্তর ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই গ্রন্থের সহিত পরিচয়লাভ ত করিয়াছিলেনই। ১৯০৮ অব্দে স্বকীয় কন্যা ইন্দিরা দেবীর সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ আপন পিতৃদেবের আত্মচরিত ইংরেজি ভাষায় ছাপাইয়া ইংরেজী-অভিজ্ঞ সমস্ত লোককে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। এই আত্মচরিত সম্বন্ধে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ বলিয়াছেন যে,—

The autobiography contains no stirring adventures or sensational incidents of any kind. Its value consists in its being a record of the spiritual struggle of a noble soul...... the struggle of a soul striving to rise from empty idolatrous ceremonial to the true worship of the One Living God.

স্বকীয় পিতৃদেব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিরূপ খাটে তাহা আমরা দেখাইতেছি। আপাততঃ এইটুকু বলা আবশ্যক যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবক ছিলেন। সুরাটের চিরস্মরণীয় রাষ্ট্রীয় সভার সময় যে একেশ্বরী ধর্ম্মপরিষদের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অধ্যক্ষতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামক পত্রের তিনি শেষ পর্য্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ লেখাই মাতৃভাষায় লিখিত। ঐ সব লেখার দ্বারা তাঁহার স্মৃতি ত স্থায়ী হইবেই, কিন্তু বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্র এই দুই প্রদেশে যতদিন ভক্তিমার্গের লোক আছে ততদিন তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার রচিত স্বয়ংস্ফূর্ত্ত পদাবলীর দ্বারা এই মহৎকার্য্য সাধিত হইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। মহর্ষির আত্মচরিতের মধ্যে যে পরিমাণে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বৃত্তান্ত আছে সেই পরিমাণেই সত্যেন্দ্রনাথের পদাবলীর মধ্যেও এক ভক্ত-অন্তঃকরণের আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আমাদের প্রদেশে এইরূপ লোক বড় বেশী নাই। দেবেন্দ্রনাথ একজন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীলোক ছিলেন, এখানকার লোক এইরূপ বুঝিয়া থাকে; এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা সুব্যবস্থিত আকার দিয়াছিলেন, লোকে এই কথাই জানে। কিন্তু তিনি যে এক struggling soul ছিলেন, অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা তাঁহাকে চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিতে দিত না এবং এই ব্যাকুলতা তাঁহার উপদেশ ও গানের দ্বারাই ব্যক্ত হইত— এই কথা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, তাহা অপেক্ষা, অন্তঃকরণের ব্যাকুলতার বিচার করিতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাহা আরও অধিক পরিমাণে সত্য। তাঁহার রচিত পদাবলীই তাহার সাক্ষ্য। তিনি কতকগুলি সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, শুধু এই কথা বলিলে তাঁহার সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবন যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু যে কেহ তাঁহার পদাবলীর মধ্যে তাঁহার আন্তরিক জীবনের প্রবাহ দেখিবার জন্য প্রযত্ন করিবে সে-ই সত্যেন্দ্রনাথের পদাবলীর শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমাদের পুরাতন সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহার কতকগুলি পদাবলী গৃহীত হইয়াছে। "হে করুণাময় দীনসখা" ইহা তাঁহারই একটি গান। "গাওরে জগপতি জগবন্দন" তাঁহার এই গান আমাদের নিকট পরিচিত। "দয়াঘন তুজবিন কো হিতকারী" (দয়া ঘন তোমা হেন কে হিতকারী") ইহাও তাঁহার একটি রচনা। তথাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনের সাক্ষী—তাঁহার অনেক সুন্দর পদাবলীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মূলেই পরিচয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বিচারালোচনা করিবার সময়ে এই একটা বিশেষ কথা আমাদের মনে উপস্থিত হয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপ যখন বঙ্গদেশে প্রভূত পরিমাণে চলিতেছিল, সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই-প্রদেশে থাকিয়াই মহর্ষির আধ্যাত্মিক জীবনের স্পৃহনীয় পরিণাম স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং মহর্ষির আধ্যাত্মিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সত্যেন্দ্রনাথই হইয়াছিলেন। তদনুসারে, মহারাষ্ট্রীয় সাধুদিগের বাণী তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের চিন্তার ছায়া তাঁহার অনেক পদাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সত্যেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার সারাংশ এইরূপ ছিল যেঃ—হে দেব, তুমি আমার সর্ব্বস্ব হও। অনেক পদাবলীর মধ্যে, বিভিন্নরূপে, মর্ম্মস্পর্শী উক্তির দ্বারা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, তুমি বিনা সর্ব্বসম্পদ ব্যর্থ, এবং তোমাকে লাভ করিলে ঘোর বিপদও সম্পদ-তুল্য হয়। আর একটি গানে তিনি বলিতেছেনঃ—হে দেব, আমি তোমাকে আর কি দিব? যাহা কিছু সকলই তোমারি, আমাদের কি আছে? তোমার প্রেমে হৃদয় বিকশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে তুমিই দেব বিরাজমান। আর এক জায়গায়, তিনি ভক্তের ভাবে বলিয়াছেন যেঃ—হে দেব, এখন কেবল বিষয়সুখে আমার মনের তৃপ্তি কি করিয়া হইবে? তোমার চরণামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এখন ধনজনমানের কি প্রয়োজন? "পরমেশ্বর পাদ-কমল-মধু" পান করিবার জন্য এখন অতি তীব্র ইচ্ছা হইয়াছে; এবং উহা সঞ্চয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে "না চাহি অপর কিছু"। কারণ একবার মধু সঞ্চয় হইলে পর, যেরূপ মধুকর মধুপানের দ্বারা আপন তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ হে দেব, আমার দশা হইয়াছে। তোমার চরণের আশ্রয় আমি লাভ করিয়াছি, সে সুখ আমি উপভোগ করিয়াছি, এখন আমি তোমার চরণ কিছুতেই ছাড়িব না, এখন আমার আর কোন বাসনা নাই। এই প্রকার উক্তির পর তিনি অনেক সময় স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যেঃ—

"তোমা বিনা চাহিনা চাহিনা কিছু আর।
সম্পদ বিষ সম তোমারে ছাড়িয়ে ॥"

তাঁহার অনেক পদাবলী তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার যে সাক্ষ্য দেয়, তাহা ঐ সকল পদাবলী দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। এই প্রকারে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা করিতে করিতে এই বৃদ্ধ সেবক স্বকীয় ইহলোক যাত্রা সমাপন করিয়াছেন এবং স্বকীয় আদর্শচরিত পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদাবলী ও তাঁহার লেখার দ্বারা তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিবার স্ফূর্ত্তি নব্য বংশীয়দিগের মধ্যে যেন বৃদ্ধি পায় এবং এই মহতী ভক্তির উন্নত পথে যে সকল আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা যেন সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
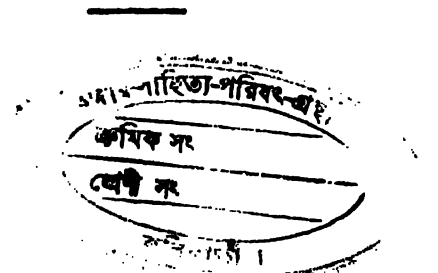
শেষ গান।

(কথকশ্রেষ্ঠ শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ)

আজিকে গাহিব মোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান
ছিল যাহা আচ্ছাদিত অনলসমান
এই মোর হৃদয়ের কোনে; প্রতিক্ষণে
কতনা বিবিধ ভাবে, বিচিত্র স্বননে
উঠিত যে গান! কখনো প্রেমের বাঁশী;
কখনো বা গরজিয়া বীর-রসে ভাসি
বাজিয়া উঠিত শিঙ্গা। আড়ম্বরহীন
শ্রেষ্ঠ এই গান মোর আছিল নিলীন
সে সভার এক কোণে, আপনা লইয়া
আজি এই শুভক্ষণে উঠেছে ধ্বনিয়া।
আর তো বাজে না বাঁশী, অমনি নীরব
শিঙার গভীর ধ্বনি; সেই গানে সব
করিয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ, বিশ্বে সুর যত
সকলি তাহার মাঝে হয়েছে সংহত।

শাশ্বতধর্ম্ম অথবা শুদ্ধ আচরণের আবশ্যকতা।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

পাণ্ডব বনবাসে গিয়া দ্বৈতবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কথোপকথন হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা মহাভারতের বনপর্ব্বের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজকে বলিতেছেন :—

"তুমি নিয়ত ধর্ম্মানুসরণ করিয়াই চলিয়া থাক। ধর্ম্মের জন্য,—ভীমসেন, অর্জ্জুন প্রভৃতি আপন ভাইদিগকে এবং আমাকেও ত্যাগ করিতে পার। ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তুমি আর কিছুই মনে কর না। এইজন্যই তোমার এই দুর্দ্দশা। বনবাসের মধ্যে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন ও ক্লেশ তোমাকে ভোগ করিতে হয়। আর দুর্য্যোধন ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, অধর্ম্মাচরণ করিয়া সাম্রাজ্যসম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তাহা হইলে, ধর্ম্মের উপযোগিতা কি? ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি? অধর্ম্ম আচরণ করিলে, তাহাতে খারাপটা কি?"

ধর্ম্মরাজ এইরূপ উত্তর করিলেন :—

ধর্ম্ম হইতে আমার ফললাভ হইবে, এই ইচ্ছা করিয়া আমি ধর্ম্মাচরণ করি না।

অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ ॥ ১ ॥

হে কৃষ্ণে! ফল হউক বা নাই হউক, পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য বিশেষতঃ গৃহস্থের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি যথাশক্তি করিয়া থাকি। ফলের জন্য ধর্ম্ম করিবে, এইরূপ ভাবে আমি ধর্ম্ম ক্রয় করি না। নিষ্কামভাবে ধর্ম্মাচরণ করা ইহাই প্রকৃত মার্গ; তাহারই যোগে আমরা উন্নত পদবী প্রাপ্ত হই এবং তাহার দ্বারা ঐহিক ফল প্রাপ্ত না হইলেও, ধর্ম্ম নিষ্ফল, তাহার কোন আবশ্যকতা নাই, তাহা হইতে সুপরিণাম উৎপন্ন হয় না—এইরূপ মনে করিবে না।" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মরাজ আবার বলিতেছেন :—

"অফলো যদি ধর্ম্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্ম্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতজ্জগন্মজ্জেদনিন্দিতে ॥ ১ ॥
নির্বাণং নাধিগচ্ছেয়ুঃ ন চার্থং কশ্চিদাপ্নুয়ুঃ ॥ ২ ॥

হে অনিন্দিতে! ধর্ম্ম হইতে কোন ফল নাই বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মপথে মনুষ্য চলিলে এই জগৎ প্রতিষ্ঠাশূন্য হইয়া অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে। মনুষ্যের সুখলাভ হইবে না। তাহার জীবন পশুর ন্যায় হইবে। সঙ্কল্পিত কার্য্য বিনষ্ট হইবে; কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ হইবে না। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে থাকিলে, মনুষ্যের কোন আটক বা বন্ধন থাকিবে না; মনুষ্যেরা কামক্রোধাদির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিবে, অহমিকার বশীভূত হইয়া একজন অপরকে নিষ্ঠুরভাবে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিবে; কোনপ্রকার ব্যবস্থা না থাকায় মানবসমাজ নষ্ট হইবে; পশুরা যেমন পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া আপন আপন গুহামধ্যে বাস করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা পৃথকভাবে বাস করিবে। সত্য ও ন্যায়, যাহার উপর মনুষ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহার বিনাশ হইলে সেই সমাজের সমস্ত ইমারৎ ধসিয়া পড়িবে। "সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং" এইরূপ একটা কথা আছে। সত্যের উপর ভর দিয়া যাহা কিছু সমস্তই রহিয়াছে। অতএব সত্য ও

ন্যায়কে মনুষ্য বিসর্জ্জন করিলে, সমাজ থাকিবে কি করিয়া? এবং যে পরিমাণে সমাজের মধ্যে এই দুই তত্ত্বের প্রসার থাকে, সেই পরিমাণে সেই সমাজ দৃঢ়তা ও সুখসমৃদ্ধি লাভ করে। সত্য, ন্যায় ও দয়া অথবা প্রেম মনুষ্যের মধ্যে না থাকিলে নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ অথবা সংসারের মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত শান্তির অবস্থা মনুষ্য কখনই প্রাপ্ত হইবে না। এই তত্ত্বগুলি না থাকিলে, যদি কোন কারখানা খোলা যায় কিংবা কোন রাজ্য অধিকার করা যায়, তাহা হইলে সেই কারখানা বা রাজ্য বিনষ্ট হইবেই হইবে। কারখানার কার্য্যে প্রবৃত্ত মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পরের উপর যদি বিশ্বাস না থাকে কিংবা প্রজারা যোগ্য প্রসঙ্গেও রাজাকে যদি সাহায্য না করে, তাহা হইলে সেই কারখানা ও সেই রাজ্য চলিবে কি করিয়া? অতএব ধর্ম্মাচরণ ব্যতীত কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না।

উদাহরণ:—মনুষ্যগণের সমাজ গঠিত হইলে পর, কোন এক শ্রেণী, অপর কোন শ্রেণীকে আপন অপেক্ষা নীচ মনে করে এবং তদনুসারে তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে—এই প্রকার অল্পবিস্তর সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রকার অন্যায় ব্যবহারে, নীচ বলিয়া অবধারিত শ্রেণীদিগের মনোবৃত্তি কলুষিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈমনস্য বৃদ্ধি হয় এবং যে সকল কাজে একজোট না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেই সব কাজ সেই সমাজের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই অনিষ্ট পরিণাম প্রত্যক্ষ অনুভব করায় কতকগুলি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মধ্যে, এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা বিলুপ্ত করিয়া, ঐ রাষ্ট্র সকলের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা হইয়াছে। এই প্রকার ঘটনা প্রাচীনকালে রোমদেশে ও অর্ব্বাচীনকালে ইংলণ্ডদেশের মধ্যে স্পষ্টরূপে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। এবং এই প্রকার ঐক্য সাধিত হইলে পর ঐ দুই রাষ্ট্র অভ্যুদয় লাভ করে। আমাদের এই ভারতবর্ষে ভিন্ন শ্রেণীদিগের মধ্যে এইরূপ ঐক্য না হইয়া, ঐ সকল শ্রেণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে মনান্তর চরমে উঠিয়াছে। এই কারণে একজোটে হইবার মত কাজগুলা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ অর্ব্বাচীনকালে, ভারতভূমির অন্তর্গত কোন এক হিন্দু সমাজের, সাম্রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু রাজকুলের মুখ্য পুরুষ, প্রধান মণ্ডল এবং সেই প্রধান মণ্ডলের সর্দ্দার—ইহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের পূর্ণ সঞ্চার হওয়ায় সেই সম্ভাবনা নষ্ট হইল এবং যাহার মধ্যে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যবস্থা চলিতেছিল—এইরূপ এক পরকীয় সমাজেরই জয় হইল। মার্ক্‌ইস্-অফ ওয়েলেস্‌লি, মাউণ্টষ্টুয়ার্ট-এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিকুশল ব্যক্তিগণ এই দেশে যে রাজ্য সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা নিজের জন্য নহে, তাহা সাত হাজার মাইলেরও অধিক যে রাজা ছিলেন কিংবা যে রাষ্ট্র ছিল, তাহাদের জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে, রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকায় পেশোয়া রাজ্য চালাইতেন এবং পেশোয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট হইলে তাঁহার সর্দ্দার সিন্দে ও হোলকর, হিন্দুস্থান ও মালব প্রদেশে আপনাদের জন্য রাজ্য স্থাপন করিলেন। এইরূপ,—যেখানে অসত্য, অন্যায় ও স্বার্থপরতার অপ্রতিহত সঞ্চার হয়, সেইখানেই এই অশুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। ন্যায়, প্রভুভক্তি ও রাষ্ট্রপ্রীতি যে সমাজে অবস্থিতি করে সেই সমাজের সম্মুখে আমাদের ন্যায় (উপরে বর্ণিত) সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না।

এক্ষণে হিন্দুসমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের প্রসার ভিন্ন ঐ সমাজের কল্যাণ নাই। প্রাচীন ধর্ম্মবিধানাদির উপর বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, স্নান-সন্ধ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে, পানাহারের নিয়মপদ্ধতি নষ্ট হইয়াছে। ইচ্ছা হইলেই, টাকাকড়ির সুযোগ হইলে, যুবকেরা পরদেশযাত্রা করিতেছে। এক্ষণে স্নানসন্ধ্যা ও পানাহারের নিয়মপদ্ধতি—এ সব কেবল বর্ণধর্ম্ম মাত্র,—সত্য ন্যায় ও প্রেম এই সমস্ত শাশ্বত ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বেকার নিয়মপদ্ধতি চলিয়া গিয়াছে অথচ তাহার স্থানে আর কিছু আসে নাই। এই অবস্থা অতীব ভয়াবহ। কারণ, স্নানসন্ধ্যা ও পানাহারের নিয়মপদ্ধতি পালন করিবার জন্য যে আত্মসংযম আবশ্যক, তখন সেই

আত্মসংযমের একটা ধারণা ছিল। এক্ষণে ঐ সকল অনুষ্ঠান ও নিয়মের উপর শ্রদ্ধা চলিয়া যাওয়ায় সেই আত্মসংযমের ধারণাও বিনষ্ট হইয়াছে। এই বিশ্বাস নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত মিথ্যারই প্রসার বাড়িয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, পানাহার করিতেছে, যে কোন মনুষ্যের রাঁধা অন্ন সেবন করিতেছে, কিন্তু বাহিরে গিয়া, "আমরা পবিত্র" এইরূপ সকলকে বুঝাইতেছে। অতএব ইহার দরুণ সংযম তো নষ্ট হইলই, অসত্যও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা কি ইষ্টজনক? পুরাতন ধর্ম্মনিয়মাদি নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যগণের মধ্যে শাশ্বতধর্ম্মের নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে না কি? অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে চেষ্টা করা আবশ্যক নহে কি?

সেইরূপ আবার, বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ইচ্ছা আমাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই ইচ্ছা অনুসারে, যে সকল অধিকার আমরা লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার যোগ্যরূপে সম্পাদন করিবার জন্য, সত্য ও ন্যায়ের ধারণা মনোমধ্যে পোষণ করা আবশ্যক নহে কি? পৌর ব্যবস্থার অধিকার আমরা লাভ করিয়াছি; প্রাদেশিক ব্যবস্থা ও অন্য প্রকার ব্যবস্থার অধিকার আমরা লাভ করিতেছি। এই অধিকারের স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়া, সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া, নিরপেক্ষভাবে শুধু রাষ্ট্রকল্যাণের ইচ্ছাই আমাদের মনে পোষণ করিতে হইবে। নচেৎ নূতন অধিকারাদি হইতে আমাদের দেশের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে। সহরে যে সব দীপ লাগানো হইবে তার মধ্য হইতে একটা দীপ নিজের গৃহের সম্মুখে লাগানো চাই। গ্রামের যে রাস্তা হইবে তাহা যাহাতে নিজ গৃহের পাশ দিয়ে যায় তাহার তদ্বির করা চাই। এইরূপ কাণ্ড চলিতে থাকিলে, নবলব্ধ অধিকার হানিজনকই হইবে। অতএব, প্রথমে, সৎধর্ম্মপ্রচারের যোজনা করিয়া তাহার পর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কিংবা দুই বিষয়ে এক সঙ্গেই প্রযত্ন করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রার্থী তাঁহারা সৎ-ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করেন কি?

আর একটি বিষয়—সমাজসংস্কার। এদেশে ধর্ম্মের সংস্কার না হইলে, কখনই সুফল লাভ হইবে না। হীনজাতীয় লোকদিগকে যে উচ্চে উঠাইবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত শ্লাঘনীয়; হীনজাতীয় লোকেরা উচ্চে উঠিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাহাদের মনোমধ্যে ন্যায় ও সাম্যবুদ্ধি এতটা কম যে, তাহাদিগের অপেক্ষা নিম্নজাতিকে তাহারা আপনাদের সমান করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত নহে। এস্থলেও সেই জাতিকে উপরে উঠাইবার পূর্ব্বে কিংবা একই সময়ে, সাম্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

আর একটি বিষয়—দেশের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন। চারিদিকে রাষ্ট্রমধ্যে কারখানা স্থাপন করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে—ইত্যাদি বিচার আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য বিষয়ের ন্যায় ইহারও গুরুত্ব আছে। কিন্তু কারখানা ও অন্য উদ্যোগ সম্বন্ধে আবশ্যক যে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, শুদ্ধ মন, এবং সত্য ও ন্যায়—এই সমস্তের অনুসরণ করিয়া ঐ সকলের ধারণা প্রথমে লোকের মধ্যে আনয়ন করা আবশ্যক। এই ধারণা না থাকিলে, এই কারখানা, এই উদ্যোগ কখনই সফল হইবে না। অতএব ইহারও প্রতি দৃষ্টি করিলে, শাশ্বত ধর্ম্ম অর্থাৎ নীতির প্রবৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ শীঘ্রই করা আবশ্যক।

মোদ্দা কথা, দেশের সর্ব্বপ্রকার প্রগতির উদ্দেশে, রাষ্ট্রজনিক প্রেম আমাদের লোকের অন্তঃকরণে যাহাতে প্রবিষ্ট হয় তৎপক্ষে প্রযত্ন করা অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের লোকেরা বলে যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভই মুখ্য কথা, তার পর সমৃদ্ধিবর্দ্ধন এবং তাহার পর দীর্ঘকালক্রমে সমাজসংস্কার। ধর্ম্মবৃদ্ধির কোন কথাই কেহ উত্থাপন করে না। এ কি চমৎকার! আমার ত মনে হয়, ইহারই আবশ্যকতা সব-চেয়ে বেশী।

এক্ষণে মনুষ্য স্বভাবত স্বার্থের দিকে, অহমিকার দিকে বড়-বেশী ঢলিয়া পড়ে এবং কামক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব সত্য ন্যায় ও প্রেমের বৃদ্ধি করা বড় সোজা কাজ নহে। ধর্ম্মরাজ-কথিত নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে উৎপন্ন হওয়াও সহজসাধ্য নহে।

এই অবস্থায়, উহা সহজসাধ্য করিবার উপায়টা কি? এক উপায়—সৎ-ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রদ্ধা হওয়া চাই; অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, দয়া, দম এবং তজ্জনিত শান্তি ও সমাধানের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, ঐ সব বিষয়ে যে স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিবে, সেই অনুরাগকে দৃঢ় করিতে হইবে। এই বিষয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সকলের সাধ্য হয় না। এই হেতু, সৎ-ধর্ম্ম যাঁহার স্বরূপ; সত্য ন্যায় ও প্রেম—এই সব গুণ যাঁহাতে পূর্ণভাবে অবস্থিত; যিনি পরম দয়ালু, যিনি সমস্ত বিশ্বের অধিপতি, যাঁহার মহিমা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে অত্যন্ত রম্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, যিনি সর্ব্ব পদার্থে এবং আমাদের অন্তঃকরণে বাস করিয়া সকলকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার শরণ লইবে, তাঁহার ধ্যান করিবে, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার প্রেমের চিন্তা করিবে। তিনিই আমাদের রক্ষক—এইরূপ অনন্যভাব অন্তঃকরণের মধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে। ইহাই মুখ্য উপায়। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

অর্থাৎ—কোন মনুষ্য খুব দুরাচারী হইলেও সে যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই বলিতে হইবে, তাহার কর্ম্মচেষ্টা উত্তম এবং সে তখন ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অনন্য ভক্তিযোগে মনুষ্য পাপী হইলেও পবিত্র হয়, ধর্ম্মাত্মা হয়।

এই পবিত্রতা ও এই ধর্ম্মাত্মতা,—ঈশ্বরশ্রদ্ধামূলক যে ধর্ম্মের যোগে সাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাকে একেশ্বরী ধর্ম্মই বল, প্রার্থনাসমাজের ধর্ম্মই বল, কিংবা উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার সারভূত ধর্ম্মই বল, প্রকৃত সনাতন আর্য্যধর্ম্মই বল, হিন্দুধর্ম্মের রহস্যভূত ধর্ম্মই বল, কিংবা মনুষ্যধর্ম্মের অন্তর্ভূত সমস্ত প্রচলিত ধর্ম্মের সারই বল, তাহার চারিদিকে প্রচার সম্বন্ধে অন্য বিষয় অপেক্ষা অধিক প্রযত্ন করা আবশ্যক এবং উহারই প্রচারে দেশ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উৎসবে আশা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আশা লইয়াই মানুষ সংসারে জীবিত থাকে। মনুষ্যদেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশার স্পন্দন প্রতিনিয়ত আমাদের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। কিন্তু এই আশাকে ফলবতী করিতে হইলে, যে উদ্যম, উৎসাহ ও সাধনার প্রয়োজন, তাহা আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে আমরা সকলেই কল্যাণের আশা রাখি। আশা ত সকলেরই রহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ফলবতী করিবার জন্য যে প্রচেষ্টার আবশ্যক, তাহা কয়জনের মধ্যে বিরাজমান? ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের আশার কথা পরিহার করিয়া, সমগ্র জাতিগত বা দেশগত স্বার্থের আশাকে মূর্ত্তিদান করিবার জন্য কয়জনই বা লালায়িত? আমরা যে ভাবে আশা পোষণ করি, তাহা নিরাশার নামান্তর মাত্র। আলস্য ও ঔদাস্যের জীবাণু যাহার সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, নিৰ্জ্জীবতার প্রতিরূপ সেই ঘোর অদৃষ্টবাদই এ দেশের লোকের চিরন্তন ব্যাধি। এই বিষম অদৃষ্টবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা রসাতলের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। শোক-দুঃখ—সর্ব্ববিধ জ্বালাযন্ত্রণার মর্ম্মান্তিক প্রবাহের ভিতরে ক্ষণিক সান্ত্বনা লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু কর্ম্মবিমুখতা ও নিশ্চেষ্টতা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যে সুতীব্র আশা অন্তরে প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিলে মানুষ অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, জীবনকে সুন্দর ও নবভাবে বিগঠিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এমনই দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন কাটিয়া গিয়াছে।

অদ্যকার দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, আশার জ্বলন্তবর্ত্তিকা হস্তে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নিরাশ নিরানন্দ ও নিদ্রিত জনবৃন্দকে সচকিত করিয়া আশার বারতা শুনাইয়াছিলেন, আশা-পোষিত প্রাপ্যকে লাভ করিতে পারিলে যে তাহাতেই মানবের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা, তাহা নির্ভয়ে বিঘোষিত করিয়াছিলেন,

তাই আজ আমাদের এই আনন্দ-কোলাহল। যে দুশ্ছেদ্য গতানুগতিকতার প্রভাব আমাদিগকে এতদিন নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, যে সুদৃঢ় আচার-বিচারের প্রাবল্য প্রকৃত সত্যকে এতকাল অবগুণ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছিল—স্বাধীনভাবে একপদও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, অদ্যকার দিনে তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়াই আজ আমাদের এই আনন্দধ্বনি। একবার স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পৌরাণিক জল্পনা ও কল্পনার ভিতর দিয়া বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। তন্ত্রোচিত সাধনার তাণ্ডব-লীলায় পশুরক্তে আমরা দেবদেবীর প্রসন্নতা বিধান করিতে গিয়া কারুণ্যভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরকে পাষাণসমান কঠোর করিয়া ফেলিয়াছি। প্রাণহীন ও অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ডবাহুল্যের মধ্যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাই নাই। অন্ধভক্তির আতিশয্যে জ্ঞানের আলোককে একেবারেই নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, এক অপ্রতিম ঈশ্বরের আসনে বহুদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যদি বা কখন কাহারও অন্তরে চৈতন্যের উদ্রেক হইয়াছে, জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, সৎসাহস এমনই নির্দ্দয়ভাবে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল যে, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বা আচরণ সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে কাহার সাধ্য! এইখানেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের অদম্য বীর্য্যের পরিচয় পাই। তিনিই জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিতরে যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন—ধর্ম্মের সাধনার সহিত হৃদয়-তন্ত্রীর ঝঙ্কারের যে ঐক্য আছে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। নিরবচ্ছিন্ন নিজের যুক্তি তর্কে নহে, কিন্তু উপনিষদের ভাষায়, বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনায় ও দেশ-বিদেশীয় শাস্ত্রের মন্থনে। তিনি স্বাধীন চিন্তার পথ প্রমুক্ত করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীনতম শাস্ত্র-সম্ভার আমাদের সম্মুখে বহুকষ্টে উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, আশা রাখিয়া গিয়াছেন যে, স্বাধীনতার অপব্যবহার না করিয়া উপনিষদের সাহায্যে সুমার্জ্জিত জ্ঞানের আলোকে নিষ্ঠার সহিত সত্যের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, ভক্তির তীর্থে উপনীত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিব, শান্তিরসধারা পান করিয়া ইহজীবনকে ধন্য করিব।

রাজা যে আশা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করিলেন, মহর্ষিদেব সেই আশা পোষণ করিয়া ইহারই মূলে জলসেচন করিলেন যে, ইহা মহাদ্রুমে পরিণত হইয়া সকলকে অমোঘ আশ্রয় বিধান করিবে। আজ আমরা এই মহামহোৎসবের পবিত্র সন্ধ্যায় সেই জ্বলন্ত আশায় উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশার সুবিমল রশ্মি দেশ ভরিয়া চারিদিকে বিকীরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিতে না পারিলে, সত্যকে ও নীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করিতে না পারিলে, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংসাধিত করিতে না পারিলে, একই ধর্ম্মের আশ্রয়ে সমবেত হইতে না পারিলে, ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহসৌহার্দ্দ্যে সকলের সহিত গ্রথিত হইতে না পারিলে, প্রকৃত জাগরণ, যাহার প্রভাবে সর্ব্ববিধ জঞ্জাল অপসারিত হইতে পারে, তাহা লাভ করা সুদূরপরাহত। জাতিগত এই নিশ্চেষ্টভাব বিদূরিত করিবার জন্য, জনসাধারণের ভিতরে চেতনাকে মুখর করিয়া তুলিবার জন্য—স্বাধীন চিন্তার ধারাকে প্রমুক্ত করিবার জন্য এবং আমাদিগকে কর্ম্মপ্রবণ করিয়া তুলিবার জন্য, সময়ের আহ্বানে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ইহারই কল্পে আপনার সমস্ত শক্তি, বিপুল অর্থ নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য মহাজন, যাঁহারা ইঁহাদেরই আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া অজেয় শক্তির পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিতেছেন, একমাত্র আশাই সর্ব্ববিধ নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহাদিগকে অচল ও অটল করিয়া রাখিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহারা কর্ত্তব্যের পথ, সাধনার ক্ষেত্র পরিহার করেন নাই। এই উদ্দীপনার আলোক যখন আবার ভারতের অযুত অগণ্য লোকের নির্ব্বাণপ্রায় আশার বর্ত্তিকাকে পূর্ণভাবে আলোকিত করিয়া তুলিবে, তখনই এই আত্মবিস্মৃত জাতির সর্ব্ববিধ মোহ কাটিয়া যাইবে, প্রাচীন ঋষিগণপরিসেবিত সেই পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের দেশে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া পড়িবে।

নিরবচ্ছিন্ন অতীতের কাহিনী লইয়া গৌরব অনুভব করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম যে চির উন্নতিশীল ও চিরবিকাশশীল। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানের এবং আলোচনার ও আশার যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। এই জ্ঞানোন্নত শতাব্দীতে প্রচলিত ধর্ম্মসকলের মধ্যে যত-কিছু আবিলতা আছে তাহা আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; সম্প্রদায়গত বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মূল সত্যের দিকে প্রধাবিত হইবার আকুলতা ধর্ম্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল সাধকগণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বাহুবিস্তারে আগমন-উন্মুখ নবাগত অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করিবার সময় সমুপস্থিত। নিজ নিজ চরিত্রের প্রভাবে ত্যাগের উৎকর্ষে, বিনয়ের কোমলতায়, জ্ঞান ও ভক্তির সাধনায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাবকে আকর্ষণী শক্তি দিয়া জনসাধারণের সম্মুখে ভাস্বর করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবেন, আশা ও আনন্দে সকলে উৎফুল্ল হইবে।

আমরা এই পবিত্র উৎসবস্থলে সকলকে স্মরণ করিয়া দিতে চাই যে, আমরা আজ সকলেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে দণ্ডায়মান; সার্ব্বভৌমিক সত্যের দ্বারে আমরা সকলেই অভিযুক্ত; শান্তির প্রবর্ত্তক মহেশ্বরের রাজদ্বারে আজ সকলে সমুপস্থিত; সকল ধর্ম্মের পত্তনভূমি পবিত্রতা ও উদারতার, নিষ্ঠা ও মিতাচারের, বৈরাগ্য ও সংযমের রাজনিয়মের ব্যতিক্রমে ঘোর অপরাধী। বিচারের পরিবর্ত্তে অনুতাপিত চিত্তে, সাশ্রু নয়নে, করজোড়ে তাঁহার নিকট আজ সমবেতকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা কর। বলদাতা পিতা, শিষ্যবৎসল গুরুর নিকট শক্তি ভিক্ষা কর। পূজার সমস্ত আয়োজন স্তবকে স্তবকে তোমাদের সম্মুখে বিরাজমান। ব্রহ্মপূজায় প্রবৃত্ত হও। এই ব্রহ্মপূজা জীবনের ব্রত করিয়া লও। পাপের ও দুর্ব্বলতার পিচ্ছিল পথে আর কখনও পরিভ্রমণ করিবে না, তাঁহার নামে এই প্রতিজ্ঞা মর্ম্মদেশকে কাঁপাইয়া গ্রহণ কর, তোমাদের কলুষরাশি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং সকল অপরাধ ক্ষমিত হইবে। আশাপূর্ণহৃদয়ে প্রমুক্তকণ্ঠে তাঁহার নামগানে আজ গগনাভোগ পূর্ণ কর, জীবন ধন্য হইয়া উঠুক।

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেসী; শিল্প, শিক্ষা, ও সমাজের উন্নতিচেষ্টা।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

যে সময়ে কিশোরীচাঁদ কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইলেন অনেকে সেই সময়ই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদিও আমরা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের প্রতি পর্ব্ব অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত ও অনুপম মহিমায় পরিপূর্ণ দেখি এবং কোন্ অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় তাহা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম, তথাপি কতিপয় কারণে আমরা তাঁহার জীবনের এই সময়ের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেছি এবং বোধ হয় কিশোরীচাঁদ স্বয়ংও এই সময়টিই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় ও গৌরবময় কাল বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। সুখময় কেন?—পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে; কারণ, কিশোরীচাঁদ জীবনে কখনও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেকালে যখন মানবের আবশ্যক দ্রব্যাদি এত মহার্ঘ্য ছিল না এবং এরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড বিষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তখনও কিশোরীচাঁদ রাজকর্ম্ম করিয়া এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত আতিথ্য ও লোকহিতার্থে দান তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য করিত। তিনি কখনও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিতেন না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। গৌরবময় কেন? লোকবাঞ্ছিত দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নহে—কারণ, কিশোরীচাঁদ কখনও পদগর্ব্বে গর্ব্বিত হয়েন নাই এবং যে পদের জন্য লোক লালায়িত এবং আপনার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কিশোরীচাঁদ আপনার স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সেই পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তবে কিসের জন্য? কিশোরীচাঁদের জীবনের স্বপ্ন সফল হইল বলিয়া—তিনি দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার জীবন উৎসৃষ্ট করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া। যে অভিমত আমার অথবা আপনার সমর্থনে রাজা অথবা প্রজা গ্রাহ্য করিবেন না, তাহা উচ্চপদাধিষ্ঠিত কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির স্বীকৃত হইলে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ এই সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই এই সময় অতি সুখময় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহার লোকহিতেচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার দুইটি উপায় দেখিতে পাইলেন। প্রথম, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকে বিরত দেশের অবস্থা

বুঝাইয়া দেওয়া এবং এই প্রকারে দেশহিতকর বিষয়ে তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সহকারিতা লাভ করা। দ্বিতীয় —দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সমাজের নেতা, যাঁহারা সমাজের কলঙ্কক্ষালনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাঁহাদিগের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেওয়া, তাঁহাদিগকে কর্ম্মজীবনে প্রবৃত্ত করা।

কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একটী উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করেন। তখন চীফজাষ্টিস, পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে কাশীপুরে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের ইচ্ছা, পূর্ব্বোক্ত প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করা। নিকটবর্ত্তী কামারহাটী গ্রামে বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ বাস করিতেন এবং দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহার নিকটে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার বাসস্থানে সতত সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকার সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন।

কিশোরীচাঁদ প্রায়ই তাঁহার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া পরস্পরের আলাপ করাইয়া দিতেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিরাট আয়োজনে ভোজ দিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাঁহার কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর নাম পাওয়া যায়:—

২রা নভেম্বর ১৮৫৫। সন্ধ্যাকালে একটী ক্ষুদ্র পার্টি দিয়াছিলাম। থিওবোল্ড, মেজর এ এম, আমার অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র, আমার সহকর্ম্মী মিষ্টার ফেগান্ এবং রেভারেণ্ড প্রফেসর কে-এম ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণের (কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়ের) খোষগল্পে ও হাস্যকৌতুকে সন্ধ্যাকালটা বেশ আমোদে কাটিয়াছিল।

৩রা নবেম্বর ১৮৫৫। আর একটা 'পার্টী' দেওয়া হইল। এটা গত কল্যের পার্টি অপেক্ষা জাঁকাল এবং সেইরূপই আনন্দে শেষ হইত, যদি 'বুড়া রাজ' গোল না বাধাইত। তাহার স্ফূর্ত্তি আনন্দের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। গোপাল লাল ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, গৌরদাস বসাক, নন্দলাল সেন এবং রাজ এই কয়জন আসিয়াছিলেন। বড় পার্টি আমি দেখিতে পারিনা। ছয় জনের অধিক লোক হইলেই আমি বড় পার্টি বলিয়া গণনা করি। কিন্তু অদ্য আমি অধিক লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহার কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার টেবিলে যত জন ধরে তত জন কৃতবিদ্য যুবককে একত্র দেখিব।

উক্ত ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হয় যে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১নং দমদম রোডস্থিত উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন:—

১৭ই জুন ১৮৫৫। অদ্য প্রাতে আমার পাইকপাড়ার নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিলাম। দাদা ও আমি বৈকাল ৫টার সময় গাড়ী করিয়া আসিলাম। আমরা উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি প্রার্থনা করি যেন আমি এই বাটীতে সুখভোগ করিতে পাই। আমি কেবল সচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদন ও গ্রীষ্মের উত্তাপ ও বর্ষা-শীতাদি হইতে আশ্রয়-লাভজনিত দৈহিক সুখ চাহিনা, নৈতিক ও মানসিক উন্নতিজনিত সুখের প্রয়াসী। হে সর্ব্বশক্তিমান অনন্তকালবিদ্যমান জগদীশ্বর! যদি এই বাটীতে আমার অবস্থিতি তোমার ইচ্ছানুযায়ী হয় তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এখানে সুখে বাস করিতে পারি। তোমার করুণা যেন দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করি। যে অলসভাব আমাকে সম্প্রতি আক্রমণ করিয়াছে তাহা দূর করিয়া আমি যেন জ্ঞানচর্চ্চা ও তত্ত্বচিন্তায় একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ করিতে পারি। আমার শক্তিনিচয় যেন আমার নিজের এবং স্বদেশবাসীদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিবিধানকল্পে নিয়োজিত করিতে পারি। বাঙ্গালা দেশের যে সামাজিক সংস্কারব্যাপারে আমি যোগদান করিয়াছি তাহা যেন দিন দিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করে এবং দেশীয় সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কার্য্যতঃ সহানুভূতি লাভ করে। আমি যেন উক্ত ব্যাপারে অবিশ্রান্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারি।

এই রোজনামচার শেষাংশে তাঁহার সমাজোন্নতি বিষয়ে চেষ্টার উল্লেখ আছে। তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার দেশীয় শিল্পোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল গুডউইন বেথুন সোসাইটীতে "Union of Science, Industry and Art" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও এতদ্দেশে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। ঐ বৎসরে মার্চ্চ মাসে ইঁহারই চেষ্টায় মিঃ হজসন প্র্যাটের বাটীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ অ্যালেনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং—Society for the promotion of Industrial Art নামে একটি সমিতি সংগঠিত হয়। সার সিসিল বিডন ইহার সভাপতি এবং রেভারেণ্ড জে. লং,উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ

ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হয়েন। * এই সমিতির চেষ্টায় The Calcutta School of Industrial Arts নামক শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে গঠিত দ্রব্য (Models) এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় (natural objects) দৃষ্টে অঙ্কন ও স্থাপত্য অঙ্কন (architectural drawings) ধাতুর উপর খোদাই কার্য্য (etching) কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য (wood engarving) লিথোগ্রাফি, মৃণ্ময়পাত্র নির্ম্মাণ (pottery) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে প্লাষ্টারের ছাঁচ নির্ম্মাণ (moulding) ফটোগ্রাফি প্রভৃতি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসে রিগো, মিঃ ফাউলার, মিঃ জর্জ্জ হুইট্লি, মুসে ম্যালিয়েট প্রভৃতি শিক্ষক ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন।

কিশোরীচাঁদ এই সমিতির প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে দুইটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫। প্রাতে গাড়ী করিয়া Industrial School এর কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে একটি প্রদর্শনী খোলা উচিত কি না সেই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত সভা আহূত হয়। আমি কর্ণেল গডউইনের উক্ত প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করি এবং বলি যে বিদ্যালয়ের বাটীতেই একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রদর্শনী খোলা হউক। আমার প্রস্তাবই গৃহীত হইল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিদ্যালয়ের মাসিক ২০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে, সুতরাং খরচ কমান প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের নূতন সম্পাদক রেভারেণ্ড সি এচ এ ডল উহার কার্য্যে সোৎসাহ মনোনিবেশ করিতেছেন এবং যদিও তিনি সম্প্রতিমাত্র বষ্টন নগর হইতে আসিয়াছেন এবং কলিকাতার বিষয় অনভিজ্ঞ তথাপি তিনি শীঘ্রই খুব নিপুণ সম্পাদক হইবেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫। প্রাতে Industrial Art Schoolএ গাড়ী করিয়া গিয়াছিলাম। ছাত্রদের গঠন ও অঙ্কন বিদ্যায় উন্নতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। প্রোফেসর রিগো আমাকে কতকগুলি "এস রিলিফ" দেখাইলেন। মিষ্টার হ্যানিডের জন্য তিনি উহা প্রস্তুত করিতেছেন। সেগুলি বাস্তবিক অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে একটি মেডিচির ভিনস্ ও একটা হার্কিউলিস্ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলাম। উহা জীবন্ত মানুষের ন্যায় বৃহৎ হইবে এবং পিত্তলের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমার উদ্যানে স্থাপিত হইবে। আমি ভিনস্ ও হার্কিউলিস্ এই জন্য মনোনীত করিলাম যে একজন সৌন্দর্য্যের ও অপরজন পুরুষোচিত শক্তির আদর্শ।

কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটীকার বৈঠকখানা গৃহের প্লাষ্টারের কাজও রিগোর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

যাহাতে দেশে শিল্পোন্নতি হয় তজ্জন্য তিনি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এসিয়াটীক সোসাইটি এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর তারিখে তিনি তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :—

এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে গিয়াছিলাম। রামগোপাল আমাকে সভ্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সভার সহিত সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিতে আমি এই জন্য ইচ্ছা করি যে রাজসাহী যাওয়ার পূর্ব্বে আমি ইহার সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলাম। এই সভাটীর সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে আমি উৎসুক। আমার বিবেচনায় যে উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার বহির্ভূত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা এই সভার সাহায্যে একটি শিল্প-প্রদর্শনী স্থাপিত হয়। কর্ণেল গডউইনের প্রস্তাবিত ব্যবসায়-শিল্প-প্রদর্শনী সংস্থাপনে এই সভা কেন নেতৃত্ব গ্রহণ করিল না ? আমার অভিমত কৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রাজেন্দ্র লাল, লঙ, কোলব্রুক ও যাদবকে বলিতে হইবে এবং এই সভার পুনর্গঠনবিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

বহুদিন হইতেই এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীচাঁদ চেষ্টা করিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি কলিকাতায় রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফকে তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, এবং রাজশাহিতে স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রায়ই বেসরকারী স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিতেন, পারিতোষিকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে স্কুল ফণ্ডে অর্থসাহায্যাদি প্রদান করিতেন। * পাইকপাড়ার একটী

---

* শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবের কলিকাতার ইতিহাস—শিল্পপুষ্পাঞ্জলি ১ম বর্ষ ১৮৮৬।

* ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'Hindoo Patriot' হইতে একটী প্যারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"We are glad to inform our readers and the public that our worthy Junior Magistrate Roy Kissory Chand Mitter has given a handsome donation to the Calcutta Seminary and has also expressed his desire of visiting the school one day.

বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন। তিনি স্কুলসমূহে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কৃষি এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখের ডায়েরীতে তিনি লিখিয়াছেন :—

দাদা ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুকাল কথাবার্ত্তা হইল। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত। এদেশে গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বড় বেশী। সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় কেবল পাঠশিক্ষা ও দ্বিতীয় অবস্থায় লিখন ও অঙ্কশিক্ষা দেওয়া হইবে,—কিন্তু তাহার পর একটা শিল্পবিদ্যা এবং কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। বালকগণকে কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যার মূল বিষয়গুলি শিখাইতে হইবে—শব্দ না শিখাইয়া বস্তু শিক্ষা দিতে হইবে। লঙ সাহেবের ঠাকুরপুকুরের স্কুল আমি দেখিয়া আসিব এবং Botanic স্কুলটী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিব। আগামী শীতকালে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। মানুষের আয়ু অল্প তাহা আমি এখন যেরূপ করিতেছি সেরূপ অপব্যয় করিলে চলিবে না।

কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, এতদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই মেডিক্যাল কলেজে বট্যানিক গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিটেণ্ডেণ্ট ডাক্তার টম্‌সনের উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতাদি শুনিতে যাইতেন। রেভারেণ্ড ডল্ ও লঙও তাঁহার সহিত যাইতেন। মিঃ লঙই টমসনের সহিত কিশোরীচাঁদের আলাপ করাইয়া দেন। সেই অবধি ডাক্তার টমসন মধ্যে মধ্যে কিশোরী-চাঁদের বাটীতে আসিতেন এবং উভয়ে এতদ্দেশে কৃষি-শিক্ষাবিস্তারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাদি হইত :—

২৫শে অক্টোবর ১৮৫৫। বাড়ীতে একটী ছোট প্রাতর্ভোজ পার্টি দিয়াছিলাম। ডাক্তার টম্‌সন্ (বোটানিক গার্ডেনের নূতন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট), রেভারেণ্ড জে লঙ, আগাবেগ, দাদা ও রাজ। খাওয়ার পর ডাক্তার টি, লঙ, দাদা ও কুমুদকে সাতপুকুরে লইয়া গেলাম। ডাক্তার বাড়ীটির ঐশ্বর্য্য ও সুরুচির পরি-চায়ক সাজ-সরঞ্জামের তারিফ করিলেন। সাতপুকুর হইতে আমরা আমার বাগানের সংলগ্ন রাজা নরসিংহের বাগানে গেলাম। ডাক্তার টম্‌সন্ নানাবিধ বৃক্ষলতার সুবিশাল সংগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দর্শন করিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় বাগানটী প্রদক্ষিণ করা হইল না, কেবল কন্‌সার্ভেটারিটি দেখিয়াই তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ৩টার সময় টিফিন খাইলাম ও দিনটি বেশ আমোদে কাটিল। ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গালা মেডিক্যাল ক্লাস, কৃষিবিদ্যালয় স্থাপ-নের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সকল বিষয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হইল। গোধূলির সময় সকলে প্রস্থান করিলেন।

২৭শে অক্টোবর। আমি অনেকদিন ধরিয়া কৃষিবিদ্যালয়ের বিষয় ভাবিতেছি, এবং গতকল্য টমসন ও লঙ্ এর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা ও সহজসাধ্যতা সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। আমি একটা skeleton plan প্রস্তুত করিয়া বন্ধুদিগকে দেখাইব। বাঙ্গালা মেডিক্যাল ক্লাস ও বালিকাবিদ্যালয় আমাকে পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিতে হইবে। শেষোক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীডন সাহেবের সহিত আমাকে দেখা করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যালয়টাও যতবার পারি পরিদর্শন করিতে হইবে।

কিশোরীচাঁদের এই কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কতদূর বলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তিনি আজীবন লিখিত প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং কথোপকথনে যাহাতে এইরূপ বিদ্যালয় সর্ব্বত্র স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ কিশোরীচাঁদের উদ্যোগে এবং প্রযত্নে কুমার কালীকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক পাইকপাড়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি প্রায়ই স্কুল পরি-দর্শন, পরীক্ষাগ্রহণ ও পারিতোষিক প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রগণ এবং শিক্ষকগণকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে য়ুরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আনয়ন করিতেন। ইহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় পরীক্ষা লইতেন এবং পুস্তকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই স্কুলের প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে কুমার কালীকৃষ্ণ কিশোরীচাঁদের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে :—

"I have been always warmly assisted by Roy Kissory Chaud Mitter, the Magistrate of the Northern Division, Calcutta. He has always evinced a deep interest in the welfare of the School and is one of its sincere friends."

———

বঙ্গীয় পল্লীসমাজের জীবন-মরণ সমস্যা।

(শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের জলসেচনের বাঁধ ও জলাশয়ের করুণ কাহিনী আসিয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমিক অবনতির ইতিহাস এই সকল জলাশয়ের ধ্বংসকাহিনীর সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় যান, দেখিতে পাইবেন যে, শরতে বৃষ্টির অভাব পূরণ করিবার জন্য, বর্ষার প্রত্যেক জলবিন্দুটী সঞ্চয় করিবার জন্য, অতীত কোনও যুগের সহৃদয় জমিদারসম্প্রদায় কি অসাধারণ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সহিত জলাশয় খনন করিয়া ও বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য কথাটা একটু সুস্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান অসমতল হওয়ায়, বৃষ্টির জল স্বভাবতঃই গড়াইয়া নদী নালায় পড়ে। যে দিকে গড়াইয়া যায়, সেই স্থানে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিলেই, সহজে অধিকাংশ জল আবদ্ধ করিতে পারা যায়; ইহাকেই সেচনের "বাঁধ" বলা হয়। সমতল ভূমিতে পুষ্করিণী খনন অপেক্ষা ইহার খরচ অনেক কম, কিন্তু বাঁধ হইতে নিম্নস্থ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন সহজসাধ্য বলিয়া ইহার উপকারিতা অনেক বেশী। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশ ও মল্লভূমের তৎকালীন জমিদারগণ যেরূপ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সহিত পশ্চিমবঙ্গে এই উপায়ে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা পাওয়া অতিশয় দুর্লভ। এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের ভূম্যধিকারিগণ, দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির মূল এবং পল্লীবাসীদের প্রাণস্বরূপ এই সকল জলাশয়কে বিনষ্ট হইতে দিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়াও কঠিন। এই সকল জলাশয় যে প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও তাহাদের উপযুক্ত স্থান যেরূপ বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা সহকারে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদের লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ দেখিলেও সেই বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহাদের কোনও কোনওটী ছোট খাটো হ্রদের মত বৃহৎ, তাহা হইতে হাজার হাজার বিঘার জলসেচনের বন্দোবস্ত ছিল; সে সকল জমির ধান কখনও মরিত না। অপরগুলি আকারে ছোট হইলেও, যে সকল জমি সেচনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদুপযুক্ত জল ধারণ করিত। বড় বড় বাঁধগুলিতে দূরস্থ উচ্চ ভূমি হইতে জল আনিবার খাল কাটা ছিল এবং জমিতে জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল! এই সকল বাঁধ ও জলাশয় হইতে কেবল যে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন হইত তাহা নহে, ইহাতে স্থানীয় অধিবাসী ও পশ্বাদির পানীয় জলের সংস্থান হইত।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা পূর্ব্বপুরুষগণের এই সকল কীর্ত্তিগুলি অযত্নে নষ্ট হইতে দিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অবহেলায় ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে, এই সকল জলাশয়ের কোনটা বা ভরাট হইয়া গিয়াছে, কোনওটী বা পঙ্কিল ডোবায় পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ সে দিকে দৃকপাত না করিয়া, মামলামোকদ্দমা ও দলাদলিতে মত্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, এবং কখনও বা অদৃষ্টকে, কখনও বা দেশের আবহাওয়াকে, আর কখনও দেশত্যাগী প্রবাসী জমিদারসম্প্রদায়কে যত অনর্থের মূল বলিয়া গালি দিতেছে। কালক্রমে জমিজায়গা হস্তান্তরিত হইয়া বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল। তাঁহারা এবং তাঁহাদের উপরিস্থ জমিদারবর্গ প্রজাদের নিকট জমির জন্য কর আদায় করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে সকল জলাশয় তাঁহাদের প্রজাবর্গের প্রাণদান করিতেছিল ও কৃষিক্ষেত্রগুলি সফল করিতেছিল, সেই সকল জলাশয়ের সংস্কার কার্য্যে কেহই মনোযোগ করেন নাই। কোনও স্থানে এক পুষ্করিণীর স্বত্ব বিভিন্ন সরিকগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে এবং সেই পুষ্করিণী হইতে যে সকল জমি সেচন হইত তাহাও কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কৃষকের হাতে আসিয়াছে, কিন্তু দুই পক্ষের কেহই জলাশয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত মনে করে নাই। কেবল যে যত্নের অভাব ঘটিয়াছে তাহা নহে; অনেক স্থলে সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জলাশয়কে ভরাট করিয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত করা হইতেছে। এমনি করিয়া অনেক বাঁধ ও জলাশয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। কোথাও বা বাঁধের খানিকটা অংশমাত্র হইতে পূর্ব্বতন জলাশয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকলের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে, তাহার অধিকাংশেরই আয়তন ও গভীরতার হ্রাস হইয়াছে।

এই জেলায় নদীগুলিতে বর্ষায় প্রবল বন্যা আসে, কিন্তু বৎসরের বাকী কয় মাস তাহারা শুকাইয়া যায়; সুতরাং জমিতে সেচনের জন্য ও পানীয় জলের জন্য এই সকল বিনষ্ট জলাশয়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই জন্যই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ব্যবহার করে ও তাহাতেই তাহারা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে; সেই

জলে তাহারা নিজেরা স্নান করে, আবার গো-মহিষের গা ধোয়ায়, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, এবং গ্রামের যাবতীয় আবর্জনা তাহাতেই নিক্ষেপ করে। অনাবৃষ্টির সময় যখন জমিতে জলসেচন করিবার প্রয়োজন হয়, তখন সমস্ত জল নিঃশেষ হইয়া যায় এবং মানব ও পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিম্নস্থ তরল কর্দমরাশি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

যে স্থানে এই সকল কারণ একাধারে বিরাজ করিতেছে, সেখানে যে প্রতি বৎসরই শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ হইবে এবং সেখানকার শতশত লোক যে অনাহারে ও ব্যাধির প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহাতে আর বিস্ময় কি? বাঁকুড়ার মত স্বাস্থ্যকর স্থানে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব যে জলাভাব ও অপরিষ্কৃত জল ব্যবহারের ফল তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, অপর্যাপ্ত আহার ও শারীরিক পুষ্টির অভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ, এবং যেখানে জলাভাবে শস্যহানি ঘটিয়া লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে সেখানেই এই রোগের সমধিক প্রকোপ লক্ষিত হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়ার সহিত অজন্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তদ্বিষয়ে তর্ক করা চলে না। অধিকন্তু, সেদিন বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনীতে বক্তৃতা উপলক্ষে, কলিকাতা ট্রপিকাল মেডিসিন বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ডাক্তার মুইর এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জলাভাব বশতঃ লোকে ভাল করিয়া স্নানাদি করিতে পারে না বলিয়াই এই জেলায় নিদারুণ কুষ্ঠরোগ এত বিস্তার লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, অপরিষ্কৃত আঙ্গুলের নখের কোণে কুষ্ঠরোগের বীজাণু থাকিয়া যায়, এবং পরে সেই নখ দিয়া শরীরের কোন স্থানে চুলকাইলে সেই বীজাণু শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য, ব্যাধি ও শস্যাভাব, ম্যালেরিয়া ও কুষ্ঠরোগ এই সকলের প্রত্যক্ষ কারণ জেলার অধিবাসীদের অবহেলা, ঔদাস্য ও অজ্ঞতা, যাহার ফলে জেলার অন্যূন ত্রিশ চল্লিশ হাজার জলাশয় আজ নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

যে কৃষকদের জমি এই সকল জলাশয় হইতে সেচন হইত তাহারা এতকাল মোকদ্দমায় ব্যাপৃত এবং দলাদলি ও গ্রাম্য কলহে মত্ত ছিল। তাহাদের বোধ হয় ভাবিবার অবসর হয় নাই যে, যদি একদিন তাহারা বিরোধ ত্যাগ করিয়া একতাবদ্ধ হয়, তবে জমিদার বা গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকেই, কেবলমাত্র নিজেদের সমবেত চেষ্টায়, অনায়াসে ও অতি অল্পব্যয়ে এই সকল জলাশয়ের সংস্কার করিতে পারে। ইহার উদাহরণস্বরূপ বর্ত্তমানে পঙ্কোদ্ধার করা হইতেছে এমন একটী জলাশয়ের কথা বলিতেছি। ইহা হইতে পূর্ব্বে প্রায় ১০০০ এক হাজার বিঘা জমিতে জলসেচন হইত, কিন্তু কালক্রমে বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইহাতে এখন বেশী জল ধরে না এবং উক্ত হাজার বিঘার মধ্যে প্রায় ৪০০ চারি শত বিঘার ধান জলাভাবে প্রতি বৎসর মরিয়া যায়। প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের মূল্য ন্যূনকল্পে ১০ টাকা ধরিলেও, এই প্রজাবর্গের বৎসরে অন্ততঃ চার হাজার টাকা ক্ষতি হইতেছে। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করিবেন না যে, বাঁধটী মেরামত করিয়া এই ৪০০০৲ টাকার ক্ষতি নিবারণ করিতে কেবলমাত্র ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। আর একটী জলাশয়ে কেবলমাত্র ২০০৲ টাকা খরচ করিয়া জল আসিবার প্রণালীটি মেরামত করিয়া দিলেই, সেই জলাশয়ে ১০০০ এক হাজার বিঘা সেচনের উপযুক্ত জল সঞ্চিত হইতে পারে, এবং বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর যে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হইতেছে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। এই প্রকার বিস্ময়জনক দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। কোন বাঁধ মেরামত করিতে হয়ত ২০০০৲ টাকা খরচ, আবার একটী ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ের সংস্কারে হয়ত ২০০৲ টাকা মাত্র ব্যয় হইবে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সংস্কারের ফলে অধিকতর শস্য উৎপন্ন হইয়া প্রতি বৎসর যে লাভ হয় তাহাতে এক বৎসরেই খরচের সমগ্র টাকা উঠিয়া যায়। সুতরাং লাভের তুলনায় খরচের পরিমাণ অতিশয় কম এবং কৃষকেরা যদি সমবেত হইয়া কায করিতে শিক্ষা করে তবে অনায়াসেই ও অতি অল্পব্যয়ে এই ভয়ঙ্কর অজন্মা ও দারিদ্র্য নিবারণ হইতে পারে।

কিন্তু দেশে সমবেত চেষ্টার একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া এ বিষয়ে কোন উদ্যোগই হয় নাই।

এই সকল পুরাতন পুষ্করিণী ও জলাশয় ব্যতীত, এই জেলায় অনেক ছোট ছোট "জোড়" বা জলস্রোত আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অধিকাংশ সময়ে একেবারেই শুকাইয়া যায়; আবার অনেকগুলিতে সারা বৎসর ধরিয়া ভূনিম্নস্থ ঝরণার জল একটু একটু বহিয়া থাকে। এই সকল স্রোতের মুখে বাঁধ দিলে যে অনাবৃষ্টির সময় জমিতে সেচনের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যায় তাহা এ জেলার কৃষকগণ বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছে। সেই জন্য স্থানে স্থানে কৃষকেরা স্রোতের উপর কাঁচা বাঁধ বরাবরই প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ইহাতে ধান্য রোপণের সময় কতকটা ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু বর্ষার প্রবল স্রোতে তাহারা টিকিতে পারে না। ফলে শরতের অনাবৃষ্টিতে যখন ধান মরিতে থাকে তখন ঐ সকল কাঁচা বাঁধ কাজে লাগে না, পরবৎসর আবার

নূতন করিয়া বাঁধ দিতে হয়। প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ বা দলাদলির জন্য অনেক সময় কাঁচা বাঁধও হইয়া উঠে না। এইরূপ জলাভাব দূর করিবার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহাতে হয় তাহার জন্য সকলের সমবেত চেষ্টা কোথাও হয় নাই।

১৯১৬ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খেলার গ্রামে একটী জল সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশে প্রজাবর্গের সমবেত চেষ্টায় জলাভাব দূর করিবার কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। ১৯১৯ সালে, বীরভূম কৃষিসমিতির উদ্যোগে ও তত্রস্থ শাখা কৃষিসমিতিগুলির সহায়তায় পুরাতন জলাশয় সমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য যে জেলাব্যাপী আন্দোলন করা হইয়াছিল, বীরভূমের জেলাম্যাজিষ্ট্রেটরূপে সেই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। বীরভূমের এই আন্দোলনে যথেষ্ট সুফল হইয়াছিল এবং বীরভূম কৃষিসমিতির সম্পাদক, বঙ্গীয় সমবায় মণ্ডলী গঠন সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুত রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম, এল, সি, মহাশয়ের নেতৃত্বে বীরভূমের গ্রাম্য সমিতিগুলি প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বহু জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার করিয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রথমটী রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর আমারই নামে নামকরণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত এই আন্দোলনের সংবাদ বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তত্রত্য সমবায় সমিতির ইনস্পেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী যে বীরভূমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রজাবর্গের নিকট হইতে জমির অনুপাতে চাঁদা আদায় করিয়া জলাশয় ও বাঁধগুলির সংস্কার করিবার প্রণালী বীরভূমের অনুকরণেই বাঁকুড়া জেলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রফুল্ল বাবু বীরভূমের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কয়েকটী গ্রাম্য কৃষিসমিতি গঠন করেন, তাহাদের কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমের ন্যায়, জমিদারের সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় জলাভাব সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে সমবায় সমিতির ইনস্পেক্টার সুরেশ বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ১৯২০ সালে তিনটী জল সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসর আরও তিনটী সমিতি গঠিত হয়, এবং আরও দুই তিনটী সমিতি গঠনের কথা চলিতেছিল। বিষ্ণুপুরে একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় সমবায় সমিতিগুলির টাকা কর্জ্জ পাইবার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু জলসেচন সমিতির গঠনের চেষ্টা আর অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এবং দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ের কোনও খোঁজ খবর পায় নাই। এই প্রণালীতে কাজ করিলে কতদূর উন্নতির সম্ভাবনা তাহাও কেহই উপলব্ধি করে নাই।

বিগত শীতকালের প্রারম্ভে এই অবস্থা। বাঁকুড়া জেলার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া এই প্রচেষ্টার অসীম উপকারিতা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তদনুসারে সমস্ত জেলার কৃষকগণকে সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া জলাশয় সমূহের পঙ্কোদ্ধার করিতে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করি। এই উদ্দেশ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঁকুড়ায় একটী স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। কি ভাবে এই জেলার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে সেই সকল গুরুতর বিষয় চিত্রে অঙ্কিত করিয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন একদিকে জীবন ও অপরদিকে মৃত্যু, একদিকে ঔদাস্য ও জড়তা, দ্বন্দ্ব ও কলহ, অপরদিকে সমবায় ও ঐক্য, দারিদ্র্য ও ব্যাধি দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এই দুইয়ের মধ্যে একটী পথ অবলম্বন করিতেই হইবে—এই কঠোর সত্য জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। প্রদর্শনীর সময়ে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়, তাহাতে জেলার কালেক্টরকে সভাপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সভ্যরূপে লইয়া জেলার উন্নতিকল্পে জেলা উন্নতি সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি পরে জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতির সহিত মিলিত হইয়া জেলার হিতসাধনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে এবং আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে জলাভাব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়, সেই জন্য জেলার সর্ব্বত্র সমবায় জল সরবরাহ সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে গ্রামে একতা ও সমবায়ের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, সমবেত চেষ্টায় কৃষি ও গৃহশিল্পের উন্নতি হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার স্থূল নিয়মগুলি সকলে পালন করে ও পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর হয়, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষি ও হিতকরী সমিতি স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

———

(ক্রমশঃ)

শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবিকা-সমস্যা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ বাঙ্গালীর জীবিকাসমস্যা দিন দিন এত জটিল হইয়া উঠিতেছে, যে মনে হয়, উহার বুঝি সমাধান নাই। দলে দলে ছেলেরা কলেজ হইতে বাহির হইতেছে, Law College হইতে বাহির হইতেছে, Medical College হইতে বাহির হইতেছে—আর সমস্যা জটিলতর হইতেছে। কিছুদিন হইতে ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর নজর পড়িয়াছে। তাহার ফলে বৎসর বৎসর অনেক বণিকমণ্ডলী (firm) অনেক আপিস সৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের অস্তিত্ব যে কোন্ অতলে ডুবিয়া যায় তাহা নির্ণয় করা শিলালিপিপাঠের মত এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সমস্ত ব্যবসাদার-মহোদয় business বা ব্যবসায় বলিতে প্রধানতঃ order supply বা হুকুমী সরবরাহ বুঝিয়া থাকেন এবং যে মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের সাহেবী সুট, আফিস-ঘরের ভাড়া, টিফিন আর ভাড়াটে হাওয়াগাড়ী taxiতেই ফুরাইয়া যায়। দুই চারিবার ঘা খাইয়া যখন অভিজ্ঞতা লাভ করেন তখন তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্য দুইই শেষ হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন, শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ কি করিবেন? প্রথম যখন ইংরাজী শিক্ষার চলন হইয়াছিল তখন চাকরী পাওয়া যাইত। তারপর ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি নূতন নূতন পেশা শিক্ষিত বাঙ্গালী অবলম্বন করিলেন। আজ এ সকলগুলি একত্র করিয়াও সঙ্কুলান হইতেছে না। কার্য্যে নিযুক্ত লোকের চেয়ে বেকারের সংখ্যাই সর্ব্বত্র অধিক। শূন্যপসার ব্যারিষ্টার briefless barrister, মক্কেল-বিহীন উকিল প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে। সেদিন মফঃস্বল সহরের একজন পরিচিত ডাক্তারকে বলিতে শুনিয়াছিলাম "দেশে অবশ্য অসুখ-বিসুখের অভাব নাই। কিন্তু পয়সা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার লোকের একান্ত অভাব। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে চিকিৎসা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে বটে, কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে visitএর বা দর্শনীর টাকা তো পাওয়া যায়ই না বরং dispensary বা ঔষধালয় থাকিলে ঔষধও দিতে হয়।" অধিকাংশ চিকিৎসকেরই এই অবস্থা। উকিলের অবস্থা ইহার উপর। বরং যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে চাকরী পাইয়াছেন তাঁহারা একটু নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন। তাঁহাদের আয় নিয়মিত; সেই আয় অনুসারে যে কোন উপায়ে নিজেদের ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া—অবশ্য অধিকাংশই অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু ১০০ জন পদপ্রার্থীর মধ্যে বড় জোর ১০ জন চাকরী সংগ্রহ করিতে পারেন। বাকী ৯০ জন বেকার। ইহাঁদের এবং ডাক্তারী ও ওকালতী লাইনের অতিরিক্ত এবং অনাবশ্যক ভদ্রগণের জীবিকা-উপার্জ্জন কি ভাবে হইবে ইহাই সমস্যা। বর্ত্তমান সময়ের জীবনযাপন প্রণালী এবং সমস্ত জিনিসের দুর্মূল্যতা আমাদের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে যে সকল ব্রাহ্মণের দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমিতে সমস্ত পরিবারের বাৎসরিক খরচ চলিত, এখন সেই জমির আয়ে তাঁহাদের পূরা একমাসও চলে না। তারপর পাশ্চাত্য ভদ্রবেশী সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের জামাকাপড়ের খরচও পূর্ব্ব হইতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে সমস্ত পেশা আমাদের করতলগত হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা দেশের যথার্থ ধনবৃদ্ধি আদৌ হয় নাই বরং দরিদ্রের যৎসামান্য উপার্জ্জন শিক্ষিতের হস্তগত হইবার উপায় সুগম হইয়াছে।

দেশের যথার্থ ধনোৎপত্তির (production) উপায় দুইটী। প্রথম কৃষি; দ্বিতীয় শ্রমশিল্প। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশেষ এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি কৃষিপ্রধান। এই চাকরীবহুল-যুগেও এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা ঠিক ধনবৃদ্ধি হয় না। বাণিজ্য ব্যক্তিবিশেষের ধনবৃদ্ধির একটী উপায় বটে, কিন্তু জাতির পক্ষে উহা ধনবিভাগের (distribution of money) পন্থা মাত্র। আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুঃসময়ে দেশের শিক্ষিতগণ বাণিজ্যের প্রতি বেশী মনোযোগ না দিয়া যদি কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতির প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। তার উপর এদেশের

বাণিজ্যের যথার্থ কোন অর্থ নাই—আমাদের অধিকাংশ বাণিজ্যদ্রব্য বিদেশী। দেশের লোকের ঘাড়ে সে সকল জিনিষ চাপাইয়া দেওয়ার প্রকৃত অর্থ দেশকে আরও দরিদ্র করিয়া তোলা। উদাহরণস্বরূপ Motor carএর ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে দেশী মূলধন লইয়া অনেকগুলি মোটরগাড়ীর বণিকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীগণ পরোক্ষে দেশের অনিষ্টসাধনই করিতেছেন। মোটরগাড়ীর যন্ত্রাদি ও গাড়ী যদি তাঁহাদের কারখানায় প্রস্তুত হইত তাহা হইলে কারবারটী যথার্থ দেশের হিতকর হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত কারখানায় সে সকল কার্য্য কিছুই হয় না। বিভিন্ন অংশগুলি শুধু যোড়াতাড়া দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপ ব্যবসায়ের ফলে দেশের মূলধন বিদেশীর করায়ত্ত হয়—বলিতে গেলে ব্যবসায়ী শুধু শতকরা কয়েক টাকা মাত্র দালালী বা কমিশন লইয়া থাকেন। *

আমাদের দেশের যে সকল ভদ্রলোক কারবার করিতে গিয়া প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন তাঁহারা এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের জন্য যে বাজারের উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় সে বাজারের control বা সংযমন তাঁহাদের হাতে নয়। অনেক সময় তাঁহাদিগকে Speculation বা অদৃষ্টখেলা করিতে হয়। আসলে অদৃষ্টখেলা আর কিছুই নয়—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া একপ্রকার অন্ধকারেই ঢিল ছোড়া। যিনি কৃতকার্য্য হন তাঁহারও নিজের কৃতিত্ব খুব অল্পই থাকে।

রাতারাতি বড় মানুষ হইবার লোভ আমাদিগকে ছাড়িতে হইবে। অদৃষ্টের অনিশ্চয় পথ ত্যাগ করিয়া দৃষ্টের নিশ্চিত মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। অদৃষ্টখেলার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া ধনোৎপাদক ব্যবসায় ধরিতে হইবে। দেশে তাহার উদাহরণস্থলের অভাব নাই। Tata Iron works—এটী যথার্থ আমাদের দেশের একটী গৌরবের জিনিষ। পার্সী সম্প্রদায় বাঙ্গালীর অপেক্ষা অধিকতর ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন। ব্যবসায় ব্যাপারে তাঁহাদের অনুকরণ আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হইবে। ধনোৎপাদক ব্যবসায়ের উদাহরণ বঙ্গদেশে একেবারেই যে নাই তাহা নহে। Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ld, কোম্পানীর কার্য্যাবলী মহৎ উদাহরণস্থলস্বরূপে আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। নিষ্কামকর্ম্মী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কারবারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৫০০০৲ টাকা লইয়া এই কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করেন। অল্পদিনেই ইঁহারা কার্য্যে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের যথেষ্ট কার্য্যপ্রসারও ঘটে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী যৌথকারবারে Limited Companyতে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন তাহার মূলধন তিনলক্ষ টাকা। ঐ তিন লক্ষের মধ্যে কোম্পানীর কারখানার অন্তর্গত জমি ও বাড়ীর দাম ১২০০০০৲ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার উপর, কলকারখানার দাম প্রায় ৬০০০০৲ ষাট হাজার টাকা হইবে। ইহার উপর কোম্পানী অংশীদারগণকে সন্তোষজনক মুনফা বা dividend দিতেছেন। যে নিয়মে এই কারবারের কার্য্যাবলী সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা প্রত্যেক কারবারওয়ালার অনুকরণযোগ্য। এই কারবারের যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ ঐখানেই বিভিন্ন বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিজেদের কারবারের ব্যবহারের জন্য ইঁহাদের অনেক টাকার label বা লেপপত্র, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা ছাপাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সকল কাগজপত্র কর্ত্তৃপক্ষগণ বাহিরের অন্য কোন মুদ্রাযন্ত্র হইতে ছাপাইয়া লন না। ঐ কারখানার সীমানার মধ্যেই কোম্পানীর নিজস্ব একটী মুদ্রাযন্ত্র আছে। কোম্পানীর আবশ্যকীয় যাবতীয় কাগজপত্র ঐখানে ছাপা হয়। দেশবিদেশে জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য অনেক packing caseএর বা পুটলি-বাক্সের দরকার। ইঁহারা বাহিরের কোন লোককে তাহার চুক্তিপত্র না দিয়া নিজেরা একটী ঐ বাক্স তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করিয়াছেন—কোম্পানীর আবশ্যকীয় সমস্ত পুটলী-বাক্স সেইখানেই প্রস্তুত হয়। এই প্রণালীতে কাজ করিলে কোম্পানীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য অতি সহজে সত্বর এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে

---

* এবিষয়ে সকলে একমত হইতে পারিবেন কি না জানি না। অনেকের মতে এই দালালীটুকুও যাহাতে বিদেশে না গিয়া দেশীয়ের হস্তগত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তঃ সং

সম্পন্ন হয়। সকল প্রকার ঔষধ, Acid বা দ্রাবক, এমন কি অস্ত্রচিকিৎসা করিবার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত আছে। বৎসর বৎসর কত লক্ষ টাকার বিলাতী ঔষধ এবং ডাক্তারী যন্ত্র যে আমাদের ক্রয় করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। বেঙ্গল কেমিকালের অনুকরণে আরও দুই চারিটী কারবার যদি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে দেশের অনেক টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতে পারে।

বাংলাদেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল্‌সএর কর্ম্মকর্তৃগণ সুচারুরূপে কারবার চালান সম্বন্ধে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। যাঁহারা নূতন কারবার করিবেন তাঁহাদের কিছুদিন এই সকল কারখানায় শিক্ষানবীষি করা উচিত। আমরা কারবারে যে উন্নতি লাভ করিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ বাণিজ্য-শিক্ষা আমাদের নাই। দ্বিতীয় কারণ পরস্পরের প্রতি আমরা বিশ্বাসহীন। কারবারের কথা উঠিলে অধিকাংশ লোকই মূলধনের কথা তুলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যেন কেবলমাত্র মূলধনের অভাবেই তাঁহারা কারবার করিতে পারিতেছেন না। সিদ্ধান্তটী যে কত ভ্রমাত্মক তাহা প্রতি বৎসর বিলুপ্তকারবারগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মূলধন হইলেই ব্যবসায় হয় এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কিছু মূলধন লইয়াই কারবার আরম্ভ করিয়া দেন, কিন্তু শিক্ষার অভাবে দুদিন যাইতে না যাইতে তাঁহাদের সে ব্যবসায় যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করে তাহার ঠিকানা থাকে না। হিসাব ব্যবসায়ের প্রাণ; কথায় বলে হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না। অথচ নূতন ব্যবসায়ীমাত্রই এই হিসাবের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী নহেন। কোন্ ব্যবসায়ে কতদিনে কিরূপ লাভ হইতে পারে এবং সেরূপ লাভ করিতে হইলে কোন্ বাবত কত খরচ করা যুক্তিসঙ্গত তাহার কিছুমাত্র ধারণা অধিকাংশ নব্য ব্যবসায়ীর থাকে না। থাকিলে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ট্যাক্সি, আপিসের বিজলীপাখা ও আসবাবপত্রের প্রতি অত বেশী মনোযোগ দিতে পারিতেন না। বড়বাজারের বড় বড় মাড়োয়ারি যাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা কারবারে খাটিতেছে তাঁহাদের ব্যবস্থা-খরচা কত অল্প তাহা অনেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

আমাদের ব্যবসায়ের দ্বিতীয় অন্তরায় বলিয়াছি বিশ্বাসের অভাব। শীতকাল পড়িয়াছে, এখন বাংলার প্রতি পল্লীতে গরম কাপড়ের মোট-মাথায় অসংখ্য কাবুলীওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর আফগানিস্থান হইতে এই বাংলা মুল্লুকে আসিয়া তাহারা কিভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অধিকাংশ কাবুলীওয়ালার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাহাদের মূলধন যৎসামান্য। তাহারা নগদ টাকায় কাপড় কিনিতে পারে না। কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া কাপড় ক্রয় করে; তারপর ওয়াদা অনুসারে ঠিক নির্দ্ধারিত দিবসে মহাজনকে পাওনা টাকা দিয়া থাকে। সকলেই জানেন উহারা বাংলার পল্লীতে গিয়া দীনহীন কৃষকগণকে ধারে কাপড় বেচিয়া থাকে—তাহাদের সঙ্গে পরিচয় নাই, তাহাদের অবস্থা জানা নাই, এমন কি কে কিরূপ লোক সাধু কি অসাধু তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। অথচ এই সমস্ত কৃষক অত্যন্ত অনাটনের সময় যখন গ্রাম্য মহাজন দাদাঠাকুরের নিকট টাকা ধার করিতে যায়, তখন দাদাঠাকুরের সাবধানতার আর অন্ত থাকে না। পাঁচজন সাক্ষী ডাকাইয়া, নানারূপ বাঁধন দিয়া, সুদের হার যতদূর চড়ান সম্ভব তাহা চড়াইয়া, হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লন। কাবুলীওয়ালারা অবশ্য অনেক চড়া দামে জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের ব্যবসাপ্রণালী যে অনুকরণযোগ্য একথাও বলি না; কিন্তু যেরূপ বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাহারা কারবার চালায় তাহা আমাদের মত অবিশ্বাসীর পক্ষে বাস্তবিকই আদর্শস্থল। আমি একবার এক কাবুলীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "মহাজনেরা কি বিশ্বাসে তোমাদের ধারে জিনিষ দেয়। আজ যদি তুমি মারা যাও, কি উপায়ে তোমার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবে?" সে একটুও না ভাবিয়া উত্তর দিল—"সে বিষয়ে মহাজনকে কোন চেষ্টাই করিতে হইবে না। আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ দেশে আমার যাহা কিছু আছে সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া মহাজনের টাকা শোধ করিবে। আমার পুত্র-পরি-

বার বরং উপবাস করিবে কিন্তু মহাজনের নিকট অবিশ্বাসী হইবে না। মহাজন সন্তুষ্ট থাকিলে ভবিষ্যতে আমার ছেলে যখন কারবার করিবে তখন তাহাকে আর ভাবিতে হইবে না।” এই বিশ্বাস ব্যবসায়ের প্রাণ। আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের একান্ত অভাব। আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা বর্ত্তমান ছাড়াইয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে চায় না। তাই সকল কার্য্যেই আমাদের পদে পদে এত বাধা। আমাদের অবিশ্বাস এতই বলবৎ হইয়াছে যে বাঙ্গালীর যৌথকারবার যে শুধু সাধারণের অর্থ ফাঁকি দিয়া কতিপয় লোকের বড়মানুষ হইবার একটী সহজ উপায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। যৌথকারবারের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা নাই। অথচ বড় বড় সমস্ত কারবার, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা যৌথকারবার ব্যতিরেকে একজনের টাকায় হওয়া সম্ভবপর নয়। অন্য টাকার কথা দূরে থাকুক স্বদেশীর যুগে জাতীয় ধনভাণ্ডারের টাকা এবং বর্ত্তমান কালের “তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের” টাকার সদ্ব্যয় হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস নাই। পাঁচজন একত্র হইয়া কোন কাজ করিবার শক্তি আমাদের নাই। পাঁচজন একত্র হইলে কেবলই মতভেদ ও বিরোধ। অনেকস্থানে সে বিরোধ, বিবাদ এবং মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়া ব্যাপারেও পরিণত হইয়া থাকে।

অথচ এই সকল অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে কর্ম্মের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। স্বাধীন জাতির প্রথম এবং শেষ কথা স্বাধীন জীবিকা। জীবিকার জন্য যাঁহাদিগকে পরের দাসত্বের উপর নির্ভর করিতে হয় তাঁহাদের মুখে স্বাধীনতার নাম বাতুলতা মাত্র। অসহযোগ মন্ত্র তেমন কার্য্যকর না হওয়ার মূলেও ঐ জীবিকা-সমস্যা। চাকরী নামধেয় উপজীবিকার নিমিত্ত চিন্তিত হইয়াই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকগণ এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রাণ টলিয়াছিল কিন্তু হস্তপদ সাহস করিয়া অগ্রসর হয় নাই। প্রাণের উপর দাসত্বের আবরণ! চিন্তা করিতেও সমস্ত মন শিহরিয়া উঠে! এরূপ পরাধীন বোধ হয় আর কোন জাতিই হয় নাই।

ইংরাজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, কাবুলীওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িয়া পর্য্যন্ত সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের লোক বাংলাদেশের ছোট-বড় সকল রকম কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। শুধু এই সুজলা সুফলা দেশের অভাগা সন্তানগণ “অন্নাভাবে জীর্ণ, ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।” ইহার চেয়ে অধিকতর হৃদয়বিদারক নাটক (more heart-rending tragedy) কোন দেশের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। তথাপি যদি সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মৃত্যু আমাদের অভিলষিত না হয়, তাহা হইলে উপায় অন্বেষণ করিতেই হইবে। আমাদের বিশ্বাস যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জীবিকা স্বাধীন না হইবে, অন্ন এবং বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, ততদিন কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা সুফল লাভ করিতে পারিব না। মহাত্মা গান্ধী একথা বুঝিয়াছেন বলিয়াই ঐ এক কথার উপর তিনি সমস্ত শক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন—“খদ্দর”। মহাত্মার নিকট “খদ্দরের” অর্থ স্বাধীন জীবিকা, নবীন জীবন। এই নবীন জীবনই আমাদের মনের দাসভাবকে দূর করিতে সক্ষম, নতুবা এ দাসমনোভাব (slave mentality) কিছুতেই যাইবার নয়। “বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং ?” পুণ্যশ্লোক কর্ম্মী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাত্মার এ বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারই আদর্শে আমাদিগকে উদ্বোধিত হইতে হইবে। অনেকদিন হইতেই “বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের” জন্য তিনি যথার্থ কাতর; আজ মহাত্মা গান্ধীর উপদেশবাণীর মধ্যে তিনি এই আত্মহারা জাতির মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহামতি মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমলখাঁ প্রভৃতি ত্যাগী কর্ম্মিগণ দেশের জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামে আহ্বান করিয়া অসহযোগ কার্য্য-প্রণালী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিয়া থাকেন তাহা করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরন্ন জনসাধারণের অন্নসমস্যা কি ভাবে সমাধান হইবে—সহস্র সহস্র শিক্ষিত, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক কি উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন—তাহা উদ্ভাবন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যাহারা "শুধু দুটি, অন্ন খুঁটি কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রাখে বাঁচাইয়া"; বৃদ্ধ পিতামাতা পত্নীর রোগদীর্ণ অনশনক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া যে সকল শিক্ষিত যুবককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাকাল অন্নচিন্তায় চমৎকার হইতে হয়—তাহাদের নিকট "কাউন্সিলে প্রবেশ করায় আমাদের রাজনৈতিক মঙ্গল কিছু হইবে কি না, কিম্বা কাউন্সিল ভাঙ্গিতে হইলে তাহার মধ্যে গিয়া ভাঙ্গা সুবিধা কি তাহার বাহির হইতে ভাঙ্গা সুবিধা" —এ সকল প্রশ্নের কোন মূল্য নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝি জাতিকে স্বাধীন হইতে হইলে তাহাকে স্বাধীনজীবী হইতে হইবে। পরভাগ্যোপজীবীর সুখ কোথায়? কৃষি ও শিল্প অবলম্বন ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হইলেও এখনও এদেশে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্রের অভাব হয় নাই, এখনও অনেকস্থানে অনেক জমি পতিত আছে। ২৫৲।৩০৲টাকা মাহিনার চাকরীর আশায় কলিকাতার মেসের সঙ্কীর্ণ ঘরগুলির স্থান সঙ্কীর্ণতর না করিয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া এই সমস্ত কার্য্য অবলম্বন করিবার দিন আসিয়াছে। যাঁহারা টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা অনেক জমি লইয়া নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বড় বড় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। যাঁহাদের সে সঙ্গতি নাই তাঁহারা দুই দশ বিঘা জমি লইয়া নানরকমের তরকারীর চাষ যদি করেন, তাহাতেই সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারে। পতিত জঙ্গল-জমি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া কিভাবে তাহা লাভজনক জমিদারীতে পরিণত করা যায়, তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী Canning Town এর Port Canning and Land Improvement Co Ld. কোম্পানীর কার্য্যাবলী * কৃষিকার্য্যে নূতন লোকের স্থান আছে, নূতন নিয়ম অবলম্বন করিলে তো কোন সন্দেহই নাই। তারপর শ্রমশিল্পের (industry) কথা। বস্ত্রশিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ছুরি কাঁচি নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যেই দেশীয় শিল্পীর যথেষ্ট আদর আছে। যাঁহাদের টাকাকড়ি নাই তাঁহাদের জন্য গৃহশিল্প cottage industry; আর যাঁহারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিধিবদ্ধভাবে এ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন তাঁহাদেরও প্রচুর লাভবান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অভাব শুধু কর্ম্মীর। প্রকৃত পরিশ্রমী সৎস্বভাবসম্পন্ন কর্ম্মীই এই মুমূর্ষু জাতিকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। অনেক বড় বড় কাজ এদেশে হইতে পারে। মূলধনের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক ধনীর গৃহে সঞ্চিত অর্থ নিরর্থক বসিয়া আছে। সেই সকল মূলধনের সহিত যথার্থ কর্ম্মীর সংযোগ একান্ত আবশ্যক। কারণ কর্ম্মী ও মূলধন (labour and capital) এ উভয়ের অস্তিত্ব পরস্পরসাপেক্ষ। মূলধন ব্যতীত কর্ম্মী বিশেষ কিছু বড় কাজ করিতে পারেন না এবং কর্ম্মীর অভাবে মূলধন দুইদিনেই কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা থাকে না। এই উভয়ের মিলনেই দেশের যথার্থ মঙ্গল। ইয়ুরোপে labour এবং capitalএ দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এ বিরোধ কোন পক্ষেই মঙ্গলপ্রসূ হইবে না।

শুনিয়াছি প্রার্থিতবস্তু মন-প্রাণের সহিত চাহিতে পারিলেই পাওয়া যায়। আমাদিগকে সেই সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে। সমস্ত প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে—স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিবই করিব—জীবিকার জন্য কখনই দাসত্ব অবলম্বন করিব না। আমাদের পিতামহগণেরও এই সঙ্কল্পই ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী চাকরীজীবী হইয়াছে—সে বেশীদিনের কথা নয়। সংস্কৃত কলেজ যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন বড় বড় পণ্ডিতগণ বেতন লইয়া অধ্যাপক হইতে রাজী হন নাই। ঐ কার্য্য তাঁহারা একপ্রকার দাসত্ব বলিয়া মনে করিতেন। বাড়ীতে ছাত্র রাখিয়া বিদ্যা দান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহাদের জানা ছিল। মনে পড়ে রাজাধিরাজের সম্মুখে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মার স্পর্দ্ধিত উত্তর—"নাহং শাসনশতেনাপি বিদ্যাবিক্রয়ং করিষ্যামি"—আমি শত মুদ্রার বিনিময়েও বিদ্যাবিক্রয় করিতে পারিব না। "prostitution

* ইহা বহুদিনের কথা। এপ্রকার জমি পাওয়া বর্ত্তমানে সম্ভব কি না সন্দেহ। ভং সং

of intellect" আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন না। প্রাচীন কালের এই সংস্কার সমস্ত জাতির মনে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এসকল বিষয় লইয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন—অনেক কর্ম্মী অগ্রসর হইয়াছেন—অনেক ধনী ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সমস্ত দেশের অভাবের তুলনায় তাহা যৎসামান্য মাত্র। অগ্রগামীগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া দেশের সমস্ত শিক্ষিত যুবকগণকে এই পথে যাত্রা করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লোকমান্য ৺ বালগঙ্গাধর টিলকের টিপ্পনীর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদ)

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মাহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন—(৩৭) হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা (তো) হউক, পরন্তু (প্রকৃতিস্বভাবে) সম্পূর্ণ প্রযত্ন অথবা সংযম না হইবার কারণে যাহার মন (সাম্যবুদ্ধিরূপ কর্ম্ম-) যোগ হইতে বিচলিত হইবে, সে যোগসিদ্ধি না পাইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? (৩৮) হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! এই পুরুষ মোক্ষপ্রদ হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গে স্থির না হইবার কারণে দুইদিক হইতে ভ্রষ্ট হইলে পর ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় (মধ্যস্থলেই) নষ্ট তো হয় না? (৩৯) হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ তোমাকেই নিঃশেষরূপে দূর করিতে হইবে; তুমি ছাড়া এই সন্দেহ মিটাইবার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া যায় না।

[যদাপি নঞ্ সমাসে আরম্ভের নঞ্ (অ) পদের সাধারণ অর্থ 'অভাব', তথাপি কয়েকবার অল্প অর্থেও উহার প্রয়োগ করা হয়, এই কারণে ৩৭ম শ্লোকে "অযতি" শব্দের অর্থ "অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযত্ন বা সংযমকারী"। ৩৮ম শ্লোকে যে বলা হইয়াছে যে, "দুইদিকের আশ্রয় বিরহিত" অথবা "ইতোভ্রষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ", উহার অর্থও কর্ম্মযোগ-প্রধানই করা চাই। কর্ম্মের দুই প্রকার ফল; (১) কাম্য বুদ্ধিতে কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞার অনুসারে কর্ম্ম করিলে পর তো স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে উহা বন্ধক না হইয়া মোক্ষদায়ক হইয়া যায়। পরন্তু মনুষ্যের এই অসম্পূর্ণ কর্ম্মের স্বর্গাদি কাম্যফল লাভ হয় না; কারণ উহার এই প্রকার হেতুই থাকে না; এবং সাম্যবুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে না; এই জন্য অর্জ্জুনের মনে এই শঙ্কা উৎপন্ন হইল যে, ঐ বেচারীর স্বর্গও লাভ হইল না এবং মোক্ষও লাভ হইল না—কোথাও উহার এইরূপ স্থিতি তো হয় না যে, দুই দিন হইতে পাঁড়ে চলিয়া গেল, কিন্তু হালুয়াও মিলিল না মণ্ডও মিলিল না? এই সংশয় কেবল পাতঞ্জলযোগরূপ কর্ম্মযোগের সাধন সম্বন্ধেই করা হয় না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে, কর্ম্মযোগসিদ্ধির জন্য আবশ্যক সাম্যবুদ্ধি কখনো পাতঞ্জলযোগ দ্বারা, কখনো ভক্তি দ্বারা এবং কখনো জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং যেপ্রকার পাতঞ্জলযোগরূপ এই সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভক্তি বা জ্ঞানরূপ সাধনও একই জন্ম অপূর্ণ থাকিতে পারে। অতএব বলিতে হয় যে, অর্জ্জুনের উক্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মযোগমার্গের সকল সাধনারই পক্ষে সাধারণ রীতিতে উপযোগী হইতে পারে।]

শ্রীভগবান কহিলেন—(৪০) হে পার্থ! কি এইলোকে এবং কি পরলোকে, এইরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত! কল্যাণজনক কর্ম্মকর্ত্তা কোনও ব্যক্তির দুর্গতি হয় না। (৪১) পুণ্যকর্ত্তা পুরুষের প্রাপ্য (স্বর্গাদি) লোকসমূহ পাইয়া এবং (সেখানে) বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়া পুনরায় এই যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট পুরুষ পবিত্র শ্রীমান লোকের ঘরে জন্ম লয়; (৪২) অথবা বুদ্ধিমান (কর্ম্ম-) যোগীদিগেরই কুলে জন্ম লাভ করে। এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় দুর্লভ।

(৪৩) উহাতে অর্থাৎ এই প্রকারে প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায়; এবং হে কুরুনন্দন! সে উহা হইতে ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক (যোগ-) সিদ্ধি পাইবার প্রযত্ন করে। (৪৪) নিজের পূর্ব্ব জন্মের ঐ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকিলেও সে (পূর্ণসিদ্ধির দিকে) আকৃষ্ট হয়। যাহার (কর্ম্ম-) যোগের জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়া লইবার ইচ্ছা, হইয়া গিয়াছে সে-ও শব্দব্রহ্মের উপরে চলিয়া যায়। (৪৫) (এইপ্রকার) প্রযত্নপূর্ব্বক উদ্যোগ করিতে করিতে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া (কর্ম্ম-) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া অন্তে উত্তম গতি লাভ করে।

[এই শ্লোকগুলিতে যোগ, যোগভ্রষ্ট এবং যোগী শব্দ কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট এবং কর্ম্মযোগীর অর্থেই ব্যবহৃত। কারণ শ্রীমান-কুলে জন্ম লইবার অবস্থা অন্যের ইষ্ট হওয়া সম্ভবই নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম হইতে যতটা হওয়া সম্ভব ততটা শুদ্ধ-বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগের আচরণ আরম্ভ করিবে। অল্পই কেন হউক না, কিন্তু এই রীতিতে যে কর্ম্ম করা যাইবে তাহাই এই জন্মে না হয় তো পর জন্মে, এই প্রকার অধিক অধিক সিদ্ধি পাইবার জন্য উত্তরোত্তর কারণ হইবে এবং উহা হইতেই অন্তে পূর্ণ সদ্গতি লাভ হয়। "এই ধর্ম্মের অল্পও আচরণ করিলে তাহা মহাভয় হইতে রক্ষা করে" (গী. ২. ৪০), এবং "অনেক জন্মের পর বাসুদেব-প্রাপ্তি হয়" (৭. ১৯), এই শ্লোক এই সিদ্ধান্তেরই পূরক। অধিক বিচার গীতারহস্যের পৃ ২৮৫-২৮৯ করা হইয়াছে। ৪৪শ শ্লোকের শব্দব্রহ্মের অর্থ 'বৈদিক যজ্ঞ-যাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম'। কারণ এই কর্ম্ম বেদবিহিত এবং বেদের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াই ইহা করা যায়, এবং বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম শব্দ অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। প্রত্যেক মনুষ্য প্রথম প্রথম সকল কর্ম্মই কাম্য বুদ্ধিতে করে; কিন্তু এই কর্ম্ম দ্বারা যেমন যেমন চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে তেমনই তেমনি পরে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হয়। এই কারণেই উপনিষদ সমূহে এবং মহাভারতেও (মৈত্র্য ৬. ২২; অমৃতবিন্দু ১৭; মভা. শাং. ২৩১. ৬৩; ২৬৯. ১) এই বর্ণনা আছে যে—]

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

"জানা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম দুই প্রকার; এক শব্দ-ব্রহ্ম এবং অপর উহার অতীত (নির্গুণ)। শব্দব্রহ্মে স্থির হইয়া গেলে পর পুনরায় ইহা হইতে অতীত (নির্গুণ) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়"। শব্দব্রহ্মকে কাম্য কর্ম্মের দ্বারা বাড়াইয়া দিয়া অন্তে লোকসংগ্রহের জন্য এই সকল কর্ম্মেরই প্রয়োজক কর্ম্মযোগের ইচ্ছা হয়, এবং তখন আবার এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কিছু কিছু আচরণ হইতে লাগে। অনন্তর "স্বল্পারম্ভাঃ ক্ষেমকরাঃ"র ন্যায়েই অল্প আচরণ সেই মনুষ্যকে এই মার্গে ধীরে ধীরে টানিয়া লয় এবং অন্তে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি করাইয়া দেয়। ৪৪শ শ্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, "কর্ম্মযোগ জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইলেও সে শব্দব্রহ্মের উপরে যায়" উহার তাৎপর্য্যও ইহাই। কারণ এই জিজ্ঞাসা কর্ম্মযোগরূপ চরখার মুখ; এবং একবার এই চরখার মুখে লাগিয়া গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পর জন্মে, কখনও না কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয় এবং সে শব্দব্রহ্মের অতীত ব্রহ্ম পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া থাকে না। প্রথম প্রথম মনে হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদির একই জন্মে লাভ হইয়া থাকিবে; পরন্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে ঠিক জানা যায় যে, তাঁহাদেরও এই ফল জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ব্ব সংস্কার হইতেই লাভ হইয়া থাকিবে। হৌক; কর্ম্মযোগের অল্প আচরণ, এমন কি, জিজ্ঞাসাও সর্ব্বদাই কল্যাণজনক, ইহার অতিরিক্ত অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিও নিঃসন্দেহ ইহা দ্বারাই হয়; অতএব এখন ভগবান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন যে—]

§§ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন। ৪৬।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৪৭।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥৬॥

(৪৬) তপস্বী লোকসকল অপেক্ষা (কর্ম্ম-) যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী পুরুষদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মকাণ্ডীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুঝা যায়; এইজন্য হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও।

[অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের ক্লেশদায়ক ব্রত দ্বারা অথবা হঠযোগের সাধনা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকদিগকে এই শ্লোকে তপস্বী বলা হইয়াছে; এবং সাধারণত এই শব্দের ইহাই অর্থ। "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং" এ (গী. ৩. ৩) বর্ণিত, জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যমার্গ দ্বারা কর্ম্ম ছাড়িয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাংখ্যনিষ্ঠ লোকদিগকে জ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার গী. ২.৪২-৪৪ এবং ৯. ২০-২১এ বর্ণিত, নিছক কাম্য-কর্ম্মকর্ত্তা স্বর্গপরায়ণ কর্ম্মঠ মীমাংসকদিগকে কর্ম্মী বলিয়াছেন। এই তিন পন্থার মধ্যে প্রত্যেকে ইহাই বলে যে, আমারই মার্গে সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু এখন গীতার কথা এই যে, তপস্বী হও, চাই কর্ম্মঠ

মীমাংসক হও বা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্মমার্গও শ্রেষ্ঠ। এবং প্রথমে এই সিদ্ধান্তই "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" (গী. ৩. ৮) এবং "কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট" (গী. ৫. ২) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে (দেখ গীতারহস্য প্রকরণ ১০, পৃ ৩০৯, ৩১০)। অধিক কি, তপস্বী, মীমাংসক অথবা জ্ঞানমার্গী ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, 'ইহারই' জন্য পূর্ব্বে যে প্রকার অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, 'যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর' (গী. ২. ৪৮; গীতার পৃ ৫৬) অথবা যোগ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াও (৪. ৪২), ঐ প্রকারই এখানেও পুনরায় স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে, "তুমি (কর্ম্ম-) যোগী হও" যদি এই প্রকার কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ না মানা হয়, তবে "তস্মাৎ তুমি যোগী হও" এই উপদেশের 'তস্মাৎ = এইজন্যই' পদ নিরর্থক হইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গের টীকাকারদিগের এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব ঐ সকল লোক 'জ্ঞানী' শব্দের অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানী শব্দের অর্থ শব্দজ্ঞানী অথবা যাহারা কেবল পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানের লম্বা-চৌড়া বাক্য বিস্তার করেন। কিন্তু এই অর্থ নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের। এই টীকাকার গীতার এই অর্থ চান না যে, কর্ম্মবিরহিত জ্ঞানমার্গকে গীতা নিম্নস্তরের মনে করেন। কারণ ইহা হইতে উহার সম্প্রদায়ের গৌণতা আসে। এবং এইজন্যই "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" (গী. ৫. ২) এরও অর্থ উঁহারা বদল করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিচার গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকের যে অর্থ আমি করিয়াছি, সে বিষয়ে এখানে অধিক চর্চ্চা করিতেছি না। আমার মতে ইহা নির্ব্বিবাদ যে, গীতা অনুসারে কর্ম্মযোগ-মার্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন পরের শ্লোকে বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগীদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তারতম্য ভাব দেখা যায়—]

(৪৭) তথাপি সকল (কর্ম্ম-) যোগীর মধ্যেও আমি তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তম সিদ্ধ কর্ম্মযোগী বুঝি, যে আমাতে অন্তঃকরণ রাখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভজনা করে।

[এই শ্লোকের এই ভাবার্থ যে, কর্ম্মযোগেও ভক্তির প্রেমপূর্ণ মিলন হইলে, সেই যোগী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবানই স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ (গী. ১২. ১২)। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভক্তির সমুচ্চয়কে শ্রেষ্ঠ বলা এক কথা এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে ব্যর্থ করিয়া, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বলা অন্য কথা। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম ভাবের এবং ভাগবত পুরাণের পক্ষ দ্বিতীয় ভাবের। ভাগবত (১. ৫. ৩৪) সকল প্রকার ক্রিয়াযোগকে আত্মজ্ঞানবিঘাতক নিশ্চিত করিয়া, বলিয়াছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।

নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মও (ভাগ. ১১. ৩. ৪৬) ভগবদ্ভক্তি বিনা শোভা পায় না, তাহা ব্যর্থ হয়, (ভাগ. ১. ৫. ১২ ও ১২. ১২. ৫২)। ইহা হইতে ব্যক্ত হয় যে, ভাগবৎকারের ধ্যান কেবল ভক্তিরই উপর হইবার কারণে তিনি বিশেষ প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতারও পরে কিপ্রকার চার লাফ মারেন। যে পুরাণের নিরূপণ এই বুদ্ধিতে করা হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা হইতে গীতাতেও ভক্তির যেরূপ বর্ণনা হওয়া আবশ্যক সেরূপ হয় নাই; উহাতে যদি উক্ত বচনের সমান আরও কোন বাক্য পাওয়া যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমার তো দেখিতে হইবে গীতার তাৎপর্য্য, অথবা ভাগবতের কথা? উভয়ের প্রয়োজন ও সময়ও বিভিন্ন; এই কারণে বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে উহাদের একবাক্যতা করা উচিত নহে। কর্ম্মযোগে সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্য যে সাধনসমূহ আবশ্যক, তন্মধ্যে পাতঞ্জল যোগের সাধনসমূহের এই অধ্যায়ে নিরূপণ করা গিয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিও অন্য সাধন; পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে ইহার নিরূপণ আরম্ভ করা হইবে।]

এই প্রকারে শ্রীভগবানের গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের সংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

শ্রাদ্ধ। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁহার বালিগঞ্জস্থ ভবনে বিগত ২৭এ পৌষ বৃহস্পতিবার পিতার চতুর্থী শ্রাদ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ৪ঠা মাঘ পিতার আদ্যকৃত্য করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর আসন গ্রহণ করেন এবং আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উভয় দিবসেই অনেকগুলি মহিলা এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

উপনয়ন। হাবড়া ৪৮ নম্বর কালীকুমার মুখুয্যে লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীমান ভাস্করনাথ ও শ্রীমান ভার্গবনাথের উপনয়ন আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে বিগত ৭ই মাঘ যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।
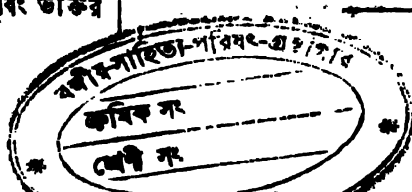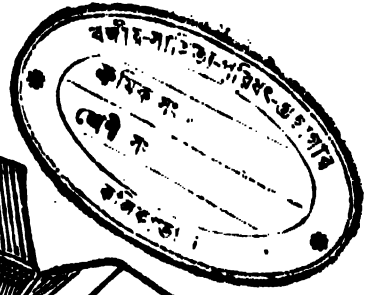
একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৩।

৯৫৬ সংখ্যা

১৮৪৪ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺সত্যেন্দ্রনাথে উপাসনার প্রভাব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ)

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন ব্রাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বল শ্রী দেখা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে ব্রহ্মোপাসকগণ উপাসনার প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাযোগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, উপাসনার প্রভাবই তাহার একমাত্র কারণ। ইহা তো ধরা কথা যে সাধনা করিলেই সিদ্ধি। যিনি যে বিষয়ে সাধনা করিবেন, তিনি সেই বিষয়েই সিদ্ধি লাভ করিবেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে যুবকগণ জ্ঞান অর্জ্জনে খুবই যে সাধনা করিতেছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ঠিক সেই রকমই কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ব্রাহ্মসমাজে যুবকগণের মধ্যে উপাসনার ভাব বড়ই কমিয়া গিয়াছে। এখনকার যুবক ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই উপাসনার উপযোগিতাই স্বীকার করেন না। অনেক ব্রাহ্মকেই বলিতে শুনিয়াছি যে, ঈশ্বরকে কি না ডাকিলে তিনি আমাদের অভাব মোচন করিবেন না? অভাবমোচনের জন্য ঈশ্বরকে ডাকা যে ঈশ্বরের উপাসনা নয়, তাহা বলিতে পারি না—অভাব হইলে সন্তান পিতামাতার নিকট প্রার্থনা করিবে না তো কি করিবে?—ইহাও প্রীতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু এইভাবে ডাকা, মনে হয়, ব্রহ্মোপাসনার নিম্নতম অংশ। ব্রহ্মোপাসনার মূলপ্রাণ হইল ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগসাধন। উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি হইল সেই যোগসাধনের উপায়। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে যখনই এবিষয়ে আলাপ করিয়াছি, তখনই তিনি উপাসনার অভাবে যুবক ব্রাহ্মদিগের প্রকৃত ধর্ম্মভাব হইতে দূরে যাইবার কথা উল্লেখ করিয়া কতনা হা-হুতাশ করিয়াছেন। হাহুতাশ করিবারই কথা। সহস্র জ্ঞান অর্জ্জন কর, কোটী কোটী টাকাই সংগ্রহ কর, ধর্ম্মের উপর না দাঁড়াইতে পারিলে, উপাসনাকে আমাদের জীবনের অন্ন করিয়া না লইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন কে নিবারণ করিতে পারিবে? ব্রাহ্মদিগের সন্তান সন্ততির উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কিপ্রকারে সংযমের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যাইবে? নব্য ব্রাহ্মযুবকদিগের মধ্যে এই উপাসনার অভাবের কারণেই, আজ ব্রাহ্মসমাজবহির্ভূত পরিবারের কথা ছাড়িয়া দাও,—ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত যে সকল যুবক বিলাত প্রভৃতি বিদেশে জ্ঞান উপার্জ্জন প্রভৃতির জন্য গমন করেন, কে না অবগত আছেন যে, তাঁহাদের অনেকেই স্বীয় চরিত্র অক্ষত রাখিতে পারেন না?

আজ পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথে উপাসনার প্রভাবের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া ব্রাহ্ম পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিজ নিজ পরিবারে

উপাসনা সজীব রাখিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা বা কর্ত্রীকে মিনতি করিয়া বলি যে, তিনি নিজ পরিবারের সকলকে লইয়া নিয়মিতভাবে প্রতিদিন যেন ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগসাধন করিবার প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রদান করেন। দিনের পর দিন উপাসনা নীরস হইতেছে দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই। একদিন সহসা দেখিবে যে, কোথা হইতে ভগবানের করুণা-ধারা নামিয়া উপাসনাকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। এবিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষার ধারা স্রোতরূপে বহিয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মত পথ প্রস্তুত হয়, সেগুলিতে বর্ষাকালে বেশ স্রোত থাকিলেও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। এখন যদি কেহ সেই সকল বর্ষার ধারার পথগুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক দেখিয়া বন্ধ করিয়া তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলির সহিত এক ও সমান করিয়া লইতে বলেন, তাহা হইলে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এবং সেই পথগুলি খোলা থাকিলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলির যে কত উপকার হইতে পারে, তাহাও সহজেই উপলব্ধ হইবে। সেই-প্রকার, মনের অবস্থা নীরস থাকিলে আমাদের উপাসনাও যে নীরস হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবানের প্রেমধারা অন্তরে আনিবার চেষ্টা কর, উপাসনাও সরস হইয়া উঠিবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে উপাসনার ভাব কি সুন্দররূপে বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র-কন্যার অন্তরে উপাসনার মধুর ভাব খুদিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা জানি যে, তাঁহাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল; প্রেমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধাতে তাঁহাদের জীবন সরস হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তানগণের উপর উপাসনা কি প্রকার প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, সত্যেন্দ্রনাথের জীবন তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং সে সকল বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। তাঁহার সেই সকল কার্য্যের দ্বারা কোলাহল-কলরবের ফলে তাঁহার জীবনের একটা দিক ঢাকিয়া গিয়াছে, লোকের দৃষ্টি হইতে একটু অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে—সেটা হইতেছে তাঁহার একনিষ্ঠ ধর্ম্মভাব, জীবনের সকল কার্য্য ব্রহ্মো-পাসনা দ্বারা নিয়মিত করিবার ভাব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য তিনি যে কতটা পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন, তাহা আজকালকার ব্রাহ্মদিগের জানা সম্ভব নহে। আমরা বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি যে, ধর্ম্মভাবে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রবলের কারণে, তাঁহার প্রাণের উৎসাহের কারণে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই অঞ্চল হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে যখন মাঘোৎসবে বক্তৃতা করিতেন, তখন মাঘোৎসবের উপর দিয়া যে উৎসাহের ঝড় বহিয়া যাইত, সে ভাব বর্ত্তমানে আমাদের কল্পনাতেও আনা সুকঠিন। এই ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে আসিয়াছিল কেবল উপাসনার প্রভাবে।

আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি জীবনের একটী দিনও উপাসনা পরিত্যাগ করেন নাই। কোন ঘটনাই তাঁহাকে উপাসনা হইতে বিমুখ করিতে পারে নাই। বিলাতে যাত্রাকালে এবং বিলাতে পৌঁছিয়াও তিনি প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতেন। তাঁহার বিলাত গমনের ঠিক পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক পারিবারিক উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই উপাসনাসূত্রে তিনি সত্যেন্দ্র-নাথকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কোন সূত্রেই দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ না করেন, কারণ উপাসনাই আত্মার অন্ন-জল। সত্যেন্দ্রনাথও সক্ষম থাকিতে আজীবন সেই উপদেশ এক-নিষ্ঠভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই উপা-সনার বলেই তিনি দেশবিদেশে বহুবৎসর প্রবাসী-ভাবে কাটাইলেও নিজের চরিত্রকে আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মল রাখিতে পারিয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যে সময়ে বিলাতে যান, তখনও সেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রভাব অস্তমিত হয়

নাই। সেই প্রভাবের কারণে অনেক বড় বড় ঘরের মহিলা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সখ্যস্থাপনে অগ্রসর হইতেন। একবার দুইটী ডিউরূপত্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের মতে তাঁহাদের মধ্যে কে অধিকতর সুন্দরী। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ যাঁহাকে বেশী সুন্দরী বলিবেন, তাঁহারই প্রেমে সত্যেন্দ্রনাথ বাঁধা পড়িয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে, এবং তখন সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধবের নিকট উপহাসের পাত্র হইবেন। কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি স্থিরদৃষ্টি পূতচরিত্র সত্যেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তমধ্যে ভগবৎকৃপায় সেই বিপদ-জাল কাটাইয়া উঠিলেন। তিনি একজনকে শ্বেতগোলাপ এবং অপরটীকে রক্ত গোলাপ বলিলেন; উভয়কেই একই গোলাপের পদবী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং নিজের মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এই প্রকার মানসিক ভাব রক্ষা করিতে পারিবার একমাত্র কারণ উপাসনা নিয়মিত করা। এই কথাটী আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি।

একবার তিনি একটী হত্যাকাণ্ডের বিচারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনে অতিসামান্য একটু সন্দেহ আসিয়াছিল যে বিচারার্থে আনীত ব্যক্তি যথার্থ দোষী কি না। সন্দেহটী এত সামান্য যে, তিনি অনায়াসে তাহা উপেক্ষা করিয়া বধদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিদিন ন্যায়বিচারের মূল প্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের উপাসনাতে স্থিরমতি ছিলেন বলিয়া সেই সন্দেহ-টুকু অতি সামান্য হইলেও তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সন্দেহ মিটাইবার জন্য তিনি তিন রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি সেই বিষয়টী হাইকোর্টে বিচারার্থ পাঠাইলেন।

এই সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। এইরূপে ছোটখাটো ঘটনা হইতে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের গভীরতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং ভগবানের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আজকালকার বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদিগকে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উপাসনার ভাব অন্তরে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে অনুরোধ করি। রক্ষা করিলেই, তাঁহারা দেশেই থাকুন, বা বিদেশেই যাউন, নিজেদের চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন এবং সমস্ত বিপদ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তাঁহারা ইহাও যেন মনে রাখেন যে, কালে তাঁহারাই আবার সন্তানসন্ততির জনকজননী হইবেন। তখন তাঁহারাই আমাদের এই অনুরোধের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। ব্রাহ্মপরিবারের লোকেরা এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি এবং তাঁহাদের পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মকৃপায় ধন্য হইয়া যাইবে।

গান।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক সংকলিত)

কেবা কার পর, কে আপন—
কাল-শয্যাপরে মোহ-তন্দ্রাঘোরে
দেখি পরস্পর আশার স্বপন।
আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্ম-গতিকে—
কে রোধিবে সেই আবর্ত্ত-গতিকে?
যাতায়াতের পথে কার বা সাথী কে—
পথিকে পথিকে পথের আলোচনা।
স্রোতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে
তোমায় আমায় সবে এসেছি মিশিয়ে
এক তৃণ ছেড়ে আর তৃণ ধরে
কোন্ দেশে পুনঃ করিব গমন।

ব্রাহ্মসমাজে নববিধ পুরাণের আবির্ভাব।

ভূ-ভার হরণের জন্য অবতারের আবির্ভাব, ইহাই পুরাণের মর্ম্মকথা। রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব-প্রমুখ অবতারগণ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকথা নানা অবাস্তব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। মীন, বরাহ ও কূর্ম্ম অবতারগণ কি ভাবে ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য ও ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সহজে বোধগম্য নহে। গীতাশাস্ত্রকার শেষোক্ত

অবতারগণকে লক্ষ্য করিয়া "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কি না জানি না। অথচ এদেশের জনসমাজ কোন কোন অবতারকে পূর্ণ অবতার, এবং অপরগুলিকে কলা বা অংশাবতারগণ্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরোচিত পূজা অর্পণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের সমস্ত লীলাকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সীতাদেবী অবতারের মধ্যে পরিগণিতা না হইলেও হলকর্ষণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং তিনি অযোনিসম্ভবা বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এদেশের পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাশ্চাত্যদেশে এ বিশ্বাস বহমান রহিয়াছে যে যিশুখৃষ্ট তাঁহার মাতা কুমারী মেরীর গর্ভজাত। যে সকল অবতার এদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তাঁহাদের জন্মের পূর্ব্বে স্বর্গের দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট বা অন্য কোন শক্তিশালী দেবদেবীর নিকটে পৃথিবীর দুর্গতি নিবারণ জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আপনার স্বরূপকে বা অংশকে জগতে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছেন। এবং অবতার ভূমিষ্ঠ হইলে স্বর্গের দেবতাগণ নিম্নে নামিয়া অলক্ষ্য ভাবে সূতিকাগৃহের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণের ভিতরে তাহার বিষদ বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস অচঞ্চল অবস্থায় রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোচনা যখন এদেশের যুবকবৃন্দের হৃদয়ে নব আলোকের সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই তাঁহাদের মনে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্ম ও ধারণা বিষয়ে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিলেন; পুরাণ তন্ত্রের কাহিনী তাঁহাদিগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না; অনেকে নাস্তিক হইয়া দাঁড়াইলেন, কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের স্বাভাবিক পিপাসা মিটাইতে আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তিনি উপনিষদের জ্বলন্ত সত্যের সন্ধান দিয়া তাহারই প্রচারে বিদ্রোহী দলকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অধীনে আনিবার জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিলেন; এবং ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ বিধান করিলেন।

পুরাতন তন্ত্রের কাহিনী ও জটিলতা পরিহার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব। উহার মধ্যে যে সমস্ত নির্ব্বিবাদ জ্বলন্ত সত্য আছে আমরা একদিনের জন্যও তাহা পরিত্যাগ করি নাই; ছাড়িয়াছি কেবল অবতারবাদ ও জ্ঞানবিরুদ্ধ কাহিনী এবং রুচি ও হৃদয়বিরুদ্ধ আচরণ। তাই বলিয়া আমরা হিন্দুসমাজের সহিত অকারণ বিরোধ পোষণ করি না, নিন্দাগ্লানিতে কাহাকেও আঘাত করিতে প্রস্তুত নহি, এবং আমরা নিজেকেও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান করি।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন আদিব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, ঠিক সময়োচিত না হইলেও, জ্বলন্ত আদর্শ লইয়া বাহির হইলেন এবং সেই আদর্শটিকে স্থিরভাবে ধরিয়া দেশবিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বরই তাঁহার নিকটে একমাত্র আদর্শ ছিল। কিন্তু ক্রমে যিশুখৃষ্টকে আনিয়া ঐ আদর্শের পার্শ্বে ধরিলেন। ক্রমে খ্যাতিপ্রতিপত্তি যখন তাঁহাকে একেবারে মাতাইয়া তুলিল, তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে একটু সরিয়া গিয়া নিজেই নববিধানের পত্তন করিলেন এবং বিপদসঙ্কুল আদেশ-প্রত্যাদেশবাদ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন; আপনার অত্যদ্ভুত শক্তিতে যখন একটু আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন, তিনি নিজেই যে একজন অবতারকল্প (inspired prophot) লোকসমালোচনার বহির্ভূত, তাহারও একটু ইঙ্গিত পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন।

শ্রদ্ধেয় কেশববাবুর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার দলস্থ ভক্তেরা তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কেশববাবু নিজ জীবদ্দশায় খৃষ্টকে আদর্শীভূত করিয়াছিলেন এবং যিশুখৃষ্টের আদর্শে কয়েকজনকে তাঁহার নিজের পারিপার্শ্বিক শিষ্য (disciple) করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে "প্রেরিত" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশববাবুর দেহাবসানে খৃষ্টকে আদর্শের স্থান হইতে সরাইয়া কেশববাবুর ভক্তগণ

কেশববাবুকেই মধ্য-বিন্দু ও আদর্শ করিয়া তুলিবার জন্য আড়ে-হাতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা কেশববাবুকে তাঁহার অতুল্য প্রতিভার জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। কিন্তু নিতান্ত অশোভন-ভাবে ভক্তি প্রদর্শনের পথ বড়ই পিচ্ছিল। ভক্তি প্রকাশ করিতে গিয়া যেন আমরা কাহাকেও দেবতা না করিয়া তুলি। আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হইবে যেন আমরা একখানি নূতন ধরণের পুরাণের সৃষ্টি না করি।

বিগত ১২ই মাঘ নববিধানের ঘোষণার দিন উপলক্ষে কমলকুটীরে উৎসব হয়। সেখানে পুরাণের ধরণে লিখিত "নবশিশুর জন্মকথা" বিতরিত হইয়াছিল। আমরা তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি এবং তাহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"বৈকুণ্ঠধামে নিত্য আনন্দোৎসব। * * * রাজকুমারগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার (এরাজ্যের) অধীশ্বরীর নিজ হাতে। সন্তানদের লালনপালন স্বহস্তেই করেন। একদা সন্ধ্যার সময় রাজরাজেশ্বরী সন্তানগণকে লইয়া অন্তঃপুরে খেলা করিতেছিলেন, * * * কেহ বা (জননীর এই রূপ দেখিয়া) আনন্দে মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন, কেহ কেহ রাজকুমারদের নৃত্য দেখিয়া তালে তালে বাদ্য বাজাইতেছেন। * * * এমন সময় দ্বারে আঘাত, আঘাতে দ্বার উদ্ঘাটিত। আলুলায়িতকেশা মলিন-বসনা বসুমাতা গৃহে প্রবেশমাত্র সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া সিংহাসনতলে আসিয়া লুণ্ঠিতা হইলেন। কাতর ক্রন্দনাশ্রুতে বক্ষ ভাসিতেছিল। * * * রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! কি হইয়াছে, কেন এত ক্রন্দন, কেন এমন বেশ? * * * উত্তর দিলেন বসুন্ধরা—মা গো আর পারি না, এত দ্বন্দ্ব কোলাহল এত অশান্তি আর সহিতে পারি না। রাজ্ঞী—"কেন বৎসে! কিসের অশান্তি?" "যুগযুগান্তরে নর নারীর অত্যাচার * * অনেক সহিয়াছি। কিন্তু এ কলিযুগে এ যে অসহনীয় ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিধানে বিধানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অমিল! * * * ধর্ম্মের মিলন, বিধানের মিলন করিয়া সকল অশান্তি দূর কর। নতুবা মাগো আমাকে ধ্বংস কর। * * * রাজ্ঞী "বৎসে! তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি কতবার যে আমার বুকের ছেলেদের এক একটি করিয়া পাঠাইয়াছি। মনে আছে কি? বসুমতি, যত্ন আদর তুমি দিতে পার নাই। বাছাদের কষ্ট নির্য্যাতন ভাবিলে আমার বুক যে কেমন করে। তোমার এ দুঃখ যাতনা কিসে যাবে? আর আমি কি করিব? (বসুমতী—) "আর কষ্ট হবে না এবার আমি সাবধানে যত্নে রাখিব। দাও মা একটি পুত্ররত্ন।" * * * ইহার পূর্ব্বে ছেলেগুলি মায়ের অঞ্চলের ও কোলের ভিতরে লুকাইয়া খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ কোলের শিশুপুত্র কোল হইতে উঠিয়া মায়ের মুখচুম্বন করিলেন। জননী বুঝিলেন এই কোলের শিশুকেই এবার দুরন্ত ভবভবনে পাঠাইতে হইবে। বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বসুমতি, কেমন করিয়া তোর সঙ্গে এই শিশুকে পাঠাই, বড় অনাদর বড় অযত্ন হয় যে আমার রত্নগুলির"। "এবার দেমা আমায় তোর ছেলে, আর সয় না যাতনা; রক্ষা কর মা"। * * * "তোমার ছেলে না হলে অশান্তি ঘুচিবে না।" "মা দয়া কর, আগুনে জলধারা বর্ষণ কর"। মা স্বর্গেশ্বরী বসুমতীর কাতর ক্রন্দন আর শুনিতে পারিলেন না, সেই জন্য প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য ক্ষুদ্র শিশুপুত্রটিকে লইয়া বসুমতীর কোলে দিলেন। (তার পর একটি সঙ্গীত।) বসুমতী শিশু রাজ-কুমারকে প্রণাম করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— * * * "আমি যাই মা আগে, শিশুর আগমনবার্ত্তা দিই ধরার নরনারীদিগকে"। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের মুখ বিশুষ্ক, জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ সজল-নয়না, মার প্রতি তাকাইয়া কাতরস্বরে একে একে সুধাইতে লাগিলেন, "হ্যাঁ মা কেমন করে তোমার ছেলেকে পাঠাবে মা, ভাই আমাদের কখনও তোমায় ছেড়ে থাকে নাই। আহার স্নান শয়ন ক্ষুধা তৃষ্ণামোচন, সব যে তুমি কর। * * * না মা পাঠাস নি মা। বড় আঘাত দেয় বসুমতীর সন্তানেরা। সেই যে ক্রুশে বিদ্ধ করে, আগুণে ফেলে, জলে ডুবাইয়া, কলসীর কাণা ফেলিয়া কত রকমে আঘাত দিয়াছে।" পরে সঙ্গীত—

ওগো জননি, তোমার কোলের ছেলে
কেমন করে ছেড়ে দেবে।
তোমার বক্ষের ধন, পুত্ররতন,
কেমন করে ভবে পাঠাইবে।
(মা বই শিশু কিছু জানে না)
(মা বই ত কিছু চাহে না)
জানি গো ভূতলে অরিদলে (কত)
নিদারুণ আঘাত করিবে।
(ক্রুশে বিদ্ধ করি কভু,)
(বিজনে, বিপিনে পাঠিয়ে কভু)
(হস্তী পদতলে ফেলি)
তোমারে ছাড়িয়ে, থাকিলে জননী
নয়ন জলে যে সে ভাসিবে।
(কেমনে মা কাঁদাইবে,) (তুমি ভকতবৎসলে,)
(শিশুর কোমল বদন শুকাইবে) (এমন হাসিমুখ)

জননী সন্তানবৎসলা, সন্তানদের একে একে চুম্বন করিয়া বলিলেন "তোরা কাঁদিস না, ভাবিস না। আমি কি কোলের ছেলে, বেশী দিনের জন্য পাঠাইতে পারি। আমার এ শিশু যে আমার বুকের আনন্দপদ্ম। কলিযুগে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিল নাই, বিধানে বিধানে মিল নাই। ভুলিয়া গিয়াছে বসুমতীর নরনারী যে বিশ্বপরিবার আমারই প্রেম পরিবার। নিরানন্দ ঘুচাতে, অপ্রেম নাশিতে এক পরিবার করিতে তোদের এ শিশু ভাই ছাড়া আর কেহ কি পারিবে? এ যে আমার স্তনপায়ী শিশুপুত্র। মা আর ছেলের যে কি সম্বন্ধ কি স্নেহ, তোদের এই শিশু ভাই-ই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবে। ধরাতে বৈকুণ্ঠধাম অবতীর্ণ হইবে, আমাকে লইয়া যাইবে, তোরাও সব যাবি। তাই বলি তোরা চোখের জল মুছে ফেলে আদরে সাজায়ে বরণ করে দে।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ভাই ভগিনীগণ, "মা, কতদিন রাখবে ভূতলে ভাইকে?" জননী—"দেহ ধরে থাকবে বাছা কেবলমাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর।" তখন কতক আশ্বস্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনীগণ ভাইকে সাজাইতে লাগিলেন, দিদিরা বরণ করিয়া জয়মালা গলায় দিলেন। এক ভাই দিলেন মাথায় বিশ্বাসের মুকুট, এক ভাই বুকে নির্ব্বাণ শক্তিকবচ, এক ভাই হাতে সুকৃতি বলয়, একজন জ্ঞানকুণ্ডল কাণে। (তার পর সঙ্গীত) শিশু ভাই ভ্রাতাভগিনীদিগের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলেন। তার পরে "মায়ের আদেশে যাই ভববাসে, দেখ ভাই আমায় ভুল না" এই বলিয়া সঙ্গীত। • • • জননী সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বিষাদের রেখা দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি সকলের কত প্রিয় কত স্নেহের। নিজে পুত্রকে কোলে করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া শত শত চুম্বনে দেহটি আবৃত করিলেন। • • • মা কতক্ষণ এমনই ভাবে বুকে ধরিয়া মধুর স্নেহ সম্বোধনে বলিলেন, "প্রাণের বৎস! আমার এই চুম্বন তোকে বর্ম্মের মত আবৃত করিয়া রাখিবে। কোনও বাণ, কোনও অসিতে তোমার এই অঙ্গে আঘাত লাগিবে না। বাছারে আমারই কোলে তুই থাকবি, তবে বসুন্ধরার দুঃখ তাপ নাশ করিবার জন্য কয়বৎসরমাত্র তোর দেহ ধারণ করিয়া ভববাস করিতে হইবে"। বলিয়া আবার শিশুকে চুম্বন করিয়া কর্ণে কি মহামন্ত্র দিলেন, মুখে অমৃত দিলেন, বক্ষে আনন্দপদ্ম ফুটাইয়া দিয়া আবার শির চুম্বন করিয়া প্রধান দেবদূত যিনি আশাবাহক তাঁহার বক্ষে শিশুকে রক্ষা করিলেন। বৈকুণ্ঠধাম পূর্ণ করিয়া জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল ধরার নরনারীর প্রাণে, ঘুমাইয়া হাসিল শিশু শয্যায়, সতীর সিন্দুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ধার্ম্মিকের প্রাণ নাচিল, দূতগণ শিশু রাজকুমারকে লইয়া মেঘের ভিতর লুকাইয়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলেন অবনীতে। ১৯ নবেম্বর প্রাতঃকালে কলুটোলাস্থ প্রাসাদতুল্য এক গৃহে মা সারদা দেবীর বিনা প্রসববেদনায় এক সুপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। অদৃশ্য রাজ্যের মঙ্গলধ্বনি নহবতের ধ্বনিতে মিশিল, দেবদেবীর ফুলবৃষ্টি পড়িল বসুন্ধরার মাথায়।"

এগার পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকাখানি বেশ সরস ভাবে লিখিত—নাট্যাংশ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমাদের আশঙ্কা হয় এই পুস্তিকাখানি আরও পল্লবিত হইয়া "কেশব সেনের পালা" বলিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হয়। বাইবেলে আছে যে, ঈশ্বর তাঁহার প্রিয়পুত্র ঈশাকে জগতের অমঙ্গল দূরীকরণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান পুস্তকে কেশব বাবুর দিক দিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কুমারী মেরীর গর্ভে

ঈশার আবির্ভাব। বর্ত্তমান পুস্তকে এই পর্য্যন্ত আছে, বিনা প্রসব বেদনায় কেশব বাবুর আবির্ভাব। কেশব বাবুর জন্ম হইলে দেব দেবীগণ (পুরাণে যেমন আছে) উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। "প্রধান দেবদূত যিনি আশাবাহক তাঁহার বক্ষে শিশুকে রক্ষা করিলেন" পুস্তিকাখানিতে এই উল্লেখ আছে; "আশা বাহক" যে কে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদের নিকট আর একখানি পুস্তক আছে, তাহা কেশব বাবুর দলের জনৈক ব্যক্তির লেখা। পুস্তকখানির নাম God man Keshob Chandra Sen উহাতে একভাবে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে এরূপ উল্লেখ আছে। এসরাইলগণ ঈশার শত্রু ছিলেন এবং অবিশ্বাসী বলিয়া বাইবেলে তাঁহাদের দুর্ণাম আছে। কেশব বাবুর সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজের কোন এক সম্প্রদায় অবিশ্বাসীর দল বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, কেশব বাবু সুমহান আদর্শ লইয়া প্রথম বয়সে ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষজীবনে তুল্যভাবে সে আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কোচবিহার রাজের বিবাহের ব্যবস্থা করিবার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

কুচবিহারের মহারাজার অকালমৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। রাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বিলাত হইতে পরলোকগত মহারাজের ভস্ম লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কুচবিহারে সমাধি নির্ম্মাণ। কিন্তু কুচবিহারের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পরামর্শে ভস্মাদি বারাণসীর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং শ্রাদ্ধাদি হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজার পিতা নববিধানকে রাজধর্ম্ম বলিয়া স্বরাজ্যে বিঘোষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার পরিণাম দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত। এখনও শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিতা। এইরূপ আচরণে তাঁহার প্রাণে নিশ্চয়ই বেদনা লাগিয়াছে। কেশব বাবু প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ কুচবিহারে দিয়াছিলেন—কেশব বাবুর এইরূপ ধারণা ছিল। প্রত্যাদেশ যে মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হয় না এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু প্রত্যাদেশ বলিয়া লোকে যাহা পায়, এদেশে সে তাহা প্রাণান্তেও অপরের নিকট প্রকাশ বা ঘোষণা করে না। সকল সময়েই তাহার মনে আশঙ্কা থাকে যে যাহা আমি প্রত্যাদেশ বলিয়া অনুভব করিতেছি, পাছে তাহা অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময়ে মনের খেয়ালকেও লোকে প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করে। অনুমান হয় যে, কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য এবং পদস্থ স্বাধীন রাজাকে দলস্থ করিয়া লইতে পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াই রাজার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন এই বিবাহে ১৮৭৮ অব্দে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তখন প্রত্যাদেশের দোহাই না দিলেই ভাল হইত। এই বিবাহটী সত্যই প্রত্যাদিষ্ট হইলে তাহার উদ্দেশ্যের এরূপ বিসদৃশ পরিণাম ঘটিত না। বর্ত্তমানে কুচবিহারে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে 'প্রত্যাদেশ' এই কথার মর্য্যাদা হানি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। স্বার্থের গন্ধমাত্রহীন সুনির্ম্মল চিত্তপটেই প্রকৃত প্রত্যাদেশ প্রকাশ পায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

তাঁহার দেহান্তে তাঁহাকে অবতারোপম করিবার প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের নিকট সমাদরের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপের অবতারণা করিয়া দিবে। ধর্ম্মসমন্বয় করিবার জন্য কেশব বাবু প্রাণপাত করিয়াছিলেন, উদারভাবে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ধরিয়া রাখিবার অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার অন্ধ ভক্তগণের ঈদৃশ চেষ্টার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, এবং একটি ক্ষুদ্রতম বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহাদিগকে আরও সম্প্রদায়গত করিয়া তুলিবে। আলোচ্য পুস্তিকা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ পুস্তক প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নববিধ পুরাণের সৃষ্টি হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে একেবারে ম্লান করিয়া ফেলিবে। পুস্তিকখানিতে ব্রহ্মসংস্পর্শকে লইয়া যেন ছেলেখেলা করা হইয়াছে। নিতান্ত ব্যথিত হইয়া আমরা বক্তব্য প্রকাশ করিলাম—কাহারও অন্তরে ব্যথা দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অদ্ভুত স্বপন। *

(শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য)

নিশীথে নিদ্রার ঘোরে দেখিনু স্বপন,
"উঠো" বলে কে যেনরে ডাকে একজন !
অমনি উঠিনু আমি,
বিছানা হইতে নামি,
সে বলিল "সঙ্গে এসো", চলি তার সাথে,
ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে নামিল যে পথে।
নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিনু,
দেউড়ীর কাছে গিয়ে সদরে চাহিনু;
রয়েছে নিদ্রিত দ্বারী,
কি কৌশল দেখি তারি—
কপাট ছুঁইবামাত্র খুলিল সত্বর,
তারি সাথে গিয়া পড়ি রাস্তার উপর।
স্পষ্টত দেখিতে নারি, কেবা নাহি জানি,
ছায়া-পুরুষের মত হেন অনুমানি।
আমারে বলিছে যাহা,
বাধ্য হয়ে করি তাহা,
উঠিল আকাশপথে সেথান হইতে,
পশ্চাতে উঠিনু আমি তাহার সহিতে।
সম্মুখে দক্ষিণে বামে তারকা সকল,
আলোক দিতেছে কত হয়ে সমুজ্জ্বল।
চলেছি তাহারি সাথে,
পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ যাতে;
এক বাষ্পসিন্ধু মাঝে প্রবেশ করিনু,
যেখানে নক্ষত্ররাজি নাহিত দেখিনু।
কত' দূর গিয়া দেখি,
বাষ্পের ভিতরে সে কি—
উপদ্বীপ সম এক পূর্ণচন্দ্র রয়
যত তার কাছে যাই তত বৃদ্ধি হয়।
নাহি সে তো গোলাকার,
চেপ্টা আকার তার,
সেখানে দাঁড়াল যেই সে ছায়া-পুরুষ,
আমিও দাঁড়ানু সাথে নাহিক কলুষ।
শ্বেত প্রস্তরের ভূমি দেখি সমুদয়,
ফুল ফল তৃণ-লতা নাহি গুল্মচয়।
যতদূর দৃষ্টি যায়,
শুভ্র সে মাঠের প্রায়;
নিজালোকে আলোকিত, স্নিগ্ধ কিবা জ্যোতি,
সেথা এই সূর্য্যরশ্মি নাহি এক রতি।

দিনের ছায়ার মত,
সুখ-স্পর্শ বায়ু কত,
যাইতে যাইতে সেই খোলা মাঠ দিয়া,
প্রবেশ করিনু এক নগরেতে গিয়া।
শ্বেত প্রস্তরের পথ,
শ্বেত সব ইমারত,
কিবা স্বচ্ছ পরিষ্কৃত প্রশান্ত বিমল,
নাহি সেথা জন-প্রাণী নাহি কোলাহল।
পথ পার্শ্বে এক হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিয়া,
উঠিল সে নেতা মোর দোতলায় গিয়া।
প্রশস্ত সে ঘরখানি,
সঙ্গেতে রয়েছি আমি,
শ্বেত পাথরের দেখি টেবিল চেয়ার,
"বসো" বলে সে আমারে বসাল এবার।
ছায়া ত বিলীন প্রায়,
আর কেহ নাহি হায় !
নীরব নিস্তব্ধ গৃহে থাকিনু একাকী,
ঘরের সম্মুখ দিকে শুধু দৃষ্টি রাখি।
দরজার পর্দ্দা খুলে সহসা সম্মুখে,
উপস্থিত—মা আমার দেখি স্মিতমুখে।
(মৃত্যুদিন, সমতুল—
সেইরূপ এলোচুল,
দেখিয়া ভাবিনু—সত্য ভেবেছিনু তাই,
জননীর মৃত্যুকালে তাঁর মৃত্যু নাই।
শ্মশান হইতে ফিরে,
সে বিশ্বাস রয় ঘিরে,
সত্যই জীবন্ত মাকে দেখিনু এখন,)
আমাকে দেখিয়া কন মধুর বচন।—
"তোরে দেখিবার তরে,
ডাকিয়া এনেছি ঘরে;
বড় ইচ্ছা হয়েছিল দেখিব এ ঠাঁই,
ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস্ এ তো দেখি নাই।—
"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" তোর—
অমনি আনন্দে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল মোর।
দেখি বিছানায় পড়ে,
মরি ছটফট্ করে,
দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন যাঁর কৃপা বলে,
দুর্জ্জয় শকতি দিল আশ্চর্য্য কৌশলে।

* মহর্ষিদেবের স্বপ্ন অবলম্বনে।

বঙ্গীয় পল্লীসমাজের জীবন-মরণ সমস্যা।

(শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উকীল, মোক্তার, জমীদার, ইত্যাদি, বে-সরকারী জন-সম্প্রদায়ও আগ্রহ সহকারে এই প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন এবং জেলা ও গ্রাম্য সমিতি সমূহের সভ্যরূপে এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও বাঁকুড়া জেলার হেল্‌থ অফিসারের সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদকও এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আন্দোলনের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবার জন্য অনেক পরামর্শসভার অধিবেশন করা হইয়াছে। আদর্শ উপবিধিসমূহ গঠিত হইয়াছে; সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা বোধ করা গিয়াছে, তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত অবৈতনিক কর্ম্মিগণের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিয়মাবলীও প্রচার করা হইয়াছে। বিগত চারি মাস ধরিয়া এইভাবে যে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে আজ সমবায় জল-সরবরাহ-সমিতি গঠন করিবার জন্য দেশব্যাপী একটা আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়াছে। জেলা-সমিতি হইতে নক্সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করিবার জন্য সার্ভেয়ার এবং সমিতি গঠন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কয়েকজন সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হইয়াছে। জলসেচন সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য বাঁকুড়াতে একটী যৌথ জল সরবরাহ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং এই ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়া এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য জেলাবাসিগণকে আহ্বান করা হইতেছে। ব্যাঙ্কের মূলধন আপাততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা, প্রয়োজন হইলে ইহার মূলধন আরও বাড়াইতে হইবে। বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড নক্সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়রকে আদেশ করিয়াছেন এবং আন্দোলনের আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থসাহায্যও করিয়াছেন। সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এই জেলার সার্কেল অফিসারগণ এই প্রচেষ্টা ফলবতী করিবার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন এবং জেলার সমিতির অনুরোধ ক্রমে সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট এই কার্য্যের জন্য একজন অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ও তিনজন সুপারভাইজার নিযুক্ত করিয়াছেন; আর জলসেচন সমিতি গঠন কার্য্যে যাহাতে বিলম্ব না হয় সে জন্য চারি জন অবৈতনিক গঠনকর্ম্মীও নিযুক্ত করিয়াছেন। সমবায় সমিতির ইন্সপেক্টরগণ প্রাণপণে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ও তাঁহাদের চেষ্টায় যথেষ্ট সুফলও ফলিয়াছে।

মোটামুটী ধরিতে গেলে জলসেচন সমিতিগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলির উদ্দেশ্য নূতন বাঁধ বা জলাশয় নির্ম্মাণ আর কতকগুলির উদ্দেশ্য বর্ত্তমান জলাশয়গুলির সংস্কার ও পুনরুদ্ধার। যে সকল সমিতি নদী বা ক্ষুদ্র জলস্রোতে বাঁধ নির্ম্মাণ করেন তাহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই উপায়ে ৫,০০০৲ টাকা হইতে ৪০,০০০৲ টাকা অথবা ততোধিক অর্থব্যয়ে ৫০০৲ শত হইতে ৫,০০০ বা ততোধিক বিঘা জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়। এক-একটী বৃহৎ সমিতি ২০।৩০টা গ্রামের পাঁচ হইতে ছয় শত পরিবারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই জেলায় এই প্রকারের কয়েকটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শালবাঁধ জলসরবরাহ সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৪০,০০০৲ টাকা খরচে এই সমিতি একটী জলস্রোতে পাকা বাঁধ বাঁধিয়া ৫,০০০ বিঘা জমীতে জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে ১০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং বাকী ৩০,০০০৲ গবর্ণমেন্ট ধার দিতেছেন। চারি কিস্তীতে এই টাকা শোধ দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যেই সমিতিকে ২০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই টাকা লইয়া বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে এই বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় শালবাঁধ সমিতিকে এবং এই জেলার সমগ্র প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন; এবং বাঁকুড়া জেলা-কৃষি-সমিতি জেলার জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিষ্টার কে, সি দে কয়েকটী সমিতি পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতিগুলি পুরাতন বাঁধ ও জলাশয়ের সংস্কার করিতেছে। এক-একটী জলাশয়ের সংস্কার-কার্য্যে ৩০০৲ হইতে ১০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইতে পারে। কোনও ক্ষুদ্র সমিতির কার্য্যক্ষেত্র ১৫টী অথবা ২০টী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আবার কোনও সমিতি ৭।৮টা গ্রামের ২০০ অথবা ৩০০ পরিবার লইয়া গঠিত

হয়। এই প্রকারের অনেকগুলি সমিতি বর্ত্তমানে গঠিত হইতেছে।

কি প্রকারে এই সকল সমিতি গঠিত হয় এবং কি প্রকারে ইহাদের কার্য্য পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। মনে করুন যে, মাঝারি রকমের একটী জলাশয়ের সংস্কার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। জলাশয়টী হইতে আন্দাজ ২০০ বিঘা জমির সেচন হয় এবং উহার মেরামতের খরচ ১০০০৲ টাকা। ৭৲ সাত টাকা মূল্যের ২০০ অংশ বা শেয়ার লইয়া সমবায় সমিতিটী গঠিত হইল। এই ১৪০০৲ টাকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা জলাশয়টীর মেরামতের জন্য ব্যয় হইবে; কর্জ্জের টাকার সুদের বাবত ২০০৲ টাকা ধরা হইল এবং অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য বাকী ২০০৲ টাকা হাতে থাকিল। প্রথমেই সমিতিভুক্ত কৃষকগণ বিঘা প্রতি ১৲ এক টাকা সংগ্রহ করিয়া, মোট ২০০৲ টাকা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। অবস্থা অনুসারে এই প্রথম কিস্তির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। সকলের নিকট প্রথম কিস্তির টাকা আদায় হইলে, এবং জলাশয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক সমিতিভুক্ত হইলে, সমিতিটী সমবায় আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রারী করা হয়। তখন সমিতি যৌথ জলসরবাহ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বাকী ৮০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া মেরামতের কার্য্য সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করে। প্রতি বৎসর প্রতি শেয়ার বাবত ১৲ টাকা উঠাইয়া, এই ঋণের টাকা সুদ সমেত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু সমিতি যে বৎসর গঠিত হয়, সেই বৎসরই সভ্যগণের প্রথম কিস্তির টাকা এবং ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করা টাকা লইয়া, জলাশয়টী উপযুক্তভাবে মেরামত হওয়ায়, পর বৎসর হইতে সেই সকল জমিতে ফসল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ এক বৎসরে যে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায় তাহাতেই মেরামতের সম্পূর্ণ খরচ উঠিয়া যায়। যাহাতে জলাশয়টী সংস্কারের অভাবে পুনরায় নষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রতি বৎসর প্রতি বিঘায় কিছু চাঁদা তুলিবার ব্যবস্থা আছে; সেই অর্থ হইতে মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার ও পার মেরামত ইত্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। এই প্রকারে জলাশয়ের উন্নতিসাধন হইলে কেবল যে জমিতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা নহে, তাহাতে মাছের আবাদ করিয়া অনেক লাভ হইতে পারে। মাছের স্বত্ব জলসেচনের স্বত্ব হইতে পৃথক। যেখানে সমিতির সভ্যগণের এই স্বত্ব নাই, সেখানে সম্ভব হইলে সমিতি স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে মাছের আবাদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। কিন্তু জলাশয়ে জমিদারের যে সকল ন্যায্য অধিকার আছে তাহা সকল ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। কোথাও কোথাও সমিতি নিজেদের মধ্যেই মেরামতের সম্পূর্ণ টাকাই সংগ্রহ করে, তখন আর কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন থাকে না। কোনও সমিতি বা স্থানীয় মহাজনের নিকট অল্প সুদে টাকা যোগাড় করে। কিন্তু সচরাচর সমিতির মূলধনের কিয়দংশ যৌথ জলসরবাহ ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করিতে হয়।

এই সকল জলাশয় ও বাঁধের যে কখনও পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে এবং ক্ষেত্রের শস্য অজন্মার হাত হইতে রক্ষার উপায় হইতে পারে, কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষকেরা ইহা ধারণাই করিতে পারিত না। আজ বাঁকুড়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় বুঝিয়াছে যে, সমবায়-সমিতি গঠন করিলে এই কার্য্য অনায়াসেই সাধন হইবে, এবং এ বিষয়ে তাহারা যে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতেছে ও এই অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র যে প্রকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা অতীব আশাপ্রদ। বর্ত্তমানে প্রায় একশত সমবায় জলসরবরাহ সমিতি গঠিত হইতেছে; এই সকল সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যেই ৫০টী সমিতি গঠিত হইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

যদি আরও অধিক অবৈতনিক গঠনকর্ম্মী ও সমবায়-সমিতির ইন্‌স্পেক্টার এই কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইত, এবং বড় বড় সমিতির নক্সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করিবার জন্য উপযুক্তসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য পাওয়া যাইত, তবে কাজ আরও অনেক বেশী হইতে পারিত। বাঁকুড়ার অন্নসমস্যার সম্যক্ সমাধান করিতে হইলে, আগামী ৫ বা ৬ বৎসরের মধ্যেই জেলার ত্রিশ হাজার জলাশয়ের সংস্কার করিতে হইবে এবং বহুসংখ্যক ছোট বড় জলস্রোত বাঁধিয়া জল সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে যে ভাবে কাজ হইতেছে তদপেক্ষা অনেক দ্রুত গতিতে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। কেবলমাত্র গঠনকর্ম্মীর ও ইন্‌স্পেক্টরের অভাবে এবং নক্সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুতের জন্য ইঞ্জিনিয়ারের অভাবেই কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছে না। এই সকল অভাব পূরণ হইলে এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন মত টাকার যোগাড় থাকিলে, উদ্দেশ্য সাধনের পথে আর কোন বাধাই থাকিত না। আরও কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টার নিয়োগের জন্য সমবায়-বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে; এবং আমার বিশ্বাস যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত এত অনুকূল যে, অচিরাৎ কেবল জলসেচন সমিতি গঠন কার্য্যের জন্য আমরা একজন ইঞ্জিনিয়ার পাইব। এবং ইহাও আশা করা যায় যে, বাঁকু-

ত্যার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে. যদি প্রয়োজনরূপ অর্থ সংগৃহীত না হয়, তবে গবর্ণমেন্ট হইতে জলসেচন-সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হইবে। সুতরাং ইহা মনে করা দুরাশা নহে যে, সাধারণের মধ্য হইতে আরও অনেক লোক অবৈতনিক কর্ম্মীভাবে এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইলে এবং গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আবশ্যকীয় কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঁকুড়ার শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও ব্যাধি, এই সকল বিষয়ের প্রতিবিধান হইবে।

ইতিমধ্যে সমবেত চেষ্টার যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় আশ্চর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত পাঁচ মাসের মধ্যেই এই জেলাবাসীর জীবনপ্রবাহের গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ আশার আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না। যেখানেই জলসেচনের জন্য সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেখানেই দলাদলির পরিবর্ত্তে সহযোগিতা ও ঐক্যের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, এবং অদৃষ্টবাদ, নিরাশার অন্ধকার ও জড়তার পরিবর্ত্তে উৎসাহ ও পুরুষকার উদ্বোধিত হইয়া নবজীবনের সূচনা করিতেছে।

এই আশার বাণী, এই নবজীবনের সংবাদ দেশের গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে প্রচার করিতে হইলে, আমাদের গ্রাম্য জীবনকে ঐক্যের বন্ধনে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইলে, জনসাধারণের সকল শ্রেণী হইতে দলে দলে স্বদেশসেবকের আবশ্যক। এ বিষয়ে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম তদনুসারে বাঁকুড়ার উকীল ও মোক্তার মহোদয়গণ সভায় সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে গিয়া জলসেচন সমিতি ও গ্রাম্য কৃষি ও হিতকরী সমিতি গঠিত করিবেন। তাঁহারা যদি এই দেশহিতকর সঙ্কল্প হইতে বিচলিত না হন, এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া, দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোকও যদি এই কার্য্যে যোগদান করেন, তবে যে অচিরাৎ জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়া হইতে দূর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? শুধু তাহাই নহে, সমবেত চেষ্টার দ্বারা একটী প্রধান অভাব দূর করিয়া যখন পল্লীজীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও এই একতার আবির্ভাব হইবে, তখন যে এই মরণোন্মুখ জেলা প্রকৃতই "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" হইয়া অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতেই বা কি সন্দেহ আছে?

জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতে সমবায় প্রণালী প্রয়োগ করিলে, পল্লীজীবনের যে কতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝাইবার জন্য আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। "কৃষিকার্য্যে সমবায়" প্রসঙ্গে হ্যারল্ড পাওয়েল এই আশ্চর্য্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯০৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রায় ১৪০ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ যাহাতে জলসেচন হয় তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশই সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়াছিল; এবং এই প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্য কোনও ব্যবসায়েই সমবায়নীতি এত অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ ভূভাগ অপেক্ষা অধিক জলহীন উটা প্রদেশের উন্নতি সাধনের জন্যই আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথমে জলসেচনের বন্দোবস্তে সমবায় পদ্ধতি প্রথমে অবলম্বন করা হয়। ইহা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য অনুর্ব্বর প্রদেশের অধিবাসিগণের প্রণিধান করিবার কথা। এই প্রদেশে যে সকল মর্মনগণ (Mormon) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা স্বীয় প্রাণধারণের জন্যই, আজ বাঁকুড়ায় যে ভাবে নদীতে বাঁধ দিবার চেষ্টা হইতেছে, সেই প্রকার বাঁধ দিবার জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল। উটা প্রদেশের ক্রমিক অভ্যুদয়ের আদিম অবস্থার ইতিহাস বিবৃত করিতে গিয়া (Samuel Fortier) ফর্টিয়ার বলিতেছেন যে, যাঁহারা প্রথমে এখানে বাসস্থান করেন তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ সংস্থান ছিল না এবং বাহিরের কোনও লোকের নিকট অর্থ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া, যে সকল কাজ একাকী বা অল্প কয়েকজনের চেষ্টায় সম্পন্ন হয় না, তাহার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সমবায় নীতিই উটা প্রদেশের উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। জলসেচনের ফলে ও বাঁধ নির্ম্মাণে সমবায় নীতির যে সুফল হইয়াছিল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া অন্যান্য ব্যবসায়েও এই নীতির প্রয়োগ করা হইল। সেই জন্যই আজ আমেরিকার সর্ব্বত্র যৌথ ষ্টোর, যৌথ ক্রিমারি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়।

উটা হইতে এই সকল সমিতি চতুর্দ্দিকে প্রদেশসমূহে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ফলে মন্টানা, কালিফর্ণিয়া, ওয়াইওমিং, নেভাডা ইত্যাদি প্রদেশেও সেই প্রকার সমিতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোলোরাডো প্রদেশে পূর্ব্বে মহাজনেরাই (Capitalists) খাল প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু এখন সেখানে এই প্রকার অনেক অনুষ্ঠান সমবায়-পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে।

আমেরিকার জলসেচনের প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তথাকার আর একজন বিখ্যাত লেখক এলউড-মীড্ বলিতেছেন যে, কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের অনেকগুলি সহরের অস্তিত্ব সমীপবর্ত্তী ফলের বাগানগুলির উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এই কথা বলা চলে যে, জলসেচনের সুবন্দোবস্তেই এই সকল নগরের উদ্ভব হইয়াছে। লস্‌এঞ্জেলস, রিভারসাইড,

ক্লেভল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি সহরের সম্বন্ধে এই কথা খাটে। উটা প্রদেশের অধিবাসীগণ প্রথমে সামান্য কৃষি-কার্য্য লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল; ক্ষেত্রে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত না হইলে তথাকার বর্ত্তমান নগরগুলির অস্তিত্বের কল্পনাও করা যাইত না। এই প্রকার অবস্থা ইডাহো, ওয়াইওমিং প্রভৃতি প্রদেশেও কতক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

পশ্চিম আমেরিকার প্রদেশসমূহে সমবায় জলসেচন পদ্ধতি যে সুফল প্রসব করিয়াছে, তদ্বিষয়ে উক্ত লেখক বলিয়াছেন—"কি প্রকারে সমবায়ের সাহায্যে সামাজিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ও উন্নতিবিধান করিতে পারা যায় তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। এক জলাশয় হইতে অনেকগুলি কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন, এবং সেই জল বিতরণের সময়ে বিধিবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার প্রয়োজনীয়তা যখন দেশের লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে সমবায়ের ভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পশ্চিম অঞ্চলে ইহার প্রভাবে আজ সমবায় প্রণালী অনুসারে নানা ব্যবসায় চলিতেছে, ইহার মধ্যে কালিফর্ণিয়ার ফলের আড়ৎ ও কলোরেডোর আলুর আড়ৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপর লোকের নির্ম্মিত জলাশয় অপেক্ষা, কৃষকদের নিজের দ্বারা সমবায় প্রণালীতে স্থাপিত জলাশয়গুলিতে খরচ কম পড়ে এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনাও কম হয়।"

বর্ত্তমানে সমবায় জলসরবরাহ সমিতি গঠনের যে প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাতে জনসাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি থাকিলে, বাঁকুড়া জেলা ভারতের উটা প্রদেশে পরিণত হইতে পারে; এবং এই আন্দোলন বাঁকুড়া জেলার উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অন্যান্য অনুর্ব্বর স্থানগুলিকে শ্যামল শস্যাবৃত স্বাস্থ্যকর গ্রাম ও সমৃদ্ধিশালী নগরে পূর্ণ করিতে পারে; এবং ইহাও দুরাশা নহে যে আমেরিকার ন্যায় জলসেচনের বন্দোবস্তে সমবায় প্রণালীর উপকারিতা প্রতীয়মান হইলে, সমাজের উন্নতিকর অন্যান্য সকল ব্যবসায়েই সমবায় পদ্ধতি অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বাঙ্গলার একটী জেলার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যুর যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, কি প্রকারে সেই প্রশ্নের সমাধান করা হইতেছে এবং আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেই কাহিনী আপনাদের নিকট বিবৃত করিলাম। এই কাহিনী হইতে বাঙ্গালার পল্লীবাসিগণ যে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, এখন তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব। আপনারা শুনিয়াছেন যে, বাঁকুড়ার দারিদ্র্য ও ব্যাধি, কুষ্ঠ ও ম্যালেরিয়া, কোনও মারাত্মক বীজাণুর অকারণ অত্যাচার অথবা প্রাকৃতিক জল বায়ুর দোষের ফল নহে; ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, অদৃষ্টবাদ ও দলাদলির জন্য পল্লীবাসিগণের একত্র কাজ করিবার সামর্থ্য নাই; এমন কি তাহার প্রয়োজনও তাহারা অনুভব করিতে পারে না। ইহাও আপনারা শুনিয়াছেন যে, জড়তা ও কর্ম্মহীনতায় নিমজ্জিত এই জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে; যাহারা কোনও দিন আত্মোন্নতির কোনও চেষ্টাই করে নাই, তাহারা আজ জাগ্রত হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বড় বড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে। এই কাহিনীর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নহে, সমগ্র বাঙ্গালার পল্লীবাসীদের প্রণিধানযোগ্য কোনও উপদেশ কি নিহিত নাই? সব জেলায় হয়ত জলাভাবই ম্যালেরিয়া, পল্লীর সাধারণ অবনতির কারণ না হইতে পারে; যদিও স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টরের মতে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অবনতি এই কারণেই ঘটিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী প্রধান সংবাদ পত্রে ("Statesman") লিখিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীগ্রাম হইতে আজ এই হাহাকার উঠিয়াছে "ওগো, আমাদিগকে জল দাও, নতুবা আমরা ধ্বংস হইব।" বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র, কোথাও হয়ত বা জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোথাও বা জঙ্গল বা জলাভূমি পরিষ্কার করিতে হইবে, আর কোথাও বা বন্যার জল আটকাইবার জন্য বাঁধ দিতে হইবে। কিন্তু স্থানীয় উন্নতির সমস্যা যেখানে যে প্রকারই হউক, সমবেত চেষ্টার যাদুমন্ত্রের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইবেই। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ডের সাহায্য লইতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্রই স্থানীয় লোকের মধ্য হইতে প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সমবেত ও সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টা ব্যতীত কোনও উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ফলতঃ, কোন্ নিদারুণ ব্যাধি আজ বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করিতেছে, এই প্রশ্নের যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয়, তবে আমি এই বলিব যে, ইহা ম্যালেরিয়ার ব্যাধি নহে, ইহা মামলা-মোকদ্দমা ও পরস্পরের সহিত বিরোধরূপ ব্যাধি, যাহার বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এবং জড়তা আমাদের জাতির জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আর ইহাও বলিব যে, এই ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ কুইনাইন নহে, ইহার অব্যর্থ ঔষধ পরস্পরের সহযোগিতা। কারণ, যে জাতি সমবেতভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছে তাহারা আপন আপন জলাশয়, নদী-নালা এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম; তাহাদের কখনও অর্থাভাব ঘটে না, তাহারা সহজেই ম্যালেরিয়া ব্যাধি হইতে আত্ম-

রক্ষা করিতে পারে, মশক দেখিয়া তাহাদের হৃৎকম্প হয় না। অপরন্তু যাহারা খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল এবং একতার অভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ একদল লোককে যদি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানে বসাইয়া দেওয়া হয় ও তাহাদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক প্রকৃষ্ট উপায়সমূহ অবলম্বন করা হয়, তবুও দেখা যাইবে যে ম্যালেরিয়া অচিরাৎ তাহাদের মধ্যে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে।

একথা আমি বলি না যে, জাতীয় উন্নতির জন্য অপর কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক ও আমরা আশা করি যে শীঘ্রই তাহা দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে। স্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ অনুসারে ম্যালেরিয়া নিবারক উপায় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়াও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও ইউনিয়ান বোর্ডসমূহ যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোক নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে না শিখিবে ততদিন অপরের সাহায্যে একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেও পুনরায় পড়িয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং যে নিশ্চিত অবসাদ, ঔদাসীন্য ও জড়তা আমাদের গ্রাম্য ও জাতীয় জীবনকে মহা ব্যাধির মত অধিকার করিয়াছে তাহা কি করিলে দূর করা যায় তাহাই আমাদের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। নিরাশা দূর করিয়া আশার আলোক জ্বালিতে হইবে, স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মের অজ্ঞতা দূর করিয়া সকলকে পরিষ্কার ও সুস্থভাবে জীবনযাপন করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। বিরোধের স্থানে সমবায় মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অনৈক্যের স্থলে একতা আনিতে হইবে। পল্লীবাসিগণকে শিখাইতে হইবে যে, সমবেত চেষ্টায় কাজ করিলে তাহারা আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং দারিদ্র্য, ব্যাধি ইত্যাদি যে সকল সমস্যার মীমাংসা করা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা কত সহজেই নিবারণ করা যায়। প্রাণধারণের পক্ষে যাহা আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিলে, ক্রমশঃ আত্মশক্তিতে তাহারা বিশ্বাস করিতে শিখিবে এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করা যে অসম্ভব নহে তাহাও বুঝিতে পারিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই কার্য্য যত কঠিন বোধ হউক না কেন, বাঙ্গালার পল্লী-জীবনের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের এই পরিবর্ত্তন সহজেই সাধিত হইতে পারে, অবশ্য যদি প্রচার ও সমিতি-গঠন কার্য্যের জন্য প্রকৃত দেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া যথেষ্ট লোক অক্লান্তভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকেন।

বর্ত্তমানে গবর্ণমেন্টের বিবিধ বিভাগগুলি এই প্রকার জ্ঞানপ্রচার ও সমিতি গঠনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। দেশের যাবতীয় অভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন —প্রথমতঃ প্রতি জেলার শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এক একটি কর্ম্মীর দল গঠিত হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা স্থানীয় অবনতির প্রকৃত কারণগুলি নিরূপণ করিয়া গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় প্রাগুক্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হইবেন। স্থানে স্থানে দুই একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে কোনও ফল হইবে না; ইহার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন ও দেশব্যাপী চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। ফল কথা, প্রতি জেলার স্থানীয় অবস্থা ও অভাবের উপযোগী সমবায় পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করিবার জন্য এক একটি বিশিষ্ট সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে প্রতি জেলায় এমন একদল লোক চাই যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিবেন, যাঁহাদের অন্তরে দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী এবং যাঁহারা পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিতে যত্নবান হইবেন। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে এই তিনটির একত্র সমাবেশ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামে যে সকল কারণে অবনতি ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে ধীরভাবে চিন্তা করেন, এমন লোক অতি বিরল। জাতীয় জীবনের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে উৎসাহ ও উত্তেজনার যতটা প্রয়োজন, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আবার যেখানে প্রকৃত কারণগুলি নির্ণীত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করা হয়, সেখানে হয়ত ঔদাসীন্য ও অন্তরের আবেগের অভাবে কোনও কাজ হয় না। পরন্ত স্থানে স্থানে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করিয়া চলিলেও সমবেত চেষ্টা ও বিধিবদ্ধ কার্য্যের দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। কলিকাতায় একটী হিতসাধন মণ্ডলী আছে। বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরে তাহার এক একটী শাখা স্থাপিত হউক। এমন একটী সমিতি তো বাঙ্গালা-দেশে কোথাও দেখিতে পাই না, যেখানে বাঙ্গালা দেশের কয়েকটী চিন্তাশীল ব্যক্তি ও স্বদেশহিতৈষী কর্ম্মিগণ একত্র হইয়া, পল্লীজীবনের সমস্যাগুলির নানাদিক হইতে আলোচনা করিতেছেন এবং সমবায় পদ্ধতির

সাহায্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! কেবল সমগ্র প্রদেশের জন্য নয়, প্রতি জেলায় ও প্রতি গ্রামে এই প্রকারের এক-একটী সমিতি গঠিত হউক; এবং একতা ও হিতসাধনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া কেবলমাত্র দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য নহে, গ্রামগুলি পরিষ্কৃত করিবার ও গ্রামবাসীদের দৈনিক জীবন স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মানুসারে চালিত করিতে শিক্ষা দিবার জন্য সেই শক্তি নিয়োজিত করা হউক; এবং অচিরাৎ এই দেশ জলসরবরাহ ও জল-নিকাশ, ক্রয় ও বিক্রয় ইত্যাদির জন্য নানাপ্রকার সমবায় সমিতিতে ছাইয়া ফেলা হউক। শিল্প ও কৃষি-কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করা হইলে. শীঘ্রই শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্যও সেই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে। অর্থবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নীতি-বিষয়ে জ্ঞানপ্রচার ও উন্নতিবিধানের জন্য গ্রামে গ্রামে "কৃষি ও হিতকরী" সমিতি স্থাপন করা হউক।

আয়ার্লাণ্ডের এক বিখ্যাত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"যেখানেই পল্লীগ্রামের উন্নতি লক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সংঘবদ্ধতাই তাহার মূল। যেখানে পল্লীগ্রামের অবনতি ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, সে সকল পল্লীগ্রামে লোকের বাস ছিল বটে কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রণালীতে সামাজিক ব্যবস্থার অভাব হইয়াছিল, গ্রামের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য সমিতি বা সংঘের সুবন্দোবস্ত ছিল না।" পুনশ্চ ইনি বলিয়াছেন—"প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লীগ্রামই জাতীয় জীবনের উৎসস্বরূপ; পল্লীবাসীগণকে সমবায় প্রণালীতে সম্বদ্ধ করিতে পারিলেই, জাতীয়তার ভাব ও স্বদেশ-প্রীতি তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃই বদ্ধমূল হইবে; অর্থাৎ যে সকল লোকের সহিত একত্র বাস করা যায় তাহাদের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ যে অভিন্ন, এই ভাব তাহাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে; এবং সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত জনসমাজের মধ্যে যখন পরস্পরের স্বার্থের এই অভিন্নতা উপলব্ধি হয়, তখনই জাতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর স্তরে অধি-রোহণ করিতে সক্ষম হয়।" আর একজন মনীষী সত্য সত্য বলিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের আর্থিক ও আধ্যা-ত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে সঞ্জীবনী শক্তির প্রয়োজন, তাহা সমবায়ের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই জন্য গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর সামা-জিক ব্যবস্থার মধ্যে সমবায়ের মত আশ্চর্য্য জিনিষ আর কিছুই নাই।

এই সমবায় মন্ত্র অন্যত্র যে প্রকার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা হয় নাই, ইহার কারণ কি? আমার মনে হয় যে, সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত এদেশে জনসাধারণ এখনও সমবায়ের অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করে নাই, এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহাকে নিজস্ব করিয়া লইতে জনসাধারণের কোনও আগ্রহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। গবর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং এযাবৎ যতটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টার ফলে। কিন্তু যে বিস্ময়কর জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সমবায়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, তাহা লাভ করিতে হইলে, দেশের সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, এই সমবায়মন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া সামাজিক জীবনে সর্ব্বত্র ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে।

আয়ারল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড অথবা ডেনমার্ক, ইটালি অথবা আমেরিকা, যেখানেই সমবায়ের গুণে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে যে, এই উন্নতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় হয় নাই। ইহা একদল স্বার্থত্যাগী স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টার ফল। ফিনল্যাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, পশ্চিম-আমেরিকায় মর্মন পুরোহিতগণ, বেলজিয়ম, সুইট-জারল্যাণ্ড স্পেইন ও ইটালিতে ক্যাথলিক পুরোহিতগণ এই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ডেনমার্কে কতকগুলি লোক কৃষিসমিতি গঠন করিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডেও একদল শিক্ষিত ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য দিবারাত্র অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন। বাঙ্গালায় বা সমগ্র ভারতবর্ষে সেই প্রকার দেশহিতব্রত লোকের সমিতি কোথায়? আজ সেই প্রকার দলবদ্ধ কর্ম্মপরায়ণ স্বদেশসেবকের জন্যই দেশের জনসাধারণের নিকট আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, সমবায়ের মধ্যে যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে, তাহাকে নব যুগের একটি ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র মনুষ্যত্ব, বিশ্বপ্রেমিকতা এবং সার্ব্বজনীন সাম্য ও উন্নতিবিধান। পল্লীজীবনের পুনর্গঠন-কার্য্যে এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহে আজ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক জীবন (Community life) বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ এবং যে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানু-ষ্ঠানের উপরে প্রাচীন পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার ক্রমিক অবনতি হওয়ায়, এদেশের সামাজিক জীবন শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং তার ফলে যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর মানব সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতি সর্ব্বদা নির্ভর করে তাহা লোপ পাইয়াছে:

বাংলার শিক্ষিত নর-নারীগণ! আপনাদের নিকট

আমার এই সুনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা এই নব ধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালার পল্লীবাসীগণকে সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হউন—এক একটি গ্রাম্য মুক্তি ফৌজের (Rural Salvation army) ন্যায় দলবদ্ধ হউন, এবং সমবায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রচার ও গ্রামবাসীগণের শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য নানাবিধ সমিতি গঠন করিয়া পল্লীসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হউন।

আসুন, আজ আমরা পল্লীগ্রামের ঐক্য ও উন্নতিবিধানকল্পে স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশসেবার এমন একটি অনল প্রজ্জ্বলিত করি যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের গ্লানি ও কলঙ্করাশি ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন, উন্নত ও সমন্বয়পূর্ণ করিয়া তুলিবে। আসুন, সেই পবিত্র অনলের এক-একটি জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ আমরা বাঙ্গালার অন্ধকার পল্লীগ্রামগুলিতে লইয়া যাই!

কেহ যেন একথা বলিতে না পারে যে, জাতীয় উন্নতির জন্য যেটুকু সুক্ষ্মদৃষ্টি, প্রাণের আবেগ, স্বার্থহীনতা ও কার্য্য করিবার সঙ্কল্পের প্রয়োজন আজ বাঙ্গালার শিক্ষিত জনসম্প্রদায় সেটুকু দেখাইতে পারিল না; তাহাদের কাব্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আজ যে স্বদেশপ্রীতি অভিব্যক্ত হইতেছে সেই স্বদেশপ্রীতিকে তাহারা তাহাদের পল্লীসমাজের দৈনিক জীবন সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিল না এবং সেই স্বদেশপ্রীতির ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, স্বাস্থ্য ও জনহিতের মহান্ আদর্শ তাহারা বাঙ্গালার একটি গ্রামেও ফুটাইয়া তুলিতে পারিল না!

শিবরাত্রি।

(শ্রীহরিপদ ত্রিবেদী)

শিবরাত্রি সম্বন্ধে উপাখ্যান এই :—

এক ব্যাধ শিকার করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। শিকারান্তে লব্ধ মাংসভার লইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল; আসিতে আসিতে পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হওয়ায় নিশা যাপনার্থ এক শ্রীফল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হস্তস্থিত মাংসভার বিল্বশাখায় বিলম্বিত করিয়া শ্রান্তিবশতঃ সেই বৃক্ষোপরি নিদ্রিত হইল। সেদিন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথি; রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। বসন্তবায়ু মৃদুভাবে বহিতেছিল, শুষ্ক পত্রাদি পবনহিল্লোলে ঝরিয়া পড়িতেছিল। ভূতভাবন ভবানীপতি ভবানীকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। ভ্রমণান্তে সেই শ্রীফলবৃক্ষমূলে আসিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। ব্যাধ-বিলম্বিত মাংসভার হইতে যে বিন্দু বিন্দু শোণিত পড়িতেছিল, তাহা দেবাদিদেবের অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। শ্রীফল বৃক্ষের পক্বপত্রাদি মৃদু বসন্ত বায়ুর আঘাতে ঝরিয়া বিশ্বেশ্বরের মস্তকে ও গাত্রে পড়িতেছিল। আশুতোষ মনে করিতে লাগিলেন, এই সুগভীর নিশাকালে কোন ভক্ত জাগ্রত থাকিয়া আমার পূজা করিতেছে। ভোলানাথ সাতিশয় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে কোন্ ভক্ত আমায় অর্চ্চনা করিতেছ? বর গ্রহণ কর। দয়াময় মহেশ্বরের আহ্বানে ব্যাধের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মহাদেবের আহ্বান শুনিয়া ব্যাধ শশব্যস্তে শ্রীফল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল, এবং সম্মুখে বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক করযোড়ে নিজকৃত পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল। নিষাদের প্রার্থনা ও স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া চিরমঙ্গলময় শিব অভয় প্রদানপূর্ব্বক বর দিলেন। শিবের বরে ব্যাধের মোক্ষ লাভ হইল।

এই আখ্যায়িকার অর্থ এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে,—ব্যাধ অর্থে সংসারমোহে আচ্ছন্ন স্বার্থপর পাপী মানব। তাহারা পরস্পরকে হিংসা, নিপীড়ন, তাড়ন ও হনন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহা মৃগয়া ভিন্ন আর কি। শ্রীফল বৃক্ষ আর কিছুই নহে। আমরা নানা উপায়ে যে শ্রীসম্পদ লাভ করি এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারে অবস্থান করি, উহাই শ্রীফল বৃক্ষ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। মাংসভার অর্থে আমাদের পাপার্জ্জিত অর্থ ও সম্পদ। সমস্ত দিনের কর্ম্মাবসানে যখন আমরা কৃতকর্ম্মের আলোচনা করি তখন বিল্ববৃক্ষ হইতে আপনা হইতে পত্র পতিত হইবার ন্যায় আমাদের হৃদয় অজ্ঞাতসারে ভগবানের চরণে অবনত হয় এবং কখন কখন তাঁহার নাম করিয়া ফেলি। ভগবান আশুতোষ। তিনি মানবের ঈদৃশ সামান্য চেষ্টা ও সাধনেও তৃপ্তিলাভ করেন এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তখন আমাদের অন্তরে তাঁহার স্বরূপ

অল্পে অল্পে প্রকাশিত হয়। তিনি আমাদের অন্তরে চেতনার বিধান করিতে থাকেন। আমাদের অহঙ্কার ও ঔদাস্য সমস্তই বিদূরিত হইয়া যায়। মানবের মোহাচ্ছন্ন অবস্থাও নিদ্রিত অবস্থা ভিন্ন আর কি? পাপী মানবকে মোহাচ্ছন্ন দেখিয়া বিশ্বেশ্বর তাঁহার অযাচিত করুণা দ্বারা তাহাকে বর প্রদান জন্য আহ্বান করেন। সেই মুক্তির আহ্বান শ্রবণে তাহার মোহনিদ্রা অপসারিত হয়। তখন জ্ঞাননেত্রে জীব দেখিতে পায়, শ্রী-ফল-বৃক্ষ-মূলে জ্ঞানের অতীত, চিন্তার অতীত, অনন্ত স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, ভূমা মঙ্গলময় শিব ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন সে বুঝিতে পারে যে, আমাদের শ্রীসম্পদ সকলেরই মূলে তিনি। এ সমস্তই তাঁহার দান। তিনিই শিবস্বরূপ তিনিই প্রকৃত কল্যাণময়। ঈশাবাশ্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ; এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে; সকলই শিবের অর্থাৎ মঙ্গলময়ের সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। শিবরাত্রিতে সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকিয়া চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিবার নিয়ম। ইহার অর্থ মানবজীবনের চারি অবস্থা—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য; এই চারি অবস্থাই মানবজীবনের চারি প্রহর। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া নিজ চেতনাকে জাগ্রত রাখিতে হইবে; উক্ত চারি প্রহরেই তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা করিতে হইবে। ইহাই এক রাত্রিব্যাপী প্রচলিত শিবরাত্রির পূজার প্রকৃত অভিপ্রায়। কিন্তু চাই মানবের চিরজীবনব্যাপী সাধনা।

যিনি নিজ চেতনাকে জীবনব্যাপী সাধনায় জাগ্রত রাখিয়া মঙ্গলময় দেবদেবের পূজা করিতে পারেন তাঁহার সমস্ত দুর্নিমিত্ত কাটিয়া যায়। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন, এবং সংসারের মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্যকাল অবস্থিতি করেন। ওঁ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। *

* লেখকের শিবরাত্রি সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটী সুন্দর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক অনেক আখ্যায়িকারই এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু আখ্যায়িকাগুলি মূলে যে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন অথবা আধ্যাত্মিক ভাবের উপরেই লিখিত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তঃ সং

দামোদর দেব, গোপাল দেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

[শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী]

দামোদর দেব ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে গৌতম-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সদানন্দের ঔরসে সুশীলা দেবীর গর্ভে নলোচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করদেব দামোদরদেবের পিতৃবন্ধু ছিলেন। সদানন্দের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দামোদরদেবের জন্ম হয়। তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম সর্ব্বেশ্বর ও মধ্যমের নাম রত্নাকর। দামোদরদেব কৃষিবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নীলকণ্ঠ-রচিত দামোদরদেব-চরিতেও দামোদরদেবের কৃষিকার্য্যের কথা উল্লেখ আছে :—

"দামোদর বদতি সকলো জানা তুমি।
ভক্তি বৃক্ষ গজিবার তুমি নিজ ভূমি॥
অবশ্যে সাধিবা গতি সমস্ত লোকর।
কিছু কৃষিকর্ম্মে মতি আছয় আমার
মাধবে বোলন্ত উত্তম কিরিষি।
তাহ বুলি গীতে এক করিলা হরিষ॥"

এখানে দামোদরদেব শঙ্করদেবকে আত্মকথা নিবেদন করিতেছেন। দামোদরদেব কৃষির কথা বলিলে শঙ্করদেব "কৃষি" শব্দের উপর রহস্য করিয়া হরিনামের "কৃষি"র বিষয়ে একটী গীত রচনা করেন। মাধবদেবের পদাবলী মধ্যে ঐ গীতটির উল্লেখ আছে :—

কিরিষি কর আলেহ মনাই হরিচরণ
সেবার পরম সুখে।
যতন করিয়া হরির নাম সদা ভাব সুখে।
অরুণ বরণ হরির চরণ সদায় চিন্ত মনে।
থরে নামারে বানে লেনে ফলে ছলে বলে॥
হেন কিরিষি তেজিয়া মনাই কোন কিরিষি কর।
থরে মারিব বানে দুঃখ পায় কেনে মর॥
ভাল খেতখানি হরির চরণ বতর বান্ধিয়া নৈয়ো।
যেমন বলি তেমন হয় যতন করিয়া বৈয়ো॥
হরির চরণে চি শষ্য বলি সকল অবিনাশী।
যত খুজি তত পায় এবড় কিরিষি॥
সব তেজিয়া নৈয়ো মনাই সন্তের সঙ্গতি।
তেবেসে কিরিষি ফলে কহয় মাধব মূঢ়মতি॥

৺রাম রায় চরিতেও দামোদর দেবের কৃতির কথা উল্লেখ আছে। শঙ্করদেব স্বয়ং তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার লইয়া তাঁহাকে নিজ মতানুবর্ত্তী করিয়া লন। তিনি তাঁহার নিকট পাটবাউসীতে অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতেন ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন।

দামোদরদেব কাহার নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কোন পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। নলোচা গ্রামনিবাসী রাম রায় লিখিয়াছেন, তিনি জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন:—

"আসিলন্ত নারদ সন্ন্যাসী রূপ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তিভাব ধরি॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিরে জানিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাওক তত্ত্বজ্ঞান দিলা॥"

রামরায়ের মতে দামোদর দেব বিষ্ণুর অংশে অবতার হন।

দামোদর দেব শঙ্কর দেব প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বিভিন্নভাবে জনসমাজে প্রচার করেন। মহাপুরুষীয়াদিগের যে চারি নামাত্মক মন্ত্র দামোদরীয়ারাও তাহাই গ্রহণ করেন। বরপেটায় অবস্থান করত ধর্ম্মপ্রচার কালে কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ, শিববর দৈবজ্ঞ ও কামেশ্বর গিরিসহ বিজয়পুরে কোচরাজ পরীক্ষিতের নিকট দামোদরদেবের বিরুদ্ধে বহু-দোষাবহ কথা বলায় রাজা তাঁহাকে তথা হইতে ধৃত করাইয়া আনেন। বিচারকালে দামোদর দেব তাঁহাকে নিজ ধর্ম্মমত বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

দামোদর দেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন ভগবানদেব, ভট্টদেব ভট্টাচার্য্য, বলদেব (১) ও সন্তদেব। ইঁহাদের মধ্যে ভট্টদেব স্বনামধন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভট্টদেব দামোদর দেবের আজ্ঞানুযায়ী ভাগবত, গীতা ও রত্নাবলী এই তিনখানি পুস্তক গদ্য ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দামোদর দেব ভট্টদেবকে পাটবাউসী সত্রের অধিকারী করিয়া কুচবিহারে চলিয়া যান এবং সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ বা বৈকুণ্ঠপুর নামে এক সত্র স্থাপন করেন। কুচবিহারে অবস্থানকালে তিনি "বেদুয়া" নামক চৈতন্যপন্থী জনৈক ব্রাহ্মণকে পুনরায় দীক্ষা দিয়া নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। দামোদর দেব শঙ্করদেব অথবা মাধবদেব অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য দ্বারা অনেক গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের তিরোভাবের পর তদীয় শিষ্য মাধবদেবের উপর ধর্ম্মাদি ন্যস্ত হওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন হইয়া "মাধবদেব কর্ত্তৃত্বের বাহিরে" বলিয়া চলিয়া যান। শঙ্করদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে মাধবদেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। দামোদরদেব বলেন, "তিনি শূদ্র, একারণ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন না।" ইহাতে মাধবদেবের সহিত তাঁহার মনান্তর হওয়ায় উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়।

বিগত ১৩২৭ সালে আসাম অঞ্চলের কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণকালে দামোদরদেব সম্বন্ধে অনেক কল্পিত কথা লেখকের কর্ণগোচর হইয়াছিল। কেহ বলেন "তিনি আগম (শিবোক্ত তন্ত্র), নিগম (বেদ) উভয় ধর্ম্মমত মানিয়া চলিতেন।" কেহ বলেন, "তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" কেহ বলেন "তিনি শিষ্যদের ইচ্ছানুযায়ী শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মমতে দীক্ষা দিতেন।" তাঁহাদিগের এ সকল কথার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বঙ্গদেশের সহজিয়া বৈষ্ণবেরা যে রকমে চৈতন্যচরিতে কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহাকে "পরকীয়া" রতির প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করেন, আসামের অনেক শাক্ত, বৈষ্ণব দামোদর দেবের বিষয়ে তাহাই করিয়া থাকেন। ফলকথা—শঙ্করদেবের তিরোভাবের পর মাধবদেবের উপর ধর্ম্মাদি ন্যস্ত হওয়ায় দামোদর দেব মনঃক্ষুণ্ন ও তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া চলিয়া যান। শঙ্করদেব শূদ্র (কায়স্থজাতীয়) এবং দামোদর দেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইজন্যই দামোদর-পন্থীরা আপনাদিগকে "বামুনীয়া" বলিয়া পরিচয়

---

(১) বলদেব — ইঁহার প্রধান শিষ্য বনমালী দেব দক্ষিণপাট-সত্রের সংস্থাপক। বনমালী দেব কুরুবাহী সত্রের বিপ্রদেবকে ধর্ম্মগদি অর্পণ করিয়া বিহারস্থ দামোদর সত্রে গমন করেন।

দেন। দামোদর দেবের উপর শূদ্রের (শঙ্করের) প্রভাব লুক্কাইত রাখিবার উদ্দেশে শেষে তাঁহারা অনেক অমূলক কথার সৃষ্টি করেন। কিন্তু দামোদর দেবের প্রধান শিষ্য ভট্টদেব সঙ্কলিত সংস্কৃত "ভক্তি-বিবেক" নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, "শঙ্করদেব যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন দামোদর দেব তাহার একটুও বাহিরে চলিয়া যান নাই।" কিন্তু ইদানীং "বামুনীয়া" সম্প্রদায়ের বহুলোক আপনাদিগকে বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রমাণ করিবার জন্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপও করিয়া থাকেন।

দামোদরদেব প্রতিষ্ঠিত সত্র
।
(পাটবাউসী সত্র)

ভগবানদেব	ভট্টদেব	বলদেব	সন্তদেব
(গোবিন্দপুর সত্র)	(১)পাটবাউসীসত্র (২)ব্যাহকুচি বা ব্যাসকুচী সত্র।	(বেহারসত্র) । বনমালীদেব (দক্ষিণপাট সত্র)	(গরৈমারিসত্র)

গোপাল দেব—

ইনি ১৪৭০ শকে মালিপুর গ্রামে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বলভদ্র এবং মাতার নাম যমুনা দেবী। বাল্যকালে পিতৃমাতৃবিয়োগ ঘটিলে গোপালদেব ভগ্নীপতির গৃহে লালিত-পালিত হন। শঙ্করদেবের বরদোয়ায় অবস্থানকালে গোপালদেব কার্য্যবশতঃ সেখানে গমন করেন। শঙ্করদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবদিগের সংসর্গে কালযাপন করেন। তিনি বংশী লইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "বংশীগোপাল" নামে ডাকিতেন। শঙ্করদেবের তিরোভাবের পর গোপাল দেব বরপেটায় গমনপূর্ব্বক মাধবদেবের নিকট অবস্থান করত তাঁহার সহিত শঙ্করদেবের ধর্ম্মনীতি আলোচনা করেন। মাধবদেবের আজ্ঞানুযায়ী তিনি উজনী (২) অঞ্চলে শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। গোপালদেবের চরিতে উল্লেখ আছে:—

"মহাপুরুষর ধর্ম্ম মাপিয়া লোকত।
দেহ এরি রহিলন্ত বৈকুণ্ঠ পুরত॥
(গোপালদের-চরিত)

গোপালদেব দামোদর দেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেও মাধবদেবের নিকট সাত বৎসর থাকিয়া শঙ্করদেবের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করেন এবং তাঁহারই কথামত উজনীতে সত্র স্থাপন করেন। ইঁহার স্থাপিত সত্র (আখড়া) গুলির মধ্যে কাঁহিকুচি, কমলাবাড়ী, ডেবেরাপার, পৌরাণি ও কুরুয়াবাহী সত্র প্রধান। গোপালদেবের তিরোভাবের পর তদীয় প্রধান শিষ্য নিরঞ্জনদেব আউনীয়াটী সত্র এবং বনমালীদেব দক্ষিণপাট সত্র স্থাপন করেন। আউনীয়াটীতে গোপালদেবের "গোবিন্দ" নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তিনি উহা জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সত্র পরবর্ত্তীকালে শাক্তমতেরও সমর্থন করেন। ইহার ঐতিহাসিক কারণ আছে। আহোম রাজগণ (৩) হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শাক্তমত অবলম্বন করিলে রাজ-অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় দক্ষিণপাট সত্র শাক্তআদি মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু মূলত উহা মহাপুরুষীয়া সত্র। মিশ্রদেব কুরুবাহী সত্রের গদি অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে গোপালদেব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও শঙ্করদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "মদন-গোপাল" মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

বংশীগোপাল দেব প্রতিষ্ঠিত সত্র।

মিশ্রদেব	জয়হরিদেব ও লক্ষ্মীকান্তদেব	নিরঞ্জন পাঠক	লক্ষ্মীদেব	অর্জ্জুনদেব
(কুরুবাহী-সত্র)	(গরমুর-সত্র)	(আউনীয়াটী-সত্র)	(দবেরাপার সত্র)	(নচাপরি-সত্র)

মিশ্রদেব (কুরুবাহী-সত্র) হইতে: রামচন্দ্র (কুরুবাহী), কৃষ্ণকান্ত (ডিফলু-সত্র)

গতিকান্ত (শ্রবণী সত্র), হরি (পরপুখুরীয়া সত্র)

(২) উজনী—এই শব্দটী সম্ভবতঃ উ+যা ধাতু হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ উপরের দিকে যাওয়া। নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়াকে অসমীয়ারা "উজাই যাওয়া" বলেন। আসামের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র; কাজেই কামরূপ হইতে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বিরুদ্ধে যাইয়া যে সকল স্থান পাওয়া যায় অসমীয়াতে তাহাদিগকে "উজানী অঞ্চল" বলা যায়। বর্ত্তমানে কামরূপের পূর্ব্বদিকে যে সকল জেলা আছে অসমীয়ারা তাহাদিগকে "উজানী" বলিয়া থাকেন।

(৩) আহোম রাজগণ—ইঁহাদের প্রদত্ত ব্রহ্মত্তর ও দেবত্তর ভূসম্পত্তির দ্বারা আসামের অনেক ব্রাহ্মণ, গোঁসাই ও মোহন্তর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা অদ্যাবধি চলিতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়।

(লোকমান্য ৺ বালগঙ্গাধর টিলকের টিপ্পনীর
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদ)

[প্রথমে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগ সাংখ্যমার্গের সমানই মোক্ষপ্রদ কিন্তু স্বতন্ত্র এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং যদি এই মার্গের অল্পও আচরণ করা যায়, তো তাহা ব্যর্থ হয় না; অনন্তর এই মার্গের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উদ্দেশ্য যাহার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের এই কসরত করিতে হয়, সেই সকল নিছক বাহ্য ক্রিয়া নহে, উহার এখন পর্য্যন্ত বিচার হয় নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানই অর্জ্জুনকে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের এই প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, "কামক্রোধ প্রভৃতি শত্রু ইন্দ্রিয়সমূহে আপনাদের ঘর প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে" (৩. ৪০, ৪১) এইজন্য প্রথমে তুমি ইন্দ্রিনিগ্রহ করিয়া এই শত্রুগুলিকে মারিয়া ফেল। এবং পূর্ব্ব অধ্যায়ে যোগযুক্ত পুরুষের যে বর্ণন করা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা "জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত" (৬. ৮) যোগযুক্ত পুরুষ "সমস্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে এবং পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণীকে" দেখেন (৬. ২৯)। অতএব যখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার বিধি বলিয়া চুকিলেন, তখন ইহা বলা আবশ্যক হইল যে, 'জ্ঞান' এবং 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে, এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও কর্ম্মযোগমার্গের কোন্ বিধি দ্বারা অন্তে নিঃসন্দিগ্ধ মোক্ষ লাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অবধি সতেরো অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত—এগারো অধ্যায়ে—এই বিষয়ের বর্ণনা আছে এবং শেষের অর্থাৎ অষ্টদশ অধ্যায়ে সমস্ত কর্ম্মযোগের উপসংহার হইয়াছে। সৃষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক বিনশ্বর পদার্থে একই অবিনাশী পরমেশ্বর সমান রহিয়াছেন—ইহা বুঝিবার নাম 'জ্ঞান', এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে 'বিজ্ঞান' বলে (গী. ১৩. ৩০), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা ব্যতীত নিজের শরীরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহাকে আত্মা বলে, উহার প্রকৃত স্বরূপকে জানিয়া লইলেও পরমেশ্বরের স্বরূপের বোধ হইয়া যায়। এই প্রকারের বিচারকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার বলে। তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর-অক্ষরের বিচার বর্ণনা করিয়া পুনরায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারের বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্যপি পরমেশ্বর এক, তথাপি উপাসনার দৃষ্টিতে উহাতে দুই ভেদ আছে, উহার অব্যক্ত স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ-যোগ্য এবং ব্যক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য। অতএব এই দুই মার্গ বা বিধিকে এই নিরূপণেই বুঝাইতে হইয়াছে যে বুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বরকে কিরূপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা বা ভক্তি দ্বারা ব্যক্ত স্বরূপে উপাসনা করিলে উহা দ্বারা অব্যক্তের জ্ঞান কিরূপে হয়। তখন এই সমুদয় বিচারে যে এগার অধ্যায় লাগিয়া গেল, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা ব্যতীত এই দুই মার্গে পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহও নিজে নিজেই হইয়া যায়, অতএব কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহসম্পাদক পাতঞ্জল যোগমার্গ অপেক্ষা মোক্ষ-ধর্ম্মে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের যোগ্যতাও অধিক মান্য যায়। তবুও মনে রাখিও যে, এই সমস্ত বিচার কর্ম্ম-যোগমার্গ উপপাদনের এক অংশ, উহা স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি এবং তৃতীয় ষড়ধ্যায়ীতে জ্ঞান, এই প্রকার গীতার যে তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা হয় তাহা তত্ত্বতঃ ঠিক নহে। স্থূলভাবে দেখিলে এই তিন বিষয় গীতাতে আসিয়াছে সত্য পরন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু কর্ম্মযোগের অঙ্গ-রূপেই উহার বিচার করা হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতারহস্যের ১৪শ প্রকরণে (৪৬০-৪৬৫) করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না। এখন দেখিতে হইবে যে, সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ ভগবান কি প্রকারে করিয়াছেন।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥
মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

শ্রীভগবান কহিয়াছেন—(১) হে পার্থ! আমাতে চিত্ত লাগাইয়া এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া (কর্ম্ম-) যোগের আচরণ করিতে থাকিলে তোমার যে প্রকারে বা যে বিধি দ্বারা আমার পূর্ণ ও সংশয়বিহীন জ্ঞান হইবে, তাহা শোন। (২) বিজ্ঞানসহ সেই পূর্ণ জ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিয়া লইলে এই লোকে আর কিছুই জানিবার জন্য বাকী থাকে না।

[প্রথম শ্লোকের "আমাকেই আশ্রয় করিয়া" এই শব্দে এবং বিশেষত 'যোগ' শব্দে প্রকাশ হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্যই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা হইয়াছে—স্বতন্ত্ররূপে বলা হয় নাই (গীতার পৃঃ ৪৬২-৪৬৩)। কেবল এই শ্লোকেই নহে, প্রত্যুত গীতাতে অন্যত্রও কর্ম্মযোগকে লক্ষ্য

করিয়া এই শব্দ আসিয়াছে 'মদ্যোগমাশ্রিতঃ' (গী. ১২. ১১) 'মৎপরঃ' (গী ৫৭ এবং ১১. ৫৫); অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যে যোগের আচরণ করিতে গীতা কহিতেছেন, তাহা পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগই। কতকগুলি লোক বিজ্ঞানের অর্থ অনুভবিক ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, পরন্তু উপরের কথনানুসারে আমি জানিতেছি যে, পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ (জ্ঞান) এবং ব্যষ্টিরূপ (বিজ্ঞান) এই দুই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান শব্দে উহাই অভিপ্রেত (গী ১৩. ৩০ আর ১৮. ২০ দেখ)। দ্বিতীয় শ্লোকের এই শব্দ "আবার আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না" উপনিষদের ভিত্তিতে লওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে উহার পিতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "যেন... অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি"—উহা কি যে একটীকে জানিয়া লইলে সকলই জানিয়া লওয়া যায়? এবং ফের পরে পুনরায় উহার এইরূপ খোলসা করিয়াছেন, "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছা. ৬. ১. ৪)—হে তাত! যে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ জানিয়া লইলে জানা যায় যে, অবশিষ্ট মাটির পদার্থ ঐ মৃত্তিকারই বিভিন্ন নামরূপধারণকারী বিকার, অন্য কিছু নহে; ঐ প্রকারই ব্রহ্মকে জানিয়া লইলে অন্য কিছুই জানিবার থাকে না। মুণ্ডক উপনিষদেও (১. ১. ৩) আরম্ভেই এই প্রশ্ন আছে যে, "কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান হইয়া যায়? ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, অদ্বৈত বেদান্তের এই তত্ত্বই অভিপ্রেত হয় যে, এক পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে আর কিছুই জানিবার থাকে না; কারণ জগতের মূলতত্ত্ব তো এক, নাম ও রূপের ভেদে উহাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহা ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু জগতে নাই-ই। যদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রতিজ্ঞা সার্থক হয় না।]

(৩) হাজার মনুষ্যের মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধির দিকে যত্ন করে, এবং প্রযত্নকারী এই (অনেক) সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে এক-আধ জনই আমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে।

[মনে রাখিও যে, এখানে প্রযত্নকারীকে যদ্যপি সিদ্ধ পুরুষ বলা হইয়াছে, তথাপি পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া গেলেই উহার সিদ্ধিলাভ হয়, অন্যথা হয় না। পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষর বিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার এই দুই ভাগ। তন্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরম্ভ করিতেছেন—]

§§ ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

(৪) পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (এই পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত), মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। (৫) ইহা অপরা অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর (প্রকৃতি)। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইহা জান যে, ইহা হইতে ভিন্ন, জগতের ধারণশীল পরা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর জীবস্বরূপ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি আছে। (৬) বুঝিয়া রাখ যে, এই দুই হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মূল এবং প্রলয় অর্থাৎ অন্ত আমিই। (৭) হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে বাঁধা মণিসমূহের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গাঁথা আছে।

[এই চারি শ্লোকে সমস্ত ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে; এবং পরের শ্লোকসমূহে ইহারই বিস্তার করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে সমস্ত সৃষ্টির অচেতন অর্থাৎ জড় প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ এই দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই দুই তত্ত্ব হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন—এই দুই হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ত্ব নাই। পরন্তু গীতায় এই দ্বৈত সমর্থিত হয় নাই। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষকে একই পরমেশ্বরের দুই বিভূতি মনে করিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে জড় প্রকৃতি নিম্ন শ্রেণীর বিভূতি এবং জীব অর্থাৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বিভূতি; এবং বলিয়াছেন যে, এই দুই হইতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হয় (দেখ গী. ১৩. ২৬)। তন্মধ্যে জীবভূত শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির সবিস্তার বিচার ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টিতে পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে করিয়াছেন। এখন রহিল জড় প্রকৃতি, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে, (দেখ গীতা ৯, ১০) উহা স্বতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় উহা হইতে সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে। যদ্যপি গীতা প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা মানেন নাই, তথাপি সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির যে ভেদ আছে উহাই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গীতাতে গ্রাহ্য করা হইয়াছে। (গীতার পৃ. ১৮০-১৮৪)। এবং পরমেশ্বর হইতে

মায়া দ্বারা জড় প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর (গী. ১৪) প্রকৃতি হইতে সমস্ত পদার্থ কিরূপে নির্ম্মিত হয় সাংখ্যের কৃত এই বর্ণনা অর্থাৎ গুণোৎকর্ষের তত্ত্বও গীতার মান্য (গীতার. পৃ. ২৪৪ দেখ)। সাংখ্যের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ তত্ত্ব হইতেছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি হইতেই তেইস তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই তেইশ তত্ত্বে পাঁচ স্থূল ভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোল তত্ত্ব, শেষ সাত তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অর্থাৎ উহাদের বিকার। অতএব "মূলতত্ত্ব" কতগুলি, এই বিচার করিবার সময় এই ষোল তত্ত্বকে ছাড়িয়া দেয়; এবং এইগুলি ছাড়িয়া দিলে বুদ্ধি (মহান) অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূত) মিলিয়া সাতই মূল তত্ত্ব বাকী থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে এই সাতকেই "প্রকৃতি-বিকৃতি" বলা হয়। এই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি এবং মূলপ্রকৃতি মিলিয়া এখন আট প্রকারেরই প্রকৃতি হইল; এবং মহাভারতে (শা. ৩১০. ১০-১৫) ইহাকেই অষ্টধা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। পরন্তু সাত প্রকৃতি-বিকৃতির সঙ্গেই মূল প্রকৃতিকে গণনা করা গীতার যোগ্য হয় নাই মনে হয়। কারণ এইরূপ করিলে এই ভেদ দেখানো যায় না যে, এক মূল এবং উহার সাত বিকার হয়। এই কারণেই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি এবং মন মিলিয়া অষ্ট প্রকার মূল প্রকৃতি হইয়াছে, গীতার এই বর্গীকরণে এবং মহাভারতের বর্গীকরণে সামান্য ভেদ করা হইয়াছে (গীতার পৃঃ ১৮৫)। সার কথা, যদ্যপি সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতি গীতার স্বীকৃত নহে, তথাপি স্মরণ রাখিও যে উহার পরের বিস্তারের নিরূপণ উভয়েই বস্তুত সমানই করিয়াছে। গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা আছে যে,—সামান্যতঃ পরব্রহ্ম হইতেই হয়:—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

"এই (পর-পুরুষ) হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্বের ধারয়িত্রী পৃথ্বী—এই (সমস্ত) উৎপন্ন হয়" (মুণ্ড. ২. ১. ৩ কৈ. ১. ১৫; প্রশ্ন ৬. ৪)। অধিক জানিতে হইলে গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণ দেখ। চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পৃথ্বী, জল প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব আমিই; এবং এখন এই সকল তত্ত্বে যে গুণ আছে তাহাও আমিই ইহা বলিয়া উপরের এই উক্তির স্পষ্টীকরণ করিতেছেন যে, এই সমস্ত পদার্থ একই সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় গাঁথা আছে।]

§§ রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২॥

(৮) হে কৌন্তেয়! জলে রস আমি, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা আমি, সকল বেদের মধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার আমি, আকাশে শব্দ আমি এবং সকল পুরুষের পৌরুষ আমি। (৯) পৃথ্বীতে পুণ্য গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধি এবং অগ্নির তেজ আমি, সকল প্রাণীর জীবনশক্তি এবং তপস্বীর তপস্যা আমি। (১০) হে পার্থ! আমাকে সকল প্রাণীর সনাতন বীজ বলিয়া অবগত হও। বুদ্ধিমান-দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজও আমি। (১১) কাম (বাসনা) এবং রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি (এই দুইকে) বর্জ্জন করিয়া বলবান লোকের বল আমি; এবং হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাণীগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং ইহা জান যে, যে কিছু সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসভাব অর্থাৎ পদার্থ আছে সে সমস্ত আমা হইতেই হইয়াছে; পরন্তু তাহারা আমাতে আছে, আমি ঐ সকলে নাই।

["তাহারা আমাতে আছে, আমি ঐ সকলে নাই" ইহার অর্থ বড়ই গম্ভীর। প্রথম অর্থাৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য মণিসমূহে সূত্রের সমান এই পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মও যদ্যপি পরমেশ্বরই হন, তথাপি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি ইহাতেই চুকিয়া যায় না; বুঝা আবশ্যক যে, ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়া ইহার পরেও ঐ পরমেশ্বরই আছেন; এবং এই অর্থই পরে "এই সমস্ত জগতকে আমি একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছি" (গী. ১০. ৪২) এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত অন্য অর্থও সর্ব্বদাই বিবক্ষিত থাকে। উহা এই যে, ত্রিগুণাত্মক জগতের নানাত্ব যদিও আমার নিকটে নির্গুণ হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ঐ নানাত্ব আমার নির্গুণস্বরূপে থাকে না এবং এই দ্বিতীয় অর্থকে মনে রাখিয়া "ভূত-ভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ" (৯. ৪ ও ৫) ইত্যাদি পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে (গী. ১৩. ১৪-১৬)। এই প্রকারে যদি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি সমস্ত জগত হইতেও অধিক হয়, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিবার জন্য এই মায়িক জগত হইতেও উপরে যাওয়া আবশ্যক, এবং এখন ঐ অর্থই স্পষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন—]

§§ ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

(১৩) (সত্ব, রজ ও তম) এই তিন গুণাত্মক ভাব অর্থাৎ পদার্থ দ্বারা মোহিত হইয়া এই সারা সংসার, ইহা হইতে অতীত (অর্থাৎ নির্গুণ) অব্যয় (পরমেশ্বর) আমাকে জানে না।

[মায়া সম্বন্ধে গীতারহস্যের নবম প্রকরণে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মায়া অথবা অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আত্মার নহে; আত্মা তো জ্ঞানময় ও নিত্য, ইন্দ্রিয়সকল উহাকে ভ্রমে ফেলে—ঐ অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। (গীতা. ৭. ২৪ এবং গী. র. পৃ. ২৪০-২৫১ দেখ।]

(১৪) আমার এই গুণাত্মক এবং দিব্য মায়া দুস্তর। অতএব যে আমারই শরণাগত হয়, সেই এই মায়া অতিক্রম করে।

[ইহা হইতে প্রকট হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই গীতাতে ভগবান আপনার মায়া কহিতেছেন। মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, নারদকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পর শেষে ভগবান বলিয়াছিলেন যে—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

"হে নারদ! তুমি যাহা দেখিতেছ, ইহা আমারই উৎপন্ন মায়া। তুমি আমাকে সকল প্রাণীর গুণের দ্বারা যুক্ত বুঝিও না" (শা ৩৩৯. ৪৪)। ঐ সিদ্ধান্তই এখন এখানেও বলিয়াছেন। গীতারহস্যের নবম ও দশম প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, মায়া কি জিনিষ।]

(১৫) মায়া যাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেই মূঢ় ও দুষ্কর্ম্মী নরাধম আসুরী বুদ্ধিতে পড়িয়া আমার শরণাগত হয় না।

[ইহা বলা হইয়াছে যে, মায়াতে নিমগ্ন লোক পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যায়। এখন এইরূপ যাহারা করে না অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়া তাঁহাতে ভক্তিপরায়ণ লোকের বর্ণনা করা হইতেছে।]

§§ চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

(১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! চারি প্রকার পুণ্যাত্মা লোক আমাকে ভক্তি করিয়া থাকে—১ আর্ত্ত অর্থাৎ রোগে পীড়িত, ২ জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষী, ৩ অর্থার্থী অর্থাৎ দ্রব্য আদি কাম্য বাসনা মনে যে রাখে, এবং ৪ জ্ঞানী অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হওয়াতে পরে কিছুই প্রাপ্তব্য না থাকিলেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিশীল। (১৭) তন্মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ অনন্যভাবে আমাতে ভক্তিশীল এবং সর্ব্বদাই যুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে অবস্থিত জ্ঞানীর যোগ্যতা বেশী! জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। (১৮) এই সমস্ত ভক্তই উদার অর্থাৎ ভাল, কিন্তু আমার মত এই যে, (ইহাদের মধ্যে) জ্ঞানী তো আমার আত্মাই; কারণ যুক্তচিত্ত হইয়া (সকলের) উত্তম-উত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই সে দাঁড়াইয়া থাকে। (১৯) অনেক জন্মের পর এই অনুভব হইয়া গেলে যে, "যাহা কিছু আছে সে সকল বাসুদেবই", জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে। এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

[ক্ষর-অক্ষরের দৃষ্টিতে ভগবান নিজ স্বরূপের এই জ্ঞান বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় আমারই স্বরূপ এবং চারিদিক আমিই একভাবে পূর্ণ করিয়া আছি; ইহার সঙ্গেই ভগবান উপরে এই যে বলিয়াছেন যে, এই স্বরূপকে ভক্তি করিলে পরমেশ্বরকে জানা যায়, ইহার তাৎপর্য্য ভালরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক। উপাসনা সকলেরই আবশ্যক, ফের চাই ব্যক্তের কর চাই অব্যক্তের; কিন্তু ব্যক্তের উপাসনা সুলভ হইবার কারণেই এখানে উহারই বর্ণনা হইয়াছে এবং উহারই নাম ভক্তি। তথাপি স্বার্থবুদ্ধিকে মনে রাখিয়া কোন বিশেষ হেতুর জন্যই পরমেশ্বরকে ভক্তি করা নিম্ন শ্রেণীর ভক্তি। পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইবার জন্য ভক্তিশীলকেও (জিজ্ঞাসুকেও) যথার্থই ভালই বুঝিতে হইবে; কারণ উহার জিজ্ঞাসুত্ব অবস্থা হইতেই ব্যক্ত হয় যে, এখন পর্য্যন্ত উহার পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় নাই। তথাপি বলিয়াছেন যে, এই সকল ভক্তিশীল হইবার কারণে উদার অর্থাৎ ভাল মার্গে যাইতেছে (শ্লো ১৮)। প্রথম তিন শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা কৃতার্থ হইয়া যাহাদের এই জগতে কিছু করিবার অথবা পাইবার বাকী থাকে না (গী ৩. ১৭-১৯), এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে যে ভক্তি করেন (ভাগ. ১. ৭. ১০) তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ নারদাদির ভক্তি এই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এবং এই কারণেই ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ "ভক্তিযোগ অর্থাৎ পরমেশ্বরের নির্হেতুক ও নিরন্তর ভক্তি" স্বীকৃত হইয়াছে (ভাগ ৩. ২৯. ১২; এবং গীতার. পৃ ৪১৬-

৪১৭)। ১৭ম এবং ১৯ম শ্লোকের 'একভক্তিঃ' এবং 'বাসুদেবঃ' পদ ভাগবত ধর্ম্মের এবং ইহা বলিতেও কোনই ক্ষতি নাই যে, ভক্তের উক্ত সকল বর্ণনাই ভাগবত ধর্ম্মেরই। কারণ মহাভারতে (শা ৩৪১. ৩৩—৩৫) এই ধর্ম্মের বর্ণনাতে চতুর্ব্বিধ ভক্তের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

চতুর্ব্বিধা মম জনা ভক্তা এবং হি মে শ্রুতম্।
তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈবানন্যদেবতাঃ॥
অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্ম্মকারিণাম্।
যে চ শিষ্টাস্ত্রয়ো ভক্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ॥
সর্ব্বে চ্যবনধর্ম্মাস্তে প্রতিবুদ্ধস্তু শ্রেষ্ঠভাক্॥

অনন্যদৈবত এবং একান্তিক ভক্ত যেপ্রকার নিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারহিত কর্ম্ম করে সেই প্রকার অন্য তিন ভক্ত করে না, তাহারা কোন-না-কোন হেতু মনে রাখিয়া ভক্তি করে, এই কারণেই সেই তিন চ্যবনশীল হয় এবং একান্ত প্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানবান) হয়। এবং পরে 'বাসুদেব' শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি এই প্রকার আছে—"সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্" আমি প্রাণীমাত্রে বাস করি এই জন্যই আমাকে বাসুদেব বলে (শা ৩৪১. ৪০)। এখন এই বর্ণনা করিতেছেন যে, যদি সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর হন তবে লোক ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের কি ফল লাভ হয়—]

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩॥

(২০) আপন-আপন প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন (স্বর্গাদি ফলের) কাম-বাসনা দ্বারা পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার) নিয়ম পালন করিয়া অন্য দেবতার ভজনাতে নিযুক্ত থাকে। (২১) যে ভক্ত যে রূপের অর্থাৎ দেবতার শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করিতে চায়, উহার ঐ শ্রদ্ধাকেই আমি স্থির করিয়া দিই। (২২) আবার ঐ শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত হইয়া সে ঐ দেবতার আরাধনা করিতে থাকে এবং উহার আমারই নির্ম্মিত কামফল লাভ হয়। (২৩) কিন্তু (এই) অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রাপ্ত এই ফল নশ্বর (মোক্ষের ন্যায় স্থির থাকে না)। দেবতার ভজনশীল উহার নিকটে যায় এবং আমার ভক্ত আমার এখানে আসে।

[সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, যদ্যপি পরমেশ্বর মোক্ষদাতা, তথাপি সংসারের জন্য আবশ্যক অনেক ঈপ্সিত বস্তু দিবার শক্তি দেবতাতেই আছে এবং উহা প্রাপ্তির জন্য এই দেবতারই উপাসনা করা আবশ্যক। এই প্রকারে যখন এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া যায় যে, দেবতার উপাসনা করা আবশ্যক, তখন নিজ-নিজ স্বাভাবিক শ্রদ্ধা অনুসারে (গী ১৭. ১-৬) কেহ বৃক্ষ পূজা করে, কেহ কোন বেদীর পূজা করে এবং কেহ কোন বৃহৎ শিলাকে সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া পূজা করিতে থাকে। এই বিষয়েরই বর্ণনা উক্ত শ্লোকসমূহে সুন্দররূপে করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধ্যানযোগ্য প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনার যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে যে, ঐ দেবতাই উহা প্রদান করেন; কিন্তু পর্য্যায়-ক্রমে উহা পরমেশ্বরের পূজা হইয়া যায় (গী. ৯. ২৩) এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঐ ফলও পরমেশ্বরই দিয়া থাকেন (শ্লো. ২২)। কেবল ইহাই নহে, এই দেবতার আরাধনা করিবার বুদ্ধিও মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরই দেন (শ্লো ২১)। কারণ এই জগতে পরমেশ্বরের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। বেদান্তসূত্র (৩. ২. ৩৮-৪১) এবং উপনিষদেও (কৌষী ৩. ৮) এই সিদ্ধান্তই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অন্তে এক ও নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়—ইহাই এই ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার উপযোগিতা। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে ফল লাভ হয়, সে সকলই অনিত্য। অতএব ভগবানের উপদেশ এই যে, এই ফলসমূহের লাভের আশাতে না ডুবিয়া 'জ্ঞানী' ভক্ত হইবার আশা প্রত্যেক মানবের রাখা উচিত। মানিলাম যে, ভগবান সকল বিষয়ে কর্ত্তা এবং ফলদাতা, কিন্তু তিনি যাহার যেরূপ কর্ম্ম হইবে তদনুসারেই তো ফল দিবেন (গী ৪. ১১) অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও বলা যায় যে স্বয়ং কিছুই করেন না (গী. ৫. ১৪)। গীতারহস্যের ১০ম (পৃ ২৭০) এবং ১৩ম প্রকরণে (পৃ ৪৩৪—৪৩৫) এই বিষয়ের অধিক বিচার আছে, উহা দেখ। কেহ কেহ ইহা ভুলিয়া যায় যে, দেবতারাধনার ফলও ঈশ্বরই দেন এবং তাহারা প্রকৃতি-স্বভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পূজায় লাগিয়া যায়; এখন উপরের এই বর্ণনারই স্পষ্টীকরণ করিতেছেন —]

§§ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥

(২৪) অবুদ্ধি অর্থাৎ মূঢ় লোক, আমার শ্রেষ্ঠ, উত্তমোত্তম এবং অব্যয় রূপ না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত মানিয়া লয়। (২৫) আমি নিজের যোগরূপ মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবার কারণে সকলকে (আপন স্বরূপে) প্রকট দেখি না। মূঢ় ব্যক্তি জানে না যে, আমি অজ ও অব্যয়।

[অব্যক্ত স্বরূপ ছাড়িয়া ব্যক্ত স্বরূপ ধারণ করিবার যুক্তিকে যোগ বলে (দেখ গী. ৪. ৬, ৭. ১৫; ৯. ৭)। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন; এই যোগমায়া দ্বারা আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত স্বরূপধারী হন। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ব্যক্ত সৃষ্টি মায়িক অথবা অনিত্য এবং অব্যক্ত পরমেশ্বর যথার্থ বা নিত্য। কিন্তু কেহ কেহ এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও 'মায়ার' 'অলৌকিক' অথবা 'বিলক্ষণ' অর্থ মানিয়া প্রতিপাদন করেন যে, এই মায়া মিথ্যা নহে—পরমেশ্বরের সমানই নিত্য। গীতারহস্যের নবম প্রকরণে মায়ার স্বরূপের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি, এই কারণে এখানে এইটুকুই কহিতেছি যে, এই বিষয় অদ্বৈত বেদান্তেরও মান্য যে, মায়া পরমেশ্বরেরই কোন বিলক্ষণ ও অনাদি লীলা। কারণ মায়া যদিও ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন দৃশ্য, তথাপি ইন্দ্রিয়সমূহও পরমেশ্বরেরই সত্তা হইতে এই কাজ করে, অতএব অন্তে এই মায়াকে পরমেশ্বরের লীলাই বলিতে হয়। বাকী কেবল ইহার তত্ত্বতঃ সত্য বা মিথ্যা হওয়া; উক্ত শ্লোক সমূহে প্রকাশ হইতেছে যে, এই বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যে নামরূপাত্মক মায়া দ্বারা অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত মানা যায়, সেই মায়া—ফের চাই উহাকে অলৌকিক শক্তি বলো বা আর কিছু—'অজ্ঞান' হইতে উৎপন্ন দৃশ্য বস্তু বা 'মোহ', সত্য পরমেশ্বর-তত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক। যদি এরূপ না হয় তবে 'অবুদ্ধি' এবং 'মূঢ়' শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সারাংশ, মায়া সত্য নহে—সত্য এক পরমেশ্বরই। কিন্তু গীতার কথা এই যে, এই মায়াতে ভুলিয়া থাকিলে লোক অনেক দেবতার ফাঁদে পড়িয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৪. ১০) এই প্রকারই বর্ণনা আছে; সেখানে বলা হইয়াছে যে, যে লোক আত্মা ও ব্রহ্মকে একই না জানিয়া ভেদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফাঁদে পড়িয়া থাকে, সে 'দেবতাদিগের পশু', অর্থাৎ গবাদি পশু হইতে যেরূপ মানবের লাভ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী ভক্ত হইতেও কেবল দেবতাদিগেরই লাভ হয়, উহাদের ভক্তদের মোক্ষলাভ হয় না। মায়াতে মগ্ন হইয়া ভেদভাবে অনেক দেবতার উপাসনাকারীর বর্ণনা শেষ হইল। এখন বলিতেছেন যে, এই মায়া হইতে ধীরে ধীরে অবসর কি প্রকারে হয়—]

(২৬) হে অর্জ্জুন! ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ (যাহা হইয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে) সকল প্রাণীকেই আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। (২৭) কারণ হে ভারত! (ইন্দ্রিয়সমূহের) ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন (সুখ-দুঃখ আদি) দ্বন্দ্বের মোহে এই সৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী হে পরন্তপ! ভ্রমে আবদ্ধ হয়। (২৮) কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপের অন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা (সুখ-দুঃখ আদি) দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভক্তি করে।

[এই প্রকারে মায়া হইতে মুক্তি হইলে পরে উহার যে স্থিতি হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছেন—]

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং॥ ২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

(২৯) (এই প্রকারে) যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মরণ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন করেন তিনি (সব) ব্রহ্ম, (সব) অধ্যাত্ম এবং সকল কর্ম্ম জানিয়া লন। (৩০) এবং অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহিত (অর্থাৎ এই প্রকার যে, আমিই সব) যিনি আমাকে জানেন, সেই যুক্তচিত্ত (হইবার কারণে) মরণকালেও আমাকে জানিতে থাকেন।

[পরের অধ্যায়ে অধ্যাত্ম, আধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরণকালে মানুষের মনে যে বাসনা প্রবল থাকে, তদনুসারে উহার পরে জন্ম লাভ হয়; এই সিদ্ধান্তকে লক্ষ করিয়া অন্তিম শ্লোকে "মরণকালেও" শব্দ আছে; তথাপি উক্ত শ্লোকের 'ও' পদের দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে যে, মরণের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান না হইলে কেবল অন্তকালেই এই জ্ঞান হইতে পারে না (গী. ২. ৭২ দেখ)। বিশেষ বিবরণ পরের

। অধ্যায়ে বলা যাইতে পারে যে, এই দুই শ্লোকে অধিভূত। আদি শব্দ দ্বারা পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রস্তাবনাই করা। হইয়াছে।]

এই প্রকারে শ্রীভগবানের গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদে, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

'তোমার নামে'।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এল)

তোমার নামে তরুব আমি বিপদ-পাথার
তোমার নামে অগাধ জলে দিব সাঁতার!
তোমার নামে করব যাপন ঝঞ্ঝারাতি
তোমার নামে রাখব জ্বেলে পূজার বাতি
তোমার নামে ফুটবে হৃদে ফুলের পাঁতি
তোমার নামে সমান হবে আলো-আঁধার॥
তোমার নামে মধুর হবে বাক্য মনে
তোমার নামে লাগবে পুলক ক্ষণে ক্ষণে!
তোমার নামে চিত্তে মনে বাজবে বাঁশি
তোমার নামে মধুর হবে দুঃখ-রাশি
তোমার নামে জাগবে কাঁটায় ফুলের হাসি
তোমার নামে এক হবে এই এপার ওপার॥

জলবিহার।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

ভারতীয় পুরাতন সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থে আমোদপ্রিয় রাজাদিগের নানাপ্রকার জলবিহারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুবংশকাব্যে কুশের জলবিহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন জলকেলির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সরযূনদীর জলে বিহারাভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ নদীতীরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া জালের দ্বারা কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ানক জলজন্তুগুলিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। (১) হিন্দুদিগের চতুর্ব্বর্ণসম্বন্ধ যাবতীয় ব্যাপারই শাস্ত্রশাসনের অধীন; সুতরাং জলকেলির নিয়মপদ্ধতিও অতি পূর্ব্বকালেই প্রণীত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত স্থলের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কামন্দকের নীতিশাস্ত্র হইতেই অত্রত্য বর্ণনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কামন্দক জলবিহারের ব্যবস্থায় লিখিয়াছেন যে,—

"পরিতাপিষু বাসরেষু পশ্যন্ তটলেখাস্থিতমাপ্তসৈন্যচক্রম্।
সুবিশোধিতমীননক্রজালং ব্যবগাহেত জলং সুহৃৎসমেতঃ॥

ইহার অর্থ—গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিবসে নদীর তটে বিশ্বাসভাজন সৈন্যসামন্তকে দৃষ্টিগোচরে স্থাপন করিয়া মীননক্রাদির বিতাড়নজনিত সুবিশুদ্ধ অর্থাৎ নিরাপদ জলে সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়ার্থ প্রবেশ করিবে।

কালিদাসের লিপিভঙ্গী হইতে বুঝা যায় যে, অবস্থার তারতম্যানুসারে জলকেলির উপকরণেরও তারতম্য হইত। মহারাজ কুশ "চক্রধরপ্রভাব" অর্থাৎ বিষ্ণুসদৃশ প্রভুত্বশালী ছিলেন, তিনি "শ্রীমহিমানুরূপ" অর্থাৎ সম্পত্তির ও ক্ষমতার উপযুক্ত জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার জলবিহারে—"নৌ-বিমান অর্থাৎ বিমানসদৃশ নৌকা ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রস্তাবিতস্থলে "নৌ-বিমান" শব্দের অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে অতি প্রাচীনকালে বিলাসোপকরণ নৌকানির্ম্মাণে শিল্পীদিগের নিরতিশয় কৌশল প্রতিভাত হয়। কারণ—প্রসিদ্ধ পদার্থই উপমানরূপে উপন্যস্ত হইয়া থাকে; ইহাই দার্শনিকসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং কবির সময়ে বিমান বলিয়া যে পদার্থটি প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাই নৌকার উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোষগ্রন্থে ও নানাশ্রেণীর কাব্যাদিতে দুই প্রকার বিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি "দেবযান" "ব্যোমযান" প্রভৃতি নামে অভিহিত, অপরটি "সপ্তভূমিক ভবন" অর্থাৎ সাততলা দালান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান "ব্যোমযান"রূপ বিমানকে এখন সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে; পক্ষান্তরে "সপ্তভূমিক ভবন" রূপ বিমান কেবল সাহিত্যসেবীর নিকটেই নামত পরিচিত। কুশের জলবিহারনৌকার উপমানরূপে কোন বিমান অভিপ্রেত হইয়াছে? কবির অভিপ্রায় কি? তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে কবির সময়ে জলবিহার নৌকা যে বিমানের অনুকরণে প্রস্তুত হইত, তাহা বেশ

(১) স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভির্দ্ধ্বস্তমপায়নক্রাম্।
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং প্রচক্রমে চক্রধরপ্রভাবঃ। ১৬।৫৫

বুঝিতে পারা যায়। যদি "সপ্তভূমিক ভবন" অত্রত্য বিমান শব্দের অর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বিহার-নৌকাতে একটির উপরে অপরটি, এইভাবে সাতটি তালা বিন্যস্ত হইত, এবং ইহাতে নানাপ্রকার চিত্রের সন্নিবেশ হইত। কারণ—কালিদাস মেঘদূতে সপ্তভূমিকভবন বিমানে চিত্র-বিন্যাসের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"নেত্রানীতা সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং নবজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।"

পক্ষান্তরে যদি "ব্যোমযান"রূপ বিমানই বিহার-নৌকার উপমানরূপে অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহাতেও ফলতঃ বিশেষ প্রভেদ হয় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতি কর্দ্দমের বিহারসাধন কামচারী বিমানের যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তভূমিকভবন ও দেবযান বিমান এই উভয়ের অবয়বগত সৌসাদৃশ্যের অভাব নাই। সপ্তভূমিক ভবনে যেমন এক ভূমিকার উপর অপর ভূমিকার সন্নিবেশ, আকাশযান বিমানেও তেমনি গৃহোপরি গৃহসন্নিবেশ এবং তন্মধ্যে পৃথক পৃথক খট্বায় নানাবিধ শয্যা পাখা ও নানাপ্রকার আসন বিন্যস্ত।

"উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্লৃপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ॥" ৩।২৩।১৬

ইহাতেও বিহারস্থান, শয়নগৃহ, উপভোগস্থান, প্রাঙ্গন ও চত্বরের সমাবেশ আছে।

বিহার-স্থান-বিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ" । ৩।২৩।২১

ইহার মধ্যেও শোভাসম্পাদক নানাপ্রকার শিল্পের সমাবেশ, কতকস্থান মরকতমণি-নিবদ্ধ, তাহাতে আবার প্রবালের বেদী। দ্বারদেশে প্রবালের দেহলী অর্থাৎ রোয়াক্। হীরকনির্ম্মিত কপাট, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চূড়ার অগ্রভাগে স্বর্ণকলস সন্নিবিষ্ট, সুবর্ণময় ভিত্তিতে বিচিত্র পদ্মরাগমণির সন্নিবেশ, স্বর্ণময় তোরণে হারের বিন্যাস, বিচিত্র-বর্ণ বিতানেরও অভাব নাই। বিতানের অগ্রভাগে সুনিহিত কৃত্রিম হংসপারাবতকে বাস্তবিক মনে করিয়া, হংসপারাবতগুলি তাহাদের নিকটে যাইয়া স্বজাতি-সুলভ শব্দ করিয়া থাকে। ৩।২৩।১৭-২০।

সুতরাং দুই প্রকার বিমানই বিহার-নৌকার উপমান হইবার যোগ্য। অতএব "নৌ-বিমান" যে সাত-তালা জাহাজের আকারে প্রস্তুত হইত, এবং তাহাতে বিলাসোপযোগী শয্যাসনাদির বিন্যাস হইত, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসাহিত্যেও জলবিহার প্রসঙ্গে বিহারোপযোগী বিমানসদৃশ নৌকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। "দীপঙ্কর নামক পূর্ব্বতন বুদ্ধের মাতা সুদীপা দেবী "পদ্মসরোবরে" সখীবৃন্দের সহিত নৌকা-যানের দ্বারা জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার কেলিনৌকাগুলির মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে বেদিকা অর্থাৎ বসিবার উপযুক্ত বেঞ্চের মত আসন ছিল। স্থানে স্থানে বিতান ও বিচিত্র 'দুষ্য' অর্থাৎ তাঁবু খাটান ছিল। শোভা সম্পাদনার্থ 'পট্টবস্ত্রদাম' সম্ভবতঃ রেশমী রঙ্গীন কাপড়ের ঝালর টাঙ্গান ছিল। নৌকার মধ্যে বিলেপন দ্রব্য চন্দন প্রভৃতির লেপ ও সৌরভ-সম্পাদক ধূপের ব্যবস্থা ছিল; মুক্তাসদৃশ পুষ্প বিকীর্ণ ছিল এবং ছত্র, ধ্বজ ও পতাকা সুষমাসাধনরূপে বিন্যস্ত হইয়াছিল। নানা-স্থানে বিহারোপযোগী বেদিকাসমূহের বিন্যাস ছিল।" *

কাদম্বরী কাব্যে রাজা তারাপীড়ের ভবনদীর্ঘিকা মধ্যে অন্তঃপুরিকাবর্গের সহিত জলবিহারের বর্ণনা আছে। উহাতে ক্রীড়াসাধন নৌকার সম্পর্ক নাই। পৌরাণিক গ্রন্থে কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতির বিস্তৃত জল-বিহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ জলবিহারের বর্ণনা আছে। †

---

* "অথ মহামৌদগল্যায়ন। সুদীপা দেবী সখীহি সংপরিবৃতা, পদ্মিনীয়ে পুরিম-পশ্চিমবেদিহি বিতত্তবিতানেহি বিচিত্রদুষ্যপরিক্ষিপ্তেহি ওসক্তপট্টদামকলাপেহি লেপনলেপিতেহি ধূপনধূপিতেহি মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেহি বেদিকাজালসংপ্রতিক্ষিপ্তেহি উচ্ছ্রিতছত্রধ্বজপতাকেহি নাবাযানেহি প্রক্রীড়িতা"। (মহাবস্তু অবদান প্রথম খণ্ড ২৪৭ পৃঃ):

† এই প্রবন্ধের কতক অংশ যদিও লেখকের নবপ্রকাশিত "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বেই স্থান পাইয়াছে, তবুও বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাহা বাদ দিতে পারা যায় নাই।

সত্য।

(স্বরলিপি-সহ)

হে সত্য!
গহন গম্ভীর তুমি,
রুদ্র মধুর!
প্রণমি কমল চরণ।
অনন্ত জ্ঞান তুমি
শিবসুন্দর
আজি এসেছি শরণ!

হে সত্য,
নিখিল-প্রকাশ!
চিত্তকমলে মম হও হে বিকাশ,
আলাও তোমারি কিরণ!
সে কিরণে উঠো ফুটি
বচনেতে মম,
আচরণ হোক্ তার
সরল সুষম!
সে কিরণে নিও হরি
অজ্ঞান ভ্রান্তি,
সে কিরণে দিও তার
কল্যাণ কান্তি,
আজি এসেছি শরণ!
প্রণমি কমল চরণ!

হে সত্য,
দুর্লভ ধন!
ভক্তের সুলভ হয়ো, কুশলসাধন,
কৃপা করি বিকীরণ!
মঙ্গলে সুন্দরে কর।
সোণার বরণ.
সত্য হও নিত্য সখা
কলুষহরণ!
সত্যকামী, সত্যব্রত
সত্যচিন্তন
—লাভে জয়ে লাজে ভয়ে—
রেখো চিরন্তন!
আজি এসেছি শরণ!
প্রণমি কমল চরণ!

হিমালয় শ্রীসরলা দেবী।

নট্ নারায়ণ—একতালা।

পা II পা -া -ধা। মা -া -গরা। -গা -া -রা। -সা -া -া I -া -া -া।
হে স • • ত্য • • • • • • • • • • •

। প্া প্া প্া। ধ্া -া ন্া। সা রা রা I রা -গা রা। সন্া রা সা।
গ হ ন গ • ম্ভী র তু মি রু • দ্র ম ধু র

। সা সা গা। গা গা গা I মা -া মা। মপা -মগা -রসা। -রা -া -া।
প্র ণ মি ক ম ল চ • র ণ• •• •• • • •

। -া -া পা II
• • "হে"

সা II সা -মা মা। মা -পা পা। পহ্মা ধপা -া। -া ধা না I র্সা -র্রা র্রর্সা।
অ ন • ন্ত জ্ঞা • ন তু• মি • • শি ব সু • ন্দ•

। ধা -ণা -ধা। -পা -া -া। -া রা গা I মা ধা পা। মগা -মা রা।
র • • • • • • আ জি এ সে ছি শ• • র

। সা -া -া। -া -া পা II
ণ • • • • "হে"

সন্া II { সা -া রা। রসা -া -া। -া -া -া। -া - -া I পা পা পা।
হে • স • • ত্য • • • • • • • • নি খি ল

-া পা হ্মা। ধপা -া -া। -া -া (সন্া)} -া I {সা -া রা। সা ন্া সা।
• প্র • কা • • • শ্ হে• • চি • ত্ত ক ম লে

-া রা সরসা। ন্া -া -া I সা গা গা। গা -া রা। মা -গা রা। -া -া -া I
• ম ম•• • • • হ ও হে বি • • কা • শ • • •

I (পা পা পা। -া পা -হ্মা। ধপা -া -া। -া -া -া) I পা পা -া।
নি খি ল • প্র • কা • • • • শ আ লাও •

। ধা ধা -মা। মা মগা -রা। গা -া রা I সা -া -া। সা সা সা।
তো মা • রি কি• • র • • ণ • • সে কি র

। মা -া মা। গমা -পা মা। পা -া -া I ধা ণা ধা। পা -মা ধা।
ণে • উ ঠো• • ফু টি • • ব চ নে তে • ম

। পা -া -মা। -গা মগা -রা I রা গা মা। পা -া -া। ধা -পা মা।
ম • • • • • • আ চ র ণ • • তো • ক

। রা সা -া I সা মা মা। গমা -পা মা। পা -া -া। -া -া -া I পা পা পা;
তা য় • স র ল সু• • ম ম • • • • • সে কি র

। না -ধা না। র্সা -া র্সা। র্সা -া -া I র্সা -া র্গা। র্রা র্গা -র্মা।
ণে • নি ও • হ রি • • অ • জ্ঞা ন ভ্রা •

। র্গা -া র্রা। র্সা -া -া I পা পা পা। ণা -ধা পা। মা -গা রা।
ন্তি • • • • • সে কি র ণে • দি ও • ভ

। সা ন্া -া I প্া -ধ্া ন্া। সা -রা -া। রা -গা -রা। -সা -া -া I -া রা গা।
দি • • ক • ল্যা ণ কা • ন্তি • • • • • • আ জি

। মা ধা পা। মা -গমা রা। সা -া -া। -া -া -া। সা সা গা। গা গা গা।
এ সে ছি শ • • র ণ • • • • • প্র ণ মি ক ম ল

। মা -া মা। মপা -মগা -রসা। -রা -া -া। -া -া পা II
চ • র ণ• •• •• • • • • • হে

{ সন্‌া II সা -া -রা। রসা -া -া। -া -া -া। -া -া -া I পা -া পা।
হে স • • ত্য • • • • • • • • ছু • র্ণ

। পা পা -হ্মা। ধপা -া -া। (-া -া) } -া I { সা -া রা। সা সা ন্‌া।
ভ ধ • ন • • ভ • ক্তে র ঞ্জ ন

। সা -া রা। সরসা -ন্‌া -া I সা গা গা। গা -া গা। মা -মগা -রা।
ভ • হ মো•• • • কু শ ল সা • ধ ন • • •

-া -া -া I (পা -া পা। পা পা -হ্মা। ধপা -া -া। -া -া -া) } I
• • • ছু • র্ণ ভ ধ • ন • • • • •

পা পা -া। ধা ধা মা। গরা -গা রা। সা -া -া I সা -মা মা। মা মা -া।
কৃ পা • ক রি বি কী• • র ণ • • ম • ঙ্গ লে সু •

। মা গমা -পা। মা পা -া I ধা ধা -ণা। ধা পা -ধপা। মপা -ধপা -মা।
ন্দ রে• • ক র • সো ণা • র ব •• র• •• •

। গা -মগা -রা I রা -া গা। মা -া পা। ধা -পা মা। -া রা সা I
ণ •• • স • ত্য হ • ও নি • ত্য • স খা

I সা মা মা। গমা -পা মা। পা -া -া। -া -া -া I পা -া পা। না -র্সা না।
ক ল্‌ য হ• • র ণ • • • • • স • ত্য কা • মী

। র্সা -া র্রা। -া র্সা না I র্সা -া র্গর্রা। র্গা -া র্মা। র্গা -া র্রা। র্সা -া -া I
স • ত্য • ব্র ত স • ত্য• চি • ন্ত ন • • • • •

I পা পা -া। ধা ণা -ধা। পধা পমা -া। গা রসা -া I ন্‌া প্‌া ধ্‌া।
লা ভে • জ য়ে • লা• ভে• • ভ য়ে• • রে খো •

। ন্‌া সা -া। রা -গা -রা। সা -া -া I -া -া -া। -া রা গা। মা ধা পা।
চি র • ন্ত • • ন • • • • • • আ জি এ সে ছি

। মা -গমা রা I সা -া -া। -া -া -া। সা সা গা। গা গা গা I
শ • • র ণ • • • • • প্র ণ মি ক ম ল

I মা -া মা। মপা -মগা -রসা। -রা -া -া। -া -া পা II II
চ • র ণ• •• •• • • • • • হে

শ্রীনগরের পথে।

(শ্রীসুষমা দেবী)

বিশ্রামাগারে (waiting room) হাতমুখ ধুইয়া আবশ্যকীয় ওভারকোট প্রভৃতি লইয়া আমরা ল্যাণ্ডোতে চড়িয়া শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। হরিরাম এণ্ড সন্স নামক এক যাত্রী ও মালপত্রবাহক (public carriers) কোম্পানিকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দেওয়াতে পিণ্ডির ষ্টেশনে উঁহাদের লোক আসিয়া আমাদের একটি ভাল ল্যাণ্ডোতে উঠাইয়া দিল; আর আমাদের তল্পি-তল্পাগুলা সব একা গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লইয়া গেল। অধুনা মোটর গাড়ীরও বন্দোবস্ত আছে। আমরা কিন্তু মোটর গাড়ী সম্পূর্ণ নিরাপদ বিবেচনা করিলাম না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ভগিনী সু—র কাশ্মীর গমন কালে মোটর গাড়ী চূর্ণ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হয়। ভগবানের কৃপায় তিনি স্বামীসহ সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। অশ্বযানে ধীরে ধীরে যাওয়াতে আমাদের কিন্তু সুবিধাই হইল; সকলস্থান ভাল-রূপে দেখিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ পিণ্ডি হইতে যাত্রাকালীন দিবাভাগটী মেঘাচ্ছন্ন থাকায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মর্য্যাদা গ্রহণ করিবার দিব্য সুবিধা হইল এবং ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়ায় শরীরেরও কিছুমাত্র গ্লানিবোধ হইল না।

কোন একটি নূতন প্রদেশে আগমন করিলে সকলের প্রথমেই তথাকার নরনারীদিগের আকৃতি ও বসন-ভূষণের দিকে [illegible] পড়ে; আমাদেরও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। হিন্দু-মুসলমান-স্ত্রীপুরুষ সকলেরই একই প্রকারের পরিচ্ছদ; কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের মস্তক সাফা বা পাগড়ীর পরিবর্ত্তে শালের রুমাল, অথবা সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না দ্বারা আবৃত। মুসলমান রমণীগণের আপাদ-মস্তক বোরখা দ্বারা আবৃত। পরে, জাম্মু প্রভৃতি দেশের হিন্দুরমণীগণকেও বোরখা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। পথে যাইতে যাইতে বোরখা-আবৃত বহু রমণীকে অশ্বারোহণে যাইতে দেখিলাম। কোনও পর্ব্বত একে-বারে শ্বেতবর্ণের, বোধ হয় উহার উপাদানে চুণের ভাগ অধিক; আবার কোনটি লাল সুরকির ন্যায়। বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা 'ভাড়াখাটা' নামক চৌকীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাঙ্গলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে পুনরায় ল্যাণ্ডোতে উঠিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে স্থানে স্থানে লোকাট ফলের বাগান দেখিলাম। লোকাট বৃক্ষগুলি সোনালী বর্ণের ফলে এমন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে যে, দূর হইতে আমাদের ঠাকুর মার গল্পের মাণিকের গাছে সোনার ফুল-ফল ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। অ—অত লকেট ফল দেখিয়া মহাখুসী; বোধ হয় আরও অধিক খুসী হইত যদি এক কোঁচড় ফল লইয়া খাইতে খাইতে যাইতে পারিত। কিন্তু আমাদের গম্যস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে এই ভয়ে বাগানরক্ষকের নিকট গাড়ী থামাইয়া ফল ক্রয় করা হইল না। অ—কিন্তু পর্ব্বত গাত্রে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফল দেখিয়া তাহাদের সহিত রসনেন্দ্রিয়ের পরিচয় করি-বার জন্য আগ্রহ দেখাইল; কিন্তু গাড়ী থামাইয়া বিলম্ব করিতে আমরাও বিশেষ অনিচ্ছুক, সুতরাং বেচারীর আর রসনাতৃপ্তির সুবিধা হইল না। বালক দুইটি গাড়ীর আন্দোলনে প্রথম ঘণ্টাখানেক মনের সুখে নিদ্রা গেল, পরে বালকস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ গাড়ীর ভিতরেই খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। গৃহে হইলে উহাদের এত অস্থিরতা সহ্য করিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। উঁহারা এই দুই-তিন দিবস নিয়ত ট্রেনের ভিতর আবদ্ধ হইয়া কয়েদীর ন্যায় আসিয়াছে, একটু স্বাধীনতা না দিলে আমাদের বড়ই স্বার্থপরতা হয়, সুতরাং উহাদের চঞ্চলতা সহ্য করিয়া যাইতে হইল।

ঠিক সন্ধ্যাকালে আমরা 'ট্রেট' নামক দ্বিতীয় চৌকীতে আসিলাম। এখানে আসিয়া আবার মহাবিপদ—দেখি-লাম ডাকবাঙ্গলার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় দুইশত শিবির স্থাপিত, এবং সেই স্থান গোরা সৈন্যে পূর্ণ। একস্থানে কতকগুলি গোরা একটি গোহত্যা করিয়া তাহা রন্ধনের নিমিত্ত পরিষ্কার করিতেছে। আমাদের চক্ষে এই দৃশ্য বড়ই বীভৎস লাগিল। আরও, এত গোরা সৈন্য দেখিয়া হৃদয়ে যে ভীতির সঞ্চার না হইয়াছিল তাহাও নহে। এই কয়টি স্ত্রীলোক আমরা—পুরুষ অভিভাবকশূন্য; যে দুইটি ক্ষুদ্র পুরুষ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের রক্ষা বিষয়ে বরং আমরা আরও অধিক চিন্তিত। যাহা হউক, আমরা সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক গাড়ী ভিতরে আনাইলাম। বাঙ্গলার অঙ্গনে পদার্পণ করিতেই সেইখানকার এক কর্ম্মচারী সুদীর্ঘ সেলাম দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইতে আসিল দেখিয়া আমরা কিছু আশ্বস্ত হইলাম। বাঙ্গলার সমুদায় গৃহগুলি সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অধিকৃত; অবশিষ্ট একটি মাত্র গৃহে আমরা যাইয়া আশ্রয় লইলাম। সৈনিকদিগের অফিসরদিগকে দেখিতে পাইয়া আমরা নির্ভয় হইলাম। রাত্রে ভোজনান্তে আমরা যথাস্থানে শয়ন করিলাম, কিন্তু ভালরূপ নিদ্রা হইল না। দ্বারের সম্মুখেই একটি অস্ত্রধারী চৌকিদার শয়ন করিল। হায়! অগাধ সমুদ্রে এক বিন্দু বারির ন্যায় এই শত শত সৈন্যের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্রধারী পাহারা আমাদিগকে কি রক্ষা করিবে!

রাত্রি প্রভাত হইল; সূর্য্যোদয়ের সহিত রাত্রির আঁধার দূরীভূত হইল; উহার সহিত আমাদের হৃদয়ের ভীতিরূপ অন্ধকারও দূর হইয়া গেল এবং যথাকালে মারীর (Murree) জন্য রওনা হইলাম। ট্রেট হইতে মারী ১৩ মাইল মাত্র, কিন্তু রাস্তা এরূপ চড়াই যে অশ্ব দুইটি অতি ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। ইহাতে মারী পৌছিতে আমাদের দিবা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। আমাদের শকট পর্ব্বত গাত্র দিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া গমনকালে দূরে সৈন্যদিগের শিবিরগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বেঙের ছাতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

গ্রন্থ-পরিচয়।

পরকালতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষাসভার আনুকূল্যে মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

পরকালতত্ত্বের উপরই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। মৃত্যু হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবের সবখানিই নিঃশেষ হইয়া যায়, মৃত্যুর পরপারে তাহার কোন অস্তিত্বই আর না থাকে, তবে দেহ ব্যতীত আত্মা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কিছু স্বীকার করিবার দরকারই হয় না। আত্মা স্বীকার না করিলে ধর্ম্মই বল আর তাহার কেন্দ্রপুরুষ ভগবানই বল, উভয়ই কেমন ঝাপ্‌সা—ধোঁয়াটে হইয়া আসে। কাজেই পরকালের তত্ত্বটা আমাদের প্রত্যেকের বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা দরকার; অথচ বর্ত্তমানে দেখিতে পাই সকলেই ইহাকে একটু এড়াইয়া চলিতেই চাহেন। পারলৌকিক জ্ঞান অবশ্য আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে অল্পস্বল্প বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু অনুকূল শিক্ষার অভাবে তাহা দিন দিন এতই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে যে, সেই জ্ঞানের শাসনে আমাদের জীবন আর নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। যাহা হউক, আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরকালতত্ত্বের কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখক বেশ সরল ভাষায় সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তি এবং ভারতীয় ষড়দর্শনের যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা পরকালতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমে সংক্ষেপে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদীয় ধর্ম্মতত্ত্বের স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখক পরে পার্শী, শিখ, জৈন প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ধর্ম্মতত্ত্বগুলিরও আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যেকটাকে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনাক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার জন্য লেখককে যথেষ্ট শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া জীবনের অনেকখানি সময় যে এই সকলের অধ্যয়নে ও আলোচনায় কাটাইতে হইয়াছে, ইহা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়; নচেৎ তিনি জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে এমন বাছিয়া-গুছিয়া সাধারণের উপযোগী সরল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি লাভ করিতে পারিতেন না। পরকালতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মতবাদ ও যুক্তিগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় একত্র সঙ্কলন করায় লেখক বাঙ্গালা পাঠকের ধন্যবাদার্হ। এখানি প্রথম খণ্ড। লেখক আশা দিয়াছেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেততত্ত্বের মধ্য দিয়া পরকালতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইবে। আমরা তাহার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। অবশেষে পুস্তকখানির আকার প্রকারের তুলনায় ছয় আনা মূল্য নির্দ্দেশ যে সুলভ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন শিল্প পরিচয়। শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। রাজসাহী হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১০৮ নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণ প্রেসে শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য রাজসংস্করণ ২॥০ টাকা ও সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আমাদের দেশের অধুনা-লুপ্ত নানাবিধ প্রাচীন শিল্পের পরিচয়বিবরণ সংকলন করা হইয়াছে। ইহার জন্য লেখককে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গবেষণার সহিত বাছিয়া লইতে হইয়াছে। এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সম্পূর্ণ নূতন। আমরা বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অধ্যবসায়শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য, নাটক ও আখ্যায়িকা হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, তন্ত্র সূত্র, বৃত্তিভাষ্য, টীকা টিপ্পনী, কোষগ্রন্থ ও উপনিষদাদি পর্য্যন্ত কিছুই তিনি অনুসন্ধান করিতে বাকী রাখেন নাই। যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে একটী একটী করিয়া তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আজকালকার যে সব শিল্পদ্রব্যকে আমরা পাশ্চাত্যদিগেরই উদ্ভাবিত একান্ত নিজস্ব বলিয়া নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়া থাকি, বেদান্ততীর্থ মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সুদূর অতীতে আমাদের দেশেও বিদ্যমান ছিল। ইহার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে নিজের দেশের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কত অধিক তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইতে হয়, আবার যুগপৎ আত্মগৌরবের পূর্ব্বস্মৃতি অনুভব করিয়া চিত্ত উল্লসিতও হইয়া উঠে।

স্থানে স্থানে লেখকের গবেষণাপ্রবৃত্তি বেশ ফুটিয়া উঠিলেও, মনে হয় যেন, তিনি প্রমাণ সংগ্রহের দিকেই ঝোঁকটা কিছু বেশী দিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য ভালই হইয়াছে—প্রমাণ সমূহ হইতে যিনি যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই প্রকাশ করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। শিল্পের উপকরণ হিসাবে রত্ন সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিলেই ভাল হইত। 'বাদ্যযন্ত্র' প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পকথা সম্বন্ধে গ্রন্থকার প্রমাণাদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আরও আনন্দের বিষয় হইত। দুই চারিটী ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এই প্রয়োজনীয় অথচ দুর্গম পথের প্রথম যাত্রী বলিয়া আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে সানন্দে সম্বর্দ্ধনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীযুত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই, মহাশয়ের লিখিত সুন্দর ভূমিকাটী এই গ্রন্থের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়া ইহার সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য, গ্রন্থখানির মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ করিলে সাহিত্যানুরাগী মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণীর উপর সুবিচার করা হইত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ২১২ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ২৲ টাকা যেন কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মচারী। এই হিন্দী মাসিকের ফাল্গুন-সংখ্যাটী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা হরিদ্বার গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মুখপত্র। কাজেই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, পত্রিকাখানি লোকালয়ের কলহ-কোলাহলের অনেক ঊর্দ্ধে এবং আশ্রমোচিত শান্ত-গম্ভীরভাবে পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'ব্রহ্মচারী' যেরূপভাবে 'আর্য্যসমাজ' ও স্বামী দয়ানন্দকে আক্রমণ করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের তো দূরের কথা, ভদ্রতারও পরিচয় পাই না। আশা করি, এখন অবধি ইহা আশ্রমের উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইবে।

সংবাদ।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে স্কুল বন্ধ। গিরিডি হইতে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কোন বন্ধুর পত্রে আজ প্রাতঃকালে আপনার মেজ জ্যেঠা মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। তিনি অসময়ে যান নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড় হইতে এমন সাধু সন্তানের তিরোধান ব্রাহ্মমাত্রেরই গভীর শোকের কারণ। তাঁহার রচিত সঙ্গীত ও বন্দনা চিরদিন সকল সম্প্রদায়ের আদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে। এখন যে বঙ্গরমণী নিঃসঙ্কোচে দেশদেশান্তরে পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছেন—সে স্বাধীনতার তিনিই সূচনা করেন। সাক্ষাৎভাবে যদিও আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি নাই, কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের কথা ৺মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার প্রভৃতির মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছি এবং বহুদিন হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তির চক্ষে দেখিতাম। তিনি বঙ্গরমণীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া আজ এখানকার উচ্চ শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। সেই ব্রহ্মপরায়ণ স্বদেশ-ভক্ত সাধুর উদ্দেশে আজ বার বার প্রণাম করি।"

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র শুক্রবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তেরপথে অগ্রসর করিতেছেন, এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ শনিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটী নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন-প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৬॥০ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।